মধুসূদনের কবি-আত্মা
ও
কাব্যশিল্প

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত এম. এ., ডি. ফিল্.
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

—শ্রীচরণেষু

নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থে আমি মধুসূদনের কবি-আত্মার পরিচয় নেবার চেষ্টা করেছি, তারই আলোকে কবির কাব্যশিল্পের বিচার করেছি; আবার কাব্যশিল্পের ইঙ্গিতে কবি-আত্মার গভীরে পৌঁছবার চেষ্টাও করেছি। যুগপরিপ্রেক্ষিতের কথা এসেছে, কিছু আসা প্রয়োজন ছিল কবির ব্যক্তিত্বের পরিচিতির জন্যেই; কিন্তু ব্যক্তি-উপকরণকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছি; এবং সর্বাধিক মূল্য দিয়েছি কাব্যসৌন্দর্যকে।

দ্বিতীয় সংস্করণে বইটির অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। কয়েকটি নতুন অধ্যায় যোগ করেছি। মূল বক্তব্যের পরিবর্তন হয় নি—কিন্তু আমার অভিপ্রায় স্পষ্ট এবং পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রুফ সংশোধনে এবং তথ্যাদি সংকলনে বন্ধুবর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করছি।

ক্ষেত্র গুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
কবি-আত্মার পরিচয়

"কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ?"

য়ুরোপেব শক্তি তাহাব বিচিত্র প্রহবণ ও অপূব ঐশ্বযে পার্থিব মহিমার চূডাব উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইযাছে, তাহাব বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গর্জন করিতে করিতে চলিযাছে এই শক্তিব স্তবগানেব সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণ কথার একটি নূতন-বাঁধা তার ভিতরে ভিতবে সুর মিলাইযা দিল, এ কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল ?
—রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য।

॥ এক ॥

মধুসূদন যে কালে জন্মেছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসের সে কালের গৌরব অনেক। সে কালেব প্রতিভূ হিসেবে মধুসূদনকে দেখার রেওয়াজ দীর্ঘদিন চলে আসছে। বাংলা রেনেসান্সের সার্থক প্রতিনিধি মধুসূদন দত্ত। নবযুগের উল্লাস ও বেদনার সর্বাধিক গভীর প্রতিফলন তাঁর কাব্য-কবিতায়। নতুন মানবতার তিনি মুক্তিদাতা, মধ্যযুগের অন্ধ তমসাগর্ভ থেকে আলোকোজ্জ্বল নতুন পৃথিবীতে পদার্পণ তাঁরই পদচিহ্ন ধবে। বাংলা সাহিত্যের কালবদল, জাতবদলের পুরোধা তিনিই। তিনি একাই একটা বিশিষ্ট যুগ।

কথাগুলি সত্য, তবুও বিচার্য। বিচার্য এই কাবণে যে কবির সার্থকতার পেছনে যুগ আর ব্যক্তিপ্রতিভার আনুপাতিক গুরুত্ব বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। আব প্রযোজন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের মীমাংসা—সাহিত্যের ইতিহাসে যুগস্রষ্টা কবি শুধু সে কারণেই কতকাল বেঁচে থাকবার অধিকারী ?

মধুসূদন যে যুগে কাব্যচর্চা করেছেন তার আগে প্রায় ষাট বছর কেটে গেছে উনিশ শতকের। ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ ও বিস্তার হয়েছে বেশ কয়েক বছর। ইংরেজি শিক্ষা ও কাব্যচর্চার দ্বারা মনের কর্ষণ এবং সেই কর্ষিত মানসের স্বর্ণপ্রসূ সাফল্যের মাঝখানে কিছু কালব্যবধান থাকবেই। কিন্তু সামান্য কিছু পূর্বে রচিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ সে ফল ফলল না, ফলল কেন 'তিলোত্তমা-মেঘনাদ'-এ ? এর উত্তর সহজ—কিন্তু সেই সহজ আজ কোন কোন মহলে ধিক্কৃত। যুগের গুরুত্ব স্বীকারের যুগ চলছে। তাই যুগ-নিরপেক্ষ সত্য আজ একান্তই অবজ্ঞাত। মধুসূদন আজ কেবলই যুগন্ধর।

মধুসূদন যুগন্ধর, কিন্তু মধুসূদন যুগাতিশয়ী শক্তির অধিকারী। এই শক্তির আবিষ্কারের মধ্যেই তাঁর কবি-আত্মার প্রকৃত পরিচয় লুক্কায়িত। যে শক্তিতে

তিনি যুগন্ধর এবং চিরকালীন, সেই শক্তির উৎস নিশ্চয়ই কেবল যুগের সত্যে নয়, ব্যক্তির সত্যেও।

অবশ্য আমার এ সিদ্ধান্তের মধ্যে যুগকে অস্বীকার করবার প্রবণতা কোথাও নেই, কিন্তু যুগকে সর্বস্ব বলে অঙ্গীকার করা সম্পর্কে নিশ্চিত নিষেধ আছে ॥

॥ দুই ॥

উনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মহালগ্ন। পণ্ডিতেরা একে নবজাগৃতি নামে অভিহিত করে ঠিকই করেছেন। মধ্যযুগের চিন্তা ও জীবনচর্চা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার সাধনা করেছে উনিশ শতকের বাঙালি। কিন্তু পারে নি। এই সাধনা আর সাধ্যের সীমার মধ্যেই বাঙালির নবজাগৃতির পরিচয় মিলবে।

য়ুরোপের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে নবজাগৃতি সূচিত হয়। খুব সংক্ষেপে য়ুরোপীয় নবজাগৃতির সাধারণ লক্ষণগুলো বিবৃত করা চলে,—

> "thought was liberated and broadened so that it broke its scholastic framework; destiny and morals ceased to be the matter only of dogma and became problematic; a rebellion against the spiritual authority was first incited by the Reformation, which was soon afterwards the enemy of this ally, the Renascence, men looked with a new wonder at the heavens and the earth as they were revealed by the discoveries of the navigators and astronomy; superior beauty was perceived in the literature of classical antiquity, particularly in the recently recovered works of ancient Greece."
>
> —F. Legouis : History of Eng. Lit.

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে প্রথম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ এই রেনেসান্স। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইতালির ফ্লোরেন্সে প্রথম এর লক্ষণগুলি বিকশিত হয়। ইংলণ্ডে রেনেসান্সের কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতক। আর ইংলণ্ডের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজে উনিশ শতকে এই রেনেসান্সের লক্ষণগুলি দেখা দিতে থাকে

কিন্তু য়ুরোপীয় রেনেসান্স এবং বাংলার নবজাগৃতির মধ্যে চার শত বৎসরের কালব্যবধানের মধ্যে য়ুরোপে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব দেখা দিল উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র য়ুরোপের জীবনযাত্রায় তার স্বর্ণোজ্জ্বল প্রতিফলন উপলব্ধ হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, য়ুরোপ জুড়ে সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত প্রভাবশালী আন্দোলন জন্ম নেয়। রোমণ্টিসিজম্ নামে তা পরিচিত। কাজেই আমাদের দেশের নবজাগৃতি পরবর্তী শতাব্দীগুলির সমাজ, চিন্তা ও শিল্পক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকেও আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছে। এ ছাড়াও বাংলা দেশের নবজাগৃতি অন্য কতকগুলি জাতীয় বৈশিষ্ট্যেও আপনাকে প্রকটিত করে তুলেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধানত দেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংস্থান এবং অতীত ঐতিহ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বাংলাদেশের রেনেসান্সের মূল লক্ষণগুলি এখানে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হল।[১]—

এক. রেনেসান্সের প্রধান প্রত্যয় মানববাদ। ঈশ্বর থেকে ফিরিয়ে আনা হল দৃষ্টি পৃথিবীর মানুষের দিকে। মধ্যযুগের অধ্যাত্মচিন্তা ও ধর্ম-কেন্দ্রিকতা প্রাধান্য হারাল। ব্রহ্মবিদ্যার স্থান দখল করে নিল মানববিদ্যা। মানুষের জীবন ও মন, চরিত্র ও ভাগ্য এক বিপুল গৌরব ও মহিমা এবং বিচিত্র সৌন্দর্য ও আনন্দের উৎস উন্মুক্ত করে দিল। মানুষ তুচ্ছতা হারিয়ে চিন্তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে মানুষের এই পৃথিবীও শ্রদ্ধায় স্বীকৃতি পেল। দুদিনের প্রবাসযাপন নয় এ নশ্বর জগতে। পরকালের চিন্তায়, চিত্তবৃত্তির উৎসাদনে কোনমতে সেই জগতে জীবনের কালক্রমটা কাটিয়ে দেওয়া নয়। জীবনকে ভালবাসা, পৃথিবীকে তার তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা মেনে নিয়ে গ্রহণ করা। জে এ. সিমণ্ড্স্-এর ভাষায়—

> "It was scholarship, first and last, which revealed to men the wealth of their own minds, the dignity of human thought, the value of human speculation, the importance of human life regarded as a thing apart from religious rules and dogmas."
>
> —A Short history of the Renaissance in Italy.

একথা ঠিক যে মানুষের কথা বাদ দিয়ে সাহিত্য-শিল্পের সৃষ্টি হওয়া মধ্যযুগেও সম্ভব ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্য-শিল্পে মানবজীবন দেবনির্ভর—স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, মহিমান্বিত ত নয়ই। সাহিত্য-শিল্প-চিন্তা ও চেষ্টায় সর্বত্রই মানব লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এই রেনেসান্সের কাল থেকেই। রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায়, 'সতীদাহ নিবারণের চেষ্টায়, কিংবা ইংরেজি শিক্ষার আমন্ত্রণে, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের সাধনায় এবং স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের উৎসে মানববাদই সর্বাধিক সক্রিয় ছিল। মধুসূদনের কাব্যে, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের রচনায়, বঙ্কিমের উপন্যাসে বিচিত্র পথে মানবতা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নবজাগৃতি ব্যতিরেকে এই সুরের প্রাধান্য সাহিত্য ও কর্মসাধনায় এবং শিক্ষা-দর্শের উৎসে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না।

দুই. Theo-centric ভাব-ভাবনা যখন Anthropo-centric হয়ে উঠল তখনই প্রয়োজন হল যুক্তিবাদের। যুক্তিবাদ থেকেই মুক্তি আসে। আসলে মানববাদও মুক্তি God-ism থেকে, মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারা থেকে। ভাবের প্রবল আবেগে এই মুক্তি আসে, কিন্তু স্থিতি পায় যুক্তির শৃঙ্খলে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে সপ্তদশ শতকের গোড়ায় লেখা ফ্রান্সিস বেকনের 'নিউ মেথডলজিক'-এ। যুক্তির ভিত্তিতে মনকে স্বচ্ছ করে জ্ঞানের সিদ্ধিলাভ করার কথা বলেছেন তিনি। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন মানবচিত্তের চারটি দুর্মর সংস্কারের—যুক্তিকে যা নিরস্ত করে, সত্যকে যা করে আবৃত। এগুলি হল—Idols of the Tribe, যা ভাল লাগে তাকেই সত্য বলে গ্রহণ করার প্রবণতা ; Idols of the cave, কোনো ব্যক্তির নিজস্ব দীর্ঘকালীন পোষিত সংস্কারের বন্ধন, কিছুতেই যা মোচিত হয় না ; Idols of the market-place, ভাষাগত কতকগুলো বদ্ধমূল সংস্কার (শব্দ ও নামের সঙ্গে বাস্তব অস্তিত্বের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কল্পনা) ; Idols of Theatre, প্রচলিত দার্শনিক মতামতগুলির সাহায্যে আপনার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলা। বেকনের নিম্নোদ্ধৃত আত্মকথন রেনেসান্সের যুক্তিবাদী মুক্তবুদ্ধির আশ্চর্য প্রকাশ হিসেবে প্রতিনিধিস্থানীয়,—

"I possessed a passion for research, a power of suspending judgment with patience, of meditating with pleasure, of assenting with caution, of correcting false impressions with readiness, and of arranging my thoughts

with scrupulous pains. I had no hankering after novelty. no blind admiration for antiquity. Imposture in every shape I utterly detested. For all these reasons I considered that my nature and disposition had, as it were, a kind of kinship and connection with truth.'

উনিশ শতকের বাঙালি চিন্তানায়কেরা প্রায় সকলেই অল্পাধিক যুক্তিবাদী ছিলেন। প্রাচীনকে অস্বীকার করায় অথবা বরণ করায় যুক্তির আশ্রয় প্রায় সমভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। এ কালে ধর্ম নিয়ে যে বিতণ্ডা তা যুক্তিমূলক, সামাজিক সংস্কারচেষ্টাকে সমর্থন করা হয়েছে যুক্তি দিয়ে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে যুক্তির আলোয় স্বীকৃতিদানের চেষ্টা করেছেন অনেকেই। ভগবানের ভগবত্তা হয়ে পড়েছে যুক্তিনির্ভর, যেমন বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রে। মধ্যযুগের সমাজ ও পরিবারজীবনের আচরণীয় আদর্শগুলির গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ভূদেব—তাও যুক্তিরই সাহায্যে। এমন কি কাব্যরাজ্যেও যুক্তির প্রবেশ ঘটেছে। হেমচন্দ্র দশমহাবিদ্যাকে নবযুক্তির আলোতে মানবসভ্যতার বিবর্তনধর্মের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন, নবীনচন্দ্র রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে মহাভারতের মধ্যে যুক্তিবাদী সমাজবিজ্ঞানের অল্প কিছু আলোক-সম্পাতের চেষ্টা করেছেন।

তিন. রেনেসান্সের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হল প্রাচীন সাহিত্যাদির আবিষ্কার; তার সৌন্দর্য-উপলব্ধির চেষ্টা, বর্তমান জীবন ও মানবচেতনার সঙ্গে তাকে যুক্ত করা। সিমণ্ড্স্-এর ভাষায়—

"Men found that in classical as well as Biblical antiquity existed an ideal of human life, both moral and intellectual, by which they might profit in the present."

—A Short history of the Renaissance in Italy.

য়ুরোপের সর্বত্র নতুন মানবমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন গ্রীক-লাতিন-হিব্রু সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের দিকে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। মধ্যযুগের ধর্মাধিপত্য এবং বিচিত্র কুসংস্কারের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্য ও জ্ঞানের সম্পদ আচ্ছন্ন হয়েছিল, বিকৃত হয়েছিল। রেনেসান্স তাকে উদ্ধার করল। বাংলাদেশের রেনেসান্সে প্রাচীনের পুনরভ্যুত্থান ঘটল দুটি ভিন্ন পথে। প্রথমত, য়ুরোপীয় প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে বাঙালি আকণ্ঠ গ্রহণে উন্মুখ হয়ে

উঠল। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যরাজ্যেও আবিষ্কারের পদক্ষেপ পড়ল। য়ুরোপীয় ক্লাসিক্‌সের আলোচনা যেমন চলতে লাগল, ভারতীয় ক্লাসিক্‌স, রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাস প্রমুখের সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা শুরু হল। য়ুরোপীয় ও ভারতীয়—উভয় ক্লাসিক্‌সের ঐতিহ্য অনুসরণে মধুসূদনের সাধনা ও সাফল্য সর্বজনবিদিত। বিদেশি ক্লাসিক্‌সে মধুসূদনের আকর্ষণ ছিল অতি তীব্র। হোমর-ভার্জিল-টাসো-দান্তে-ওভিডের মত কবিদের অনেককেই তিনি মূল ভাষায় অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর কাব্যের তিন-চতুর্থাংশ গ্রীক বলে ঘোষণা করেছেন, একজন গ্রীক যেভাবে লিখত সেভাবে তিনিও লিখছেন—একথা বলেছেন মেঘনাদবধ প্রসঙ্গে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-কালীপ্রসন্ন-ভূদেব-বঙ্কিমের মত মনীষিগণ প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যাদি উদ্ধারের যে চেষ্টা করেছেন তা রেনেসান্সের বিশিষ্ট আদর্শে দীক্ষিত হবারই ফল। ক্লাসিক ধারার কবিরা, যেমন মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র—সকলেই প্রাচীন ভারতীয় ধারা থেকে কাব্যোপকরণ সঙ্কলন করেছেন একাগ্রচিত্তে। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা-চতুর্দশপদী (এ কাব্যেরও কিছু কবিতা রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত) ব্যতীত অপর তিনটি কাব্যের পশ্চাতেই রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর উৎস। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার বা দশমহাবিদ্যা, নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস মহাভারত-রামায়ণ বা প্রাচীন তন্ত্র-গ্রন্থাদির ভিত্তিতেই রচিত।

চার. বাংলা দেশে রেনেসান্সের বাণী যেভাবে এসে পৌঁছেছে তাতে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সর্বস্তরে সমান সাড়া জাগাতে পারে নি। ইংলণ্ডেও রেনেসান্সের কালে ইতালি থেকে আগত ভাবধারার প্রতি একদিকে যেমন সহৃদয় আমন্ত্রণ ছিল, অপরদিকে জাতীয় ভাবধারার পক্ষ থেকে একটা বিরুদ্ধতাও দানা বেঁধে উঠেছিল। বাংলাদেশ ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা-সাহিত্য-সংস্কার ও সমাজজিজ্ঞাসার মধ্য থেকে নবজাগরণের আলোড়ন লাভ করল। একটি শ্রেণীর মধ্যে বিদেশি ভাবধারা গ্রহণ করার অতি-উৎসাহ নির্বিচার পরানুকরণে পরিণত হয়েছিল। পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, দৈনন্দিন জীবনচর্চায় এঁরা সর্ববিধ দেশি ভাবধারাকে বর্জন করে চলতেন। মধুসূদন বাহ্যত এই দলের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁকে সম্পূর্ণত এর প্রতিনিধি বলা চলে না। প্রথম জীবনের তরলতায় তিনি সম্পূর্ণত এঁদেরই একজন, কিন্তু পরিণত বয়সে বাংলা সাহিত্যের চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তি-আত্মার যে পরিচয় প্রকাশিত তা অনেক গভীর। সে যাই হোক, একালে বাংলাদেশে অপর এক শ্রেণীর মধ্যে

পরানুকরণের বিরুদ্ধতা দেখা যায়। এঁরা দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে উদ্ধার করে বিদেশি ভাবধারার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমের মত বিচারনিষ্ঠ মানববাদী থেকে, গিরিশচন্দ্রের মত ভক্তিবাদী মধ্যযুগাকাঙ্ক্ষী পর্যন্ত নানা ব্যক্তি ছিলেন। এই দ্বিতীয় ধারাটিও রেনেসান্সের যুক্তিবাদ, মানববোধ, ক্লাসিক উদ্ধার প্রভৃতি চেতনাদ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। বিদেশাগত চিন্তাধারার প্রতি এঁদের অনেকেরই অন্ধ বিতৃষ্ণা ছিল না। বাংলা দেশের রেনেসান্সে এই ধারা তাই প্রতিবাদী নয়, পরিপূরক মাত্র।

পাঁচ. স্বাধীনতার চেতনা, স্বদেশভক্তি প্রভৃতিও রেনেসান্সের অন্যতম দান। মধ্যযুগে নৃপতির প্রতি আনুগত্য ছিল, আত্মরক্ষার জৈব প্রয়োজনও ছিল। রাজপুতানা বা মহারাষ্ট্রে কিছু জাতীয় চেতনার উন্মেষও হয়েছিল। কিন্তু এর সঙ্গে ধর্ম, কুলগৌরব প্রভৃতি প্রশ্নগুলির সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। জাতীয় ভাবনা উনিশ শতকের নবজাগৃতির ফলেই বাংলাদেশে অনেকখানি বিশুদ্ধ মূর্তিতে দেখা দেয়। প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থাদির উদ্ধারে, ঐতিহ্যচর্চার পেছনেও এই মনোভঙ্গি কিছু পরিমাণে সক্রিয় ছিল এবং এর ফলে এই মনোভাব অনেকখানি পুষ্টও হয়েছিল। আমাদের সাহিত্যেও নানাভাবে জাতীয়তাবাদের স্বর বেজেছে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের রেনেসান্সে আমাদের জাতীয় চেতনা যখন উন্মেষিত হল তখনই আমরা দেখলাম দেশ বিদেশি শক্তির অধীন, শৃঙ্খলিত। বাঙালির নবজাগৃতির কাব্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হয়েছে—কখনও রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" কবিতায়, কখনও হেমচন্দ্রের তীব্রকণ্ঠ বিদ্রূপে—

> চিরশিক্ষা ব্রিটনের পৃথিবীর লুট—
> ভারত ছাড়িয়া যাব—টুট টুট টুট ॥
> স্পষ্ট কথা বলা ভাল বিঘ্ন বড় ভারি,
> "মিলচ্ কাউ" ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি ॥

নবীনচন্দ্রের বিপুলাকৃতি মহাকাব্যে ঐক্যবদ্ধ একভারতবোধ প্রচারিত হয়েছে; বঙ্কিমের উপন্যাসে, দীনবন্ধুর নীলদর্পণে স্বাধীনতার বাসনা কিছুটা পরোক্ষ বক্রতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। মধুসূদনের চতুর্দশপদীর নানা প্রসঙ্গে, বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভাষণে ঐ একই স্বর বেজেছে। এই প্রসঙ্গে

উল্লেখযোগ্য যে কলকাতার বুদ্ধিজীবীমহলের কোন কোন অংশ কর্তৃক নিন্দিত নীলদর্পণ মধুসূদন কর্তৃকই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু আরও একটি কথা মনে রাখার মত। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এতই উদ্বুদ্ধ ও মুগ্ধ ছিলেন, ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তাঁরা চিন্তাও করতে পারেন নি। তখন বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহ চলেছে পুরাতন ভূমিব্যবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্য।[২] তাদের চিন্তা ছিল অপরিচ্ছন্ন। তারা বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু রেনেসান্সের নব চিন্তাধারা, বিশেষ করে জাতীয়তাবোধ, তাদের মধ্যে প্রসার লাভ করে নি। তাদের এই বিদ্রোহগুলি ছিল মূলত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নয়। নগরকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার মুক্তি এবং গ্রামের কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তির সাধনা সংযুক্ত হয়ে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে নি। আমাদের জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতাচেতনা তাই নবজাগৃতিকালে অপরিণতি ও দ্বিধাদীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই 'স্বাধীনতা'র কবি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' কাব্য শেষ হয়েছে সিপাহী-বিদ্রোহের বিকৃত নিন্দায়; বৃটিশ যুবরাজের কলকাতা আগমনে হেমচন্দ্রের 'ভারতভিক্ষা' স্তুতিবাচনে আকণ্ঠ গ্লানিজর্জর—

যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
    হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়,
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
    ভারত-ভুবন আজি লুটায়—
সেই ব্রিটনের রাজকুলচূড়া
    কুমার আসিছে জলধি-পথে,
নিরখিয়া তায় জুড়াইতে আঁখি,
    ভারতবাসীরা দাঁড়ায়ে পথে।

অথবা,

আমি বৎস তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,
ঘুচাও দুঃখের যাতনা তাদের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের,
    শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।

কবি-আত্মার পরিচয়

কি কব কুমার হৃদি-বক্ষ ফাটে
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে,
দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে।
বৃটিশ-সিংহের বিকট বদন,
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী
জাহাজী গৌরাঙ্গ কিংবা ভেকধারী
সম্রাট ভাবিয়া পূজিব সবারে।

'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ-বাণীতে বৃটিশ-শাসনের অনিবার্যতা ও কল্যাণ-রূপের নির্দেশে, নীলচাষীদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ইংরেজ কুঠিয়ালদের প্রতি কারও কারও সমর্থনজ্ঞাপনে, সিপাহী-বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ধিক্কার বর্ষণে বাঙালি বুদ্ধি-জীবীদের স্বাধীনতাচেতনার সীমা নির্দেশিত।

ছয়. নবজাগৃতির যুগে জাতীয় চেতনায় যে দ্বিধার কথা বলা হল তা বাংলাদেশে বহুক্ষেত্রেই প্রকট হয়েছিল। চিন্তা, শিক্ষা, সামাজিক আন্দোলন, সাহিত্যিক সৃষ্টি, রঙ্গমঞ্চের নব উদ্বোধন নগরজীবনের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র দেশে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে নি। নগর ও গ্রামের মধ্যেকার ব্যবধান এত প্রশস্ত হয়ে ওঠে নি আর কোন কালে। গ্রামের মানুষ পুরাতন যাত্রা-পাঁচালি-কবিগান নিয়েই মেতে রইল। রামায়ণের কথকতা, মঙ্গলকাব্যের অষ্টাহ অনুষ্ঠান আর কীর্তনের আসরে গ্রামের লোক রসের তৃষ্ণা মেটাতে লাগল। কিন্তু গ্রামের পুরানো জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছিল। সেকালীন নিশ্চিন্ততা ও বিচ্ছিন্নতা ভেঙে গিয়েছিল। ভূমিব্যবস্থার অবসান ঘটেছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থনীতির স্থানে দেখা দিয়েছিল পরনির্ভরতা। জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছিল। পুরাতন ভাঙছিল, নতুন গড়ে ওঠে নি। অপরপক্ষে ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে য়ুরোপীয় রেনেসান্স, শিল্পবিপ্লব এবং রোমাণ্টিক আন্দোলনের চার শতকের সাধনার ফল এক শতকেই বিকশিত হয়ে উঠল। কিন্তু এই বিকাশ সবটাই বুদ্ধি, চিন্তা, জ্ঞান ও সৃষ্টির দিক থেকে, বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টা, অর্থনৈতিক সমাজবিন্যাসের দিক থেকে নয়। এর ফলে একটা দ্বিতীয় দ্বিধা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেখা দিল। রেনেসান্সের চিন্তা, রোমাণ্টিসিজিম এবং শিল্পবিপ্লবের মননগত তাৎপর্য এঁরা বোধি এবং অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করলেন।

কিন্তু বাস্তবত দেশ বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের পদানত হয়ে রইল, শোষণ ও লুণ্ঠনের অবাধ শিকার হয়ে রইল। আর অর্থনৈতিক জীবনে যন্ত্রযুগের ফল ফলল না। ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ হল না। দু চারজন মনীষী ব্যতীত সেকালে এই দ্বিধার সম্পূর্ণ তাৎপর্যটি আবিষ্কার করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সাহিত্যের সৃষ্টিধর্মের মধ্যেও নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই দ্বন্দ্ব।

সাত বাংলাদেশে এইকালে ধর্মসংস্কার আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। প্রাচীন ঔপনিষদিক আদর্শে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দুধর্মের সংস্কার-প্রয়াস য়ুরোপীয় রিফর্মিজমের সঙ্গে উপমিত হবার যোগ্য।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ভাবকেন্দ্র উল্লিখিত চিন্তার প্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত। এই শতকের সাহিত্যে উপরি-উক্ত ভাব-ভাবনার তরঙ্গাঘাতে রূপগত কতকগুলি স্পষ্ট পরিবর্তন সূচিত হল। এই নতুন রূপলক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক।

প্রথমত, সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব হল। চিন্তার মুক্তি ও যুক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করলে, ঈশ্বরপ্রেম ও ভক্তির স্থানে পৃথিবীর ভূগোল বা মানুষের ইতিহাস কিংবা পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে কবিতার আবেগের ভাষার অপূর্ণতা অনুভব করা যায়। সাহিত্যিক গদ্যের উৎপত্তির পেছনে এই কারণই বর্তমান।

দ্বিতীয়ত, সাময়িক পত্রের আবির্ভাব। মধ্যযুগীয় রাজসভার আওতা থেকে বা মঠ-মন্দিরের পণ্ডিতসমাজের চৌহদ্দি থেকে জ্ঞান ও সাহিত্যিক আনন্দকে সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করার গণতান্ত্রিক চেতনা থেকেই সাময়িক পত্রের জন্ম।

তৃতীয়ত, নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব। মধুসূদনকে প্রথম নাট্যকার বলা যায় না ইতিহাসবিচারের দিক থেকে। কিন্তু প্রথম সার্থক নাট্যকার তিনিই। সফল প্রহসনরচয়িতাও। অল্পকিছুকাল আগেই বাংলা ভাষায় নাটকরচনার সূত্রপাত হয়।

চতুর্থত, কাব্যসাহিত্যে বিচিত্র ও অভিনব রূপের সংযোজন। মঙ্গলকাব্য বা অনুবাদ রামায়ণ-মহাভারত, অপরপক্ষে বৈষ্ণব বা শাক্ত পদের স্থানে নতুন ও বিচিত্র কাব্যরূপ দেখা দিল। নতুন ধরনের আখ্যায়িকা-কাব্যের সূত্রপাত রঙ্গলালে: মহাকাব্য লিখলেন মধুসূদন, লিখলেন সনেট, পত্রকাব্যও।

রোমান্টিক প্রেরণায় নতুন গীতিকবিতার জন্ম হল। ব্যক্তিচেতনার অতি-আরোপ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করল। মধুসূদন নতুন বাংলার প্রথম গীতিকবিও।

পঞ্চমত, উপন্যাসসাহিত্যের উদ্ভব।

ষষ্ঠত, রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যকে মধ্যযুগের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দানও সুপ্রচুর।

বাংলাদেশের রেনেসান্সের ভাবপরিমণ্ডল মধুসূদন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। মানবতার আদর্শ এবং স্বাধীনতার এক আবেগ-আকুল অস্পষ্ট স্বপ্ন তাঁর ছিল। যুক্তিবাদে নিষ্ঠা ছিল, কিন্তু আবেগের প্রবলতা তাঁকে যুক্তিতে স্থিত হতে দেয় নি। তাঁর পত্রাবলীতে মাঝে মাঝে যুক্তিপ্রবণ মনের যে ছবি প্রকাশ পায় তা বিস্ময়কর, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয়। আসলে যুক্তিবাদ তাঁর কাছে উপলক্ষ মাত্র, মানববাদের মুক্ত অঙ্গনই লক্ষ্যস্থল। ধর্মত্যাগ করে তিনি খ্রীস্টান হয়েছিলেন, তাও ধর্মসংস্কারের কোন আদর্শনিষ্ঠায় নয়। সামাজিক সংস্কারান্দোলনে তাঁর সমর্থন ছিল, সক্রিয়তা ছিল না। বিদেশি ক্লাসিকের প্রতি তাঁর সুগভীর আকর্ষণ ছিল, দেশের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতিও কম শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নি। অবশ্য পেত্রার্কা-বোকাচিওর মত, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যগ্রন্থ উদ্ধারে তাঁর কিছুমাত্র চেষ্টা ছিল না। য়ুরোপীয় রোমান্টিসিজমের আদর্শের প্রতি ভালবাসা তিনি যৌবনে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—বায়রনের প্রতি আকর্ষণে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রতি শ্রদ্ধায়। পরে ক্লাসিকের নিষ্ঠাবান পাঠক হয়ে ক্লাসিসিজমের চর্চায় মনোনিবেশ করলেও রোমান্টিক স্বপ্নকে বিদূরিত করতে পারেন নি অন্তর থেকে, চানও নি। মধুসূদনকে যুগন্ধর বলায় বাধা কোথাও নেই।

অপরপক্ষে নবযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সার্থক শিল্পী হিসেবে তিনিই প্রথম মধ্যযুগের উপর যবনিকাপাত করলেন। একাধিক নতুন সাহিত্যরূপের পন্থানির্দেশ করলেন। বিচিত্রধারা সৃষ্টির গৌরব তাঁর আছে।

মধুসূদনরচিত মহাকাব্য বিষয়ে ইতিহাসের কিছু জিজ্ঞাসা আছে। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকাব্য (literary epic) রচনার দিন গত হয়ে গেছে অনেক কাল। উনিশ শতকে মহাকাব্যধারার সৃষ্টি করা যায় না, এটা একটা কৃত্রিম ক্লাসিক অনুবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়—আপত্তিটা এই ধরনের। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে মহাকাব্যের ধারা সাফল্য

পায় নি। মেঘনাদবধের অত্যুচ্চ সার্থকতার কথা ছেড়ে দিলে সামান্যতম সাহিত্যিক সাফল্যের পুরস্কারও আর কারুর ভাগ্যে জোটে নি। এটা ব্যক্তিগত প্রতিভার কথা সন্দেহ নেই, তবে ইতিহাসের কিছু করণীয় ছিল। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচিত হল। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে তখন একদিকে রোমান্টিক গীতিকবিতার রাজত্ব এবং উপন্যাসের পদচারণা। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃত আবির্ভাব হয়েছে ১৮৬৫ সালে। কাজেই সারা বিশ্বে যে উপন্যাসসাহিত্য মহাকাব্যের শূন্যস্থান পূরণ করেছে, বাংলাদেশে তা সম্ভব হয় নি। মধুসূদনের প্রতিভা মহাকবির—ঔপন্যাসিকের নয়। উপন্যাসপ্লাবিত রাজ্যে তিনি মহাকাব্য রচনা করে সাহিত্যের ইতিহাসে পিছু ফেরেন নি। মঙ্গলকাব্যের রাজ্য থেকে মহাকাব্যের রাজ্যে পাঠককে নিয়ে এসেছেন।

এ ছাড়া বাংলার প্রথম পূর্ণাবয়ব রোমান্টিক গীতিকবিতা তাঁরই রচনা। তিনিই প্রথম সনেটকার, এবং অনেকের মতে বাংলার শ্রেষ্ঠ সনেটকারও। বাংলার প্রথম খাঁটি ট্রাজেডি ও সফল প্রহসনও মধুসূদনেরই রচিত।

বাংলা সাহিত্যে তিনি ভাব ও রূপসৃষ্টিতে নিশ্চয়ই যুগস্রষ্টা ॥

॥ তিন ॥

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কোন সাহিত্যিকের মূল্য নিরূপণ করায় কিছু বিপদ আছে। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এবং সাহিত্যের ইতিহাসে নবজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার্য। বিশেষ করে সাহিত্যের ইতিহাসে নবজাগরণের পটভূমিতে মধুসূদন একজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি, বলা যেতে পারে যুগন্ধর। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যের মূল্য এই সব ঐতিহাসিক গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না। বিশিষ্ট সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড-এর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"A poet or a poem may count to us historically, they may count to us on grounds personal to ourselves, and they may count to us really. They may count to us historically. The course of development of a nation's language, thought, and poetry, is profoundly interesting,

and by regarding a poet's work as a stage in this course of development we may easily bring ourselves to make it of more importance as poetry than in itself it really is, we may come to use a language of quite exaggerated praise in criticising it; in short, to overrate it. So arises in our poetic judgments the fallacy caused by the estimate which we may call historic. Then again a poet or a poem may count to us on grounds personal to ourselves. Our personal affinities, likings and circumstances have great power to sway our estimate of this or that poet's works and to make us attach more importance to it as poetry than in itself it really possesses."

—Essays in criticism.

মধুসূদন যে কালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে কালে জন্মগ্রহণ করে যুগসত্যের কোন কোন ধারাকে অবলম্বন করে হেমচন্দ্রও কাব্যরচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাফল্যলাভ ঘটে নি। মধুসূদন কেন অত্যুচ্চ সার্থকতায় পৌছলেন? ইতিহাসের বিচার সাহিত্যজিজ্ঞাসায় ব্যক্তির চিত্তের দ্বারদেশে আমাদের নিয়ে যায়, অন্তরের গহনে প্রবেশ করাতে পারে না। যুগের বিচারের ঊর্ধ্বে সাহিত্যের মূল্যনিরূপণের পথটি প্রসারিত। সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রতিভা দ্বারাই যে শেষ পর্যন্ত কোন রচনার প্রকৃত মূল্যায়ন এ কথা পুরাতন বলেই পরিহার্য নয়। এই প্রতিভার অধিকারী বলেই তিনি সার্থক—কেবল সার্থক শিল্পীই নন, মহান শিল্পী। এর উৎস আবিষ্কারে যুগচর্চাই যথেষ্ট নয়, তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিচয়লাভও প্রয়োজন।

কাব্যসৃষ্টি করে যে মন, তাকে কবিমন বলে অভিহিত করা যায়। মধুসূদনের এই কবিমনের গভীরতার ইঙ্গিত দেবার জন্যই বর্তমান গ্রন্থে আমি তাকে কবি-আত্মা নাম দিয়েছি। কবি-আত্মা এবং কবির ব্যক্তিগত জীবন এক নয়। বাস্তবজীবনে যিনি চরম ব্যর্থ, কাব্যরাজ্যে তিনি হয়ত মহাপ্রতিভাবান। ব্যক্তিজীবনে বেহিসেবী মানুষটির কবি-আত্মায় হয়ত নির্মম সংযম। রাজনৈতিক মতবাদে বাস্তবজীবনে যিনি গণতন্ত্রবিরোধী, তাঁরই

কাব্যে হয়ত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধতা সুস্পষ্ট। তবে কবির কবি-আত্মা কবির জীবনঘটনার সঙ্গে কখনই একেবারে অসম্পৃক্ত নয়। জীবনের উপকরণ নিয়েই কবির অন্তর্গূঢ় সত্তাটি গড়ে ওঠে। কবির জীবনদর্শন ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে জীবন ও আত্মার মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটির স্বরূপ কি হবে। কোন কোন কবিসাহিত্যিকের জীবনচর্যা ও আত্মার সম্পর্কটি এতই সূক্ষ্ম, বক্র ও অস্পষ্ট, বহু বর্ণে রঞ্জিত যে আপাতদৃষ্টিতে তারা নিঃসম্পর্কিত। উদাহরণ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের নাম করা চলে। আবার কোন কোন সাহিত্যিকের জীবন ও আত্মা অতি নিকটসম্বন্ধবদ্ধ এবং অনেকখানি সমান্তরাল, যেমন মধুসূদন বা নজরুলের ক্ষেত্রে। মধুসূদনের কবি-আত্মার স্বরূপ তাঁর জীবনঘটনার ব্যাখ্যায়ই অনেকখানি প্রকটিত হবে।

মধুসূদনের জীবনের তথ্য অনেকখানি সর্বগোচর। যোগীন্দ্রনাথ বসুর জীবনচরিত বা নগেন্দ্রনাথ সোমের মধুস্মৃতি আদর্শ জীবনচরিত না হলেও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, তথ্যভারসমৃদ্ধ। এইসব তথ্যের আলোকে মধুসূদনের কবি-আত্মার পরিচয় মিলবে।[৩]

মধুসূদনের কবি-আত্মার নানা প্রতিফলন তাঁর কাব্যাদিতে ঘটলেও একটি চিত্রকে বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। চিত্রটি সেতুবন্ধ সমুদ্রের। লঙ্কার দুর্গপ্রাকার থেকে সেতুর বন্ধনে ক্লিষ্ট সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রাবণ আক্ষেপ করেছিল—

> প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি, প্রভঞ্জন-সম
> ভীম-পরাক্রমে! কহ এ নিগড় তবে
> পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
> শৃঙ্খলিয়া যাদুকর খেলে তারে লয়ে;
> কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
> বীতংসে?……
> উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙি
> দূর কর অপবাদ, জুড়াও এ জ্বালা,
> ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।

প্রবল শক্তি, প্রবলতর সম্ভাবনা, স্বল্পতর সাফল্য এবং পর্বতকল্প ব্যর্থতার অন্য নাম মধুসূদন। মধুসূদনের কবি-আত্মার কামনা বিপুল। ক্ষত্রিয়সুলভ আকাঙ্ক্ষার আকাশচুম্বী বাসনা এবং চরম অতৃপ্তি। জীবনকে এবং

কাব্যকে একই সূত্রে বিদ্ধ করবার সাধনা এবং তার বিফলতায় চিত্তদীর্ণ হাহাকারেই তাঁর কবি-আত্মার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মধুসূদনের ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল সুপ্রচুর। জীবনে যেমন, কাব্যেও ঐশ্বর্যের স্বর্ণরেখা তেমনি মায়াজাল বিস্তার করেছে। মধুসূদনের মর্তপ্রেমের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ঐশ্বর্যকামনায়। প্রচুর অর্থ উপার্জনের বাসনা; শিল্পবিপ্লবের ফলে য়ুরোপীয় জীবনযাত্রায় মানের যে বিপুল উন্নতি তাকে ভোগ করতে চেয়েছেন মধুসূদন। এ কেবল তাঁর বাস্তবজীবনের বাসনা নয়, তাঁর অন্তরপুরুষের প্রত্যয় স্বরূপ। তাঁর জীবনের একটি প্রান্ত এই অর্থের সূত্রে বদ্ধ। ঔপনিবেশিক ভারতে কি পাওয়া যায়? রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে না গুনে ভিখিরিকে দান করেন। কলেজে অবস্থানের কয়েকঘণ্টায় ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে পোশাক বদলান। চল্লিশ হাজার টাকা বছরে উপার্জন না করতে পারলে জীবনটা একেবারে ব্যর্থ বলে মনে করেন। যা পান তাতে তৃপ্তি নেই। ইংলণ্ড যেতে হবে। 'I sigh for Albion's distant shore'! নতুন যন্ত্রসভ্যতার মাথায় চড়ে ধনতন্ত্রবাদ এসেছে সেখানে। পৃথিবীকে ভোগের নামে জয় করে নিয়েছে। য়ুরোপ থেকে গৌরদাসকে লিখছেন,—

> "নিঃসন্দেহে এই-ই হল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। কয়েকটি ফ্রাঙ্ক ব্যয় করে যে ডিনার খাই বর্ধমানের রাজারও তা স্বপ্নের অগোচর। কয়েকটি মাত্র ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে যে প্রমোদ উপভোগ করি, তাঁর বিপুল সম্পদের অর্ধাংশ ব্যয় করে তবেই তিনি তার অধিকারী হতে পারেন, এমন কি তাও খুবই কম বলে মনে হবে। কী অপূর্ব সঙ্গীত, নৃত্য, সৌন্দর্য! আমাদের পূর্বপুরুষ-কথিত অমরাবতী এই স্থানেই।"

এই ভোগবাদকে সামান্য তামসিক লোভ বলে নিন্দা করা ঠিক নয়। যন্ত্রযুগের বাণী আশ্চর্যভাবে মধুসূদনের জীবনকামনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সমাজেতিহাসবেত্তা বিনয় ঘোষ বলেছেন,—

> "নতুন যন্ত্রযুগের সব আবিষ্কারকে ম্লান করে দিয়েছে মুদ্রা। মুদ্রা-প্রধান অর্থনীতিই নবযুগের সমাজের বনিয়াদ। যা কিছু হচ্ছে, যত উদ্যম যত প্রেরণা গবেষণা আবিষ্কার সবই এই মুদ্রার মোহে। টাকা ধনতান্ত্রিক যুগের ধর্ম, টাকাই স্বর্গ। সবার উপরে টাকাই সত্য। টাকা শুধু গতিশীল নয়, টাকা সৃষ্টিশীল।…যন্ত্রযুগে বংশগৌরব কুলমর্যাদা কিছু নেই। বংশানুক্রমিক পেশাগত শ্রেণীভেদও টাকা ভেঙে দিয়েছে। তার

বদলে টাকা নিজের কৌলীন্য সগৌরবে হাজির করেছে। টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম তো নিশ্চয়ই, তুকতাক, ঝাড়ফুক স্তোত্রমন্ত্র সবই 'টাকা, টাকা টাকা।' তাছাড়া টাকাই গোত্র টাকাই বংশ টাকাই শ্রেণী। নতুন যে শ্রেণী-বিন্যাস হল সমাজে সে হল টাকার শ্রেণী-বিন্যাস। সবার চাইতে বড় কুলীন টাকা, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ টাকা।"[৪] —বাঙ্‌লার নবজাগৃতি।

অর্থের প্রতি, ঐশ্বর্যের প্রতি এই আসক্তির মধ্যে আমরা সচরাচর একটা সামান্যতা লক্ষ্য করি। বৈরাগ্যের একতারায় ভারতবাসীর চিন্তার সুর অনেকখানি বাঁধা পড়ে আছে। জীবনের অন্যকোটিকে তাই সহজভাবে গ্রহণ করতে সে পারে না। বাংলাদেশের কাব্যরাজ্যে বিশেষ করে আসক্তি থেকে মুক্তির সুরটাই বেজেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব অন্যসুরের অনুসরণকে আচ্ছন্ন করেছে। মধুসূদনের চতুর্দশপদীকেও কোন কোন সমালোচক আসক্তিমুক্তির কাব্য হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন এবং কবি-আত্মার কেন্দ্রে আদ্যন্ত যে সুর মন্দ্রিত হয়েছে তা আসক্তির। প্রবল আসক্তির প্রবল ব্যর্থতা আছে, উচ্চকণ্ঠ হাহাকার আছে, কিন্তু মুক্তি নেই, মুক্তিলাভের কামনা নেই।

রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে[৫] জীবনের বিপরীতমুখী দুটি সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। একদিকে তিনি ক্ষত্রিয়ের ভোগ অপরদিকে তিনি ব্রাহ্মণের ত্যাগ বলেছেন। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ সামান্য ভোগেই তৃপ্ত। বিপুলকে কামনা করবার মত সুদৃঢ় প্রত্যয় তাদের নেই। যেটুকু পাওয়া গেছে তাকে কোনমতে আঁকড়ে থাকতে পারলেই তারা নিজেদের সার্থক বলে মনে করে। যেটুকু আছে সেটুকু পাছে হারায় এজন্য তারা সর্বদা ভীত, সন্ত্রস্ত। এদের ভোগ বীর্যহীন। কিন্তু এমন ভোগবাদীও দু-চার জন পৃথিবীতে জন্মান যাঁরা প্রচুরকে কামনা করেন, ভাগ্যদেবীর দাক্ষিণ্যটুকু নিয়ে খুশি থাকতে পারেন না, বিপুলকে পাবার জন্য জীবনটাকে পর্যন্ত বাজি ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। বীর্যপূর্ণ এই ভোগবাদই ক্ষত্রিয়ের ভোগাকাঙ্ক্ষা বলে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছে। অন্যদিকে ত্যাগের আদর্শের মধ্যেও সামান্য ও মহৎ— দুটি দিক আছে। যারা ক্ষমতাহীন, দুর্বল ও ভীরু, যাদের পাবার শক্তি নেই, চাইবার সাহস নেই, তাদের ত্যাগ ক্ষুদ্রপ্রাণ। কিন্তু প্রচুরের সামনে দাঁড়িয়েও কেউ কেউ বলতে পারেন—যার দ্বারা অমৃতলাভ হবে না, তা দিয়ে আমি কি করব? ত্যাগের এই বীর্যমহান রূপও সমভাবেই অভিনন্দনযোগ্য।

মধুসূদনের অর্থলিপ্সা, সুখভোগের প্রবল আসক্তিকে ক্ষত্রিয়ের বীর্যদৃপ্ত ভোগকামনা বলে শ্রদ্ধা জানানো চলে।

আত্মবিলাপ নামক কবিতায় মধুসূদনের আত্মকথন অনেকখানি প্রকাশ পেয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার কবিতাটি ১৮৬১ সালের শেষ দিকে রচিত। তখন মধুসূদনের জীবনে কাম্যবস্তুর সার্থক ফললাভ ঘটেছে। জীবনের এই পরিপূর্ণতা, চরিতার্থতা, সর্বপ্রান্তের এরূপ ভারসাম্য তাঁর ভাগ্যে দ্বিতীয়বার ঘটে নি। অথচ সমগ্র জীবনের সুতীব্র ট্রাজেডি এ-সময়কার রচনায় অভিব্যক্ত হয়েছে। এই কবিতায় পর পর তিনটি স্তবকে কবি আপন কামনা এবং সাধনার তিনটি লক্ষ্য এবং বিফলতার কথা বলে দুঃখপ্রকাশ করেছেন—

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে,
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।...ইত্যাদি

অর্থলাভ এবং যশোলাভ মধুসূদনের জীবনের এই দ্বিমুখী কামনা একসূত্রে বদ্ধ ছিল। অর্থ ছাড়া যশোলাভ সম্ভব নয়।

"There is no honour to be got in our country without money" [মধুসূদনের পত্রাংশ]।

কবিখ্যাতি লাভ করবেন তিনি ; অতি উচ্চস্তরের কবিখ্যাতি লাভের বাসনা ও সাধনা তাঁর। হোমর-ভার্জিল-দান্তে শেক্‌স্‌পীয়র-মিলটন বাল্মীকি-কালিদাস যে প্রতিভার অধিকারী তার সমকক্ষতালাভের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। কিন্তু কেবল কাব্য-প্রতিভায়ই ও-জাতীয় চূড়ান্ত সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। জীবন-পরিবেশে সচ্ছলতা ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য চাই। মধুসূদনের জীবনব্যাপী সাধনা এই দুটি প্রান্তকে সমন্বিত করতে চেয়েছিল। অথচ এদের মধ্যে কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। মধুসূদনের কবি-আত্মা এদের দ্বৈধে বিচলিত।

মধুসূদনের কবি-আত্মার কেন্দ্রে তাঁর প্রেমবেদনা ও অতৃপ্তির ভূমিকা কি তা খুব স্পষ্ট করে বোঝার উপায় নেই। জীবনের এই একটি মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে মধুসূদনের ন্যায় বহুবাক্ কবিও বিস্ময়করভাবেই নীরব। দাম্পত্যপ্রেমের

প্রশান্তি তাঁর চিত্তকে চিরকাল তৃপ্তি দিতে পারত বলে মনে হয় না। জীবনে এই অতৃপ্তি প্রকাশ পায় নি, কাব্যে নয়, পত্রে নয়—তবে অন্তরের গভীরে এর অধিষ্ঠান ছিল বলেই মনে হয়। কেবলমাত্র আত্মবিলাপ কবিতার সাক্ষ্যেই নয়,[৬] মধুসূদনের সমগ্র ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ছিল প্রশান্তির প্রতি বিতৃষ্ণা। দাম্পত্য-জীবনে প্রয়োজন শান্তির, কিন্তু প্রেমতৃষ্ণা তাতেই মেটে না।

মধুসূদনের বাল্য-কৈশোরের অতি উচ্ছ্বসিত উত্তেজনায় কবি-আত্মার উপরে-বর্ণিত বীজগুলিই লালিত হচ্ছিল। খ্রীস্টধর্ম-গ্রহণ কিংবা দেশত্যাগ করে মাদ্রাজ গমনের পশ্চাতে, অথবা বিপুল কবিখ্যাতি পেছনে ফেলে য়ুরোপ যাত্রায় এই মানস-জিজ্ঞাসা ও তজ্জাত অস্থিরতাই সর্বাধিক সক্রিয় ছিল।

ইংলণ্ড গেলেই তিনি মহাকবি হতে পারবেন, কারণ ইংলণ্ড তথা য়ুরোপ ...নি আমাদের পূর্বপুরুষদের বর্ণিত অমরাবতী; কবির কামনার কামস্বর্গ; ...র্থ যশ দুই-ই সেখানে গেলে আয়ত্ত হবে; এ-কালের যুক্তিপ্রিয় মানুষের কাছে ... চিন্তাধারা ছেলেমানুষি, কিন্তু মধুসূদনের কাছে এর চেয়ে বড় সত্য কিছু ছিল ... কোনো বিশিষ্ট খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণের বাসনা, ইংলণ্ডে ...বার সম্ভাবনা প্রভৃতি তাঁকে খ্রীস্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। ধর্মচিন্তা ...র মনে কোনোকালেই বিশেষ স্থান পেয়েছিল বলে মনে হয় না। হিন্দু থাকা ...লেও তিনি আচার-আচরণে ছিলেন পুরোপুরি অহিন্দু, আর খ্রীস্টান হবার ...রেও তিনি আসলে থেকে গেলেন প্যাগান। প্রাণধর্মে তাঁর বিপুলতা, তাই ...াপ্ত বস্তুতে সুখ নেই, যা পাই নি তাকে চাই, সুখ-স্নেহ-বন্ধন বিসর্জন দিয়েও চাই। মধ্যযুগের বদ্ধ জীবনধারার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দুধর্ম, আপন ...মনা-চরিতার্থতার বাধা বলে মনে হয়েছিল তাকে। ধর্মতত্ত্বের তুলনামূলক ...চার করে ধর্মত্যাগ তিনি করেন নি, সেরূপ বিচার করার মত মানসিকতাও ...ার ছিল না।[৭] কৈশোর থেকেই মধুসূদন একটি বিষয়ে ছিলেন একাগ্র ও ...ভ্রান্ত। তা হল কাব্যসাহিত্যের সাধনা। ভাষা বাংলা হোক, কিংবা ...ংরেজি হোক, নিজের রচনাক্ষমতা থাক বা না থাক, তিনি ছিলেন কাব্য-প্রাণ। ছাত্রজীবনে পুরস্কার লাভের জন্য প্রবন্ধ রচনা বা মাদ্রাজের ...জীবিকার্জনের জন্য সাংবাদিকতা এর ব্যতিক্রম মাত্র।[৮] সমাজসংস্কার, দার্শনিকতা প্রভৃতি বিষয়ে কবির আগ্রহ তাঁর ব্যক্তিজীবনের মতামতের স্তর ভেদ করে কবি-আত্মার অংশ হয়ে উঠতে পারে নি। অনেকে মধুসূদনের জীবনের পাপবীজরূপে খ্রীস্টধর্মগ্রহণকে দেখেছেন, এবং তাঁর জীবনের ট্রাজেডির

উৎস এখানেই এরূপ নির্দেশ করতে চেয়েছেন। এরূপ চিন্তা ধর্মাচ্ছন্ন বলেই মনে হয়, বাস্তব বলে নয়।

মধুসূদনের আকস্মিক মাদ্রাজ-গমনের কারণ খুব স্পষ্ট নয়। পত্রের চিহ্ন দিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর জীবনপথের রূপরেখাটিকে একরূপ সর্বজনবোধ্য করে রেখেছেন। কিন্তু মাদ্রাজগমনটি ঘটল সর্বাপেক্ষা নীরবে। পরবর্তীকালে তিনি গৌরদাস বসাককে একখানি পত্রে লিখেছিলেন—

"When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety."

মাদ্রাজে আট বৎসর অবস্থানকালে রেবেকার সঙ্গে বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ এবং হেনরিয়েটার সঙ্গে বিবাহ—ব্যক্তিগত জীবনে এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটে গিয়েছিল। মাদ্রাজের এই তরঙ্গক্ষুব্ধ অতৃপ্ত জীবন যেন কলকাতা-ত্যাগ-কালীন vexation and anxiety"রই বিলম্বিত পরিশিষ্ট। প্রত্যক্ষভাবে যে সব আশা নিয়ে তিনি খ্রীস্টান হয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছিল। অর্থসাহায্য বন্ধ করেছিলেন পিতা। সর্বোপরি যে জিগীষাবৃত্তি তাঁর ব্যক্তিচিত্তের একটি প্রধান ভিত্তি তার উপরে নির্মম আঘাত এসেছিল। নীরবে কলকাতা থেকে পলায়নের পেছনে এরূপ মানসিকতাই দায়ী বলে মনে হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্রের ডায়েরিতে উদ্ধৃত মধুসূদনের নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি—

I thought to lead a sober life
With a superfine black shining lass.

এই কামনার ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ক্ষতপূরণের জন্যই কি ইংরেজদুহিতার পাণিগ্রহণ, যার জন্য

"I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against the match."

মধুসূদনের জীবনে ভারসাম্য এসেছিল মাত্র কয়েকটি বছরের জন্য। এর ভিত্তিরচনা করেছিল তাঁর আর্থিক নিশ্চিন্ততা। ১৯শে মার্চ ১৮৬০ তারিখে তিনি গৌরদাসকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"তুমি শুনে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবে যে আর্থিক দিক দিয়ে বর্তমানে আমার মন খুবই নিশ্চিন্ত। আমার মহানচিত্ত বন্ধুরা—(তাঁদের সব দিক,

দিয়েই মহান বলা যেতে পারে) অর্থাৎ রাজারা আমার দুস্থতার কথা শুনে আমাকে বেশ কিছু অর্থ অগ্রিম দিয়ে অধিকাংশ দায় থেকে মুক্ত করেছেন। সহৃদয় বন্ধু শ্রীরামের কাছ থেকে তাঁরা আমার দুরবস্থার সংবাদ পেয়েছেন। এর পরে যখন ছোট রাজার কাছে চিঠি লিখবে, তোমার এই দরিদ্র বন্ধুকে মানসিক অশান্তি থেকে তাঁদের রাজকীয় ঔদার্যে মুক্ত করার জন্য তাঁকে দয়া করে ধন্যবাদ জানাবে।"

পরবর্তীকালে মাসিক একহাজার-দেড়হাজার টাকার (সেকালে এর প্রকৃত মূল্য ছিল আরও অনেক বেশি) সরকারী চাকরি লাভ করেও এই ভারসাম্য তিনি আর ফিরে পান নি।

(কাব্যগঠন-ক্ষমতা এবং কবিপ্রতিভা এক বস্তু নয়। কবিপ্রতিভার গুণগত স্বরূপ এবং কাব্যগঠনের ক্ষমতা সর্বদা অচ্ছেদ্য নয়।) প্রসঙ্গত বিহারীলাল চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করা চলে। তাঁর কাব্যের মধ্যেই এমন সব ইঙ্গিত আছে যাতে তাঁকে একজন সত্যকার প্রতিভাবান উচ্চস্তরের কবি বলে মনে করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কাব্যদেহগঠন বা রূপনির্মাণে তাঁর ব্যর্থতা দেখে তাঁর প্রকৃত কাব্য-প্রতিভা সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে সংশয় জাগে। মধুসূদনের মত প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাও কাব্যগঠনের ক্ষমতা সংযোগে সার্থক হয়ে ওঠার সুযোগ কম পেয়েছে। আটচল্লিশ বছরের জীবনে মাত্র চার বছরের (১৮৫৯-৬২) জন্য প্রতিভা ও ক্ষমতার সাযুজ্য ঘটেছিল। চতুর্দশপদীতে কবি প্রায় বিগত-ক্ষমতা, আর পরবর্তী রচনাগুলিতে প্রতিভার শেষ শিখাটিও নির্বাণোন্মুখ। অপর পক্ষে প্রথম কৈশোরের কিছু অপরিণত প্রস্তুতি এবং একাশী বছরের মৃত্যুকালীন কিছু রোগজীর্ণ শিথিলতার কথা ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও রচন-ক্ষমতা চিরকালই অদ্বয়সম্বন্ধে বদ্ধ ছিল।

কিন্তু মধুসূদনের মনের এই ভারসাম্য বিচলিত হল। নিশ্চিন্ত স্থিতিতে থাকবার প্রাণসত্তা তাঁর নয়। শান্তির কামনা নেই তাঁর। তাই শান্তিস্থিতিকে পশ্চাতে ফেলে তিনি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ফুরিয়ে যাবার পথ ধরেন।

মধুসূদনের কবি-আত্মার অন্য একটি প্রধান প্রশ্ন হল বাঁচার প্রশ্ন। এই বিপুল পৃথিবীতে এত তীব্র আসক্তি নিয়ে যশের শীর্ষে আরোহণের অতি প্রবল কামনার জন্যই সর্বদা তাঁর এই আশঙ্কা—

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জলতলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে !

ইংলণ্ডযাত্রায় যখন কবিচিত্ত অত্যন্ত উল্লসিত, তখনও মৃত্যুভীতি কবিকে পরিত্যাগ করে না—

রেখো, মা, দাসেরে মনে,
এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে……। ইত্যাদি

যশের তরণীতে মৃত্যুসাগর উত্তীর্ণ হবার কামনা দ্বারা মৃত্যুকে কি জয় করা যাবে? গৌড়জন কি নিরবধি তাঁর কাব্যসুধা পান করবে? মধুসূদনের কাছে এ প্রশ্ন এত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে মৃত্যুঅতীত কোন জীবনের সান্ত্বনা তাঁর নেই এবং প্রচণ্ড প্রতিভার যে হোমধূম তাঁর অন্তরে প্রজ্বলিত, সৃষ্টির সামান্য চরুই তাতে উঠে এসেছে, বাকিটা সেই শিখার নিষ্ফল ইতস্তত সঞ্চরণ এবং শুষ্ক দীর্ঘশ্বাসে অবসিত॥

১ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ বর্তমান প্রসঙ্গে নেই। উৎসাহী পাঠক এ বিষয়ে বিনয় ঘোষের 'বাংলার নবজাগৃতি', 'বিদ্যাসাগর' (তিন খণ্ড), অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং অসিত সেনের 'Notes on Bengali Renascence' দেখতে পারেন।

২ "১৭৫৭ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে কতগুলি যে কৃষকবিদ্রোহ হয়ে গেছে তার সংখ্যা গণনা করা একেবারে অসম্ভব। শুধুমাত্র বৃহৎ বৃহৎ কৃষকবিদ্রোহগুলির সংবাদ কিছুটা আমরা জানি। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা। এই বিদ্রোহ ১৭৬০-'৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বৎসর ধরে চলেছিল। এই বিদ্রোহ কুচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বাঙলার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে দেখা দিয়েছিল। এই বিদ্রোহ

যখন চলছিল ঠিক তখনই বাঙলার আর এক প্রান্তে বীরভূম ও বিষ্ণুপুরে কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ('১৭৭২-১৭৮৫ খ্রী.)। তার পরে ১৮৩১ সালে পূর্ববঙ্গে ফরাজী আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৪৭ সালে বর্তমান বাঙলা, বিহার ও সাঁওতাল পরগণার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহ করে। ......নীল কৃষকদের আন্দোলন ও ফরাজী আন্দোলন বাঙলার কৃষকদের মধ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ১৮৬০-৭০ সালের মধ্যে। ......১৮৭৩ সালে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে পাবনায় কৃষকবিদ্রোহ সরকারকে আতঙ্কিত করে তোলে। বস্তুত এই সময়ে বাঙলার এমন কোন জেলা ছিল না যেখানে কৃষকবিদ্রোহ ছড়ায় নাই।"

৩ এ সম্পর্কে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী -রচিত 'মাইকেল মধুসূদনে'র জীবনভাষ্য দ্রষ্টব্য। মধুসূদনের পত্রাবলী এবং চতুর্দশপদী কবিতাও বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে মনে করবার মত। আমার সম্পাদিত "কবি মধুসূদন ও তার পত্রাবলী" দ্রষ্টব্য।

৪ এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের গৌরদাসকে লেখা একটি পত্রের অংশবিশেষ উল্লেখ করা চলে—

'I wish I could devote myself to its (বাংলাভাষা-লেখা) cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real-work for a living. I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. There is no honour to be got in our country without money. If you have money, you are বড়মানুষ ; If not, nobody cares for you ! We are still a degraded people. Who are the "বড়মানুষ" among us ? The 'nobodies' of Chorebagan and Barrabazar ! Make money, my Boy, make money ! If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done."

৫ 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর 'মাভৈঃ'।

৬ চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে প্রেম বিষয়ক কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৭ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রাংশ। "I was impressed with the belief that his desire of becoming a Christian was scarcely greater than his desire of a voyage to England."

৮ মাদ্রাজে মধুসূদন সম্পাদিত পত্রিকাদি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সঙ্কলিত না হওয়ায় এ বিষয়ে অনেক কিছুই অজানা থেকে গিয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কাব্যপাঠের ভূমিকা

"গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি"।

The contrast between romanticism and classicism has often been denied in view of the fact that romanticists were almost as fond of classical themes as the classicists.—Encyclopædia of Literature. Vol 1.

॥ এক ॥

কবিদের কাব্যদৃষ্টিকে স্থূলত দু-ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একদল কবি জগৎ এবং জীবনকে নিজের অন্তরের মধ্যে সংহরণ করে নেন। বাইরের জগৎকে তাঁরা আপনার অন্তর-জগতে রূপান্তরিত করেন। আপনার চিত্তবর্ণে এই জগৎ রঞ্জিত। অপর একদল কবি আপন ব্যক্তিগত প্রবণতা, কামনা-বাসনার বিশিষ্ট অনুরঞ্জনকে একপাশে সরিয়ে রেখে বাহিরকে যথাসম্ভব যথাস্থিতরূপে দেখতে চান।[১] প্রথমটিকে সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ Relative Vision বা আপেক্ষিক দৃষ্টি এবং দ্বিতীয়টিকে Absolute Vision বা নিরপেক্ষ দৃষ্টি নামে অভিহিত করেছেন। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে সমালোচক-প্রবর মোহিতলাল যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা উদ্ধারযোগ্য :

"আপেক্ষিক দৃষ্টির অর্থ এই যে, ইহা একটা চশমার অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ যাহা দেখে তাহাতে নিজের মনের রং অল্পাধিক মাত্রায় থাকিবেই। নিরপেক্ষ দৃষ্টি অর্থে স্বাধীন অবাধ দৃষ্টি বুঝিতে হইবে। যাঁহারা নিছক গীতিকবি তাঁহাদের এই আপেক্ষিক দৃষ্টিও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। যাঁহারা মহাকাব্য, কাহিনী বা নাটক-সদৃশ কাব্যরচনা করেন তাঁহাদের দৃষ্টিও আপেক্ষিক। এই দুইদলের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা একটি উপমার সাহায্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যাঁহারা গীতিকবি তাঁহাদের একটিমাত্র কণ্ঠ, এবং সেই কণ্ঠে একটিমাত্র স্বর। জগতের প্রায় সকল বড় কবি—কল্পনা ও কাব্যভঙ্গি যাহার যেমনই হউক—সকলেই এই আপেক্ষিক দৃষ্টির অধিকারী। দ্বিতীয় প্রধান দল—যাঁহারা নিরপেক্ষ বা পূর্ণদৃষ্টির অধিকারী—তাঁহাদের কণ্ঠ একাধিক, এবং সেই বহুকণ্ঠে বহুতর স্বর বাজিয়া ওঠে। ইঁহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প ; য়ুরোপীয় কবিগণের মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়ার, এস্কাইলাস, সোফোক্লিস, হোমার ও কতকটা চসারকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।"

মধুসূদনের কাব্যপাঠের ভূমিকা হিসেবে এ আলোচনা কিছুটা অবান্তর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এর একটু প্রয়োজন আছে। মধুসূদন মূলত আপেক্ষিক দৃষ্টির কবি। নিজের কামনা-বাসনা ও ব্যর্থতার বর্ণে তাঁর বিশ্ব রঞ্জিত। কিন্তু মধুসূদন সম্পূর্ণত গীতিপ্রাণ ছিলেন এ কথা বলার প্রধানতম বাধা হল তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্য। এই কাব্যটির মধ্যে এত বিচিত্র নারীচরিত্র কবির মনের স্বীকৃতি পেয়েছে যাদের প্রতি কবি-আত্মার কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই, বিকর্ষণ প্রচুর। কবির দৃষ্টির উৎসে কিছুটা নিরপেক্ষতা না থাকলে এ-জাতীয় সৃষ্টি সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, মেঘনাদবধকাব্যের--অন্তত একটি চরিত্র-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আপেক্ষিকদৃষ্টিজাত নয়। চিত্রাঙ্গদার চরিত্রটি রাবণ তথা রাবণস্রষ্টা মধুসূদনের জীবনদৃষ্টির একটি বিরুদ্ধ কোণ থেকে সে কাব্যটির উপরে আলোকপাত করেছে। অথচ সে ঘৃণিত রাম নয়। চিত্রাঙ্গদার প্রতি কবির সহানুভূতির অভাব নেই। আত্মভাবে উল্লসিত মধুসূদনের পক্ষে এ-জাতীয় চরিত্রকল্পনা সম্ভব হয় কিছুটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিপ্রবণতা থাকলেই।

মধুসূদনের মধ্যে সামান্যত হলেও নিরপেক্ষ কাব্যদৃষ্টি কিছু পরিমাণে ছিল। সাহিত্যাদর্শ হিসেবে তিনি যদি ক্লাসিসিজম্‌কে সম্পূর্ণ পরিহার করে রোমান্টিসিজম্‌কে বরণ করতে পারতেন তাহলে নিরপেক্ষদৃষ্টির যে কণাটুকু তাঁর মধ্যে ছিল তাও বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু তা ঘটে নি। মধুসূদন সচেতনভাবে ক্লাসিসিজ্‌মের চর্চা করেছেন, কিন্তু রোমান্টিকতার প্রভাব অন্তরে অন্তরে প্রবল ভাবেই অনুভব করেছেন। মধুসূদন প্রধানত ক্লাসিক আদর্শেই কাব্যে বর্ণনার কাজ সেরেছেন। বস্তুজগতের যে রূপ তিনি এঁকেছেন তা রোমান্টিক ধরনের নয়। রোমান্টিক বর্ণনায় কবির অন্তরজাত কল্পনার রঙ্‌ থাকে, অস্পষ্ট আকুলতা, রহস্যময় সুদূরতা থাকে। মধুসূদনের বর্ণনায় তা অল্প। ক্লাসিকধর্মী স্পষ্টতাই সেখানে বেশি। বর্ণনা সেখানে বস্তুরূপকে অস্বীকার করে না, প্রকাশ করে। আত্মভাবপরায়ণ কবি হওয়া সত্ত্বেও এই বস্তুনিষ্ঠা তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন নি।

মধুসূদনের কাব্যে ক্লাসিসিজম্‌ ও রোমান্টিসিজ্‌মের প্রশ্নে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মধুসূদন এই দুটি মনোভাবের প্রতিই মনে মনে আকৃষ্ট ছিলেন। প্রথম জীবনে বায়রনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। য়ুরোপীয় রেনেসান্সে ক্লাসিক সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। ক্লাসিক সাহিত্যের চর্চায় মধুসূদনের অত্যধিক আসক্তি

করেছেন, যতিপাতে এনেছেন অবাধ স্বাধীনতা। মধুসূদনের গম্ভীরে কোমলে সম্মিলিত আত্মার তরলতাহীন সান্দ্র রবকে ধরে রেখেছে এই ছন্দোভঙ্গি। এই ছন্দে যতিপাতের স্বাধীনতা এবং তৎসম শব্দের নির্বাচিত ধ্বনিসচেতন ব্যবহার একটা উপলমুখর গতিপ্রবাহের ব্যঞ্জনা আনে। বিচিত্র ভাব ও রস এই ছন্দের আধারে সার্থকভাবে ধরা পড়েছে, বস্তুর বর্ণনা এবং অনুভূতি-উপলব্ধির প্রকাশ, ঘটনার বিবৃতি এবং দৃশ্যের চিত্র সমান সৌন্দর্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে রূপলাভ করেছে; কিন্তু সর্বত্রই একটা বীর্যসমুন্নত মহিমার স্বর বেজেছে।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁর কাব্যকল্পনা এবং কবি-আত্মার সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধযুক্ত। তিলোত্তমা থেকে বীরাঙ্গনা পর্যন্ত এই ছন্দ ক্রমপরিণতিলাভ করেছে। এই পরিণতির পথ বেয়ে অমিত্রাক্ষর কতটা স্বাভাবিক ও সাবলীল হয়ে উঠেছে তা বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি মাত্র নয়, একে বলা যেতে পারে কবিপ্রাণের ছন্দোরূপ, কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পরবর্তী অনুকারীদের হাতে তাই অমিত্রচ্ছন্দের ব্যর্থতা প্রায় সর্বাঙ্গীণ।

লক্ষণীয়, মধুসূদন প্রচলিত পয়ার-ত্রিপদীর সোজা অনুসরণ করেন নি একটিও কাব্যে। তিনটি কাব্য তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত; ব্রজাঙ্গনা পয়ার-ত্রিপদীর ভিত্তিতে রচিত হলেও মিলের বিচিত্রতায় এবং মাত্রাসংখ্যার বিভিন্নতায় অভিনব। মধুসূদনের সনেটেও পয়ারের যতিভঙ্গি নেই, অমিত্রাক্ষরসুলভ প্রবহমাণতা আছে। এই নবীনতা ও বিচিত্রতায় মধুসূদনের কবি-আত্মার সহজ প্রতিফলন অনুভব করা যায়॥

॥ তিন ॥

মধুসূদনের কাব্যপাঠের সময়ে মানবচেতনার স্বরূপ, প্রকৃতিজিজ্ঞাসা, প্রেমানুভব কিংবা মৃত্যুভাবনার কথা বারবার মনে আসে। কিন্তু সেগুলি বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনার বস্তু নয়। কবির কাব্যে তার যে রূপ ধরা পড়েছে কাব্যবিচারকালেই তা আলোচ্য।

রচনাকালের ক্রম অনুসারে (প্রকাশকালের নয়) কাব্যগুলির বিচার ও আস্বাদে অগ্রসর হব এবং বিশেষ করে রূপবৃত্তের দিকে দৃক্‌পাত করব ॥

---

১ এ সম্বন্ধে Theodore Watts Dunton "Encylopædia Britanica"-র Poetry নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

২ ইংলণ্ডের কতিপয় সাহিত্যিকের রচনায় রোমান্টিক আন্দোলনের জন্ম অষ্টাদশ শতকের তৃতীয়-পঞ্চম দশকে। টমসনের Seasons, ইয়ংয়ের Night Thoughts, গ্রের Elegies এবং রিচার্ডসনের উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথম এর সাক্ষাৎ মেলে। এঁরাই প্রথম ক্লাসিক সংযমকে অস্বীকার করে মানবানুভূতির ভাবপ্রবণ দিকটির উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ফরাসী বিপ্লবের পরে ভাবপ্রবণতার এই ধারাটি সাময়িক ভাবে রুদ্ধ হয়, ক্লাসিসিজমের পুনরাবির্ভাব ঘটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিপ্লব যে-সব ভাবপ্রবণ সুরকে মুক্ত করে তাই-ই রোমান্টিক ভাবধারার অন্যতম প্রধান বীজ হয়ে দাড়ায়। জার্মানিতে ফিক্টের ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে শ্লেগেলের নেতৃত্বে রোমান্টিক আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে। একই সময়ে ইংলণ্ডে ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ রোমান্টিসিজমের বিজয় ঘোষণা করেন। মাদাম দ-স্তায়েলের নেতৃত্বেই প্রধানত সমগ্র য়ুরোপে রোমান্টিসিজম বিস্তারলাভ করে। রোমান্টিসিজমের পরবর্তী ইতিহাস বিচিত্র বিস্তৃত।

তৃতীয় অধ্যায়
ইংরেজি কবিতা

"I sigh for Albion's distant shore"

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

॥ এক ॥

মধুসূদনের লেখা ইংরেজি কবিতার সংখ্যা কম নয়। তরুণ বয়স থেকে ইংরেজি কবিতার চর্চাই তিনি করেছেন। বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার কোনো সম্ভাবনা বা মূল্য আছে একথা সমকালীন ইংরেজি শিক্ষিত আরও পাঁচটি তরুণের মতই তিনিও বিশ্বাস করতেন না। হিন্দুকলেজে পড়বার সময়ে রিচার্ডসন সাহেবের কাছে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ তিনি গ্রহণ করতেন। রিচার্ডসন নিজে কবি ছিলেন। তা ছাড়া সেকসপীয়র পড়াতেন চমৎকার। বায়রন এইকালে মধুসূদনের প্রিয়তম কবি হয়ে উঠলেন। টমাস মুরের লেখা বায়রনের জীবনী পড়ে তিনি পাগল হয়ে যেতেন। ইংরেজি সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার কিশোর মধুসূদনের মনে সাহিত্যরুচির জন্ম দিয়েছিল। সমকালে বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থা ছিল তাতে এই সাহিত্য-রুচির তৃপ্তি হবার কথা নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯ খ্রীঃ) তখন বাঙালি কবিদের অগ্রগণ্য মধুসূদনের সেক্সপীয়র-ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-বায়রন পড়া মনের কাছে গুপ্তের কবিতা কোনো আবেদনই নিয়ে এল না। বাংলা গদ্য সাহিত্যেরও তখন তেমন পুষ্টি ঘটে নি। গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্যরচয়িতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা আরও দূরবর্তী ঘটনা। এই দরিদ্র বাংলা ভাষায় স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ লেখা চলে, অশিক্ষিত জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হতে পারে পয়ার ছন্দে ক্ষুদ্র সরস কবিতা। ইংরেজি সাহিত্যের অমৃত স্বাদে যাদের অবারিত অধিকার বাংলা সাহিত্যের এই অকিঞ্চিৎকর সঞ্চয় তাদের শুধু করুণাই জাগাতে পারে। মধুসূদন বাংলায় কবিতা লেখার কথা ভাবতেই পারেন নি। এ-ভাষায় কোনো উচ্চস্তরের কাব্য রচনা সম্ভব বলে তাঁর ধারণা ছিল না। এমন কি বহু পরবর্তী কালে, বাংলা ভাষার উন্নততর অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র

Rajmohon's wife নামে ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছিলেন।

মধুসূদন হিন্দু কলেজের শিক্ষার গুণে এবং সমকালীন যুগপরিবেশকে সহজে মেনে নেওয়ায় অতি তরুণ বয়স থেকেই আচারে-আচরণে প্রায় সাহেব হয়ে উঠলেন। দেশি ধর্মসংস্কার বা পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তাঁর তীব্র অনীহা জন্মেছিল। এমন কি ইংরেজ বালিকা ছাড়া অপর কাউকে বিবাহ করা অর্থহীন এমন মন্তব্যও তিনি করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এক প্রবন্ধে কৌতুক করে নব্য শিক্ষিতদের ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখার কথা বলেছিলেন। মধুসূদন ইংরেজি পড়তেন, লিখতেন; ভাবতেন ইংরেজিতে, সম্ভবত ইংরেজিতে স্বপ্নও তিনি দেখতেন। ইংলণ্ডের স্বপ্ন। দূর ইংলণ্ডের তটভূমির জন্য তাঁর তরুণ হৃদয় দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত হত—

> I sigh for Albion's distant shore,
> Its valleys green, its mountains high ;—
> Tho' friends, relations, I have none
> In that far clime,—Yet oh ! I sigh
> To cross the vast Atlantic wave
> For glory, or a nameless grave !

ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি মহাকবি হয়েছেন (স্বভাবতই সে কাব্য ইংরেজি ভাষায় লেখা) এবং গৌরদাস তাঁর জীবনী লিখছেন এই স্বপ্ন-কল্পনা তো তাঁর চিঠিতেই প্রকাশ পেয়েছে।[১]

মধুসূদন যখন ছাত্র তখন অবশ্য ডিরোজিও হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর প্রভাব প্রাগ্রসর শ্রেণীর উপর থেকে তখনও মুছে যায় নি। ডিরোজিও Fakir of Jangeera নামে একটি কাব্য লিখেছিলেন। কাব্যটি যখন প্রকাশিত হয় মধুসূদন তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র। মধুসূদনের ইংরেজি কাব্যচর্চার পেছনে এই রচনাটির কিছু উৎসাহ ছিল বলে মনে হয়।

হিন্দু কলেজে শুধুমাত্র অধ্যয়নের মধ্যেই সাহিত্যচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল না। ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সেখানে স্বরচিত কবিতাপাঠ এবং আলোচনা চলত। বন্ধুমহলে খ্যাতির জয়মাল্য লাভের নেশা প্রত্যক্ষত ইংরেজি কবিতা রচনায় তাঁকে সেই তরুণ বয়সেই নিত্য প্রেরণা জোগাত।[২]

তা ছাড়া 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর', 'ক্যালকাটা লিটেরারী

গেজেট', 'গ্লীনার', 'ব্লসম', 'কমেট' প্রভৃতি সমকালীন (প্রধানত ইংরেজি) সাহিত্য-পত্রিকায় লিখবার আমন্ত্রণ ছিল। রিচার্ডসন সাহেব নিত্য উৎসাহ দিতেন। আর মুদ্রিত কবিতা নিয়ে বন্ধুজনের প্রশংসা কুড়াবার নেশাও তরুণ কবির ছিল।[৩] এই পত্রিকাগুলির প্রচলন তাঁর কবিতাগুলি প্রকাশের অবকাশ করে দিয়েছে, ফলে লেখারও। কবি তাঁর কল্পনাসুন্দরীকে লক্ষ্য করে সকৌতুকে লিখেছিলেন—

> Return, before our "Monthlies" all,
> The "Gleaner"—"Blossom"—"Commet" tempt
> Me to scribble for them all.

এইসব পত্রিকায় প্রকাশের সুযোগ না থাকলে এই কালের কতগুলি কবিতা রচিত হয়ে খাতার পাতায় মাথা খুঁড়ত বলা কঠিন। তবে সব কিছুর পেছনে ছিল তাঁর কবিমন, এবং ইংরেজি ভাষায় মাতৃভাষার মত অধিকার।

ফলে অল্পকালের মধ্যেই মধুসূদন অনেকগুলি ইংরেজি কবিতা লিখে ফেলেন এবং উচ্চশিক্ষিত মহলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। অতি অল্প সময়ে এই খ্যাতি তাঁকে প্রায় দুঃসাহসী করে তোলে। তিনি ইংলণ্ডের Black woods, Edinbourgh Magazine এবং Benteleys Miscellenyতে প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সেগুলি প্রকাশের যোগ্য বিবেচিত হয় নি।

কবির ইংরেজি কাব্যসাধনা মাদ্রাজবাসকালেও পূর্ণবেগে চলছিল। জীবনের বিপরীতমুখী ঘটনার চাপও তাকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। বিশেষ করে মাদ্রাজে কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায় কবিতা প্রকাশের একটি সহজ উপায় তাঁর আয়ত্তে ছিল। প্রত্যক্ষ প্রেরণাবশে ইংরেজি কবিতা লেখা সমানে চলতে লাগল। মাদ্রাজে তিনি 'মাদ্রাজ সার্কুলেটর অ্যাণ্ড জেনারেল ক্রনিক্‌ল', 'স্পেক্‌টেটর', 'এথেনিয়াম', 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি Timothy Penpoem এই ছদ্মনামে এই সব পত্রিকায় আপনার কবিতা প্রকাশ করতেন।

মাদ্রাজ বাসকালে তিনি ইংরেজ রমণী বিবাহ করে, ইংরেজ মহলে চলা-ফেরা করে তাদেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন। এমন কি অব্যবহারের ফলে বাংলা ভুলে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। গৌরদাসকে মাদ্রাজ

থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি এই কথা নিজেই বলেছিলেন। কিন্তু দুঃখে দারিদ্র্যে তাঁর অন্তরের কবি-প্রাণটির অপমৃত্যু ঘটে নি। তাই তিনি সমানে কবিতা লিখে চলেছেন, এবং স্বভাবতই সে সব কবিতা ইংরেজি ভাষায় লেখা।

মাদ্রাজে বসেই কবি গ্রন্থাকারে তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশ করেন; দুই সর্গে একটি পূর্ণদেহ কাহিনী-কাব্য এবং একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্যও মাদ্রাজে বসেই রচিত।

মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি বঙ্গবাসীর প্রাণরাজ্যে আবার প্রবেশ করলেন। সেখানে তখন সাহিত্য-নাট্য-শিল্পের নবজন্মোৎসব। সে উৎসবে তিনি যোগ দিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে তার শীর্ষে আসন পেলেন। বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের অব্যবহিত আগে এবং পরে তিনি ইংরেজিতে যা লিখেছেন তা অনুবাদধর্মী। কবি নিজের রাজ্যের রাজচক্রবর্তীত্ব পেয়েছেন; প্রবাসে ‹‹? দিন কাটান নি। অনুবাদগুলির পেছনে প্রকৃত সাহিত্যপ্রেরণার চেয়ে অন্যান্য কারণই বেশি সক্রিয়।

॥ দুই ॥

মধুসূদনের ইংরেজি কবিতাদির রচনাকাল সবটা ঠিকমত পাওয়া যায় নি। প্রাপ্ত তথ্যাদি দেখে মনে হয় ১৮৪১ সালের লেখা কবিতাই সম্ভবত সবচেয়ে পুরানো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কবির প্রাপ্ত চিঠিগুলির প্রাচীনতম তারিখও ঐ ১৮৪১ সাল। কবিতাগুলিকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করলে আলোচনার সুবিধা হতে পারে।

প্রথম পর্যায়—কলকাতায় (এবং শ্রীরামপুরে) ১৪৪০-৪৮ সালের মধ্যে লেখা।

দ্বিতীয় পর্যায়—মাদ্রাজে ১৮৪৮-৫৬ সালের মধ্যে লেখা।

তৃতীয় পর্যায়—পরবর্তীকালে লেখা, কলকাতায় এবং য়ুরোপে। এদের কালসীমা ১৮৫৬ থেকে ৬৭-এর মধ্যে।

প্রথম দুটি পর্যায়ের কবিতাগুলিই নানা দিক থেকে বিচার্য। কবির স্রষ্টা মনের সবটা স্রোত তখন ইংরেজি কবিতাদির খাত ধরে চলেছে। তৃতীয় পর্যায়ের রচনাগুলি মূলত অনুবাদজাতীয়। তখন কবি বাংলা সাহিত্যে আপনাকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন, ইংরেজি রচনার জন্য আর কিছু অবশিষ্ট রাখেন নি।

মধুসূদনের ইংরেজি রচনার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। প্রথমে কাব্যকবিতার কথা। তাদের সংখ্যাই বেশি। কবির অনেক কবিতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, যে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলি আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।[৪]

প্রথম পর্যায়॥ মাদ্রাজ যাবার আগে, কলকাতায় এবং শ্রীরামপুর বাসকালে—১৮৪১-৪৮ খ্রীঃ॥

১।	My fond sweet Blue-eyed maid	1841
২।	They ask me why I fade and pine	1841
৩।	The fortunate Rainy day	1841
৪।	Plunged in the fathomless abyss···	1841
৫।	Your muse, I know···	1841
৬।	Far from us thou 'rt sitting···	
৭।	An acrostic	
৮।	I sigh for Albion's distant shore···	1841
৯।	I lov'd thee	
১০।	Stanzas on Granting 'leave of absence' to my muse	
১১।	To a lady	
১২।	To another lady	
১৩।	Oh happiness !···	
১৪।	My thoghts, my dreams···	
১৫।	I am like the earth, revolving···	
১৬।	A pygmy in human form	
১৭।	The menial throng that crowds···	
১৮।	The heavenly ball	
১৯।	I loved a maid···	
২০।	The slave	
২১।	I have a heart, but that is far away···	
২২।	Song of Ulysses	
২৩।	The parting	
২৪।	"Lend me your Rollin"···	1842
২৫।	I thought I shall be able···	
২৬।	Gour excuse me that in verse···	
২৭।	If aught beneath this boundless sky···	1842

২৮।	Sonnet to futurity	1842
২৯।	Oft like a sad imprisoned bird I sigh···	1842
৩০।	Sonnet on the Ochterlony Monument	1842
৩১।	Evening in Saturn	
৩২।	Composed during a morning walk	
৩৩।	I wandered forth alone, I knew not where···	
৩৪।	To a star during a cloudy night	
৩৫।	Composed during an evening walk	
৩৬।	After a shower in the Evening	
৩৭।	I saw young Zephyr···	
৩৮।	Love, I have bask'd me···	
৩৯।	Beloved Lake, how oft I think of thee···	
৪০।	I am not rich···	
৪১।	Oh! how my heart exulteth···	
৪২।	A Storm	
৪৩।	Night	
৪৪।	The Upsori	
৪৫।	King Porus	1843
৪৬।	Hymn	1843
৪৭।	Ode (from the Persian of Sadi)	1844
৪৮।	On hearing a lady sing	
৪৯।	On a faded lily given to the author by a lady	
৫০।	Comest thou as one in beauty's ray	
৫১।	Visions of the past	1848
৫২।	The Captive Ladie	
৫৩।	Richard! There is a grief···	1849
৫৪।	And such dark grief···	1849

তৃতীয় পর্যায় ॥ পরবর্তীকালে ১৮৫৬-৬৭ ॥

৫৫।	When I was a young and gay recruit···	1856
৫৬।	Description of the Mount Dhavala. (Incomplete)	
৫৭।	Queen Seeta. (Incomplete)	

এছাড়া মাদ্রাজ বাসকালে তিনি একটি পঞ্চাঙ্ক কাব্যনাট্য লিখলেন—
"Rizia : Empress of Inde".

উপরি-উক্ত ৪৭, ৫৬ সংখ্যক কবিতাদুটি বাদে সবই কবির মৌলিক রচনা।[৫]

সংখ্যার দিক থেকেও তিনি কম কবিতা লেখেন নি। যে সব ভারতীয় কবি ইংরেজিতে কবিতা লিখে অল্পাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি-প্রতিভার দিক দিয়ে মধুসূদনের সঙ্গে অপরের তুলনাই চলতে পারে না। কিন্তু মধুসূদনের কবি-প্রতিভার প্রকৃত প্রকাশ তাঁর বাংলা রচনায়, ইংরেজি লেখায় নয়। ইংরেজি সাহিত্যের চর্চায় কবির প্রতিভার পরিণতি রূপ পায় নি, পথ খোঁজাই প্রতিফলিত হয়েছে। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে কাশীপ্রসাদ ঘোষ,[৬] রাজনারায়ণ দত্ত,[৭] গুরুচরণ দত্ত, ও. সি. দত্ত প্রভৃতি পূর্ববর্তী এবং সমকালীন বাঙালি কবিদের ইংরেজি কবিতার তুলনায় মধুসূদনের অপরিণত প্রতিভার এই সৃষ্টিগুলি কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না।[৮] অবশ্য কোনো বাঙালি কবির কবিতা প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি কবিদের রচনার সমকক্ষতা কিছুতেই দাবি করতে পারে না। কবিতা হিসেবে মধুসূদনের ইংরেজি রচনাগুলি এমন কিছু উচ্চ প্রশংসার বস্তু নয়। মাঝারি ধরনের সাফল্য কোনো কোনো রচনা লাভ করেছে। বাঙালি কবির পক্ষে তাও নিঃসন্দেহে দুর্লভ শক্তির পরিচায়ক। মাঝারি ধরনের ইংরেজি কবিতাগুলির সমালোচনার উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করি নি। ঐ রচনাগুলির কবিতা হিসেবে যতটা মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য মধুসূদনের কবিতা বলে।

মধুসূদনের ইংরেজি কবিতার আলোচনা প্রয়োজনীয় মনে করেছি নিম্নলিখিত কারণে—

প্রথমত, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বের এবং বহুমুখী সৃষ্টির সামগ্রিক পরিচয় লাভ করা দরকার। কবির বাংলা কাব্য ও নাটক তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু তাঁর গদ্য রচনা (ইংরেজি), তাঁর হেক্টরবধ, চিঠিপত্র, ইংরেজি কাব্যকবিতা, সংবাদপত্রের লেখা প্রভৃতি সব জাতীয় সৃষ্টিকর্মের বিচার-বিশ্লেষণেই মাত্র কবিকে সম্পূর্ণ চেনা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কলকাতায় ও শ্রীরামপুরে মধুসূদন কৈশোর ও প্রথম তারুণ্য কাটিয়েছেন কলেজের ছাত্র হিসেবে। তাঁর কাব্যরুচি এই কালেই বিশেষ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই সময়কার কবির সৃষ্টিধর্মের একমাত্র প্রমাণ হয়ে আছে তাঁর ইংরেজি কবিতাগুলি। মাদ্রাজ প্রবাসেও তিনি ইংরেজি কাব্যরচনায়ই আপন প্রতিভাকে নিযুক্ত রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের সাধনার সঙ্গে এদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কিন্তু কবির কাব্যপ্রতিভার

ক্রমবিকাশের পথরেখা আঁকলে এই দুই পর্বের ইংরেজি রচনাবলীর মধ্য দিয়ে এগুতে হবে। কবির শিল্পীমন কিভাবে বিকশিত হয়ে শর্মিষ্ঠা-তিলোত্তমার সিংহদ্বারে পৌছল তার পথ চিহ্নিত হয়ে আছে এই সব ইংরেজি কবিতায়। কবি-প্রতিভার সম্যক উপলব্ধিতে এদের আলোচনা তাই একরূপ অপরিহার্য।

॥ তিন ॥

১৮৪১ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে মধুসূদনের প্রথম বয়সের কবিতাগুলি রচিত।[৯] সতেরো থেকে চল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা এই কবিতায় প্রথম তারুণ্যের প্রতিফলন থাকা খুবই স্বাভাবিক। বস্তুবোধহীন ভাবাবেগের অতিরেক, উচ্ছ্বাস-তারল্য, অস্পষ্ট প্রেমবোধ নীহারিকা এ সময়ের কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কবির বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই সব অনুভূতি-উপলব্ধির সম্পর্ক কতটা তা বিশেষ করে বলা যায় না; আর কবিতাবিচারে সে প্রসঙ্গ অপরিহার্যও নয়।

মধুসূদন ১৮৪৩ সালে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম পর্বে লেখা ইংরেজি কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলিতে রচনা-কালের উল্লেখ আছে। একটিতেই মাত্র ১৮৪৪ সালের লেখা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য আমাদের হাতে এমন তথ্য নেই যাতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণকে কেন্দ্র করে যে রূঢ় অভিজ্ঞতা জীবনে তিনি লাভ করলেন, প্রথম তারুণ্যের অহেতুক উচ্ছ্বাসকে তা কথঞ্চিৎ সংযত করেছিল। তবে এমন অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত নয় যে কবিতা লেখার নেশায় সাময়িকভাবে কিছু ভাঁটা পড়েছিল।

মধুসূদনের এই সময়ের লেখা ইংরেজি কবিতাবলীর মধ্যে যে সব ভাব ও সুরের চর্চা করা হয়েছে তার মধ্যে প্রেম এবং প্রকৃতিই প্রধান। এই কবিতাগুলি প্রায়ই লিরিক কিংবা সনেটের দেহরূপকে বরণ করে নিয়েছে। কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি কবিতা বালসুলভ চাপল্য ও কৌতুকবোধের প্রকাশ। দুটি কবিতা কিছু দীর্ঘ। এদের মধ্যে আখ্যানধর্ম আছে। প্রেম এবং দেশপ্রেম এদের কেন্দ্রীয় বিষয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সনেটের সংহত ও সুদৃঢ় দেহবন্ধ অল্পপ্রাণ শিল্পীদের ভীতি উৎপাদন করে। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়—

ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।

সেই তরুণ বয়সে মধুসূদন বহুসংখ্যক সনেট লিখে প্রমাণ করেছেন,—

এক। তারুণ্য এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি মূলত শিল্পী; তা না হলে এই দুরূহ আঙ্গিক-সাধনায় ব্রতী হতেন না।

দুই। যখন ভাবে এবং রূপে তরল উচ্ছ্বাসের চর্চা করেছেন কবি (এবং বয়োধর্মে যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক) তখনও সব উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবিস্ফারের অন্তরালে বসে তাঁর শিল্পীপ্রাণ একটি সংযমের স্থান খুঁজে নিয়েছে।

শুধু তাই নয়, সনেটের প্রচলিত দেহরূপে নূতনত্ব আনবার কিঞ্চিৎ পরীক্ষা করতেও তিনি সাহসী হয়েছিলেন। 'Evening in Saturn' নাম দিয়ে একটি সনেটে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পেত্রার্ক-আদর্শের বা সেক্সপীরিয় রীতির সনেটে সর্বত্রই অন্ত্যানুপ্রাস সম্মানিত। এবং সে চরণান্তিক মিলেও কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি মানবার তাগিদ আছে। মধুসূদন কবিতাটির মুখবন্ধে নিজেই সেই বিদ্রোহী পরীক্ষার কথা সগর্বে বলেছেন—

> "Reader! who ever publishes a sonnet with a preface? I hear, or fancy that I hear, you say '*none*'! Well! I publish. I am an enemy to what men call 'custom'. But be that as it is, I publish my sonnet with a preface; I have to teach the world something new. Don't get offended. Behold! I have written *a sonnet in blank-verse*! What a rare experiment! Believe me, Reader, the Muse appeared not to resent this 'breach of etiquette' towards her. O Joy! O Glory! O happiness! that I have done successfully what none dared do before me!..."

বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠ, অতি তারুণ্যসুলভ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পেলেও এরই মধ্যে বাংলা সাহিত্যের নবযুগস্রষ্টার দূরাগত স্বর শোনা যায়। পরিণত কাব্যপ্রতিভার অধিকারী হয়েও এই প্রগল্‌ভতা তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তাঁর শতাধিক সনেটে (চতুর্দশপদী কবিতাবলী) আঙ্গিকগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবার এই সাধনা থেকে কবি বিরত থেকেছেন। জীবনগোধূলিতে রচিত একটিমাত্র সনেটকল্প কবিতায় চরণান্তিক মিল বর্জন করবার চেষ্টা দেখা যায়। এ জাতীয় পরিবর্তনে বিদ্রোহের আত্মতৃপ্তি থাকলেও শিল্পসিদ্ধি যে নেই কবির পরিণত শিল্পবোধে তা সম্ভবত ধরা পড়ে থাকবে।

অপরাপর সনেটগুলির আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য কবির মনোভাবের যে পরিচয় বহন করে তা হল—

প্রথমত। কবি সনেটগুরু ইতালির কবি পেত্রার্কের সঙ্গে যে তখনও পরিচিত হন নি সে বিষয়ে এরা আমাদের নিশ্চিত করে। পেত্রার্ক-সনেটে অষ্টক ও ষড়কের মধ্যেকার বিভাগটি ভাব ও রসাস্বাদের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কবির কোনোরূপ স্পষ্ট বোধই তখন পর্যন্ত জন্মায় নি। দুএকটি কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাসে পেত্রার্ক-সনেটের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়; যেমন—

I wandered forth alone, I knew not where, ক
For it was in that maddened mood of mind, খ
When, like th' impetuous tide that runneth blind খ
Beckoned by the pale queen of Night from far, ক
A thousand feelings rush from out their springs, গ
And deluge the sad heart : I looked around, ঘ
'Twas midnight calm, and there arose no sound ঘ
To meet mine ear, save the low murmurings গ
Of the sad night-winds : tears rushed from mine eye, চ
Oh ! those were soothing tears, they gave relief ! ছ
And like the clouds that gather on the sky চ
But soon dissolve in rain-drops, darkening grief ছ
Retired, and, lo ! Tranquillity চ
Succeeded that most painful fit tho' brief ! ছ

অথবা "I saw young Zaphyr pass from flower to flower"-এর অন্ত্যমিলের বিন্যাস [ক খ খ ক গ ঘ ঘ গ চ ছ চ ছ চ ছ] পেত্রার্ক-রীতি অনুমোদিত। কিন্তু কোথাও অষ্টক-ষড়কের মধ্যে ভাব বা রসগত সেই তরঙ্গভঙ্গ নেই যা পেত্রার্ক-সনেটের বিশিষ্ট স্বাদুতার অন্যতম নিদান।[১০]

পেত্রার্ক-সনেটের কথা কবি এই সময়ে হয়ত শুনে থাকবেন, কিন্তু এ বস্তুটির সঙ্গে তাঁর প্রকৃত পরিচয় ঘটে নি। চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছের প্রথমদিকে একটি সনেটে কবি লিখেছিলেন—

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,

বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—
সে দেশে জনম পূর্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতারার্কা কবি, বাক্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণবীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে ॥

১৮৬৫ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে বসে লেখা এই সনেট। কবি এই সময়েই পেত্রার্কের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন, কবিতাটি পড়ে তা নিঃসন্দেহে মনে হয়। এই বৎসর ২৬শে জানুআরিতে গৌরদাসকে লেখা একটি চিঠি আমাদের সিদ্ধান্তের নিশ্চিত প্রমাণ—

"I have been lately reading Petrarca—the Italian poet and scribbling some 'sonnets' after his manner."

দ্বিতীয়ত। কবি ইংরেজি সনেটের বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করেছেন। কোথাও কোথাও অন্ত্যানুপ্রাসের ধরনটি সেক্সপীরিয়। যেমন—"Shine on sweet emblem" [ক খ খ ক, গ ঘ গ ঘ, চ ছ চ ছ, জ জ], "I love to see those clouds" [ক খ ক খ, গ ঘ গ ঘ, চ ছ চ ছ, জ জ] প্রভৃতি। কিন্তু চরণান্তিক মিলের সাদৃশ্য সত্ত্বেও চারটি করে পংক্তির তিনটি স্তবকে, ভাবরসের ক্রমোচ্চতা এবং শেষ সমিল চরণদুটিতে ভাবানুভূতির সারনিষ্কাসন সেক্সপীরিয় সনেটে যে বিশেষ ধরনের স্বাদুতা সঞ্চার করে মধুসূদনের আলোচ্য কবিতাগুলি তা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু একটি কবিতায় সেক্সপীরিয় সনেটের আস্বাদ যেন কতকটা রক্ষিত হয়েছে,

I love the beauteous infancy of day, ক
The garlands that around its temples shine ; খ
I love to hear the tuneful matin lay ক
Of the sweet kokil perched upon the pine : খ

I love to see you streamlet gaily run গ
And blush like maiden beauty meek and fair, ঘ
When the bright beams of yon refulgent sun গ
Crowd on her trembling bosom pure and clear ; ঘ

I love to see the bee from flow'r to flow'r, চ
Sucking the sweets, to him they smiling yield ; ছ
I love to hear the breezes in the bower চ
Singing melodious, or along the field ; ছ

All these I love, and Oh ! in these I find জ
A balm to soothe the fever of my mind ! জ

প্রথম তিনটি স্তবকে প্রভাত-প্রকৃতির ছবি কবির শান্তোজ্জ্বল ভালোবাসার রঙে মনোরম হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শেষের দুটি চরণে ছবি থেকে বিশ্লিষ্ট শুধু হৃদয়ানুভব একাগ্র হয়ে উঠেছে।

তবে সাধারণভাবে এপর্বের সনেটে স্তবকবন্ধনের এই সচেতনতা ক্বচিৎ রক্ষিত হয়েছে। বেশির ভাগ কবিতায়ই চোদ্দটি চরণ মিলে অখণ্ড একটি ছবি বা ভাবাবেগ ধরে রেখেছে। পেত্রার্ক-সনেটের মত তা আট এবং ছয় পংক্তির দুটি অংশে বিভক্ত নয় ; সেক্সপীরিয় সনেটের মত তিনটি চার পংক্তি স্তবক এবং সমাপ্তি পয়ারের চারটি খণ্ড মিলে ঐক্যের সাধনাও তা করে নি। মিলটনের সনেটের দেহগঠনেও চোদ্দ চরণের নিবিড় অভঙ্গ ঐক্যই অনুসৃত। মধুসূদন মিলটনের কাছ থকে এই রূপাদর্শটি গ্রহণ করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তখনও মিলটন কবির কল্পলোকের দেবতা হয়ে ওঠেন নি। মনে হয় সেক্সপীয়রকে অনুসরণ করতে গিয়ে স্তবকসজ্জাটি রক্ষা করতে না পারায় সনেটগুলি এই চেহারা নিয়েছিল।

মধুসূদনের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলি বেশির ভাগ সনেট। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেঘাবৃত রজনীর একটি তারার প্রতি লেখা "Shine on sweet emblem of Hope's lingering ray", প্রভাত বর্ণনামূলক "I love the beauteous infancy of day", "I saw young Zephyr pass

from flower to flower", সন্ধ্যার স্তুতিবিষয়ক "I love to see those clouds of golden dye", মধ্যরাত্রির ছবি "I wandered forth alone, I knew not where," একটি হ্রদকে লক্ষ্য করে লেখা "Beloved Lake, how oft I think of thee"। এ ছাড়া কবির "Night" নামে একটি অসমাপ্ত কবিতার প্রথম তিনটি স্তবককে এক একটি স্বতন্ত্র সনেট হিসেবে গ্রহণ করায় বাধা নেই। রাত্রি বর্ণনামূলক পৃথক পৃথক কবিতা হিসেবে যেমন, তেমনি অখণ্ড ভাবসূত্রে গ্রথিত কয়েকটি স্তবকরূপেও এদের গণ্য করা চলে।

কবির দুটি সনেটে মিলে ("I am not rich" এবং "But oh ! I grieve not") একটিই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিটি কবিতার অখণ্ড স্বাতন্ত্র্য এর দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়েছে ঠিকই, তবু মধুসূদনের জীবনজিজ্ঞাসার পটভূমিতে এদের বিশিষ্ট মূল্য স্বীকার্য। প্রথমটিতে কবি পার্থিব ঐশ্বর্যের অভাব যে তাঁকে কাতর করতে পারে না সে কথা বড় গলায় বলেছেন। কিন্তু তাঁর ভাষায় বস্তুসম্পদের উজ্জ্বল ছবিই প্রকাশ পেয়েছে—

> I am not rich, nay, nor the future heir
> To sparkling gold or silver heaped on store
> There is no marble blushing on my floor
> With thousand varied dies : no gilded chair,
> No cushions, carpets that by riches are
> Brought from the Persian land or Turkish shore.

বস্তুসম্পদের ভোগে বিরাগী কবিমনের অনীহা এই বর্ণবস্ত চিত্রগুলিতে ধরা পড়ে নি, আসক্তিই এদের পেছন থেকে উঁকি মারছে। সেখানেই কবিপ্রাণের সত্যকার পরিচয়। জীবনভোগের বলিষ্ঠ কামনার অপর নাম মধুসূদন দত্ত। তাঁর প্রথম তারুণ্য থেকে পরিণত বয়সে তো বটেই, এমন কি মৃত্যুকালীন ভাবনায়ও এই প্রত্যয় হতে বিচ্যুতি নেই ; এই বিশ্বাসে এবং ব্যক্তিজীবনে এর অচরিতার্থতা নিয়ে ফুরিয়ে যাওয়া আছে। তাঁর কবিতায় মর্তমমতা এই বিশেষ ভোগবাদ-ঐশ্বর্যবাদের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের আয়োজনে তাঁর সম্পদহীন জীবনকে পূর্ণতা দিয়েছেন কবি পরম প্রসন্নচিত্তে। নীল আকাশ, তারার মালা, সবুজে উজ্জ্বল বসুন্ধরার বর্ণবহুল পুষ্পসজ্জা, সূর্যকরোজ্জ্বল পর্বত ও উপত্যকা কবির হৃদয় যে আনন্দে ভরে দিচ্ছে পার্থিব সম্পদজাত সুখভোগ

তার কাছে তুচ্ছ। বুকের কপাট খুলে রুদ্র ও কোমল গোটা নিসর্গ জগতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবি—

> And much there is on which my ear and eye
> Can feast luxurious ! why should I repine ?
> The furious Gale that howls and fiercely blows,
> The gentler Breeze that sings with tranquil glee,
> The Silver Rill that gaily warbling flows,
> And e'en dark and ever-lasting sea,
> All, all these bring oblivion for my woes,
> And all these have transcendent charms for me !

মধুসূদনের এই ভাবানুভূতিকে অকৃত্রিম বলে মেনে নেওয়া কঠিন। পার্থিব সম্পদের ক্লেদ ও মালিন্য থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও প্রয়োজনাতীত আনন্দের মুক্তি যাঁরা কামনা করেন কবি মধুসূদন কোনোকালেই তাঁদের সঙ্গী হতে পারেন নি, চানও নি। মেঘনাদবধ কাব্যের সীতা একবার অনুরূপ নিসর্গ-অনুভূতির পরিচয় দিয়েছে—

> ভুলিনু পূর্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
> রঘু-কুল-বধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে,
> পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি !
> কুটিরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
> ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
> পঞ্চবটী বনচর মধু নিরবধি ;
> জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
> পিকরাজ ! কোন্ রানী, কহ, শশিমুখি,
> হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
> খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
> নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্তক, নর্তকী,
> এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
>
> —[চতুর্থ সর্গ]

রাজকীয় ঐশ্বর্যের স্থানে সীতা যত সহজে প্রকৃতির সহজ আনন্দ ও সরল সৌন্দর্যকে বসিয়েছে, মধুসূদন নিজে তা পারেন না। সীতার যে চরিত্রবৈশিষ্ট্য

কবির কল্পনায় ধরা পড়েছে, তারই অনুরোধে কবি সেখানে নিজের ভাবনাকেও অতিক্রম করে গিয়েছেন। কিন্তু কবির ব্যক্তিক উপলব্ধি যে অন্য জগতের তা কোথাও অপ্রকাশ থাকে নি।

মধুসূদনের দৃষ্টিতে কখনও প্রকৃতির রূপমুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে, কখনও মানবজীবনলীলার পটভূমি হিসেবে প্রকৃতি আমন্ত্রণ পেয়েছে, কিন্তু স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠা পায় নি, জীবনোর্ধ্ব গৌরবে ভূষিত হয় নি। চতুর্দশপদীতে কবির দৃষ্টিতে নিসর্গ কিছু বেশি গুরুত্ব পেলেও কবির সাধারণ বোধকে তা ছাড়িয়ে যায় নি।

প্রভাত বর্ণনায় কবি একটি মৃদু শান্ত পরিবেশকে সাফল্যের সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর কলধ্বনিতে, কোকিলকূজনে, মধুপের পুষ্পবিহারে যে প্রভাতচিত্র ইংরেজি-ভাষারূপ পেয়েছে তা কিন্তু একান্তভাবেই বাংলাদেশের প্রকৃতির সামগ্রী, বাংলা কবিতায় বহু উচ্চারিত। পরে পরিণত বাংলা কাব্যে প্রভাতের যে রূপ তিনি এঁকেছেন তার সঙ্গে এই কল্পনার সাদৃশ্য কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করবার মত,—

> হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
> ...... কূজনিল পাখী
> নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
> মধুজীবী ; মৃদুগতি চলিলা শর্বরী,
> তারাদলে লয়ে সঙ্গে··· ।
>
> —[মেঘনাদবধ কাব্য। ষষ্ঠ সর্গ]

প্রভাত বর্ণনামূলক অপর একটি ইংরেজি কবিতায় উজ্জ্বল সূর্যালোক-উদ্ভাসিত নীল আকাশের নীচে সদ্যজাগ্রত বিহঙ্গের উচ্চ আহ্বানে কবি প্রাণের উৎসাহদৃপ্ত তারুণ্য সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে—

> The boundless heaven, bathed in the brightening shower
> Of early sun-shine, was now faintly spread
> With smiles. The lark, springing from his bed,
> With loud acclaims to every grove and bower,
> Did trumpet forth the Day's nativity ;

কাব্যমূল্যের বিচারেও এটি অবহেলিত হবার নয়। প্রসন্ন প্রাণের আলোয় উজ্জ্বল এবং উদারতায় দিগন্তপ্রসারী এমন প্রকৃতিচিত্র মধুসূদনের বাংলা কবিতায়ও সুলভ নয়।

সন্ধ্যাবর্ণনা করতে গিয়ে একটি সনেটে কবি অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণরশ্মিপাতে ঈষৎ রঞ্জিত সবুজ ক্ষেতের আর আকাশের অস্পষ্ট নীলের যে ছবি এঁকেছেন তার বর্ণ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মত।

I love to see those clouds of golden dye
Float graceful o'er yon blue expanse, serene,
……Those meadows green,
Tinged by the fading flushes of the sun…

আমাদের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর "সায়ংকাল" শীর্ষক কবিতাটির কথা মনে করিয়ে দেয়—

চেয়ে দেখ, চলিছেন মুদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে।

কবির মন ১৮৪১ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত যেন একই উপলব্ধিতে দুলেছে। সন্ধ্যার রহস্যঘন অস্পষ্টতা, অসীমাভিমুখী রোমান্টিক আর্তি কোনকালেই তাঁকে ব্যাকুল করে নি, যতটা মুগ্ধ করেছে তার বর্ণবিহ্বল কান্তি।

কবি মাঝে মাঝে অন্ধকার রাত্রির ছবি এঁকেছেন, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের বিশ্রাম-বন্দর রূপে তাকে কল্পনা করেছেন, তার নিঃশব্দ প্রশান্তি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন—

Come Night !—Sweet Night ! thy gentle reign
like of land
To mariners tempest-tost, is ever dear
To hearts, sad lacerated by the hand
Of rankling care. and with dark sorrows sear !
There is a balm e'en in thy very breeze :—
Thy silence hath a tongue—an eloquence,…[১১]

দিবালোকের অবসানে বর্তমান ধূসর অস্পষ্টতায় বিলীন হয়ে গিয়েছে, হারিয়ে যাওয়া বছরগুলোর স্মৃতির তরঙ্গ হৃদয়তটে মুহুর্মুহু চুম্বন রেখা এঁকে দিয়ে যাচ্ছে—

Depart years ! Youth-childhood !—Where are ye ?
Where is of hopes and dreams your lovely store ?
Alas !—ye came as waves that from the sea,
In joyous bands flow on to kiss the shore,
And then recede away !

মেঘনাদবধ কাব্যেও কর্মক্লান্ত দিনের শান্তির আশ্রয় স্বরূপে রাত্রির ছবি আঁকা হয়েছে—

অস্তে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি—
একটি রতনভালে ।……
……কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে ;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে ।
… … … … …
আইলেন নিদ্রা দেবী ; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা ।

—[দ্বিতীয় সর্গ]

আবার,

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট ; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব ; তারাদলে আইলা রজনী ;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি ।

—[অষ্টম সর্গ]

কিন্তু উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত রজনীর রাজেন্দ্রাণী রূপই কবির কাছে বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে আরও পরবর্তীকালে। প্রমাণ স্বরূপ চতুর্দশপদী কবিতাবলীর রাত্রি-প্রসঙ্গে লেখা সনেটগুলির কথা মনে করা যেতে পারে। "নিশা" কবিতায় কবি বলেছেন—

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি! সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ মনে।

একই রূপ ঐশ্বর্য, ঔজ্জ্বল্য ও মহিমা তাঁর "নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দিরে" কিংবা "ছায়াপথ" কবিতায়ও ধরা পড়েছে—

কহ মোরে শশিপ্রিয়ে, কহ কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন সদনে
মহেন্দ্রে,—সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনী ক্ষণেক কাল চারু তারাগণে—
সৌন্দর্য্যে?—

প্রথম তারুণ্য এবং পরিণত কল্পনার মধ্যেকার এই পার্থক্যটি লক্ষ্য করবার মত। ইংরেজি কবিতায় মধুসূদন রাত্রি-প্রসঙ্গে প্রচলিত কবিকল্পনার বশবর্তী হয়ে চলতে চেয়েছেন, হয়ত ভাষারূপে মাঝে মাঝে সাফল্য ঘটেছে। মেঘনাদ-বধে প্রসঙ্গক্রমে রাত্রির প্রথানুগ রূপই প্রকাশ পেয়েছে। চতুর্দশপদীতে তিনি স্বভাবনায় প্রতিষ্ঠিত। এই বিশিষ্ট উপলব্ধিতে এই নূতনত্বে মধুসূদনের কবি-প্রাণের পরিচয় আছে।

মধুসূদন অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির নিঃসঙ্গ তারাটিকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা লিখেছিলেন প্রথম বয়সে। জীবনের দুঃখ, হতাশা সব কিছুর মধ্যেও দূর আকাশের ঐ উজ্জ্বল তারাটি আশার ও আনন্দের প্রতীক বলে কবির মনে হয়েছিল—

Shine on, sweet emblem of Hope's lingering ray!
That while the soul's bright sun-shine is o'er cast,
Gleams faintly thro' the sable gloom, the last
To meet beneath Despair's dark night away!

তরুণ কবির প্রাণে ভবিষ্যতে বিশ্বাস আছে। সন্ধ্যার কথা বলতে গেলেই

'গোধূলিরতন ভালে' শুকতারার কথা, রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে একটি জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের প্রসঙ্গ কবির পরিণত বাংলা কাব্যে বারবার উঁকি দিয়েছে। চতুর্দশপদী রচনার কালে আকাশের একটি নক্ষত্র দূরাগত প্রশান্তি ও জীবনযন্ত্রণার শান্তিকেন্দ্র বলে কল্পিত হয়েছে। জীবনের সেই পর্বে কোনোদিক থেকে আর আশ্বাসের আলো দেখতে পান নি কবি। উষালগ্নের শুকতারাটি কোনো বিদেহী আত্মা বলে মনে হয়েছে, তার যন্ত্রণাকাতর ক্লান্ত ললাটে মৃদু স্নেহচুম্বন দেবার জন্যই যেন সুদূর আকাশ থেকে সে নেমে আসে—

> নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে
> দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
> ···দেহ-কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
> স্নেহকারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
> ভালবাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
> হৃদয় আঁধার তার খেদাইতে দূরে ?

বাংলা সনেটটিতে কবিকল্পনা অনেক পরিণত এবং মৌলিক, কিন্তু হতাশার ক্লান্ত সুরের ব্যঞ্জনাটিও অশ্রুত নয়।

শনি গ্রহকে অবলম্বন করে লেখা সনেটটির আঙ্গিকই শুধু অভিনব নয়, ভাবনাটিও একটু বিশিষ্ট। চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে তিনি শনি নাম দিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। সম্ভবত এই গ্রহটির সঙ্গে জড়িত দুর্নাম কবির বিদ্রোহী মনকে এর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। বাংলা কবিতায় কবি তো স্পষ্টই বলেছিলেন,

> কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
> জ্যোতিষী ?

ইংরেজি কবিতার পেছনেও মনোভাবটি একই। মন্দ বলে যে পরিচিত তাকে গৌরব দেবার বাসনায় এই গ্রহের এক ধরনের সুন্দর উজ্জ্বল ছবি কবি এঁকেছেন; চব্বিশ বছরের এবং দুই ভাষার ব্যবধান থাকলেও তাদের সাদৃশ্য দৃষ্টি এড়ায় না। ইংরেজি কবিতায়—

> Now from the west rose six moons hand in hand—
> Like a soft band of beauties—blushing-fair—
> Oh ! how their beams did brighten all the scene,

বাংলা কবিতায়—

ছয় চন্দ্র রত্ন রূপে স্বর্ণ টোপরে
তোমার ; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি
হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে !

কিন্তু ইংরেজি কবিতায় এমন একটি ভাবনা স্থান পেয়েছে যার অনুরূপ কোনো কিছুর চিহ্ন তাঁর পরিণত বয়সের রচনায় দেখা যায় না। তিনি শনি গ্রহ থেকে এই মাটির পৃথিবীর সামান্যতার প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন, "You, son of the poor earth." অক্টোরলনী মনুমেণ্টের উপরে বসে লেখা আর একটি কবিতায়ও একই চিন্তা স্থান পেয়েছে—

Behold ! beneath me how the grovelling band
Of this poor earth,—like emnants, whom the sight
Can scarce perceive,—are passing sadly by !
But what are they ? poor things of mortal dye !

মর্তপ্রেমিক মধুস্থদনের পক্ষে এরূপ উপলব্ধি স্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই মর্ত-ভালবাসার জন্ম হতে আরও কিছুকাল লেগেছিল। ইংরেজি কবিতা লেখার যুগে প্রথম তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে কবি যে আত্মবিস্ফার অনুভব করেছেন তাতে নিজেকে অভ্রভেদী মহিমায় উন্নীত বলে কল্পনা করে নিতে তাঁর বাধে নি। যে তীক্ষ্ণ বস্তুবোধ অভিজ্ঞতার দান, কবি তখন তার চেয়ে অনেক দূরে। এই ভাবোপলব্ধিতে তাই ফেনোচ্ছ্বাসের আধিক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়—

Lo ! raised upon this vast aerial height,
This realm of air—free, uncontrolled I stand :
... ...Round me now,
The boundles sea of air, in calm profound,
Is sleeping gently. [১২]

কিন্তু এর মধ্যে বীজ আছে ভবিষ্যতের বীর্যদৃপ্ত সেই কবিপুরুষের দৃঢ়তায়, মাহাত্ম্যে, মুক্তির কামনায় যা sublimeকে স্পর্শ করেছিল।

বর্ষা বিষয়ে গুটি দুয়েক কবিতার সন্ধান মিলছে। বাংলাদেশের ঋতুচক্রে বর্ষার ভূমিকা রাজরাজেশ্বরের। গোটা প্রকৃতিকেই শুধু সে অধিকার করে নেয় না, এ দেশের মানুষের মনোজগতেরও একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে বসে। অথচ বাংলা

কাব্য সাধনায়। এই বর্ষার নিজস্ব রূপের দিকে কবি বড় তাকান নি।[১৩] সেদিক থেকে ইংরেজি কবিতা দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। তরুণ বয়সে কবির চিত্ত-কেন্দ্রটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লাভ করে নি। নির্বাচনে ব্যক্তি-প্রবণতার কঠোর সীমা তাই আরোপিত নয়। সহজ মনে বাঙালি তরুণ বর্ষাকেও বরণ করেছিলেন তাঁর কাব্যরাজ্যে। একটি কবিতায় বাদাম গাছের নীচে বর্ষামিলনের যে চিত্র আছে তা বৈষ্ণব পদাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, যদিও এদের জাত আলাদা—

Lo ! sweet was the hour ;—and a balmy shower of rain,
Received th' drooping beauties of each flowery
mead and plain ;
Like tyrants, bereft of their power, as they fly,
The proud scorching sun was retiring in the sky—
And tuneful Zephyr warbled his heart
entrancing song,
And sighed as he wandered you green groves among ;
When gladly I met her beneath yon Almond tree,
(Oh sacred as Elysium be its happy shades to me !)
There I kissed and embraced her :

—[The fortunate Rainy day]

অপর একটি কবিতায় স্নিগ্ধ নীলনবঘন আকাশের দিকে কবির মুগ্ধ দৃষ্টিপাত ধরা পড়েছে ; প্রশান্ত শ্যামলতা শব্দের বিন্যাসে এবং ব্যঞ্জনায় কতকটা প্রকাশ পেয়েছে।—

Oh ! 'twas a spirit-stiring sight,
It soothed my heart with calm delight !
The sky was sweet as beauty's face,
When melancholy shades her brow,
And when a charming pensiveness,
Slight tinges her cheek's rosy glow :

বর্ষাপ্রকৃতিকে একটি নারীরূপে কল্পনা করা আমাদের কাব্যঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

ইংরেজি কবিতায় ঝড়ের বর্ণনা করতে গিয়ে ক্রুদ্ধ পুরুষরূপে তাকে অঙ্কিত করেছেন।

The lightning from his eye,
The thunderbolts flashes from his hand,
His breath convulses all sky !

কবির পরিণত কাব্যে ঝড়ের বর্ণনা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। রুদ্র-গম্ভীরের আয়োজন সেখানেও ব্যর্থ নয়। সে যেন কবির স্বাভাবিক প্রবণতার ফল। তবে কোনো বিশিষ্ট চিহ্ন সেখানে মুদ্রিত নেই। যেমন—

সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে!
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণপ্রভা-দানে!
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্মুহুঃ! দাবানল পশিল কাননে!

—[মেঘনাদবধ কাব্য। পঞ্চম সর্গ]

কবির প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি প্রায়ই সনেটের রূপ নিয়েছে। ফলে তা প্রায়ই হয়ে উঠেছে ছবি—কোথাও তা শুধুই রেখাময়, কোথাও আবার বর্ণবন্ত। কখনও কখনও তার সঙ্গে কবিচিত্তের বিচিত্র উপলব্ধি এবং মুগ্ধতার রঙ লেগেছে। এই কবিতাগুলি কবির ভাবাবেগের প্রকাশমাত্র হয়ে থাকে নি, ভাষারূপে ধরা পড়েছে বলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিত্বের ন্যূনতম বিচারে উত্তীর্ণ। সনেটের সংহত বন্ধন অকারণ ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্যকে প্রশ্রয় দেয় নি। রূপসাফল্যের এও অন্যতম কারণ। কিন্তু প্রেম কবিতাগুলি প্রায়ই লিরিক বা গানের রূপ ধরেছে। প্রথম তারুণ্যের প্রেমানুভূতিতে স্বভাবতই উচ্ছ্বাস তরল এবং প্রবল। প্রায়ই তা অকারণ, বস্তুবন্ধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সনেটের সংক্ষিপ্ত সংহত আকৃতি অপেক্ষা গান এবং গীতি-কবিতার বিতানিত রূপের দিকেই তার স্বাভাবিক আকর্ষণ। সেখানে কবির আবেগ যতটা প্রকাশিত ততটা রূপধৃত নয়। প্রায়ই তা নেহাৎ আবেগ এবং উচ্ছ্বাস, কবিতা নয়।[১৪]

মধুসূদনের প্রেমবোধে প্রত্যক্ষতা ছিল। কোন তত্ত্ব-দর্শনের দ্বারা তা যেমন প্রভাবিত নয়, তেমনি রোমান্টিক-ভাবনায় দেহধর্মমুক্ত হয়ে তা রহস্যময়

সুদূরে বিলীনও নয়। মিলনে আনন্দ, বিচ্ছেদে বেদনা, কামনা-বাসনায় দেহমনপ্রাণের আলোড়ন কবির প্রেমানুভূতির বৈশিষ্ট্য। পরিণত বয়সের কবিতায় নানা পাত্রপাত্রীর চরিত্র ও উপলব্ধিতে এই বোধ ধরা পড়েছে, কবি প্রত্যক্ষভাবে নিজ ব্যক্তিহৃদয়ের প্রেমোপলব্ধি কোনো গীতিকবিতায় বা সনেটে (গুটি দুয়েক সনেট "আশার ছলনে"র একটি স্তবক বাদ দিয়ে) প্রকাশ করতে চান নি। সেদিক থেকে এই ইংরেজি গীতিকবিতা এবং গানগুলি কবির সৃষ্টি-জগতে অনন্য স্থানের অধিকারী।

কবির এই রচনাগুলির পেছনে তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রভাব কতটা তা সঠিক বলা যায় না। এবং সে প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনায় অপরিহার্যও নয়। এই সব কবিতা-কল্পনার পেছনে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উপলব্ধি কার্যকর কিনা অথবা প্রথম যৌবনে প্রকৃত নারীসম্পর্কবিহীন যে অস্পষ্ট প্রণয়াবেগ হৃদয়ে গুঞ্জরণ করে, যে অকারণ ব্যাকুলতা ও ঔদাসীন্যে চিত্ত পূর্ণ হয়ে ওঠে তারই প্রকাশ এসব কবিতায়? কবি গৌরদাসকে এই সময়ে একটি চিঠিতে লিখেছেন,

"It is the hour for writing love letters since all around now is love inspiring."

ঠিক এই একই মনোভাব প্রণয়-কবিতাগুলির জন্ম দিয়ে থাকবে। আবার এমনও হওয়া অসম্ভব নয়, ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তিনি বুঝেছিলেন প্রেম ও প্রকৃতিই গীতিকবিতা ও সনেটের প্রধান অবলম্বন। কবিখ্যাতি লাভ করতে হলে প্রণয়গীতি রচনা একরূপ অপরিহার্য।

কারণ যাই হোক এ জাতের অনেকগুলি কবিতা তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে ক্বচিৎ আন্তরিকতা, ক্বচিৎ কৃত্রিমতা এবং প্রায় সর্বত্র উৎকর্ষের অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে।

দু একটি কবিতায় কবি তাঁর প্রেয়সীকে বিশ্বসৌন্দর্যে ব্যাপ্ত করে দেখেছেন, যেমন—

My thoughts, my dreams, are all of thee,
Though absent still thou seemest near;
Thine image everywhere I see—
Thy voice in every gale I hear.

... ...

What'er in this far earth I see
'Mong Nature's forms that's pure and bright

Reminds me ever, love, of thee
And brings thine image to my sight.

এই ভাবকল্পনার উৎসে কবির স্বাধীন উপলব্ধি নেই, আছে রোমান্টিক কবিকুলের বিশ্বানুভূতির অনুকরণ। কবির তরুণ মনে এই চেতনা ধরা পড়া স্বাভাবিক ছিল না; আর সত্যই তাঁর হৃদয়ের গভীরতম উৎস থেকে যদি এই কবিতাগুলি উৎসারিত হত, তাহলে এদের স্থায়ী মুদ্রণ কবিচিত্তে থাকত, পরিণত কবিতায় তাদের কিছু চিহ্ন মিলত। কিন্তু পরিণত মধুসূদনের প্রেম-ভাবনা এই পথ ধরে নি। শুধুমাত্র তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে তিলোত্তমার রূপকল্পনায় বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্য-চেতনা অনেকটা ধরা পড়েছে।

আবার দু একটি স্তবকে ভাষারূপে প্রেমকল্পনার সুন্দর চিত্র পাই—

I lov'd thee—how oft on thy soft beaming eye,
I've gaz'd with deep rapture and heart swelling high!
There was life in thy smile—there was death in thy frown;
Thy voice it was sweeter than melody's own!

প্রিয়ার হাস্যে জীবন-উল্লসিত, ভ্রূকুটিতে স্তম্ভিত মৃত্যু, কণ্ঠস্বরে সপ্তস্বর সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা—অনুভূতি যেমন সুন্দর তেমনি শব্দবন্ধেও চমৎকার প্রকাশিত। কিন্তু এরূপ সাফল্যের উদাহরণ দুর্লভ।

বেশির ভাগ কবিতায় হতাশার সুর প্রবল। কোথাও কল্পিত। প্রেয়সীর মৃত্যুবেদনায় কবিচিত্ত দীর্ণ—

But 'tis past—like a vision of ethered ray
Thou camest but to dazzle and, vanish away—
A seraph forth straying from Heaven's bright bow'r.
In sun-shine and glory to bless—but an hour!

কখনও বিচ্ছেদে তাঁর জীবন হতাশাম্লান—

O! thus abandoned to despair
I've naught but grief for me;
My life a wilderness appear
Overgrown with misery!

কখনও কবি তাঁর "fond sweet blue-eyed" প্রেয়সীর জন্য বেদনায় তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত, বিগত সুখের সন্ধানে উচ্চ চিৎকারে আর্ত, কিম্বা মৃত্যু-ভাবনায় মন্থর। সেই নীলনয়নাকে কোনদিনই পাবেন না তিনি, অচরিতার্থ কামনার দীর্ঘশ্বাস বহন করবেন চিরকাল—

I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O.
But she, oft with disdain, repaid
My fondness and affection, O.
For her I sighed, and e'er shall sigh.
Tho' she shall ne'er be mine, O.
For this sad heart's starless sky
None but herself can light, O.

কবির এই দুঃখ ও নৈরাশ্যবোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীত-পর্বের মনোভাবের সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতি"তে তাঁর সেই সময়ের হৃদয়ভাবের ব্যাখ্যা করেছেন,—

"বাহিরের সঙ্গে অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না, তখন সেই অন্তর-নিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানসপ্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোন বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই—এই জন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে—তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যাসঙ্গীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে, তাহার মূল সত্যটি অন্তরের রহস্যের মধ্যে।"

মধুসূদনের এই বিষাদানুভূতির মূলে অভিজ্ঞতার সত্য নেই, হৃদয়লোকের অস্পষ্ট অকারণ আকুতিই সত্য।

॥ চার ॥

কবি এই পর্যায়ে দুটি আখ্যানকাব্য লিখেছেন—The Upsori এবং King Porus. এই সব কাব্যের আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন ম্যুর, বায়রন, স্কটের কাছ থেকে। কবিতা হিসেবে রচনা দুটির মূল্য সামান্য, কিন্তু কবিমনের প্রথম উন্মেষকালীন কিছু প্রবণতার চিহ্ন এর মধ্যে ধরা পড়ে।

প্রথমত। মধুসূদন দীর্ঘ কবিতা লিখতে উৎসাহ বোধ করেছেন তখন থেকেই। ক্ষুদ্রাকার সনেট বা লিরিকের মধ্যে তাঁর প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে কবির সঙ্কোচ ছিল। সগর্বে তিনি বন্ধুকে জানিয়েছেন, "I am writing a long poem." এই ঘোষণার মধ্যে যেন, বহু দূর ভবিষ্যতের (অন্তত ২০ বছর পরের) এই চিন্তার অস্পষ্ট পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়—

> "What say you? Or must I sink into a writer of occasional lyrics and sonnets for the rest of my days? The idea is intollerable."

দীর্ঘ কাব্যেই অমরতা—এই ধারণা বালক বয়স থেকেই ধীরে ধীরে মধুসূদনের মনে শিকড় গাড়তে থাকে।

দ্বিতীয়ত। যে বীররসের (সঠিকভাবে বলা উচিত বীর্য ধর্মের)[১৫] সাধনা মধুসূদনের পরিণত কাব্যসাহিত্যের একটি প্রধান কীর্তি তার বিশেষ কোনো পরিচয় ইংরেজি কাব্যচর্চার প্রথম পর্যায়ের অন্য রচনায় চোখে পড়ে না। গাথা কবিতা King Porus -এর স্থান এদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

তৃতীয়ত। চরিত্রচিত্রণ এই দুটি কবিতায় প্রথম করলেন কবি। গল্প গঠনের চেষ্টাও এই প্রথম। পরবর্তীকালে গল্পগঠনে এবং চরিত্ররূপায়ণে মধুসূদনের কাব্য উৎকর্ষের দুর্লভ স্বর্গে পৌঁছেছিল। সেই উৎকর্ষের চিহ্ন না থাকলেও সেই ধারার সূত্রপাত তরুণ বয়সের এই ইংরেজি কবিতায়।

King Porus কবিতাটি The Upsori-র তুলনায় আকারে অনেক ছোট, কিন্তু কাব্যগুণে কিছু উন্নত। আলেকজাণ্ডার-পুরুর বহুখ্যাত কাহিনীটি এ কবিতার বিষয়। আলেকজাণ্ডারের বিশ্বজয়ী সেনাবাহিনীর প্রতিরোধ করলেন ক্ষুদ্র কিন্তু দেশপ্রেমিক নৃপতি পুরু। পুরু পরাজিত হলে গ্রীক বীর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরূপ ব্যবহার তিনি প্রত্যাশা করেন। পুরু সদর্পে উত্তর করলেন, বীরের মত। এই ক্ষুদ্র কাহিনীটি অবলম্বন করে কবি পুরুর বীর্য-দৃঢ় মূর্তি এবং আপন স্বদেশপ্রীতির যে পরিচয় দিতে চেয়েছেন তা মোটামুটি সার্থক হয়েছে।

পুরুর যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে জটিলতা নেই, গভীরতাও নেই। কিন্তু বীর্যস্তম্ভিত স্বদেশপ্রাণ এই নৃপতির গর্বস্ফুরিত চিত্রটি স্থির হলেও জীবন্ত। হিমালয়ের তুষারাবৃত উচ্চ শৃঙ্গের সঙ্গে এই চরিত্রটিকে উপমিত করা হয়েছে।

চিত্রটি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রারম্ভের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবার যুদ্ধরত পুরুর এই চিত্রটিও সুঅঙ্কিত—

Tho' thousands 'round him clos'd,
He stood—as stands the ocean-rock
Amidst the lashing billows,
Unmoved at their fierce thundering shock!—

বহু সহস্র মৃত ও মুমূর্ষুর মধ্যে দণ্ডায়মান পুরুর রক্তাপ্লুত মূর্ছিতপ্রায় মূর্তি অল্প উপকরণে পাঠকদের মনে মহিমার কিছুটা ভাব জাগিয়ে তোলে।

মধুসূদন এই কবিতার প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে স্বদেশপ্রাণতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মধুসূদন জাতীয় পরাধীনতার কথা কোথাও প্রত্যক্ষ ও জ্বলন্ত ভাষায় এমনি করে বলেন নি। মেঘনাদবধ কাব্যে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের বক্তৃতায় তার প্রকাশ আছে, কিন্তু তা কাব্যোক্ত বিশিষ্ট পাত্রের চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শত্রু-অবরুদ্ধ লঙ্কার সংগ্রামে, স্বর্গচ্যুত দেবগণের স্বাধীনতা হারানোর বেদনায় বা আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত মেবারের কথায় তার পরোক্ষ প্রকাশ আছে।[১৬] চতুর্দশপদী কবিতাবলীর যে সনেটগুলিতে কবির দেশাত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে তা প্রধানত এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং অতীত কীর্তির স্তুতিবাচন। ইংরেজি শিক্ষা ও জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ মধুসূদনের পক্ষে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের রূপটি স্পষ্টভাবে অনুভব করা খুব সহজ ছিল না। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনতার যে বোধ তিনি অন্তরে লাভ করেছিলেন উনিশ বৎসর বয়সে লেখা এই কবিতায় তা প্রত্যক্ষ-ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে কিম্বা নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঞ্জিনী'তে বহু পরবর্তীকালে স্বদেশপ্রাণতার যে উচ্চকণ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য করি মধুসূদনের এই কবিতায় ইংরেজি ভাষায় তার সুন্দর পূর্বসূরীত্ব দেখা যায়।

And where art thou—fair freedom!—thou—
Once goddess of Ind's sunny clime!
When glory's halo 'round her brow
Shone radiant, and she rose sublime,
Like her own towering Himalye
To kiss the blue clouds thron'd on high!
Clime of the sun! how like a dream—

How like bright sun-beams on the stream
That melt beneath gray Twilight's eye—
Thy glory hath now flitted by !
The crown that once had deck'd thy brow
Is trampled down—and thou sunk low :—
Thy pearl, thy diamond and thy mine
Of glistening gold no more is thine !
Alas ! each conquering tyrant's lust
Hath robb'd thee of thy very dust !

মধুসূদনের কবিতার এই অংশের উপরে ডিরোজিও রচিত Fakir of Jangeera কাব্যের উৎসর্গ পত্রের ভারতবন্দনামূলক কবিতাটির প্রভাব অনেকে লক্ষ্য করেছেন।[১৭] প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কবির উপলব্ধিতে কৃত্রিমতা ছিল না। পুরুর কাহিনীর সঙ্গে এই উচ্ছ্বসিত বক্তৃতাটুকুর সুরের অসঙ্গতি ঘটে নি।

কবিতাটিতে আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুটি শব্দ ব্যবহার (মাত্র দুটি, কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ) হোমরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। "God-like" এবং "Thunderer"। পরবর্তীকালে "দেবোপম" বা "দেবাকৃতি" এবং "দম্ভোলী-নিক্ষেপী" বা "বজ্রী" বলে এদের অনুবাদ করেছেন কবি। ইলিয়াড-ওডেসী কাব্যে এই শব্দদুটি বহু ব্যবহৃত। কবি তখনও মূল হোমর পড়েন নি। গ্রীক ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে আরও পরে বিশপ্স কলেজে। তবে হোমরের কোনো কোনো ইংরেজি অনুবাদ তিনি দেখে থাকবেন। ব্যাপারটি সামান্য; কিন্তু হোমরের প্রভাব মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে খুবই প্রত্যক্ষ। সেদিক থেকে প্রয়োগ দুটি কৌতূহলোদ্দীপক।

The Upsori কবিতায় জনৈক অপ্সরার মর্তভুমির দীন এক দণ্ডী-সন্ন্যাসীর প্রতি প্রেমোন্মেষের কথা স্থান পেয়েছে। স্বর্গ থেকে অপ্সরার পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসা, কালীমন্দিরে প্রণামরত সন্ন্যাসীকে দেখে তার চিত্ত-চাঞ্চল্য, তার বাসস্থানের অনুসন্ধান এবং ক্ষুদ্র কুটিরে উপস্থিতি—এইটুকুই বর্ণিত বিষয়। কাহিনী বলতে প্রায় কিছুই নেই, প্রেমবোধও অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং মধুসূদনের সমকালীন উচ্ছ্বসিত প্রেমানুভূতির অকারণ বেদনায় বিষণ্ণ ও নৈরাশ্যে তরল। চরিত্র দুটিতেও কোন স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব নেই, কবির তৎকালীন

মনোভাবের সব অস্পষ্টতা, তরুণসুলভ অকারণ হৃদয়োদ্বেলতা দিয়ে এদের গঠন করা হয়েছে। বায়বীয় অস্পষ্টতা তাই ঘোচে নি।

কবি কাহিনীকথন অপেক্ষা বর্ণনায় বেশি মন দিয়েছেন মনে হয়। বিচিত্র বস্তুর বর্ণোজ্জ্বল চিত্র অতি শিথিল সামান্য কাহিনীর সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন। উৎসবমত্ত স্বর্গের সভাস্থল, ঈষৎ বিষণ্ণ 'অপ্সরী'র ঔদাসীন্য ও সৌন্দর্য, মহাকাশে বিচিত্র গ্রহতারকার উজ্জ্বল উপস্থিতি, পর্বতবন্ধুর বনশ্যামল পৃথিবী, জ্যোৎস্নালোকিত স্রোতস্বিনী, কালীমূর্তির ভয়ঙ্করতা, তরুণ সন্ন্যাসীর বেদনাস্তম্ভিত সৌন্দর্য, তার কুটিরের দীনতা ও পবিত্রতা ভাষারূপে বদ্ধ হয়েছে। বর্ণনার ভারে ঘটনা ও পাত্র-পাত্রী একান্তভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। বর্ণনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। কবি ইংরেজিতে কবিতা লিখলেও তাঁর কাব্যপ্রেরণা একান্ত কৃত্রিম ছিল না। এ দেশের কাহিনী, এ দেশের অতিপরিচিত প্রসঙ্গ চিত্রে ধরে রাখবার প্রয়াস তিনি করেছেন। কমল, কামিনী, মলয়সমীর, বৃদ্ধবট, কামদেব, দণ্ডীসন্ন্যাসী, পারিজাত, সুমেরু পর্বত, তমালবন, তুলসীমঞ্চ, কালীর করালমূর্তি—ভারতীয় ভাবভাবনা, নিসর্গ পরিবেশ থেকেই এদের তিনি চয়ন করেছেন। তমালকে কবি বলেছেন "holy tree"; কবির কল্পনায় বটবৃক্ষ—[১৮]

hoar with years
Lifted its towering head and shed devotional tears.

ভক্তিপূত গৃহের সম্মুখে উচ্চমঞ্চে শোভিত তুলসী বৃক্ষটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।[১৯] অসুরদলনী কালীমূর্তির চিত্রাঙ্কনে ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পূর্ণই রক্ষিত—

Lo! there she stood in martial majesty.
Gorg'd with the blood of Sembo's cursed race.
And garlanded with heads![২০]

দণ্ডীসন্ন্যাসীর ভস্মাচ্ছাদিত ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত রূপটিও যেন তাঁর কত পরিচিত। কবি যে ভক্তিপ্রণত চিত্তে তাঁর কাব্যোপকরণ সংগ্রহ করেছেন এ কথা প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম ও সংস্কারকে লঙ্ঘন করাই যেন ছিল তাঁর চিত্তবৈশিষ্ট্য। খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের বহু পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যে স্বধর্ম বিষয়ে শ্রদ্ধার অভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আসলে সেই তরুণ বয়সেই তাঁর অন্তরে অন্তরে এই সত্য কাব্যধর্মের স্ফুরণ হয়েছিল যে সাহিত্যের আবেদন আকাশের কিন্তু বিশিষ্ট দেশকালের রসে তার পুষ্টি। ইংরেজিতে কাব্য লিখলেও দেশীয়

ভাবপরিবেশ সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টায় এই বিশ্বাসের প্রমাণ মেলে। এমন কি কমল-সূর্যের প্রণয় সম্পর্কের অতি পুরাতন দেশীয় কাব্য-ধারণার আধারে ছবি আঁকতেও তাঁর ইংরেজি কাব্যে দীক্ষিত মন বিদ্রোহ করে নি—[২১]

The *comul* veil'd watch'd on her liquid throne,
—Pale languishing with sad and tearful eyes
For Morn, that brings her loved and loving Sun,
And trembling, chid the night-winds' lusty play,
That tried to unveil her face and drink her
eye's soft ray.

সরোবরের বুকে মলয়পবনে পদ্মের মৃদু কম্পনের উপমাও সাগ্রহে প্রয়োগ করেছেন কবি—

She trembled as the lily on the lake,
When the Moloya doth around soft ripples wake!

ইংরেজি ভাষা এবং এদেশিয় ভাব-পরিবেশ, উপমা ও চিত্রকল্প-এর মধ্যে যে দ্বিধা আছে কবিকে এই সময় পর্যন্ত তা দ্বন্দ্বদীর্ণ করে তোলে নি। সে দ্বন্দ্ব আত্মিক সঙ্কটের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে আরও কিছু পরে Captive Ladie-Visions of the Past রচনার যুগে।

বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে "অপ্সরী" কবিতাটির কোনো কোনো অংশের সঙ্গে কবির পরিণত বাংলা কাব্যের কিছু সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়। অপ্সরা যখন বনপথে মন্দিরাভিমুখে যাচ্ছিল তখন তার পদপাতে ফুলেরা জেগে উঠল—

…on her feet
Each flow'r awakened, did in reverence pay
Soft, pearly tears,—a faery offering meet!—

আবার—

She glided on—the breeze came softly blowing,
And flow'rs wept at her feet rejoicingly!

স্তিমিত দীপশিখায়ও তার নৈকট্যে আসে নূতন দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য—

The conscious lamp assum'd a smiling glow
As if waking from its fainting trance
At her soft presence,…[২২]

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে কবি তিলোত্তমার সৌন্দর্যস্পর্শে বিশ্বময় সুন্দর বস্তুসমূহের প্রাণচাঞ্চল্যের কথা বলেছেন—

কত স্বর্ণলতা
সাধিল ধরিয়া আহা, রাঙ্গা পা দুখানি
থাকিতে তাদের সাথে, কত মহীরূহ
মোহিত মদন-মদে দিল পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলিদল,—কে পারে কহিতে ?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভানু-বিলাসিনী,
তরুমূলে ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি,
কলরবে প্রবাহিনী পর্বত দুহিতা—
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বনশোভিনীরে।

তিলোত্তমাসম্ভবের রচনা-উৎকর্ষ ইংরেজি কবিতায় প্রাপ্তব্য নয়, তাছাড়া এ কাব্যে সৌন্দর্য-কল্পনা অনেক পরিণত, ইংরেজি কবিতায় তার অস্পষ্ট বীজমাত্র আছে।

স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী মর্তের মানবকে কামনা করেছে মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের একটি কবিতায়।[২৩] মধুসূদন তার চরিত্রটির মধ্যে মর্তপ্রেমে স্বর্গের ভোগসুখ থেকে বিদায় নেবার আকুতি দেখিয়েছেন। কবির পৃথিবীপ্রীতি এই চরিত্র-কল্পনার উৎসে সক্রিয় ছিল। The Upsori কবিতার নায়িকাও দেবসভার নৃত্যে ও উৎসবে, দেবপতির চুম্বনে তৃপ্ত হয় নি; সুদূর মর্তলোক তাকে আকর্ষণ করেছে। সেখানে সর্বঐশ্বর্যহীন সামান্য দণ্ডীসন্ন্যাসীর প্রতি তার চিত্ত ধাবিত হয়েছে। কিন্তু কবি যথেষ্ট স্পষ্টভাবে চরিত্রটির মধ্যে এই মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিবেচ্য। মধুসূদন এই একই সময়ে দুটি সনেটে[২৪] পৃথিবীর প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছেন। মর্তজীবনকে তাচ্ছিল্য করেছেন। একই কালে মনোভাবের এই বিপরীতমুখী গতি কবিমনের পরিণতির অভাব সূচিত করে।

॥ পাঁচ ॥

এই পর্বে লেখা ইংরেজি কবিতাগুলির মধ্যে ছুটি রচনায় প্রকাশিত মনোভাব একেবারে অভিনব। কবি ইংলণ্ডের সুদূর তটরেখার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। পিতামাতা ভাইবোনের স্নেহভালবাসায় তাঁর চিত্ত পূর্ণ, তবুও কি এক অজানা এবং অনির্বচনীয় কারণে ইংলণ্ডের দিকেই যেতে ইচ্ছে হয়।

Oft like a sad bird I sigh
To leave this land, though mine own land it be.
Its green robed meads,—gay flowers
and cloudless sky
Though passing fair, have but few
charms for me,

ঐ ইংলণ্ডে যেন কবির সব কামনাবাসনা বাস্তবরূপ ধারণ করেছে। স্বাধীনতার সেখানে চরম স্ফূর্তি, প্রতিভা বিকাশের সেখানে অবারিত দ্বার, বিজ্ঞানের সেখানে সম্যক উন্নতি, মানব জাতির সেখানে অফুরন্ত গৌরব, প্রকৃতির সেখানে পরম শোভা—

For I have dreamed of climes more bright and free
Where virtue dwells and heaven born liberty
Makes even the lowest happy ;—where the eye
Doth sicken not to see man bend the knee
To sordid interest : —climes where science thrives,
And genius doth receive her guerdon meet,
Where man in all his truest glory lives,
And nature's face is exquisitely sweet :

এই রাজ্যই কবির কল্পনার কামস্বর্গ হয়ে দাঁড়াল। বাস্তব চাওয়া আর কাব্য-কল্পনার কামনায় পার্থক্য করতে পারেন নি কবি তখনও। পরবর্তীকালে এই ইংলণ্ডই রাবণের স্বর্ণলঙ্কা হয়ে দেখা দিয়েছে, কাব্যকল্পনা তখন জীবন-কামনা থেকে কিছু স্বতন্ত্র পথ ধরেছে।

॥ ছয় ॥

১৮৪৮ থেকে ৫৬ সাল কবির ইংরেজি কাব্যচর্চার দ্বিতীয় পর্ব। কবির বয়স তখন চব্বিশ থেকে বত্রিশ। এই সময়ে কবি যে সব ইংরেজি কাব্য-

কবিতা ও নাটকাদি রচনা করেছিলেন সংখ্যায় তা প্রথম পর্যায়ের চেয়ে অনেক বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। Timothy Penpoem ছদ্মনামে কবি তখন সাময়িক পত্রে কবিতা লিখতেন। কাজেই নিয়মিত তাঁকে লিখতে হত। কিন্তু ঐসব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর বহু সংখ্যক রচনাও লুপ্ত হয়েছে। প্রাপ্ত কবিতাগুলির সহায়তায় তাঁর মনের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টাই বর্তমানে করা হবে।

কবি লিরিক ও সনেট দু জাতের কবিতাই লিখেছেন। দুটি বড় আকারের আখ্যান কাব্য, একটি বড় কাব্যনাট্যও পাওয়া গিয়েছে।

কবির প্রেম বিষয়ক কবিতাগুলিতে ক্বচিৎ মিলন-মোহাবেশের সুর বেজেছে। রমণী-কণ্ঠোত্থিত সঙ্গীতে কবির চিত্তলোকে স্বপ্নচাঞ্চল্য জেগেছে—

But lady! sweeter is the dream
The voice awakens in the breast,
It tells of Eden's land of beam,
Its glory and its bow'r of rest.

The Captive Ladie-র প্রারম্ভে যে লিরিকটি যুক্ত করেছেন কবি তার মধ্যেও একদিকে এই স্বপ্নমদিরতা প্রকাশিত—

Come, list thee, gentle one;—and whil'st the lyre.
Breathes softer melody for thee, alone,—
I'll weave the sunny dreams, Those eyes inspire,
In wreathes to consecrate to the alone,—
Love's offering, gentle one!—to Beauty's
Queenly throne.

এগারো স্তবকের এই কবিতার শেষ দুটি স্তবকে মুখ্য কাব্যের (The Captive Ladie) প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। অন্যথায় কবিতাটি আত্ম-প্রতিবিম্বনের সুন্দর নিদর্শনরূপে গ্রহণযোগ্য। কবি আপন চিত্ত-বীণায় যুগপৎ দুটি তারে সুর বেঁধেছেন, একদিকে স্বপ্ন (এ কবিতায় বারবার স্বপ্ন কথাটির উল্লেখও লক্ষণীয়) অন্যদিকে কঠিন বাস্তব—একদিকে হতাশাদীর্ণ নৈরাশ্যলাঞ্ছিত বেদনা ও বিষণ্ণতায় পূর্ণ অস্তিত্ব অপরদিকে প্রেমমাধুর্য আস্বাদের মধ্য দিয়ে কামনার কামস্বর্গে উত্তরণ। কবির এই বেদনাবোধ বয়ঃসন্ধির একান্ত অভিজ্ঞতাহীন উচ্ছ্বাস-তারল্য ও অশ্রু-অতিরেক নয়, এর ঘনীভূত তীব্রতায় তাই সন্দেহ করা চলে না।[২৫]

The home of youth, it's far,—Oh ! far away,—
The hopes of youth the've fled and faught to weep ;—
The friends of youth, e'en they,—Oh ! Where are they ?
Ask memory and the dreams which haunt in sleep,—
Wing'd messengers and sweet form, past ! thy donjon keep !

কিন্তু সাম্প্রতিক প্রণয়সাফল্যে[২৬] এবং আত্মবিশ্বাসে সব দুঃখকে জয় করবার দৃঢ়তাও এ কবিতায় প্রকাশিত—

Though bitter be the echo of the tale
Of my youth's wither'd spring—I sigh not now,
For I am a tree when some sweet gale
Doth sweep far away the sere leaves from each bough,
And wake far greater charms to readorn its brow !

কিন্তু মদ্রাজে কবি দুঃখজয়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি। দারিদ্র্যে, প্রেমলব্ধ দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতায়, অতীতের স্নেহপ্রীতিস্নিগ্ধ মনোরম দিনগুলির স্মৃতিতে প্রতিনিয়ত তিনি অন্তরে দীর্ণ হয়েছেন। সমকালীন কবিতায় তার ছায়াপাত ঘটেছে। জীর্ণদল পদ্মের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন কবি ("I gaze upon the faded flow'r" কবিতা দ্রষ্টব্য), কখনও সৌন্দর্যদূতীর আলোকপাতে ভ্রূকুটিভঙ্গ তমিস্র পথকে উজ্জ্বল করার কামনা জানিয়েছেন—

Comest thou as one in beauty's ray
To light the starless gloom
That frowns upon the pilgrim's path
To death's domain the tomb,…

এই বেদনা যে কত তীব্র তা কাব্যরূপে সংহত সার্থকতায় ধরা পড়েছে একালে লেখা সনেটগুলির মধ্যে। অন্তরের নিভৃততম অন্দর নিত্য অবক্ষয়িত এর আঘাতে আঘাতে, অবসিত জীবনের সব মাধুর্য, সব আশা, ভবিষ্যতের সব স্বপ্ন—

Richard ! there is a grief which few can feel ;
It cuts into the bosom's deepest core.
And with unwearied fingers aye doth steal

Its summer gladness, and its faery store
'Of hopes and aspirations.

এর কাছে পূর্ব পর্যায়ের কবিতায় বেদনা শুধুই দুঃখবিলাস। অন্তহীন অন্ধকারে আদিগন্ত এর বিস্তার, এই বেদনাঘন তমসাকে ভেদ করে নব সূর্যের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠবার সব চেষ্টা ব্যর্থ নৈরাশ্যকেই শুধু আমন্ত্রণ করে—

And such dark grief is his, whose sleepless soul
Strives, but in vain, to burst the galling thrall
Of circumstance, to spun its vile control,
And rise in kindling glory, dazzling all
With splendour unconfin'd from pole to pole!

সংগ্রামক্ষত ক্লান্ত কবি যেন বাইবেলের সেই অমিতাচারী সন্তান পিতার নিশ্চিন্ত স্নেহঘেরা আশ্রয়ে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুলতা যার প্রতি নিশ্বাসে কম্পিত—

How oft, O world! thy harlot-smile
Hath woo'd me from the fount whose waters flow
In beauty which dark death will ne'er defile
I wept!—A prodigal once weeping sought
His father's breast,—And found love unforgot!

যে বিপুলা বিশ্বের পার্থিব ভোগোৎসবের নিমন্ত্রণে কবি প্রীতিনিবিড় গৃহ, পরিচিতি কোমল পরিবেশ থেকে বিচ্যুত—নিশ্চিত শান্তি থেকে অনিশ্চিত অশান্ত সমুদ্র তরঙ্গে তাড়িত আজ তাকে পণ্যারমণীর হাসি বলে ধিক্কার দিতে হচ্ছে;—মনোভাবের এই বিশিষ্টতা সাময়িক, কবির অন্য কোনো রচনায় তার প্রকাশ নেই। এই পর্বের ব্যক্তিগত দুঃখবোধও পরবর্তীকালে সংহত ট্রাজেডি কাব্যের মহিমায় আত্মসমাহিত।

মধুসূদনের Visions of the Past ১৮৪৮ সালে লেখা। The Captive Ladie-এর আগে এটি Madras Circulator পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকে এই রচনাটিকে অসম্পূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন।—

"ক্যাপটিভ লেডীর সঙ্গে ভিসন্স-অফ-দি-পাষ্ট নামক আর একটি অসম্পূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ভিসন্স-অফ-দি পাষ্টের অবলম্বনীয় বিষয় কি, ইহার বর্তমান অসম্পূর্ণ আকার হইতে তাহা অনুমান করিতে পারা যায় না।

খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ বর্ণনা করা বোধ হয়, মধুসূদনের উদ্দেশ্য ছিল।"

[মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত : যোগীন্দ্রনাথ বসু]

কবির চরিতকারের এই ধারণা ঠিক নয়। কবিতাটির শিরোনামের নিচে "A fragment" কথাটি লেখা থাকায় এইরূপ ধারণা হয়ে থাকবে। Captive Ladie-র আখ্যাপত্রেও "a fragment of an Indian Tale" কথাগুলি লেখা ছিল। কথাটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন,

"The plot is a simple one, and will, I trust, sufficiently develop itself in the course of the narrative, appealing, as all fragmentary tales must do, to the imaginations of the reader to supply its omissions."

Captive Ladie প্রসঙ্গে লিখিত এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে fragmentary Tale বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন তা জানা যাবে। খণ্ড কাব্য কথাটিই এর যথার্থ প্রতিশব্দ, খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ কাব্য নয়। লক্ষণীয় Visions of the Past-এর শেষে 'Finis' কথাটিও তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছেন।

Visions of the Past-এ বারোটি স্তবক আছে। একটি প্রারম্ভিক সনেট দিয়ে এই খণ্ড কাব্যের শুরু। কাব্যটিতে ঘটনাংশ সামান্য, চরিত্র-চিত্রণের চেষ্টা নেই। বর্ণনাই প্রধান। তবে ক্ষুদ্র ও সরল কাহিনীটি বেশ একাগ্র স্পষ্টতায় প্রকাশ পেয়েছে। খ্রীষ্টীয় পুরাণবিশ্বাস অনুসরণে প্রথম মানবমানবীর পাপ এবং স্বর্গচ্যুতি এই কবিতায় বিষয়। সম্ভবত মিলটনের Paradise Lost-এর কাহিনীর একটি সহজ তরল অনুকরণ-বাসনা এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। তার উপরে কবিতাটি আবার অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। রচনাভঙ্গিতে প্রধানত বায়রনের উচ্ছ্বাসপ্রধান রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। মিলটনের ভঙ্গির প্রতি কবির আকর্ষণ সে সময় পর্যন্ত কতটা তীব্র হয়েছিল ঠিক করে বলা যায় না। আবার এমন হতে পারে, মিলটনকে অনুসরণ করা তখনও তাঁর শক্তির অতীত এ কথা বুঝে তিনি সে চেষ্টা থেকে গোড়ায়ই বিরত থেকেছেন। অবশ্য এ আমার নেহাৎই অনুমান, এর পক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারব না।

Visions of the Past কবির সাহিত্যিক জীবনে উল্লেখ্য নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য—

এক। দীর্ঘাকার কাহিনীকবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার এই প্রথম।

হিন্দু কলেজে পড়বার সময়ে Saturn নামে একটি সনেটে পরীক্ষামূলকভাবে এই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছিল।

দুই। মিলটনের প্রতি কবির আনুগত্য এই প্রথম কিঞ্চিৎ চিহ্ন ফেলেছে তাঁর রচনায়।

তিন। খ্রীস্টীয় বিষয়কে অবলম্বন করে লেখা ইংরেজি বাংলা কবিতার সংখ্যা নগণ্য। ধর্মান্তর গ্রহণের সাময়িক উত্তেজনায় তিনি একটি প্রার্থনা সঙ্গীত লিখেছিলেন। তারপরে এই দীর্ঘ কবিতা। বহু পরে জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি দুটি বাংলা সনেটে খ্রীস্টীয় বিষয় অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তাও একান্ত সাময়িক কারণে লেখা।[২৭] প্রকৃত কাব্য-প্রেরণার সঙ্গে এদের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। Visions-ই একমাত্র কবিতা যাতে সত্যকার কাব্য-প্রেরণার বশবর্তী হয়ে কবি খ্রীস্টীয় বিষয়ের আশ্রয় নিয়েছেন। কবির সমগ্র রচনাবলীতে এই কবিতাটির বিশিষ্ট ভূমিকা তাই স্বীকার করতে হয়।

Visions-এর বিষয়-পরিচয় নিলে দেখা যাবে কবি কিভাবে ঘটনাংশকে গৌণ করে, সূক্ষ্ম রূপে মাত্র ব্যবহার করে বর্ণনার বর্ণবহুল প্রাচুর্যকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

প্রথম দুই স্তবকে কবি এক অপূর্ব কল্পজগতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। যেন বহুযুগের অপর প্রান্তে এক স্বপ্নময় সুন্দর পৃথিবীতে। প্রকৃতির সেখানে অধিকার, প্রশান্তি সেখানে চিরবিরাজিত, নগর ও প্রাসাদ-প্রাকারের কোলাহল তাঁকে স্পর্শ করে নি। মানব জাতিরই পদার্পণ ঘটে নি।

> Nor yet the countless broods of Man
> Walk'd the green bosom of the new-born Earth.
> But silence sat with pensive solitude
> In voiceless meditation…

তৃতীয় স্তবকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোমল পরিবেশে মানব জাতির প্রথম পুরুষ ও রমণীকে বিহাররত দেখতে পেলেন কবি। তাদের চার পাশে অতিলৌকিক আলোকময় স্বর্গদূতেরা বিচরণ করছেন, যেন তাদের সর্ববিধ পাপ-তাপ থেকে রক্ষা করে চলেছেন। চতুর্থ স্তবকে অপাপবিদ্ধ সুন্দর সেই পৃথিবীতে মানব জাতির প্রথম আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করেছেন কবি আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে।

পঞ্চম স্তবকের প্রথমাংশ আদি মানব-মানবীর সেই সুখনিশ্চিত জীবন, স্বর্গে মর্ত্তে সেই অঙ্গাঙ্গী সম্মিলনের স্বপ্নমধুর চিত্র কবি এঁকেছেন। দ্বিতীয়াংশে

সয়তানের আগমনের ভীতিপ্রদ বর্ণনা। ফলে সৌন্দর্যের অবসান, আলোকের মৃত্যু, আনন্দের সমাধি। কবি-অঙ্কিত এই চিত্রটি ভাষারূপে সিদ্ধ এবং উদ্ধারযোগ্য—

But there was one amidst that sunny throng—
And there he came as some dark visag'd cloud
Careering on in gloomy majesty—
Which dims the tranquil smile of every star
And wings its lightles path along the sky ;—
A form of ewe he was—

ষষ্ঠ স্তবকে ভয়ানক রাত্রির অবসান এবং প্রভাতসূর্যের প্রসন্ন হাস্য-জ্যোতির বর্ণনা। সপ্তম স্তবকে প্রভাত আলোয় মিলন-নিকুঞ্জে কবি খুঁজলেন সেই আদি মানব-মানবীকে। কিন্তু বিস্মিত হলেন তাদের অদর্শনে। সূর্যালোকোজ্জ্বল পরিবেশে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই নিকুঞ্জ, একটা ভীষণ ছায়ায় ঢাকা পড়েছে তাদের কায়া। চারিদিকে যেন প্রেতের নৃত্য, নরকের তমিস্র লোক থেকে ভেসে-আসা তীক্ষ্ণ বিলাপধ্বনি। অষ্টম স্তবকে আদি মানব-মানবীর পতনে সয়তানের পাশব উল্লাস সূর্যের ঔজ্জ্বল্যকেও যেন ম্লান করে দিল। ওজস্বিতার দিক থেকে এই বর্ণনার সৌন্দর্য স্বীকার করতে হয়।—

Awful and deep like thunder and it said,
In accents of proud triumph, lo ! 'tis done !
There was a shriek of joy—methought it b. rst
From that dread throng—and rolling far and near—
It sunk—Earth trembl'd—and from grove and bow'r
There came a sound of mournful wail and sad ;
I look'd—the sun had veil'd his dazzling brow—

নবম স্তবকে কবি দেবদূতের প্রতিরোধের মুখে শয়তানের পশ্চাদপসরণের কথা বলেছেন। দশম স্তবকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত সয়তানের পলায়ন এবং সত্য সুন্দরের পুনর্প্রতিষ্ঠা, আলোকের জয়যাত্রায় অন্ধকারের অবসান চিত্রিত হয়েছে। কম্পমান প্রকৃতিকে নির্ভর করল "dove-eyed peace and everlasting rest." একাদশ স্তবকে সেই মিলন নিকুঞ্জের পরিবর্তিত রূপের বেদনাভারাক্রান্ত বর্ণনা। পাপদগ্ধ আদি মানব-মানবীর অনুতাপে মলিন

মুখচ্ছবি। মহান্ সত্যের উজ্জ্বল মূর্তির সামনে তারা বিভ্রান্ত, ভীত ও পলায়নপর। দ্বাদশ স্তবকে স্বর্গচ্যুত আদি মানব-মানবীর ক্রন্দনের কথা কবি বলেছেন, সে ক্রন্দনে হতাশা ছিল না, করুণাময়ের দয়াই তাদের পাপদষ্ট চিত্তকে ব্যাকুল করেছিল ; এখানেই কবিতাটির সমাপ্তি।

Visions সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ হল এই কবিতার বিষয়বস্তুই শুধু খ্রীষ্টীয় নয়, চিত্রকল্প ও ভাষাভঙ্গিতে, পুরাণ-কথার উল্লেখে এবং উপমায় একটি খ্রীষ্টীয় পরিবেশ রক্ষিত হয়েছে। পূর্ববর্তী Upsori কবিতায় বা প্রকৃতি-বর্ণনামূলক সনেটে বাংলাদেশের রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্পর্শই বার বার আমন্ত্রিত, হিন্দুর ভাবপরিবেশ, ভারতীয় কাব্যকল্পনা এবং উপমা-প্রয়োগরীতিও সম্মানিত। Visions-এর স্থান এদিক দিয়ে স্বতন্ত্র। একটি মাত্র বীর্যগম্ভীর চিত্রে, সুদূর মাদ্রাজ থেকে তিনি বাংলাদেশকে স্মরণ করেছেন—

Bangala ! on thy sultry plains
Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan slumborous haunt and cool—
Echo in mimic accents among the flocks.
Conch'd there in moon-tide rest and soft repose,
Repeats the deafening and deep thunder'd roar.
Of him the royal wanderer of thy woods !

অন্যত্র বাইবেলের নানা পুরাণ কাহিনীর প্রসঙ্গই চিত্রকল্পনার ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবি Acts. IX. Ezod XIX. Gen. IX. Exel প্রভৃতি পাদটীকায় উল্লেখ করে এদের উৎস নির্দেশ করেছেন। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর চিত্র একটি স্তবকে স্থান পেয়েছে—

The pilgrim from His father's bosom—He—
His God—with blood stain'd brow and crown of thorn
Die on th' accursed tree—yea—die to save—
And dying pray for those who shed His blood !

তাঁর ইংরেজি রচনায়ও এ জাতীয় চিত্র ও ভাবপরিবেশ সুলভ ছিল না কলকাতা-বাসকালে। বরং বাঙালীর জীবনরস চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। কিন্তু মাদ্রাজে মধুসূদন যে পরিবেশে বাস করছিলেন তাতে দেশি সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি সম্পর্ক-বিরহিত হয়ে পড়েছিলেন। একদিকে খ্রীষ্টীয় ভাব-জীবন অন্যদিকে

বিদেশি সংস্কৃতি (হিন্দুকলেজের ছাত্ররা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যেরূপ যুরোপীয় ভাবধারার অনুগামী হয়েছিল, সেরূপ নয়, মাদ্রাজে যুরোপীয় এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ছিল তাঁর আত্মীয়তা ও সামাজিক সম্বন্ধ) তাঁর মনোরাজ্যে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবিতার রূপরচনায় তার প্রতিফলন ঘটেছে। একটি ক্ষুদ্রদেহ কবিতায় তিনি "Sicilias flowry shore," "Syren-song," "Elysian light," Eden's land," "Seraph" প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাবচিত্রকে ভাষারূপ দিয়েছেন। অপর একটি কবিতায় তিনি "Judas' star"-এর প্রসঙ্গ এনেছেন, "pilgrim's lone-some way"-র কথা বলেছেন। Visions-এ এই পাশ্চাত্য-খ্রীষ্টীয় ভাব ও চিত্রের চূড়ান্ত করেছেন কবি।

Visions আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের দিকে। কবির সমকালীন মনোভাব এ কবিতার শিথিলপ্রাণ সামান্য কাহিনী এবং বর্ণোজ্জ্বল বর্ণনা-প্রাচুর্যের মধ্য থেকেও মাঝে মাঝে উঁকি মারে। কবি পিতৃগৃহ, পিতৃধর্ম এবং আত্মীয়স্বজনদের স্নেহবৎসল পরিবেশ ত্যাগ করেছিলেন। কলকাতার অতি লোভনীয় ছাত্রজীবন, বন্ধুদের উচ্চকরতালি, ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের প্রাচুর্যকে একরূপ নির্বিচারে ছেড়ে এসেছিলেন। কোনো একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর চোখে হয়ত ছিল। সে স্বপ্ন প্রথম যৌবনের প্রেমের চরিতার্থতা অথবা ইংলণ্ডগমন এবং মহাকবির সম্মানলাভ অথবা কিছু অনির্বাচ্য কাম্যলোকে উত্তরণ। মাদ্রাজ-জীবনের দারিদ্র্য, কাঠিন্য পরিচয়হীন অতি সামান্য অস্তিত্ব-বহন তাঁকে পীড়িত করছিল। Visions-এর প্রথমদিকে সৌন্দর্য ও আনন্দের যে রম্যজগৎ তিনি ভাষাসৌন্দর্যে সৃষ্টি করে তুলেছিলেন তার মধ্যে কবিপ্রাণের সেই কাম্যলোকের ছবি আছে। আর পাপজীর্ণ স্বর্গসুখ থেকে স্খলিত বেদনাদীর্ণ সেই আদি নরনারীর মলিন চিত্রে তাঁর সাম্প্রতিক দুঃখময় দিনগুলির ছায়াপাত ঘটেছে। এ অনুশোচনা ঠিক ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য নয়, সামগ্রিকভাবে অতীত জীবনের জন্য এ হাহাকার।

Captive Ladie দুই সর্গের কাব্য। Visions-এর অব্যবহিত পরে লেখা। ১৮৪৮ সালে "The Madras Circulator and General Chronicle" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মধুসূদনের ইংরেজি রচনার মধ্যে এটি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে বহু নিন্দা ও প্রশংসা লাভ করেছিল। কবির ইংরেজি রচনাবলীর মধ্যে এটির পরিচিতিই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। এই

কাব্যটি লেখার সময়ে কবির মনের অবস্থা কিরূপ ছিল তার সংবাদ ভূমিকায় তিনি নিজেই দিয়েছেন—

> "It was originally composed in great haste for the columns of a local journal···in the midst of scenes where it required a more than ordinary effort to abstract one's thought from the ugly realities of life.—Want and poverty with the "battalions" of "sorrows" which they bring, leave but little inspiration for their victim."

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কলকাতায় বাংলা সাহিত্যের সাধনার কালে মধুসূদন মানস ভারসাম্য অর্জন করেছিলেন। এই ভারসাম্য ছাড়া সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। দুঃখদারিদ্র্যের পরিবেশেও সফল কাব্য রচনার নিদর্শন আছে, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন বাস্তব জীবনঘটনা থেকে লেখকের শিল্পী-মনের দূরত্ব। শিল্পীসুলভ সেই নিরাসক্তির অধিকার মধুসূদনের ছিল বলে মনে হয় না।

কিন্তু এর চেয়েও একটি গুরুতর সঙ্কট কবিচিত্তে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। শিল্পীর মন বিশ্বের আকাশে নিশ্বাস নিলেও, দেশকালের অতি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক জীবনই তার ভিত্তি। এই ভিত্তির অভাব ঘটলে শিল্পী নিরালম্ব হয়ে পড়েন। মধুসূদন ইংরেজি রীতিনীতি আচার-আচরণে অভ্যস্ত হলেও, বিদেশি ভাষায় কাব্যসৃষ্টি করলেও কলকাতা বাসকালে এই সাংস্কৃতিক জীবনভিত্তি থেকে চ্যুত হন নি। কিন্তু মাদ্রাজে এসে তিনি দেশের নাড়ীর সঙ্গে যোগসূত্রটি হারিয়ে ফেললেন। দেশিয় খ্রীষ্টীয় সমাজ তখন পর্যন্ত একান্তবাসী ছিল, ফিরিঙ্গি বা য়ুরোপীয় সমাজের সঙ্গে এ দেশের মাটির ও সংস্কৃতির কোনো যোগই ছিল না। তাঁর মাদ্রাজপ্রবাসে লেখা কবিতায় বিদেশি ভাবাবহ, চিত্রকল্প ও উপমাদির প্রয়োগ বেশ লক্ষ্য করা যায়। এর চরম নিদর্শন Visions-এ। এই কাব্যের খ্রীষ্টীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে দেশিয় ঐতিহ্যের প্রাণগত সংযোগের সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদন ধর্মে খ্রীস্টান, আচারে সাহেব, ঘুরে বেড়ান য়ুরোপীয় সমাজে। কিন্তু অন্তরে তিনি খাঁটি শিল্পী বলেই নিজ দেশ-কালের ভিত্তি থেকে সুস্থ প্রাণশক্তিতে রস টেনে ফুটে উঠতে চান, অর্কিড হয়ে থাকতে চান না। এর ফলে মাদ্রাজপ্রবাসে কবির মনোগত সঙ্কট তীব্র হয়ে উঠেছিল। বাঙালি কবির ইংরেজিতে কাব্য রচনাই একটি মানসদ্বিধার সৃষ্টি করে। ভাষার সঙ্গে বিষয়বস্তু ভাবপরিবেশ এবং চিত্রকল্পের অন্বয় সম্পর্ক

স্থাপিত না হওয়ায় সেই দ্বিধা প্রকট হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় The Upsori, King Porus প্রভৃতি কবিতায় এবং ঋতুবিষয়ক সনেটগুলিতে তিনি দেশিয় বিষয়, ভাবপরিবেশ, চিত্রকল্প ও উপমাদি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যেই একটি নিগূঢ় অসঙ্গতি আছে। কোনো জাতি এবং ভাষা তার জাতীয় অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত, জাতীয় চরিত্রের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। আবার মাদ্রাজে যখন বিদেশিয় ভাব-বিষয়কে আমন্ত্রণ জানালেন তখনও এই দ্বিধা ঘুচল না, বরং আরও তীব্র হল। কবি Visions লেখার পরে Captive Ladie লিখলেন, তার বিষয়বস্তু যেমন একান্তভাবেই ভারতীয়, ভাবপরিবেশ-চিত্রকল্প বাঙালি ভাবনার সম্পূর্ণ অনুগামী।[২৮] কিন্তু এভাবে সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। যে বাংলা ভাষাকে ভুলে যাবার কথা ভেবেও উল্লাস বোধ করতেন হিন্দু কলেজে পড়বার সময়, সেই ভাষা এবার সত্যই ভুলতে বসেছেন। সে বাঙালি জীবনপরিবেশ আজ বহুদূরে। ইংরেজি কবিতায় আজ স্বাভাবিক ভাবেই বিদেশি ভাব ও চিত্র দেখা দিচ্ছে। Captive Ladie-তে ইংরেজি ভাষায় জাতীয় সুরের চর্চাও এই সঙ্কটকে পাশ কাটিয়ে যাবার নিদর্শন, সঙ্কট-উত্তরণ নয়। সঙ্কটের অনুভূতি তাঁকে পীড়িত করছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। গৌরদাসকে মাদ্রাজ থেকে তিনি লিখেছিলেন,

> "I say, old Gour Dass Bysack! Can't you send me a copy of the Bengali translation of Mahabharata by Cassidas as well as a ditto of the Ramayana —Serampur edition. I am losing my Bengali faster than I can mention."

বিস্ময়কর হলেও এই ভাবনার তাৎপর্য বোঝা যায়। কিন্তু কবি যখন বলেন,

> "My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine, 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my father ?"

তখন বিমূঢ় হতে হয়। কবি কি ভেবে এই মন্তব্য করেছেন। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার বাসনা কি তাঁর মনে জেগেছিল? অস্পষ্টভাবে জেগেছিল, কিন্তু

আরও নয় বৎসর কাল লেগেছে সেই ইচ্ছার নীহারিকা স্পষ্ট হয়ে উঠতে, বাংলা সাহিত্য রচনার সুযোগ পেতে।[২৯]

উপরের উদ্ধৃত পত্রাংশ দুটি থেকে বোঝা যায় কবি সঙ্কটের দ্বারা যেমন পীড়িত তেমনি সঙ্কট উত্তরণের স্বপ্নও দেখছেন। এই ব্যাপারে গৌরদাস বসাকের ন্যায় বন্ধুদের পরামর্শকে কবি বড় গ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু বেথুন সাহেবের আন্তরিক উপদেশকে তিনি মূল্য দিয়েছেন।[৩০] বিশেষ করে চিত্তসঙ্কটের এই পর্যায়ে সেই চিঠি যেন মুক্তির আলো নিয়ে এল। স্পষ্ট করে বাংলা সাহিত্যের জগৎকে তিনি পেলেন না, কিন্তু ইংরেজি কাব্যসাধনার রাজ্য থেকে বিদায় নিলেন। Captive Ladieতে কবির ইংরেজি কাব্যসাধনা শীর্ষে উঠল, Captive Ladieতেই আবার ইংরেজি কাব্যজগৎ থেকে কবি বিদায় নিলেন। এরপর আরও কিছু ইংরেজি কবিতা তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু তখন অন্যতর সাহিত্যরাজ্যের অস্পষ্ট স্বপ্ন মনের কোণে দেখা দিতে শুরু করেছে।

Captive Ladieতে কাহিনী গঠন এবং চরিত্রচিত্রণ আগের রচনাগুলির তুলনায় কিছু পরিণত হয়েছে। কাহিনীগ্রন্থনে ঘটনা এবং বর্ণনার মধ্যে কিছুটা ভারসাম্য এসেছে, Visions বা আরও আগের Upsori-র মত বর্ণনার প্রাচুর্যে ঘটনা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায় নি। রোমান্টিক প্রেম এবং তার জন্য দুঃসাহসী কর্মতৎপরতা, বীরত্ব, দেশপ্রেম প্রভৃতি ভাব অবলম্বন করে কাব্যটি গড়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে এ কাহিনীর সামান্য সম্পর্ক আছে। দিল্লী-রাজ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে কনৌজ-নৃপতির (জয়চন্দ্রের) বিবাদ, জয়চন্দ্রের আহ্বানে মুহম্মদ ঘুরীর দিল্লী আক্রমণ, পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও দিল্লীর পতন এটুকু ঐতিহাসিক। জয়চন্দ্রের কন্যার সঙ্গে পৃথ্বীরাজের প্রণয় ও বিবাহ কিম্বদন্তী-মূলক। মধুসূদন ইতিহাস, কিম্বদন্তী এবং কল্পনার সহযোগে এই দীর্ঘাকার আখ্যানকাব্যটি গড়ে তুলেছিলেন।

কাব্যের প্রথম সর্গে বহুদূর সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে বন্দিনী রাজকন্যার কথা বলা হয়েছে। এই রাজকন্যাকে কনৌজনৃপতি হস্তিনাধিপতি পৃথ্বীরাজের দৃষ্টির অগোচরে বন্দী করে রেখেছিলেন। পৃথ্বীরাজ জনৈক ভাটের ছদ্মবেশে সেই দুর্গে রক্ষীদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। নানা কাহিনী গান করে তাদের মনও জয় করে নিলেন। অবশেষে রাজকন্যাকে নিয়ে রাত্রের অন্ধকারে পলায়ন করলেন। এই ঘটনাটুকুর বিন্যাসে মধুসূদন যে কৌশলের পরিচয়

দিয়েছেন তাকে কিছুতেই নিন্দা করা যায় না। এই সর্গের বেশির ভাগই কনৌজপতির আয়োজিত রাজস্থূয় যজ্ঞের বর্ণনা। এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাহিনীর পূর্বসূত্র বিবৃত করেছেন কবি। কনৌজ-নৃপতির কন্যার প্রতি পৃথ্বীরাজের ভালবাসা, কিন্তু উক্ত নৃপতির শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর অসম্মতির জন্য রাজস্থূয় যজ্ঞে পৃথ্বীরাজের অনুপস্থিতি, যোদ্ধার বেশে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করে প্রণয়িনী কুমারীকে যাজ্ঞা এবং দূর নির্জনে রাজকন্যার বন্দীত্বের সংবাদে ক্ষোভ ও হতাশা নিয়ে প্রস্থান। ঘটনা এইটুকু কিন্তু বর্ণনায় কবির প্রাণ বহুস্রোতা নদীর মত প্রাচীন ভারতের পুরাণ-কথায় পঞ্চমুখ। সেই সব উপমা কিম্বা ভাষাচিত্রই এ সর্গের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়।[৩১]

রাজস্থূয় যজ্ঞস্থলে জনৈক গায়ক প্রাচীন নৃপতিদের কীর্তিগাথা গান করছিলেন। সেই সূত্রে কবি রামায়ণ কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তীকালে রামায়ণ কাহিনীর নবরূপদানে কবি কি জাতীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন এর সঙ্গে তা তুলনীয়। কবি রাম ও সীতার প্রতি সহানুভূতিতে এই বর্ণনা শুরু করেছেন। সীতাহরণ প্রসঙ্গে রাবণকে false one বলে ভর্ৎসনা করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যেও সীতাহরণের কলঙ্ক রাবণের গৌরবময় জীবন থেকে মুছে দিতে পারেন নি কবি। কিন্তু সীতাহারা রামের এই অনুসন্ধানে তার প্রতি যে বিগলিত প্রীতির সুর বেজেছে—

> And how the wanderer of the wood
> Came home—but came to solitude—
> And in his grief sought her in vain
> O'er mount—in cave by fount—on plain.[৩১ক]

কবির পরিণত জীবনের কল্পিত রাম তা থেকে বঞ্চিত। ক্রুদ্ধ রামের বীরর্ষভ মূর্তিও তিনি এঁকেছেন, তার সঙ্গে মেঘনাদবধের ভীত-কম্পিত রামের অনেক পার্থক্য। কিন্তু কবির সহানুভূতির কেন্দ্র রাম-সীতা থেকে দ্রুত সরে গিয়ে লঙ্কাকে আশ্রয় করেছে। লঙ্কার পতনে কবি যে বেদনা পেয়েছেন তা কোথাও অপ্রকাশিত থাকে নি। সীতা তাঁর দৃষ্টিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে লঙ্কার মূর্তিমতী দুর্ভাগ্য—

> And made thee, Lunka ! all a tomb—
> Left not a soul to light,
> The funeral lamp at fall of night,

Where calmly in their bloody graves,
The warriors slept by the moaning waves,
And won the bride. who was to thee,
The evil-star of destiny ![৩২]

মেঘনাদবধ কাব্য লিখবার বারো বছর আগে থেকেই লঙ্কা তাঁর কল্পনাকে আকর্ষণ করছিল, এ ঘটনা কৌতূহলোদ্দীপক। তা ছাড়া লঙ্কা প্রসঙ্গে এমন দু একটি ভাষাচিত্র ইংরেজি কবিতাটিতে তিনি এঁকেছেন যার সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যে অঙ্কিত চিত্রের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন সমুদ্রবন্ধন প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

The very ocean wore his chain

মেঘনাদবধ কাব্যে আছে এর হুবহু প্রতিধ্বনি—

আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে।

লঙ্কার বর্ণনায়—

Fair Lunka smiles in beauty's glow
And breathes soft perfumes far and wide—
And sits her like a regal maid
In her gay, bridal wreathes array'd !

এর ভাবগত সাদৃশ্য আছে মেঘনাদবধের নিম্নোদ্ধৃত চিত্রে—

এ জগৎ যেন—
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই; সুখের সদন।

মহাভারতের বর্ণনা করতে গিয়ে কুরুক্ষেত্রের কথাই যে কবির মনে হবে তা বোঝা যায়। কারণ এখানে মহাভারতের নানা কাহিনী climax-এর মোহনায় গিয়ে পড়ল। মধুসূদন বেশ সফলতার সঙ্গেই এই বীরত্ব ও মৃত্যু-মহোৎসবের চিত্রটির ভাষারূপ দিয়েছেন—

The curu came in all his pride,
And led the mighty and the brave,
But led them to a bloody grave,…

How fatal was that bloody field,
Where warriors came but not to yield—
Where Lord chief vassal serf and all,
Wild carnage ! swell'd thy festival !
How loud the dirge, which o're them peal'd ![৩৩]

বীররসাত্মক বর্ণনায় কবি রামায়ণ-মহাভারতের প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে শুম্ভ-নিশুম্ভের কাহিনী এবং রণরঙ্গিনী চামুণ্ডার কথাও বলেছেন। মৃদু প্রেমভাবের চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি কৃষ্ণের ব্রজলীলার কথাই বেশি করে স্মরণ করেছেন।—

How fondly in the moon-lit bow'r,
When mid-night came with star and flow'r,
Young Krishna with his maidens fair
Rov'd joyously and sported there—[৩৪]

পরিণত জীবনের বাংলা কাব্যেও মধুসূদন পুরাণপ্রসঙ্গের সুপ্রচুর উল্লেখে তাঁর রচনার দেহসজ্জা করেছেন, ভাবরসসৃষ্টির চেষ্টাও করেছেন। রামায়ণ-মহাভারত এবং চণ্ডীকাহিনী সেখানেও বীর্যের ভাব ফোটাতে কবিকে সহায়তা করেছে, ব্রজলীলার চিত্র ও উপমা প্রেমকোমলতার রসসঞ্চারে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু Captive Ladie-তে এই সব উল্লেখ স্বতন্ত্র চিত্র হিসেবে উপস্থাপিত, কাব্যকাহিনীর সঙ্গে ক্ষীণ সূত্রে যুক্ত। কবি যেন ভারতীয় পুরাণকাহিনীর এক মাল্য রচনা করেছেন বিদেশি ভাষায়। অপর পক্ষে বাংলা কাব্যে এই উল্লেখ কাহিনীঅনুগ—একান্ত প্রাসঙ্গিক, চিত্রগুলি ক্ষুদ্র ও সংহত, প্রায়ই তা উপমাদির আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয় সর্গে মুসলমান আক্রমণে হস্তিনাপুরের পতন, পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও আত্মহনন বর্ণিত। এই স্বর্গে রাজার দেশপ্রেম উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশিত। রাজবধূর স্বপ্ন দর্শনের সূত্রে এ সর্গেও হিন্দু দেব-দেবীর নানা মূর্তি অঙ্কিত। কালী, রুদ্রমহাদেব, লক্ষ্মীদেবীর স্বপ্নে দর্শনদান এবং হস্তিনাপুরী পরিত্যাগ মানবিক সর্বনাশের রক্তাভার পার্শ্বপাশে অলৌকিকের কিঞ্চিৎ দ্যোতনা এনেছে। এছাড়া অগ্নিদেব, সরস্বতী প্রভৃতির প্রসঙ্গ এবং চিত্রও আছে। কবি নিশ্চয়ই হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের অনুগত নন। ভারতীয় পুরাণ-কথার সৌন্দর্যই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।[৩৫] এ যেন ইংরেজি ভাষায় বাঙালির কল্পনাধৃত দেশি পুরাণকাহিনী ও পৌরাণিক দেবলোকের এক চিত্রপ্রদর্শনী।

মুসলমানবেষ্টিত আসন্ন ধ্বংসের জন্য অপেক্ষমান রাজধানী হস্তিনা মধুসূদনের বহু রচনার পূর্বাভাস বয়ে আনে। অবরুদ্ধ লঙ্কা (মেঘনাদবধ), বিভিন্ন শক্তিপরিবৃত মেবার (কৃষ্ণকুমারী), দানব-অধিকৃত ইন্দ্রপুরী (তিলোত্তমা), শত্রুভয়কম্পিত সিন্ধু (মায়াকানন)—মধুসূদনের রচনায় এ যেন একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সুযোগে কবির দেশপ্রেম পরোক্ষভাবে প্রকাশের পথ পেয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি প্রতিবিম্বিত হয়েছে কবির আপন চিত্ত। কবি যেন বহু ঐশ্বর্যমণ্ডিত এক ভূখণ্ড, অকারণ দৈব-রোষে নিগৃহীত, ভাগ্যরূপ শত্রুদ্বারা আক্রান্ত এবং আসন্ন সর্বনাশের অপেক্ষায় অবক্ষয়িত।

এ কাব্যের চরিত্রচিত্রণ যথেষ্ট পরিমাণে না হলেও কিছুটা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কনৌজরাজ খুবই অস্পষ্ট। তার কন্যার যে মূর্তি প্রকটিত তাতে আসন্ন সর্বনাশের মুখে ভীতিবিহ্বলা নারীর ভাবই প্রতিফলিত। কিন্তু মুসলমান নৃপতি গজনীর মহম্মদ সুচিত্রিত। তার অনুদারতা ও একাগ্র ধর্ম-চেতনা, আক্রমনোদ্যত মনোভাব, বিলাসব্যসন, শক্তিমত্ততা একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বেশ প্রাণবন্ত রূপ নিয়েছে—

High in his tent of costliest shawl
Which tow'rs midst thousands glittering all,
Like fair pavilions Fancy's eyes
View limn'd on sunset eastern skies,
The Moslem-chief holds glad divan,
Nor fasts and lists to alcoran,
And that grim brow where bigot zeal,
Oft set its sternest fiercest seal,

কিন্তু নায়ক পৃথ্বীরাজের মধ্যে কবি অনেকখানি নিজেকেও দেখেছেন। পৃথ্বীরাজের রোমান্টিক প্রণয় চরিতার্থতায় বাধা—ছদ্মবেশে সমুদ্র লঙ্ঘন করে মানসীকে লাভ করা যেন কবির বাস্তবজীবনের (রেবেকার প্রতি প্রেম, বিবাহে বাধা, সেই বাধা অতিক্রমের চেষ্টা তখনও চলছিল) প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। লক্ষণীয় এই বীর প্রেমিক আবার কবিও। কিন্তু সাময়িক সাফল্যের পরে পত্নীসহ পৃথ্বীরাজের আত্মবিলোপ তাতেও কি আত্মপ্রতিফলন আছে? যদি থাকেও তা কবির সচেতন সৃষ্টি নয়, দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিতব্যের কণ্ঠস্বর।

Rizia নামে যে কাব্যনাট্য কবি লিখেছিলেন তা সবটা সংগ্রহ করতে পারি নি। মধুস্মৃতিতে নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় যে বিচ্ছিন্ন অংশগুলি উদ্ধৃত করেছেন তার সাহায্যে কোনো সিদ্ধান্ত করা কঠিন। শুধু এটুকু বলা যায়—

প্রথমত, পরবর্তীকালে 'রিজিয়া' নামে যে বাংলা নাটক লিখবার পরিকল্পনা কবি করেছিলেন তার সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল আছে। চরিত্রলিপি হুবহু এক। প্রকাশিত অংশগুলি সেই পরিকল্পনার সঙ্গে একেবারে মিলে যায়।

দ্বিতীয়ত, প্রবৃত্তির তীব্র সংঘাত দেখাবার সুযোগ তিনি এই নাটকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন।

তৃতীয়ত, খণ্ডিত বলে কোনো চরিত্র সম্পর্কেই স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। সবটা পাওয়া গেলে চরিত্রাঙ্কনে কবির সাফল্যের নিদর্শন পাওয়া যেত। মনে হয় সমকালীন সব রচনার তুলনায় চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে অনেক উঁচুতে স্থান দেওয়া যেত।

চতুর্থত, প্রাপ্ত অংশ দেখে মনে হয় কবি একে dramatic poem বলে অভিহিত করলেও এটি আসলে সেক্সপীয়রিয় আদর্শে লেখা ঘটনাবহুল প্রবৃত্তিবহুল পূর্ণাঙ্গ নাটক, এর সংলাপাংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় রচিত।

॥ সাত ॥

মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরলেন কবি। অজ্ঞাতবাস থেকে যেন মুক্তির আলোয় এসে দাঁড়ালেন। পথখোঁজার অন্ধকারে নয় [illegible]র, সিদ্ধির উজ্জ্বল মহিমা নিকট হল। ইংরেজি কবিতা রচনা মাদ্রাজ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অতীতের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। সম্ভবত মাদ্রাজে থাকতে থাকতেই তিনি ইংরেজি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তখনও প্রবেশাধিকার ঘটে নি। কবির সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট পরিকল্পনাও ছিল না। মানস শূন্যতার এই অবস্থায় 'রত্নাবলী' অনুবাদের জন্য ডাক এল। তারপরেই স্বাধীন নাট্য রচনা 'শর্মিষ্ঠা' এবং বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ। বাংলা সাহিত্যসাধনার যুগে তিনি রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং দীনবন্ধু মিত্রের দুখানা বাংলা নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করলেন। নিজের লেখা শর্মিষ্ঠারও।

তাছাড়া তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথমাংশের কয়েক পংক্তির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। এ আগ্রহ তাঁর বেশিদিন ছিল না। কবির কাব্যপ্রাণ বাংলা-ভাষার পথ ধরে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ভাষা কবিতার দেহ, পরিধেয়

নয়। কাব্যকল্পনাকে এক ভাষার পাত্র থেকে অপর ভাষায় রূপান্তরিত করায় কবিপ্রাণ সচরাচর অবিকৃত থাকে না। মধুসূদনের পক্ষে এই অনুবাদের চেষ্টা তাই সমূলে ব্যর্থ হয়েছে, কবির বুদ্ধি এর পরিকল্পনা করেছে, স্রষ্টা আত্মা সে পরিকল্পনা বর্জন করেছে।[৩৬]

কবি মাদ্রাজ ত্যাগ করার পরে একটিমাত্র স্বাধীন ইংরেজি কাব্য (অনুবাদধর্মী লেখা নয়) আরম্ভ করেছিলেন, "Queen Seeta" নামে, য়ুরোপ বাসকালে। কাব্যটির আরম্ভইমাত্র হয়েছিল, শেষ হয়নি। য়ুরোপ প্রবাসের আরও নানা লেখা অসমাপ্ত পড়ে আছে। চতুর্দশপদীর কবিতাগুলি ছাড়া আর কিছু তিনি লিখতে পারেন নি। কবির কাব্যগঠন ক্ষমতা তখন অবসিত, প্রতিভালক্ষ্মীও বিদায়ের দিন গুনছে।

ইংরেজিতে এই কাব্যটি রচনার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ সোম বলেছেন,

"'মেঘনাদবধ কাব্যে' যাঁহার অতুলনীয় চরিত্র বর্ণনা করিয়া তিনি বঙ্গবাসীকে যে সুবিমল তৃপ্তি দান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ য়ুরোপীয় সুধী সমাজকে সেই চরিত্রমহিমা জ্ঞাত করিতে তাঁহার প্রবল অভিলাষ জন্মিয়াছিল।"—[মধুস্মৃতি]

সীতাচরিত্র সম্পর্কে মধুসূদনের দুর্বলতা ছিল। তাই এই কাব্য-পরিকল্পনার অন্যতম কারণ হতে পারে। তবে আসল কারণ মনে হয় কবি হিসেবে য়ুরোপীয়দের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা। কাব্যটি রচনার মাধ্যমে কিছু অর্থোপার্জনের কথাও তিনি আদৌ ভাবেন নি, এমন মনে হয় না। য়ুরোপীয় পাঠকসমাজের প্রতি লক্ষ্য রেখেই হয়ত তিনি সীতা চরিত্রটি নির্বাচন করেছিলেন। সীতার চরিত্রবৈশিষ্ট্য য়ুরোপীয় পাঠকসমাজের কাছে একান্ত অভিনব সামগ্রী বলে মনে হবে। এই আশা কবির মনে জেগে থাকবে।

কিন্তু কাব্যটির সামান্যই লেখা হয়েছিল। কারণ তখন আর কোনো পূর্ণকাব্য লেখাই তাঁরপক্ষে সম্ভব ছিল না, ইংরেজি কাব্য তো নয়ই।

কবির তৃতীয় পর্বের ইংরেজি রচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে চোখ না পড়ে পারে না।

এক। কবি মূল বাংলা লেখার ইংরেজি অনুবাদের দিকেই বেশি ঝুঁকেছেন। মৌলিক ইংরেজি রচনার সংখ্যা মাত্র একটি, তাও আবার একেবারেই অপূর্ণ।

দুই। কবি বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রেরণা ছাড়া অন্য কারণে যেখানে অনুবাদে হাত দিয়েছেন (অর্থ, যশ, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি) সেখানেই মাত্র লেখাটি সমাপ্ত হয়েছে। সাহিত্যিক প্রেরণা যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে রচনা আরম্ভেই খণ্ডিত। কারণ কবির সাহিত্যপ্রেরণা বাংলা ভাষার সঙ্গে ইতিমধ্যেই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ।

এই দুটি লক্ষণই একটি সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে যে এর আগেই কবি ইংরেজি কাব্যসৃষ্টির রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছেন, পরে চলছিল শুধু জের টানা।

---

১ "Oh! how should I like to see you write my 'Life', if I happen to be a great poet—which I am almost sure I shall be if I can go to England." [গৌরদাস বসাককে লেখা কবির পত্রাংশ]

২ এই প্রসঙ্গে সহপাঠী ভোলানাথ চন্দ্রের একটি মন্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে "Modhu has taken up to describe a night-scene, in which among other things, he thus alludes to the stars, 'Night holds her Parliament'. The happy expression at once became a fond record to the tablet of my memory......"

৩ "He commenced to write poetry very early, and as his verses were freely published in the weekly and monthly periodicals of the day, he flattered himself with the hope of one day becoming an author." [সহপাঠী বঙ্কুবিহারী দত্তের স্মৃতিকথা]

৪ বিশেষ করে মাদ্রাজের পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বহু রচনাই যে হা[illegible]য় গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। "ইহা ছাড়া অপর দুই তিনখানি ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য লিখেছিলেন। এই খণ্ডকাব্যগুলি কখনও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই; সুতরাং এখন দুষ্প্রাপ্য।" [নগেন্দ্রনাথ সোম: মধুস্মৃতি]

৫ সাহিত্য সংসদ আমার সম্পাদিত "মধুসূদন রচনাবলী" সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে কবির ইংরেজি ও অন্যান্য রচনা, যতটা পাওয়া গিয়েছে সঙ্কলন করা হয়েছে।

৬ কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-৭৩) "Hindu Intelligencer" নামক ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। তাঁর ইংরেজি কবিতার সঙ্কলন "The shair and the other poems" নামে ১৮৩০ সালে প্রকাশিত হয়।

৭ রাজনারায়ণ দত্ত (১৮২৪-৮৯) মধুসূদনের সমব[illegible]। "Osymon" নামক কাব্য লেখেন। কাব্যের পটভূমি আরব দেশ।

৮ "We have had in our day Anglo-Bengalee poets, such as Kasi Prosad Ghosh, Raj Narain Dutt, Gurucharan Dutt, O. C. Dutt and others; Modhu distances them all." [ভোলানাথ চন্দ্র]

৯ কবির জীবনীকারেরা তাঁর বালক বয়সের দুটি ক্ষুদ্র বাংলা রচনার কথা বলেছেন। (১) বর্ষাকাল ; (২) হিমঋতু। কবিতা দুটি গৌরদাস বসাকের অনুরোধে লেখা। এদের ভাব কবিওয়ালাদের রচনার সমজাতীয়, ভঙ্গি ঈশ্বর গুপ্তের দ্বারা প্রভাবিত। বর্ষাকাল কবিতাটির আটটি চরণের প্রথম অক্ষরগুলি মেলালে "গউরদাস বসাক" নামটি পাওয়া যায়। সহজেই বোঝা যায় মধুসূদনের মনের যোগ ঘটেনি এই দুটি রচনার সঙ্গে। এরা কবিতাকৌতুক। ইংরেজি ভাষাকেই আপন অনুভূতির যোগ্য পাত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন কবি।

১০ এ বিষয়ে "মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প" গ্রন্থে চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রসঙ্গে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১১ অপর একটি কবিতায়ও রাত্রির ঠিক এই একই রূপ ধরা পড়েছে—

I looked around,
'Twas midnight calm, and there arose no sound
To meet mine ear, save the low murmurings
Of the sad night winds : tears rushed from mine eye,
Oh ! those were soothing tears, they gave relief !

১২ রবীন্দ্রনাথের তরুণবয়সে লেখা কবিতার সঙ্গে এই অনুভূতির তুলনা চলে—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

অনেক সমালোচকই এর মধ্যে উচ্ছ্বাসাতিরেক লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু উচ্ছ্বাসের ফেনার অন্তরালে সেই ভাববীজটির যেন জন্ম হচ্ছে যা পরবর্তীকালে সুগভীর মর্তমমতা এবং বিশ্বচেতনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৩ "ব্রজাঙ্গনা কাব্যে"র "জলধর" এবং "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র "মেঘদূত"-এ বর্ষার পটভূমি সামান্যত আমন্ত্রিত হলেও কিছুমাত্র মর্যাদা পায় নি।

১৪ "আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশি হোক-না, অপরের কাছে তার যা-কিছু মূল্য সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না।...মানুষ মাত্রেরই মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় ও বিলয় হয়। এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করবার নামই রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাবপ্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা। কবি যদি নিজেকে বীণা হিসেবে না দেখে বাদক হিসেবে দেখেন, তাহলে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ করবার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায়।" [প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধসংগ্রহ]

১৫ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত বীররসের সঙ্গে এর সম্পর্ক অল্প। সেইজন্যই বীর্যধর্ম কথাটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।

১৬ যথাক্রমে "মেঘনাদবধ কাব্য", "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" এবং "কৃষ্ণকুমারী নাটক"-এর প্রসঙ্গ এখানে আনা হয়েছে।

১৭ উক্ত কবিতার প্রথম কয়েকটি পংক্তি দেখলেই বোঝা যাবে মধুসূদন ডিরোজিওর কাছে অনেকটা ঋণী—

My country! In the days of glory past
A beauteous halo circled round the brow.
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory ; where is that reverence now?
The eagle pinion is chained down at last;
And grovelling in the lowly dust art thou ;
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee ;
Save the sad story of thy misery!

১৮ চতুর্দশপদী কবিতাবলীর "বটবৃক্ষ" শীর্ষক সনেটটির কথা প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে।

১৯ মেঘনাদবধেও প্রীতি, শান্তি, পবিত্রতা তুলসীমঞ্চের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। সরমা সীতার পদতলে বসল। কবি লিখলেন—

আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশদিশ। [চতুর্থ সর্গ]

২০ তুলনীয় মেঘনাদবধ কাব্যে প্রযুক্ত উপমাচিত্র—

রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ। [অষ্টম সর্গ]

২১ এ জাতীয় উপমাদির প্রয়োগ পরিণত বাংলা কাব্যে অনেক করেছেন কবি। মেঘনাদবধ কাব্য থেকে একটি এখানে উদ্ধৃত হল।

উদিল আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
... ...
বিমল জলে শোভিল নলিনী
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্যমুখী। [সপ্তম সর্গ

এবং বীরাঙ্গনা কাব্য থেকে অপর একটি—

রবি-পরায়ণা মরি, সরোজিনী ধনী,
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য কথা! [অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী]

২২ কবির এই সময়ে লেখা দুএকটি প্রেম-কবিতায়ও আমরা এ জাতীয় কল্পনার প্রকাশ লক্ষ করেছি।

২৩ "পুরুরবার প্রতি উর্বশী।"

২৪ "Saturn" এবং "অক্টোরলনী মনুমেণ্টের উপর দাঁড়িয়ে লেখা" সনেট।

২৫ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর বিশপস্ কলেজে, অবশেষে মাদ্রাজে এসে তিনি দুঃখের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন জীবনে।

২৬ সম্ভবত ইংরেজ আত্মীয়দের বাধা অতিক্রম করে রেবেকাকে বিবাহ করবার পরে প্রথম প্রেমমিলনের মনোভাব এই কবিতায় প্রকাশিত।

২৭ একটি পুরুলিয়ার খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতি অভিনন্দন, অপরটি কবির ধর্মপুত্র খ্রীষ্টদাসের প্রতি লক্ষ্য করে লেখা।

২৮ কাব্যটির মুখবন্ধের কবিতায় কবি তাঁর বিদেশিনী প্রিয়াকে লক্ষ্য করে লিখেছেন,—

Then come and list thee to the minstrel-lyre
And Lay of Eld of this my father-land,
When first, as unchain'd demons, breathing fire,
Wild, stranger foe-men trod her sunny strand,
And Pluck't her brightest gems with rude,
unsparing hand;

২৯ ১৮৪৯ সালে এই চিঠি লেখা, ১৮৫৮ সালে তিনি শর্মিষ্ঠা রচনা করেন।

৩০ Captive Ladie পড়ে বেথুন গৌরদাস বসাককে লিখলেন,—

"As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry, at all events he must write." লক্ষণীয় কবির তৃতীয় পর্যায়ের ইংরেজি রচনাগুলি তাঁর ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের "occasional exercise and proof" মাত্র।

৩১ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য অভারতীয় পাঠকদের জন্য কবি কাব্যশেষে ইংরেজিতে পরিচয়-টীকা যুক্ত করেছেন।

৩১ক তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের—

যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটির ভবনে
দেখিলা জানকী নাহি
'জানকী জানকী' আর্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে
মহা-অরণ্য আঁধার-আননে
রহিল নীরবে চাহি। [পুরস্কার]

৩২ "মেঘনাদবধ কাব্যে"র প্রথম সর্গে রাবণের মনস্তাপের সঙ্গে এ অংশ তুলনীয়।

৩৩ "চতুর্দশপদী"র "মহাভারত" শীর্ষক সনেটের সঙ্গে তুলনীয়। উদ্ধৃত ইংরেজি কাব্যাংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কার" কবিতার মহাভারত প্রসঙ্গের ভাবগত আশ্চর্য মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

দেখিতে দেখিতে হল উপনীত
ভারতের যত ক্ষত্র শোণিত,
ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত
প্রলয় বন্যাগানে।···
সমরবন্যা যবে অবসান
সোনার ভারত বিপুল শ্মশান,
রাজগৃহ যত ভূতল শয়ান
পড়ে আছে ঠাঁই ঠাঁই।

৩৪ কবির "ব্রজাঙ্গনা কাব্য", "ব্রজবৃত্তান্ত" সনেট এবং "মেঘনাদবধ কাব্যে"র বহুসংখ্যক উপমাচিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। যেমন—

বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপবধূ সঙ্গে রঙ্গে তোর চারুকূলে! [প্রথম সর্গ]

৩৫ "মেঘনাদবধ কাব্য" রচনাকালে ভারতীয় পুরাণ সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করে রাজনারায়ণকে তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু Captive রচনার যুগেও অনুরূপ অনুভূতি বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এ বিষয়ে আমার পূর্বোক্ত প্রস্তাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৩৬ কবি কবে তিলোত্তমাসম্ভবের অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন সঠিক বলা যায় না। মনে হয় কাব্যটি শেষ হবার অব্যবহিত পরেই অনুবাদটিতে হাত দিয়েছিলেন। তিলোত্তমাসম্ভব যাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল সেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছেই এই খণ্ডিত লেখাটি ছিল। তা ছাড়া এ প্রশ্নও করা যেতে পারে মেঘনাদবধ বীরাঙ্গনা প্রভৃতি অনুবাদে হাত না দিয়ে কবি দুর্বলতর কাব্য তিলোত্তমার অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন কেন। সম্ভবত তখন পর্যন্ত অন্য কোনো কাব্য লেখা হয়নি বলেই।

চতুর্থ অধ্যায়

তিলোত্তমাসম্ভব

"মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে
আপনার কূল-উপকূল"

মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল
তোমার কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল......

—রবীন্দ্রনাথ

॥ এক ॥

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য-রচনার পটভূমিটি নানা কারণে কৌতুককর, বিস্ময়-করও বটে। ঘটনাচক্রে মাত্র বৎসর খানেক আগে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করে বাংলা-ভুলে-যাওয়া সাহেব মাইকেল বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনার মূলেও কিছুটা আত্মগর্ব, কিছুটা বা ব্যক্তিগত মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জিদ কাজ করেছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা কবিতা লেখার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। যতীন্দ্রমোহন এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করায় মধুসূদন বললেন,

"যদি আমি আপনাকে অতি অল্পকালের মধ্যে আপনার ভ্রম বুঝাইতে না পারি ত আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবেন, আর যদি আপনাকে দেখাই যে, বাঙ্গালা ভাষা অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তা হলে আপনি—'
যতীন্দ্রমোহন বাধা দিয়া বলিলেন, 'তা হলে আমি আপনার গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিব,—আর সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিব।'...এই তর্ক-বিতর্কের পরে তিন চার দিনের মধ্যেই মধুসূদন তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ রচনা করিয়া পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে পাঠাইয়া দিলেন।"

—[নগেন্দ্রনাথ সোম : মধুস্মৃতি]

ছাত্রজীবনে যে বালসুলভ নিষ্ঠা ও বিজিগীষা একদিন তাঁকে ঘোষণা করতে প্ররোচিত করেছিল, "শেক্সপীয়র নিউটন হতে পারে, কিন্তু নিউটন কখনও শেক্সপীয়র হতে পারে না।"[১] সেই মনোবৃত্তিই কবিকে উত্তেজিত করেছিল যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বাজি রাখতে এবং তিলোত্তমাসম্ভব রচনা করতে।

ঘটনাটি কৌতুককর। কিন্তু প্রশ্ন এই, বিজিগীষা কবি-প্রাণকে কতটা আলোড়িত করতে পারে? এই প্রবৃত্তি মানবচিত্তের—বিশেষ করে কবি-চেতনার—উপরিতলকে ভেদ করে গভীরতর প্রদেশে, সৃষ্টির উৎসে প্রবেশ করতে পারে কি? সাধারণভাবে এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা কঠিন। কারণ কবিদের ক্ষেত্রে সাধারণ সত্য নয়—ব্যক্তিগত সত্যই অভিপ্রেত। এবং মধুসূদনের প্রতিভায় দেখি এই দুইয়ের একাত্মসম্বন্ধ। এ বিষয়ে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> "মাইকেলের মধ্যে 'স্ববারি' ও নিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। না, তাহার চেয়েও বেশি; তাঁহার আন্তরিক নিষ্ঠা এতই প্রবল যে স্ববারিতে যে ভাবের জন্ম, নিষ্ঠার প্রভাবে কবির অজ্ঞাতসারে তাহার প্রকাশ অসামান্যতা লাভ করিয়াছে।"
>
> —[মাইকেল মধুসূদন: জীবন-ভাষ্য]

অন্যভাবে বলা চলে,—স্পর্ধিত আত্মঘোষণা এবং বিজিগীষা তাঁর কবিপ্রাণের গভীরতা থেকেই জাত।

মাত্র একবছর আগে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনার সময়েও এমনিই একটি আকস্মিক ঘটনা কবির সৃষ্টিক্ষমতার দ্বারোন্মোচন করে। বাংলা ভাষায় ভাল নাটক নেই, রামনারায়ণের একটি বাজে অনুবাদের জন্য রাজারা এত খরচ করছেন! "আচ্ছা, আমি ভাল নাটক লিখে দেব!"[২] বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লেখা সম্ভব, না পয়ার-ত্রিপদীর পুরানো পথেই পরিক্রমা চলবে এই নিয়ে সং... ? "আচ্ছা, আমি অমিত্রাক্ষরে কাব্য রচনা করব!" এই ঘোষণায় বালসুলভ উচ্চকণ্ঠ আছে, ঘটনাগত আকস্মিকতা আছে, কিন্তু চেতনাগত কোনো প্রস্তুতি নেই কি?

মধুসূদনের মধ্যে যে একটি কবিপ্রাণ বাস করত কলেজজীবন থেকেই তার নানা পরিচয় প্রকাশিত। ইংরেজি কাব্য-কবিতা রচনার বহু আড়ম্বরের অন্তরালে তাঁর হৃদয়ে কোন নূতন মহাদেশ পলে পলে সম্ভবত রচিত হচ্ছিল। হয়ত মাদ্রাজ-প্রবাসে ভুলে-যাওয়া বাংলাভাষায় নূতন পাঠ নেবার জন্য কৃত্তিবাস-কাশীরামকে স্মরণ করায় তারই কোন অস্পষ্ট ইঙ্গিত; হয়ত বহু ভাষা শিক্ষার মহাযজ্ঞের মধ্যে দরিদ্র মাতৃভাষার নামোচ্চারণ তারই কোন সংকেত,—

> "My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine; 6-8 Hebrew, 8-12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am

I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?"

—[গৌরদাসকে লেখা মধুসূদনের পত্রাংশ]

"ক্যাপটিভ লেডি"র সমালোচনায় গৌরদাসের উপদেশ কিংবা বেথুনের পত্রের কি প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে ঘটেছিল সে সম্বন্ধে কোনো দলিলগত তথ্য আর হাজির করার উপায় নেই; তবে একেবারে আকস্মিকের সূত্রে পূর্বোক্ত ঘোষণাগুলির উদ্ভব হলে কোনোদিনই কোনো সৃষ্টির সার্থকতায় তারা উত্তীর্ণ হত না। কবির চিত্তে ও চেতনায় যে সৃষ্টির আবেগ আকৈশোর লালিত তার প্রবাহ হয়ত কালক্রমে আরও শক্তিসঞ্চয় করেছিল, কিন্তু বাংলাভাষার পথেই যে তার ভবিষ্যতের গতি এ প্রত্যয় বোধ হয় এখন অনেকখানি ধরা পড়েছিল,—ভবিষ্যতের রূপ-রেখার কোনো স্পষ্টমূর্তি নয়, অস্পষ্ট অনুভূতিমাত্র।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকাশক-পাঠকের জনযুগ তখন অভ্যুত্থিত, কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠ নয়; পুরানো পেট্রনযুগ অবসিত, কিন্তু সর্বথা ও সর্বত্র পরিহার্য নয়। মধুসূদনের ঐ সোচ্চার আত্মঘোষণায় প্রথম পেট্রন লাভে অবরুদ্ধ প্রতিভার উন্মুক্ত উল্লাসই দ্যোতিত। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চ ও ঈশ্বর সিংহদের আনুকূল্যের মুক্তপথে মধুসূদনের সৃষ্টির সূচনা। তেমনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যই তাঁর কাব্যরচনার প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন।[৩]

কিন্তু নাটক রচনা করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনের গভীরে একটি নবতর সত্যদ্যুতি আবির্ভূত হল। নাটকীয় সংলাপের উপযুক্ত আধার খুঁজতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করে বসলেন আপন প্রতিভার মৌল সঙ্গীত-স্বরূপকে,

"No real improvement in the Bengali drama could be expected untill Blank Verse was introduced to it."

এই Blank Verse-এরই অপর নাম কবি মধুসূদন দত্ত। (নবতর ছন্দ-পরীক্ষা হিসেবে অমিত্রাক্ষরের সার্থকতা ও সম্ভাবনা এবং উত্তরাধিকারের হাতে এর ঐতিহাসিক পরিণতি ঘটেছিল ঠিকই। তবুও বলা যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটি ছন্দমাত্র নয়, এ এক বিশিষ্ট কবির আত্মারই সঙ্গীতরূপ, এ তাঁরই বিশিষ্ট কাব্য-ভঙ্গি ও জীবনভঙ্গি—এ বস্তু অননুকরণীয় এবং অননুকৃতও।)

কিছুদিন আগে 'পদ্মাবতী' নাটকের সংলাপে কবি কয়েক চরণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা লিখেছিলেন।[৪] সেখানেই মধুসূদনের কবিমনের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে কথোপকথনে এই নব-আবিষ্কৃত সঙ্গীত-চেতনারই প্রকাশ। কবি নিজে তখন এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থাকুন কিংবা না থাকুন।

মধুসূদনের কবিচিত্তে কাব্যসঙ্গীতের জন্ম অনেকখানি বিষয় নিরপেক্ষ—যেন ভাষা নিরপেক্ষও। এ ঠিক কাব্যক্ষমতার উন্মেষ নয়—তার পূর্বাবস্থা। তাকে কাব্য-আবির্ভাব না বলে তার উষালগ্নের স্বপ্নজড়িত অবস্থা বলে উল্লেখ করা চলে। কিন্তু প্রভাতের সূচনা উষায়। কাব্য-কল্পনার এই উষা-মুহূর্তগুলিও তাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের "ভাষা ও ছন্দ" কবিতাটির কথা স্মরণ করা চলে। নূতন ছন্দ-সঙ্গীতের আস্বাদে মত্ত মধুসূদনের বর্তমান মানস অবস্থাও ঠিক ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরই মত—

> যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,
> মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
> দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
> মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল,
> তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
> ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়,······।

মধুসূদনেরও এই একই অবস্থা। তিনি নিজেই জানতেন না যে তাঁর সমগ্র প্রতিভা, কল্পনা এবং দেশী-বিদেশী কাব্যানুশীলন বিগলিত হয়ে এই বিশিষ্ট সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে। আকস্মিক উচ্চকণ্ঠ প্রতিজ্ঞা এবং বালসুলভ একগুঁয়েমির পেছনে যে তাঁর সমগ্র সত্তা আলোড়িত কবি আপনি তা জানতে পারেন নি। তাই কাব্যসমাপ্তির পরে আপনার সৃষ্টিতে আপনি আশ্চর্য হয়ে লিখেছেন—

> "I began the poem in joke and I see I have actually done something that ought to give our national poetry a good life."

এই "something"—এই অমিত্রাক্ষর ছন্দই—তিলোত্তমাসম্ভবের কেন্দ্রীয় সত্য। আর সত্য এই নব-আবিষ্কারের আনন্দ—আপনার এই আবিষ্কারকে সম্পূর্ণ না চেনার বিস্ময়ও।

তিলোত্তমাসম্ভব প্রস্তুতির কাব্য। জীবন ও জগৎ, মানুষ ও প্রকৃতি, চিত্তের মুক্তি ও পরিবারের বন্ধন, মধুসূদনের চেতনায় বিশিষ্ট কাব্যবোধরূপে ধরা দিয়েছিল। মেঘনাদবধের নয়সর্গের বিস্তৃতিতে তা প্রতিষ্ঠিত। তিলোত্তমায় কবি-প্রাণের গভীরে চলেছে তারই অনুসন্ধান। আর কখনও ধরা পড়েছে

তার স্পষ্টতর অনুভূতি। ফলে এ কাব্যে ঘটেছে তার অপুষ্ট পঙ্গু প্রকাশ। আখ্যায়িকাগঠনে নবসংহতি যে নূতন আদর্শের সৃষ্টি করেছে মেঘনাদবধে এখানে তা অনুপস্থিত, যদিও বাইরের বস্তুপুঞ্জের অভ্যন্তরে তার একটা রক্তমাংসহীন কাঠামোর সূত্র অনুসরণ করা সম্ভব। নূতন মানবতাবোধের যে আদর্শ মধুসূদনের কাব্যকল্পনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য তার সম্যক প্রকাশ এখনও বিলম্বিত। এই মানববোধের সন্ধানে কবি-চিত্ত এখানে দ্বিধা-দীর্ণ।

এককথায় বলা যেতে পারে যে প্রতিভালক্ষ্মী গরুড়ের জন্মসম্ভাবনায় দোহদলক্ষণা। অকাল বোধনে সেখানে অরুণের জন্ম ঘটেছে। সে অপূর্ণ কিন্তু সূর্যরথের সারথিও বটে॥

॥ দুই ॥

মধুসূদনের কবিদৃষ্টির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে তা সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্রণে গঠিত—যদিও 'সাপেক্ষ' শিল্পবোধের দিকে তাঁর ঝোঁকটি অনেক বেশি। কিন্তু পূর্ণ আত্মমুখী তিনি কিছুতেই হতে পারতেন না; অবশ্য চতুর্দশপদীতে এর কাছাকাছি তিনি পৌঁছেছিলেন। একমাত্র বীরাঙ্গনায় তাঁর বিশ্বমুখী নিরপেক্ষ দৃষ্টি অনেকখানি জয়যুক্ত।

তিলোত্তমায় একটি নবাবিষ্কৃত ছন্দের স্রোতে ভেসে যাওয়া এবং পার্থিব যাবতীয় বস্তুসৌন্দর্য খণ্ডখণ্ডভাবে উপলব্ধি করা এবং প্রসঙ্গত একটি কাহিনী-কথনই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু কবি-প্রাণ নানাভাবে আপনার আশা-আনন্দ ও ব্যর্থতার কথা বলেছে এই কাব্যে। কবির ব্যক্তিক কামনা-বাসনা, যুগসত্য এবং কাব্যাদর্শ একটি অদ্বয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সমগ্র কাব্যচেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এর ঘূর্ণাবর্ত থেকে কবি প্রায় কোথাওই মুক্ত হতে পারেন নি। একবার মাত্র ক্ষণকালের জন্য তিনি এই আবর্ত-বিচ্যুতি হয়ে মানব-কোলাহলে পড়েছিলেন এবং বীরাঙ্গনার সংক্ষিপ্ত সাধনায় সে ঋণ মোচন করে যেন তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে চতুর্দশপদীতে আপনার মধ্যেই অবগাহন করেছেন। তিলোত্তমায় কবির আপন ব্যক্তিত্ববোধ কাব্যচেতনার সঙ্গে সম্পূর্ণত ঐক্যসূত্র পেয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ আপন সৌন্দর্যচেতনার স্বরূপ বুঝবার সময় এখনও তাঁর আসে নি। তাই আপন কাব্য-চেতনার কাম-স্বর্গ এখনও ভাষা-ছন্দে নির্মাণ করে তুলতে পারেন নি কবি;—মেঘনাদবধেই সে নির্মিতি পূর্ণ এবং সার্থক। মামুলি স্বর্গচিত্রণে এবং ইন্দ্রাদির সেই সুখস্বর্গ থেকে

নির্বাসনে কবির ব্যক্তিক বেদনার সুর অপ্রত্যক্ষভাবে কিছুটা বেজে উঠেছে তিলোত্তমায়—

কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
সাগর বিপুল বংশ যে লোভেতে হত ?

কবির দৃষ্টির মধ্যে একটা দৈবী ক্রিয়া থাকে। অথবা এমনও বলা যায় যে কবির আত্মবোধ তথা জীবনবোধ বাইরের অতিপ্রত্যক্ষ পর্বতপ্রমাণ তথ্যস্তূপকে অতিক্রম করে একান্ত অজ্ঞাত জীবন-রহস্যের সন্ধান আনে। যে স্বর্গ-সাধনায় সাগরবংশ হত মধুসূদনেরও জীবনব্যাপী সেই সাধনা এবং সেই সাধনায়ই তিনি নিঃশেষিত হয়েছেন। অবশ্য তিলোত্তমাসম্ভব সৃষ্টির মুখে তাঁর জীবনের অনেকাংশে ভারসাম্য স্থাপিত এবং গৌরব ও জয়মাল্যের তোরণদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাজপ্রবাসে চরম দুর্দশার মধ্যে যে সত্য চকিতচমকে তাঁর মনের কোণে উঁকি মেরে গেল তার রেশ কি হারাবার ? এই পৃথিবীতে তাঁকে অত্যন্ত বেহিসেবি লোকসানের পাল্লায় ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, এ বোধ তাঁর ছিল। তাই দেবতাদের স্বর্গচ্যুতিতে তিনি আপনার বেদনারও সন্ধান পান ;—এ কেবল রোমাণ্টিক চেতনার পক্ষবিধূননই নয়, এর সঙ্গে কবি-জীবন, কবি-আত্মার এবং যুগপরিবেশের ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষতা স্বীকার্য—

কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী ?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, সুবর্ণ আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ?
কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা,
রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি—
উভয় উজ্জলতর উভয়ের তেজে ?
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন ?
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি ?
কোথা সে উর্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা
চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা,
মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ?

কোথায় কিন্নর ? কোথা বিদ্যাধরদল ?
গন্ধর্ব—মদন-গর্ব খর্ব যার রূপে ?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
মহারথী ? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ !
যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে করি থরথর
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
আতঙ্কে ?······

হায় রে, কোথায় আজি সে দেববিভব !
হায় রে, কোথায় আজি সে দেবমহিমা !

নানাভঙ্গিতে বিচিত্র সুযোগে কবি কামনার এই কাম-স্বর্গে উত্তরণের বাসনা প্রকাশ করেছেন। ব্রহ্মলোক-বর্ণনার সূচনায় কাব্য-কল্পনার পক্ষ তিনি আয়ত্ত করতে চেয়েছেন সেই লোকে প্রয়াণ করবার জন্য। তাতে যোগীদের উল্লেখ থাকলেও কবির চিত্তবর্ণের অভাব ঘটে নি—

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে দুর্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহাযোগ···

সেই দুর্লভ যোগিজন-কাম্য ব্রহ্মলোক মধুসূদনের গূঢ় সংস্কারের যোগে মণি-মাণিক্য-স্বর্ণ-রত্ন-খচিত দ্বিতীয় ইন্দ্রলোক কিংবা তার চেয়েও অধিকতর ঐশ্বর্যের দ্যোতক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও "হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে" এবং ভক্তি ও আরাধনা নাম্নী দেবীদ্বয়ের সাহচর্য ছাড়া এ লোকে প্রবেশ অসম্ভব, তবু এর বৈভব দেবতাদেরও কল্পনার অতীত।

দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময় ; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম···· ।

তৃতীয় সর্গের মাত্র একটি স্তবকে কবি ব্রহ্মলোকের এই ঐশ্বর্য-লক্ষণ বোঝাতে যে-সমস্ত শব্দ ও বিশেষণাদি ব্যবহার করেছেন তার তালিকা সংকলন করা যেতে পারে : কাঞ্চন-তোরণ। হিরণ্ময়। স্বর্ণপদ্ম। হৈমতরুরাজি।

মরকতময়। রত্নমালা। পদ্মরাগমণি। স্বর্ণবীণা। হেম-কমল। উপমা হিসেবে ব্যবহৃত : রতির বিম্বময় অধরসুধা। বনসুন্দরীর কামদেহ-আলিঙ্গন। নৃত্য-ক্লান্ত উর্বশীর বক্ষবিলম্বিত মন্দারের মালা। ব্রহ্মার চতুষ্পার্শ্বের ব্রহ্মর্ষিদের "কাঞ্চন-কিরীট শিরে" এবং সমভিব্যাহারিণী বাগ্‌দেবীর হাতের বীণাটিও স্বর্ণময়। এখানে—

যে যাহা ইচ্ছিলা, তাহা পাইলা তখনি।
যে আশা এ ভবমরুদেশে মরীচিকা,
ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে।

ফল চাইলে হাতের মধ্যে ফলের গুচ্ছ এসে উপস্থিত হয়, ফুল চাইলে শুকনো শাখা স্তবকে স্তবকে ভরে যায়, সুধা চাইলে সুধার স্রোত সম্মুখে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীরূপ মরুভূমিতে যে আশা মরীচিকা এখানে তা আয়ত্ত—সত্য।

আসলে যোগীদের ধ্যানলোকের সঙ্গে মধুসূদন বর্ণিত এ ব্রহ্মলোকের সাদৃশ্য কিছুমাত্র নেই। এ লোক তাঁরই কামনা-সম্ভূত, চিত্তলোকের চিরজাগ্রত স্বপ্ন। যে ঐশ্বর্যের কামনা তাঁর মহাকবি হবার বাসনার মতই অতি তীব্র এবং সমগ্র জীবনগতির নিয়ামক তারই অস্ফুট প্রতিফলন ঘটেছে ইন্দ্রলোকে; এবং ব্রহ্মলোকের সত্ত্বগুণের সম্পূর্ণ বিস্মরণে—সেখানে সচেতন রাজসিকতার আরোপে।

মধুসূদনের এই ঐশ্বর্য-কামনা তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসারই একটি মুখ্য দিক। উনিশ শতকের বলিষ্ঠ ভোগবাদ তাঁর জীবন স্বীকৃতি। তাই শমন কিংবা প্রভঞ্জন যখন পরাজয়ের লাঞ্ছনায় পৃথিবীকে ধ্বংস করতে উদ্যত তখন কুবেরের কণ্ঠে যে নিষেধবাণী উচ্চারিত তাতে কবিকণ্ঠের স্পর্শ আছে—

…তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন,
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?
কে পারে নাশিতে তোরে জগৎজননী
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের! তারা-দল যার সখী-দল!
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে!

সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায়! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,
শ্যামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
সৃজেন সতত ধাতা ফুল্লরত্নাবলী
বহুবিধ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
দিবানিশি! কে আছয়ে, হে দিক্‌পালগণ,
এ হেন নির্দ্দয়?···

কবিপ্রাণের স্বত-উৎসারিত এই সৌন্দর্যবন্দনা এবং মর্তপ্রীতি কিন্তু ঐশ্বর্যাধিপতি কুবেরের জবানীতেই প্রকাশ পেয়েছে। হয়ত এ ব্যাপার কবির সচেতন উপস্থাপনা নয়, কিন্তু একান্ত কাকতালীয় বলেও একে মনে করা যায় না।

স্বর্ণলংকার কল্পনায় এবং আবেগকম্পিত বর্ণনায় কবির যে কাম্যলোক জীবন্ত হয়ে সমগ্র কাহিনীটির একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভারকেন্দ্র রচনা করেছে মেঘনাদবধে, এখানে চেতনার ও রূপনির্মাণের সে সংহতি নেই। ইতস্তত নানাস্থানে ক্বচিৎ স্পষ্টভাষায় এবং প্রধানত অস্পষ্ট ইঙ্গিতে এ কামনা ছড়িয়ে আছে। এই প্রকীর্ণ অর্ধস্ফুটতা প্রস্তুতির কাব্যের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু কাহিনী-কাব্যে আত্মকথন আরও তীব্র-গভীর হয়ে ওঠার সুযোগ পায় যখন মেঘনাদ-রাবণের ন্যায় চরিত্রের মাধ্যমে তা উদ্বেল ও আর্ত হয়ে ওঠে। তিলোত্তমায় এ সিদ্ধি নেই। সাধনার যে ইঙ্গিত তাও যথেষ্ট রূপসাফল্য পায় নি। তিলোত্তমায় প্রথমাবধি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি কবির যে সহানুভূতি তাতে তাঁর চিরবিদ্রোহী চিত্তের সমর্থন ছিল কি? অপর পক্ষে সুন্দ-উপসুন্দের ভূমিকা এ কাব্যে এতই সামান্য যে তাদের সম্যক পুষ্টিই যেন ব্যাহত হয়েছে। আসলে কবিচিত্তের সহানুভূতিতে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাই-ই যেমন সুন্দ-উপসুন্দের মৃত্যুতে যথেষ্ট বেদনার সঞ্চার করতে পারে নি, আবার দেবরাজ ইন্দ্রের বিজয়ে আমাদের করে তুলতে পারে নি যথেষ্ট উল্লসিত। সহানুভূতির যোগ ঘনিষ্ঠ না হলে আত্মপ্রতিফলন বাধাগ্রস্ত হয়। এখানেও তাই ঘটেছে।

॥ তিন ॥

১৮৬০ সালের ১লা জুন মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" প্রকাশের খবর জানিয়ে চিঠিতে লেখেন,

"I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil. Kalidas, Dante (in translation), Tasso (do) and Milton. These কবিকুলগুরু sought to make a fellow a first-rate poet—if nature has been gracious to him."

১৯শে জুন রাজনারায়ণ তিলোত্তমার সমালোচনা-সম্বলিত এক দীর্ঘ পত্র লেখেন মধুসূদনকে—

"As all natural objects and all the gods lent their respective chief attractions to the Hindu Pandora better than that of grand-mother-like old garrulous Hesiod, because from her no evils flowed as from the charms of Epimetheus, but good only, so all sublime things and beautiful—the sky, the ocean, the mountain, the rainbow, the Zephyr, the lotus—as well as great masters of song—Vyas and Valmiki, Homer and Virgil, the Hebrew prophets and Dante, Tasso and Milton, Kalidas and Shakespeare have contributed their respective quotas to the composition of the "Tilottama"; but as the divine skill of Viswakarma enabled him to combine and arrange his store of materials in such a manner as to produce a peerless masterpiece of female beauty, so your extraordinary genius has enabled you to arrange your immense store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole and produce a masterpiece of poetry that will delight mankind from generation to generation."

কালোচিত কিছু অতিশয়োক্তি থাকলেও এ সমালোচনায় কাব্যটির মূল তাৎপর্য ধরবার চেষ্টা আছে। তাই এটি মূল্যবান। এবং এ পত্রের সূত্র ধরেই

তিলোত্তমা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। এ কাব্যের কাহিনীতেই কেবল তিলোত্তমাসম্ভব ঘটে নি, এখানে কবিচিত্তের সৌন্দর্যবোধ ও কাব্যরচনক্ষমতারও তিলোত্তমা সম্ভব।

মধুসূদনের কবিপ্রতিভা দুই ধারার সঙ্গম। কবিকুলগুরুদের নানা অবদানে তাঁর চিত্তের যেমন উজ্জীবন, প্রকৃতি-সৌন্দর্যের বিচিত্র উপকরণ সংযোগে তেমনি তার রূপায়ণ। যুগাতীত অমর কবিদের কাছে মধুসূদনের ঋণ অসামান্য। অনেকের কাছ থেকেই বর্ণনীয় বিষয়, কোথাও বা বর্ণনা-ভঙ্গি, ছন্দ-বিশিষ্টতা, উপমাদি প্রয়োগের কৌশল, নিসর্গ-সম্ভোগ, দেবকল্পনা, নিয়তিবাদ, মানবপ্রীতির দীক্ষা তিনি নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের যে মূল ধর্ম তারই আগ্নেয় প্রক্রিয়ায় সব একাকার হয়ে একটিই "মূর্তি" রচনা করেছে। সে আগুন যা গলাতে পারে নি, কাব্য হিসেবে প্রধানত সেখানেই বিচ্যুতি ঘটেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে "সে মূর্তি" নির্মাণের যে চেষ্টা তিলোত্তমায় তাতে কবির কবিজনোচিত সৌন্দর্য-চেতনার উদ্বোধন ঘটলেও কবিমানসের সামগ্রিক সত্যরূপ বিধৃত হয় নি। সে মূর্তির যদি কোন নাম থাকে তবে তা মেঘনাদবধের রাবণ—তিলোত্তমা নয়। মধুসূদনের সৌন্দর্য-চেতনা জীবন-বিবিক্ত নয়। সুগভীর জীবন-জিজ্ঞাসা, মানব-চরিত্র, মানব-ভাগ্য এবং স্বয়ং কবি-ব্যক্তিত্বের আশা-নৈরাশ্যের কেন্দ্রে তা আবর্তিত। অপর পক্ষে তিলোত্তমায় আছে মানববিবিক্ত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের এক সিদ্ধিহীন সাধনা।

প্রথমে তিলোত্তমা নাম্নী নারীচরিত্রের কথায় আসা যাক।

তিলোত্তমার কল্পনায় গুরুতর স্ববিরোধ আছে। সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী এ দেবী পৃথিবী ও মানবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এমন কি যে দেবকুলে তার আবির্ভাব কোনো সম্বন্ধের বন্ধনে তাদের সঙ্গেও সে বদ্ধ নয়। সে অযোনিসম্ভূতা, তার ফুটে ওঠা "বৃন্তহীন পুষ্প সম"।

বিশ্বের বস্তুনিচয় থেকে সৌন্দর্যকে নিষ্কাশিত করে নিয়ে বিশ্বকর্মা এই দেবীমূর্তি সৃষ্টি করেছেন। বস্তুর ভার থেকে অমূর্ত সৌন্দর্যকে অনেকখানি পৃথক করা গেছে, আর এ বিষয়ে ভারতীয় উপমা-প্রয়োগ ও চিত্র-রচনারীতি কবিকে সাহায্য করেছে। সাধারণভাবে এই রীতি কাব্যকলায় খুব উচ্চ মার্গের সম্পদ বলে স্বীকৃত নয়। বরং চিত্রনির্মাণে এদের প্রয়োগগত একান্ত ভাবতন্ত্র রূপের স্খলনকেই ডেকে আনে। সুন্দরী তন্বীর গতিভঙ্গিমার সঙ্গে হস্তিনীর গতিকে উপমিত করা কিংবা তার কটির ক্ষীণতা বোঝাতে মৃগরাজের

তুলনা আহ্বান করা বিদেশী কাব্যরসিকের কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ বলেই মনে হবে। কিন্তু ভারতীয় ভাববাদ অতি সহজেই বস্তুকে বাদ দিয়ে তার কোন বিশেষ ভাবকে গ্রহণ করতে পারে। হাতী বা সিংহের বিপুল বস্তুভারকে বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে কেবল নির্বস্তুক গতিচ্ছন্দ কিংবা ক্ষীণতার উপলব্ধি তাদের দীর্ঘ অনুশীলনজাত অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এই বহুব্যবহৃত প্রয়োগ-কৌশলকে মধুসূদন কেবল বাচনগুণে এবং কিছু নির্বাচনগুণেও বিশিষ্ট করে তুলেছেন। কোনও কোনও পংক্তিতে বস্তুভিত্তিক, কিন্তু [বস্তু অতীত না হলেও—বলা যেতে পারে] বস্তুনিংড়ানো ভাবরসের আমেজ এসেছে।

১. বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-বাগে।

২. শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা!

৩. ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।

৪. জলে যে তারা-রতন উষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইল চক্ষুদ্বয়।

৫. আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুল-শর নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী।[৫]

এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে অবশ্য খগোল, রম্ভা ও মেরুশৃঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো উপকরণে পূর্বকথিত ভারতীয় উপমা-ঐতিহ্যের অতি বৃহৎ এবং অতি ভয়ানক বস্তুভার নেই। মধুসূদনের পাশ্চাত্য সাহিত্যরস-অনুশীলনের ফল বলে একে মনে করা যায় না। কারণ উপমা-প্রয়োগের ঐ ভারতীয় রীতি আলোচ্যকাব্যের অন্যত্র এবং কবির অন্যান্য কাব্যেও সুপ্রচুর। কিন্তু

উপকরণের বিচিত্র সঞ্চয়—বিদ্যুৎ-রেখার অলক্তরাগ, মেঘনির্মিত কবরী, ইন্দ্রধনুর'সিঁথি—একটু বিশিষ্ট। ছায়াপথ-নির্মিত মেখলার অস্পষ্টতা এবং শুকতারা-চোখের দূরাগত রহস্যলোক বস্তু থেকে বস্তু-অতীতে ভাবের রাজ্যেই আমাদের অধিক আকর্ষণ করে। পঞ্চম উদাহরণে আবার অতিমামুলি কথাবস্তুই কেবল ভঙ্গির গুণে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কামোদ্দীপনার প্রবল ক্ষমতা বোঝাতে ভ্রূ-যুগ কামধনু এবং অপাঙ্গ-দৃষ্টি কামশরের সঙ্গে সর্বদাই উপমিত হয়। কিন্তু কামের তূণ থেকে বিশ্বকর্মার হেসে হেসে মদনশর সংগ্রহ করায় সেই উপকরণ অনেক বেশি ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে।

তিলোত্তমার রূপসৃষ্টিতে মধুসূদন কবিকর্মের যে পরিচয় দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করা গেল। এবারে মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। তিলোত্তমা কল্পনার উৎসে যে সৌন্দর্য-চেতনা তার দ্বিধার কথা বিশ্লেষণে এই নারীমূর্তির রূপ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং কবির অন্তর্লোকের আরও কিছু সংবাদ পাওয়া যাবে।

তিলোত্তমা যে সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী তা যে মানব-সম্পর্ক-রহিত এ কথা পূর্বেই বলেছি। সৌন্দর্যের বিচ্ছুরিত দীপ্তি ও বিহ্বল মাদকতায় সে কামবাসনা জাগায় কিন্তু লোভের ও ভোগের হাত বাড়ালে ধ্বংসই নেমে আসবে। তার সৌন্দর্যে চোখের তৃপ্তি, হৃদয়ের আনন্দ এবং উল্লাস। কিন্তু এ সৌন্দর্য ভোগের অতীত, প্রয়োজনের সীমায় বদ্ধ নয়, একে কামনাই করা যায় শুধু, পাওয়া যায় না কখনও। সুন্দ-উপসুন্দের ধ্বংস থেকে এ তাৎপর্যই উচ্চারিত।

কারও আয়ত্ত নয় তিলোত্তমা। দেবসভায় উর্বশী-রম্ভা-মেনকা-মিশ্রকেশীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নি সে। সুন্দ-উপসুন্দের মৃত্যুর পরে সূর্যলোকে—সমস্ত রূপজগতের চিরন্তন আলোক-উৎসে হয়েছে তার নিত্যপ্রস্থান।—

> যাও এবে (বিধির এ বিধি)
> সূর্যলোকে, সুখে পশি আলোক-সাগরে
> কর বাস।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল প্রকৃতির সঙ্গে এই সৌন্দর্য-দেবীর যে সম্বন্ধ কবি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাই। চতুর্থ সর্গে বিন্ধ্যকাননপথে তিলোত্তমার যাত্রার একটি নয়নাভিরাম ছবি কবি এঁকেছেন। তার পায়ের স্পর্শে জড়

বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত শিহরিত হল, তপস্বী বনদেব চোখ মুদ্রিত করলেন, পশুরাজ সিংহ পেতে দিল আপন পৃষ্ঠাসন,—

শিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদপরশে,
সম্মোহন বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড়।...
বনদেব তপস্বী মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ে।

তিলোত্তমা প্রাকৃতিক জগতের তিল তিল উত্তমের সমন্বয়েই মাত্র গঠিত নয়, সে প্রাকৃতিক জগতের প্রাণসত্তার সারভূত বিগ্রহ এবং তাদের সেই আদর্শ-সৌন্দর্যের স্বপ্ন যাকে পাবার কামনায় তারা একান্ত অধীর—

কত স্বর্ণ লতা
সাধিল ধরিয়া আহা, রাঙ্গা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে, কত মহীরুহ
মোহিত মদন-মদে দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতিস্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলিদল,—কে পারে কহিতে ?
আপনি ছায়া-সুন্দরী—ভানু-বিলাসিনী—
তরুমূলে ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি,
কলরবে প্রবাহিণী—পর্বত-দুহিতা—
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে।

সৌন্দর্য-লক্ষ্মীরই যেন কতকগুলি খণ্ডপ্রকাশ জগতের বিচিত্র বস্তুশোভায় বিকীর্ণ হয়ে আছে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই অন্তরনিবাসিনী হৃদয়বৃন্ত-শয়নে শায়িতা এক "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্র-রূপিণী।"

অখণ্ড সেই পরম আদর্শের প্রতি এই খণ্ডরূপের গভীর আকর্ষণ, তাকে আয়ত্ত করবার জন্য এদের ব্যগ্র বাহুর কী আকুলতা! কিন্তু নিরাসক্ত সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। তারই পদপাতে পৃথিবীতে যে প্রেম জাগছে, তারই পলকপাতে প্রকৃতির বস্তুনিচয় যে সৌন্দর্যের তরঙ্গোদ্বেল, সে-সম্পর্কে যেন তার চেতনা নেই। তারই রূপে মুগ্ধ স্থন্দ-উপস্থন্দ যে অন্যোন্যসংগ্রামে নিহত এতে তার বেদনাবোধ নেই, নেই আনন্দোচ্ছ্বাসও। কাউকে কামোন্মত্ত করতে তার চেষ্টা নেই, তার দৃষ্টিতে যে কামশরগুলি স্থাপন করা হয়েছিল ভ্রূ-ভঙ্গির জ্যারোপণে তাদের গতি একাগ্র হয়ে ওঠে নি সমগ্র কাব্য-কল্পনায় একটিবারের জন্যও। মাঝে মাঝে এমন মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়, তিলোত্তমা কি অচেতন বস্তু-সৌন্দর্যের সমষ্টি, প্রাণহীন জড়পিণ্ড? প্রমথ চৌধুরীর একটি কবিতার এই প্রশ্ন—

প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করে।
আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি,
এনেছি তারার মত জ্যোতির্ময় মণি,—
রত্ন দিয়ে দেবীমূর্তি গড়িবার তরে।
ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধ্রুরে,
পরায়েছি শ্যামশাটী মরকতে বুনি,
রক্তবিন্দু পারা দুটি স্থলোহিত চুনি,
বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে।
প্রজ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুকুতা-নির্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন,
স্থকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ।
অপূর্ব স্থন্দর মূর্তি, কিন্তু অচেতন,—
না পারি পূজিতে কিম্বা দিতে বিসর্জন।

তিলোত্তমা সম্বন্ধেও তোলা যায় কি? অথবা সে উত্তাপ বিকীর্ণই করে কিন্তু নিজে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে না।

মনে হয় তিলোত্তমা প্রাণ-চঞ্চলা হয়ে ওঠে নি দুটি কারণে। প্রথম: কবি তার মধ্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সর্ববিবিক্ত আত্মলীনতা ও চরম আসক্তিহীনতাই আঁকতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়: কবির আত্মভাবের কিছু প্রতিফলন এখানেও ঘটেছে।

প্রথমটি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয়টির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যাক। তিলোত্তমা জগতের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ কিছুই বোঝে না। কোন মানবসত্যে তার চিত্ত স্থিত নয়। কোন জীবন-জিজ্ঞাসায় সে উচ্চকিত নয়। কিন্তু সৌন্দর্যদর্শনে সে বিবশা, সৌন্দর্যের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণে তার হৃদয়ের কার্পণ্য নেই। কিন্তু সে জানে না এ তার আপনারই প্রতিবিম্বন মাত্র।

ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে,
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে! "এ হেন রূপ—" কহিল রূপসী
মৃদুস্বরে—"কারো আঁখি দেখেছে কি কভু?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
বাসব; দেবসেনানী; আর দেব যত
বীরশ্রেষ্ঠ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী;
দেব-কুল-নারী-কুল; বিদ্যাধরী-দলে;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে? ইচ্ছা করে, মরি, কায়-মন দিয়া
কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পা দুখানি!
বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জলতলে দরশন দিলা।"
এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নোয়াইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্তি প্রতি; সেও শির নমাইল!
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদুস্বরে সুধিলা—"কে তুমি, হে রমণি?"
আচম্বিতে "কে তুমি? কে তুমি, হে রমণি—
হে রমণি?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে!
মহাভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারিদিকে।

মধুসূদনের কবি-চেতনার একটি প্রধান লক্ষণ তাঁর অতিতীক্ষ্ণ আত্মবোধ। এ আত্ম-উপলব্ধির প্রকাশ তাঁর পত্রাবলীতে সুপ্রচুর, কোথাও উচ্চকণ্ঠ।

তিলোত্তমা রচনাকালে এ-চেতনা পূর্ণমূর্তি লাভ করে নি। একটা অন্ধ কাব্য-সংস্কার ও সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসার জন্ম হয়েছে মাত্র। যে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর আরাধনা এ কাব্যে ঘটেছে তাকে দেখে কবির মুগ্ধ বিস্ময় জন্মেছে। "এ কি আমারই আত্মা, আমারই কাব্য-লক্ষ্মী, আমারই সৌন্দর্য-চেতনা? এ অপূর্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু এই কি আমি?"

তিলোত্তমা কাব্যে খণ্ডচিত্রের সমারোহ আছে, আখ্যান-গ্রন্থনের নিপুণ সিদ্ধি এখনও বহুদূর। তাই চিত্ররচনার খণ্ডত্বের সঙ্গে সমগ্র কাব্যের ঐক্যসূত্র নিটোল সম্পূর্ণতা পায় নি। চরিত্র-চিত্রণে নেই গভীরতা, ব্যক্তিবোধ কিংবা জীবন-জিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণতা। সর্বোপরি মধুসূদনের সৌন্দর্য-চেতনা ব্যক্তিগত জীবনের সর্বব্যাপক সুখ-সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য-ভোগতৃপ্তির বাস্তব প্রাপ্তিজনিত আনন্দোপলব্ধির অথবা তার বিরাট কামনার ভূমিকায়ই সত্য। স্বর্ণলঙ্কা সুন্দর, কারণ তাঁর কামনা সেখানে বস্তুরূপ গ্রহণ করেছে। মেঘনাদের যৌবন সুন্দর, কারণ রাবণের বাসনার তিল তিল সঞ্চয়ে সে সত্য হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্য মধুসূদনের কল্পনায় তাই বিশুদ্ধ নয়। প্রয়োজনের (কথাটি এখানে একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত) সঙ্গে তার যোগ ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতিও তাঁর কাছে মানব-বিবিক্ত সৌন্দর্যের আধার হিসেবে মূল্যহীন। তাই পটভূমির প্রয়োজনই তারা সাধন করেছে। তিলোত্তমায় মধুসূদনের কবিপ্রতিভার এই পরিণত স্বরূপ প্রকাশ পায় নি। এবং এই কারণেই তিলোত্তমার সৌন্দর্যচেতনার মধ্যেই একটা মূল দ্বিধা থেকে গেছে। বিবিক্ত, প্রয়োজনাতীত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের কেন্দ্র-লক্ষ্মী তিলোত্তমার সৃষ্টির মূলেই রয়েছে এক বিরাট প্রয়োজন। দেবতাদের স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য সুন্দ-উপসুন্দের মৃত্যু ঘটাতেই বিশ্বকর্মা তাকে নির্মাণ করেন। মধুসূদনের নিজের অন্তরে দ্বিধা না থাকলে এত বড় অসঙ্গতি তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি সরস্বতীর সাধনায় লক্ষ্মীকে ব্যর্থ নমস্কার ফিরিয়ে দিতে পারেন নি। এই লক্ষ্মী কেবল অর্থ-সম্পদের নন— প্রয়োজনের এই বাস্তব পৃথিবীর অধীশ্বরী। মধুসূদন লক্ষ্মী-সরস্বতীকে অদ্বয় সম্বন্ধে বদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কাজেই তাঁর সৌন্দর্যের কেন্দ্রীয় দেবী তিলোত্তমা বিশুদ্ধি পরিহার করে দানবদলনের প্রয়োজনকে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু এই বিপরীতের ঐক্য এখনও ঘটে নি। কারণ সে ঐক্য মিশ্রণে আসে না, মিলনে জন্ম নেয়, আর তার জন্য মেঘনাদবধ পর্যন্ত মধুসূদনের কাব্য-পাঠকদের অপেক্ষা করতে হয়েছে।

॥ চার ॥

ব্যাসদেবের মূল মহাভারত থেকে এ কাহিনীর উপকরণ সঙ্কলন করেছেন মধুসূদন। পূর্বসূরিদের কাছ-থেকে-পাওয়া এই উপকরণগুলিকে কবি কিভাবে ব্যবহার করেছেন তার বিশ্লেষণে কবিদৃষ্টির কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা যেতে পারে। উৎসকে তিনি কতটা অনুসরণ করেছেন এবং কতটাই বা করেছেন অতিক্রম তার তুলনামূলক বিচারে কবিদৃষ্টির মৌলিকতার কিছু পরিমাপ করা যাবে।

মহাভারতের আদিপর্বের নবাধিকদ্বিশততম, দশাধিকদ্বিশততম, একাদশাধিক-দ্বিশততম এবং দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ে সুন্দ-উপসুন্দ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

"পূর্বকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে মহাবলপরাক্রান্ত তেজস্বী এক দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। ঐ দৈত্য যাবতীয় দানবগণের অধীশ্বর ছিল। ভীমপরাক্রম ক্রূরমনাঃ সুন্দ ও উপসুন্দ তাহারই পুত্র। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত একনিশ্চয় ও এককার্যনিরত ভ্রাতৃদ্বয় সর্বদা সমদুঃখসুখ হইয়া কালযাপন করিত।...কিয়দ্দিন পরে সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্য-বিজয়সঙ্কল্পে দীক্ষিত হইয়া বিন্ধ্যপর্বতে গমনপূর্বক অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল।...তদনন্তর সর্বভূতহিতকারী ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং সেই মহাসুরদ্বয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন।...তখন সুন্দ ও উপসুন্দ কহিল, 'হে পিতামহ! যদি আপনি নিতান্তই অমর না করেন, তবে এই বর প্রদান করুন যেন, ত্রৈলোক্যস্থ যাবতীয় স্থাবর বা জঙ্গম পদার্থ হইতে আমাদের কোন ভয় না থাকে; কেবল আমরা পরস্পরকে সংহার করিতে পারি।' ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে দানবেন্দ্রদ্বয়! আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলাম,......' তদনন্তর সেই যুদ্ধদুর্মদ কামচারী দানবদ্বয় অন্তরীক্ষে গমন করিয়া দেবগণের ভবনে প্রবেশ করিল।...দৈত্যসৈন্যগণের উপদ্রবে আশ্রমসকল ভগ্ন এবং কলস স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রীসকল চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইল। ফলতঃ তৎকালে সমুদয় জগৎ কালগ্রস্তের ন্যায় শূন্যপ্রায় বোধ হইতে লাগিল।...চতুর্দিকে কেবল হাহাকার শব্দ, সকলেই ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর। ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা এবং কৃষি, গোরক্ষাকার্য সমুদয় নিবৃত্ত হইল; দেবকার্য, পিতৃকার্য ও পুণ্যোদ্বাহ প্রভৃতি শুভকর্মসকল বিলুপ্তপ্রায় এবং নগর ও আশ্রম সমুদয় উৎসন্ন হইয়া গেল।...... তখন দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণও ঐ দানবদ্বয়ের দৌরাত্ম্য-বৃত্তান্ত পিতামহকে

জানাইলেন। ভগবান কমলাসন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর কর্তব্যবিষয়ে মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া সুন্দ ও উপসুন্দকে সংহার করিবার বাসনায় বিশ্বকর্মাকে …এক সর্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী নির্মাণ করিতে আদেশ করিলেন।…সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাহার নাম তিলোত্তমা রাখিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, 'তিলোত্তমে! তুমি দানবরাজ সুন্দ ও উপসুন্দের সমীপে গমনপূর্বক স্বীয় রূপসম্পত্তি দ্বারা তাহাদিগকে এইরূপে প্রলোভিত কর যেন, তাহারা তোমার আলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করে।'… চারুহাসিনী তিলোত্তমা তাহাদের নয়নগোচর হইবামাত্র উভয়েই এককালে কন্দর্পশরে জর্জরিত হইল।…তাহারা কামে মোহিত হইয়া চিরপরিচিত সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দে এককালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক ক্রোধভরে উভয়ে ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিল…পরস্পর প্রচণ্ড আঘাত করিতে করিতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া গগনচ্যুত সূর্যদ্বয়ের ন্যায় দুইজনেই ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।"

—[কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারতের গদ্যানুবাদ]

প্রথমেই চোখে পড়ে, আলোচ্য কাব্য উৎসকে সর্বত্র অনুসরণ না করলেও মূল দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে নি। মেঘনাদবধে রামায়ণের মূল কাহিনীর সঙ্গেই মধুসূদনের চিত্তের যে বিরুদ্ধতা তিলোত্তমায় তা নেই। দ্বিতীয়ত, কবি উৎসের প্রতি তীব্র বিরূপতা না দেখালেও কাহিনীর ক্ষীণসূত্র হিসেবেই মাত্র একে ব্যবহার করেছেন। মাত্র দু-একটি স্থানেই কবির বর্ণনা একান্ত মূলানুগ। তিলোত্তমাকে দর্শন করে কামোন্মত্ত সুন্দ-উপসুন্দের যে চিত্র কবি এঁকেছেন—

কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে ;—"কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর ?" সুন্দ উত্তরিলা—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি। আমার ভার্যা গুরুজন তব,
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।"
যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে
আরো জ্বলে, উপসুন্দ,—হায় মন্দমতি—
মহাকোপে কহিল ;—"রে অধর্ম-আচারি,

কুলাঙ্গার ! ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে ?"

তা মহাভারতের বর্ণনার নৈকট্য পেয়েছে।—

"সুন্দ কহিল, 'এ আমার ভার্যা, সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার গুরু হইল।' উপসুন্দ কহিল, 'এ আমার ভার্যা, সুতরাং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার বধূ হইল'।"

আবার মধুসূদনের কাব্যে সুন্দ-উপসুন্দের মৃত্যুর পরে তিলোত্তমার স্থান নির্দেশ করে ইন্দ্রের যে উক্তি—

যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্যলোকে, সুখে পশি আলোক-সাগরে
কর বাস।

তা মহাভারতের ব্রহ্মার আদেশেরই অনুরূপ,—

"হে ভাবিনি ! সূর্য যে পথে গতায়াত করেন তুমি সেই পথে গমনাগমন করিবে, তেজঃপ্রভাবে কেহই তোমাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে না।"

সুন্দ-উপসুন্দের তপস্যা ও বরলাভের ঘটনাও অনেকখানি মূলানুগ। বর্ণনায় এরূপ সামীপ্যের উদাহরণ অধিক নেই। বিচিত্র বর্ণনা এবং চিত্রসজ্জা এই ক্ষুদ্র কাহিনীর সূত্রে বিদ্ধ হয়ে এ কাব্যের দেহনির্মাণ করেছে। তৃতীয়ত, ঘটনাগত যে বিস্তৃতি মহাভারতের, আলোচ্য কাব্যে তা অনেকটা সংক্ষিপ্ত হয়েছে। সমস্ত কাহিনীটি সুন্দ-উপসুন্দের দিক থেকে উপস্থাপিত করার ফলে মহাভারতে এর যে বিস্তৃতি, দেবতাদের দিক থেকে উপস্থাপিত করায় এখানে তার অনেক ঘটনা পরিত্যক্ত হয়েছে বা প্রত্যক্ষের অন্তরালে পরোক্ষের রাজ্যে চলে গেছে।

কিন্তু ঘটনাগত সর্বপ্রধান গুরুত্ব এসেছে দেবতাদের ভূমিকায়। ইন্দ্রকে কাহিনীর নায়কত্বে বরণ করা হয়েছে। দেবতাদের স্বর্গচ্যুতি সংঘাতের মূল কারণ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। ব্রহ্মা সক্রিয়তা সংহরণ করে যথাসম্ভব নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠেছেন। এ সমস্তই করা হয়েছে ঘটনা ও চরিত্রকে আস্বাদযোগ্য বিস্তৃতিদানের জন্য। মহাভারতে কিন্তু দানবগণ কর্তৃক স্বর্গরাজ্য অধিকৃত হওয়ার ব্যাপারটিকে মাত্র কয়েকটি পংক্তির উল্লেখে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সুন্দ-উপসুন্দকে দেব-দ্বিজ-মানব-হিংসক যজ্ঞধ্বংসকারী, সামাজিক নীতি-ন্যায়ের বিঘ্নকারী, সভ্যতা ও সমৃদ্ধির শত্রু হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

"তাহারা কখন মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের রূপ ধারণপূর্বক দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত ঋষিগণকে বধ করিত, কখন সিংহরূপী, কখন ব্যাঘ্ররূপী হইয়া তপোধন-গণের প্রাণসংহার করিত, সেই দুর্দান্ত দানবদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে বহুসংখ্যক নৃপতিগণ ও ব্রাহ্মণগণ প্রাণত্যাগ করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন একেবারে রহিত হইল; উৎসবের সম্পর্ক রহিল না।...চতুর্দিকে কেবল অস্থি ও কঙ্কাল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে ভূমণ্ডল একেবারে দুষ্প্রেক্ষ হইয়া উঠিল। চন্দ্রসূর্য প্রভৃতি গ্রহগণ, তারাসমুদয়, নক্ষত্রমণ্ডল ও অন্যান্য দেবগণ সেই ক্রূরকর্মা দানবদ্বয়ের নৃশংসাচরণ-দর্শনে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।"

মধুসূদন কিন্তু দানবদের এই রূপের সঙ্গে আমাদের আদৌ পরিচিত করান নি। দানবদের প্রতি যে সব কটুবাক্য দেবতারা প্রয়োগ করেছেন তা আপনাদের পরাজয়ের অপমানে। সুন্দ-উপসুন্দ কর্তৃক পর্যুদস্ত দেবতাদের গ্লানির বর্ণনা বার বার এসেছে। দেবতাদের মুখে সে বর্ণনায় উল্লাস না থাকলেও বিস্তৃতি আছে, দানবদের কণ্ঠে তাই-ই বিজয়োন্মত্ততায় তরঙ্গোদ্বেল হয়ে উঠেছে। এখনও রাবণের মূর্তি তাঁর কল্পনায় ধরা পড়ে নি, কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে দেববিদ্রোহী কোন মনোবৃত্তির বীজও কি জন্মায় নি? দানব মানেই নৃশংসতার প্রতিমূর্তি, পৌরাণিক এ ধারণায় যে তিনি প্রথমাবধিই বিশ্বাস করতে পারেন নি, এখানে তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলছে। তিলোত্তমাসম্ভব থেকেই মধুসূদনের স্থির সিদ্ধান্ত "শয়তানকে যতটা কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করা হয়, ততটা কদর্য সে নয়।" আর দেবতারাই যে বারংবার পৃথিবীর নির্যাতিত অত্যাচারিত মানুষের সাহায্যে করুণার্দ্র এ ধারণাও পরিহার্য।

এ কাব্যে কবি দানবের স্বর্গ-অধিকার ও রাজ্যহীন দেবতাদের স্বর্গচ্যুত গ্লানিময় অবস্থার বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এর মধ্যে কবিব্যক্তিত্বের কি সম্ভাব্য প্রতিফলন আছে তার আলোচনা আগেই করেছি। এর মধ্যে কবির স্বাদেশিক চিন্তারও কিছু ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়। লক্ষণীয়, মেঘনাদবধেও লঙ্কাপুরী শত্রুদ্বারা আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ। কৃষ্ণকুমারী নাটকেও উদয়পুরের আসন্ন ধ্বংসের ছায়াতলে শ্বাসরোধকর ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছে। আর যে 'ইলিয়ড'-এ অবরুদ্ধ নগরীর বহিঃপ্রাকারই সমগ্র কাহিনীর লীলাভূমি তাই-ই মধুসূদনের প্রিয়তম কাব্য। মধুসূদন যে সচেতনভাবে ঘটনাবিন্যাসে এ-জাতীয় পরিস্থিতির প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন তাতে সন্দেহ নেই।

আর এর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবির সহানুভূতি আক্রান্তদের প্রতি, আক্রমণকারীদের পেছনে নয়। লক্ষণীয়, ইলিয়াডের অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি তার নাম দেন 'হেক্টরবধ'। রাজনীতির দিক থেকে না হলেও জাতির পরাধীনতার বেদনা যে চতুর্দশপদীর তথাকথিত স্বাদেশিক চিন্তায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই তাঁর গভীর কাব্যানুভূতিকে স্পর্শ করেছিল একথা নিশ্চিত। কিন্তু আলোচ্য কাব্যে দেবতারাই আক্রান্ত ও রাজ্যচ্যুত। তাই তাঁর সহানুভূতির স্বাভাবিক প্রবাহ এমন একটা খাতে বইল যার প্রতি তাঁর বিরুদ্ধতা সমগ্র সত্তার মধ্যে ঘনীভূত। দেব ও দানবদের মধ্যে কবির সহানুভূতি এইভাবেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে তিলোত্তমায়। এখনও কবিমন অভিপ্রায়ের কেন্দ্র খুঁজে পায় নি।

॥ পাঁচ ॥

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে মানবরসের অভাব আছে, এমন সমালোচনা প্রায়ই শোনা যায়। মধুসূদন নিজেও এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন,

> "The want of 'human interest' will no doubt strike you at once, but you must remember that it is story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women."

মানব-মানবীর চরিত্র না থাকলেই যে মানবরসের অভাব ঘটে তা মনে করা যায় না। কারণ পৌরাণিক উপাখ্যানে দেবতা, দানব ও মানবের মধ্যে পার্থক্য এমন কিছু গভীর ছিল না। সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যে যে বৃত্তিগুলি লক্ষণীয় তা মানবিক বৃত্তি। তাদের অপরাজেয় বিশ্ববিজয়ী হবার কামনা, সাধনা ও সিদ্ধি, কামাতুরতা এবং কামান্ধতাজাত আত্মধ্বংস সাধারণ মানবধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। দেবতাদের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মার চরিত্রে এক সুদূর নির্লিপ্ততা ও দেবোচিত সমুন্নত মহিমা আছে। কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণের পরাজয়ের অপমান এবং অনেক পরিমাণে প্রত্যক্ষ বীরত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে শাঠ্যের আশ্রয়ে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার সম্পূর্ণ মানবিক। সামান্য কিছু কিছু অলৌকিকতা এদের চরিত্রে থাকলেও তাতে মানবরসে ঘাটতি পড়ে নি। কারণ রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত মানবকুলও শক্তির প্রবলতায় এবং নানা অলৌকিক গুণাবলির সংযোগে দেব বা দানবকল্প। মহাভারতের কোন পাঠক বীরর্ষভ অর্জুন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে

মানবরসের আনুপাতিক প্রশ্নে পার্থক্য দেখতে পাবেন না। তা ছাড়া মেঘনাদবধ রচনাকালে মধুসূদন রাবণ নামক রাক্ষসকে নায়ক করে তার পরিবারধর্ম ও ট্রাজিক জীবনজিজ্ঞাসাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে মানবরসের এক অবারিত উৎসের সন্ধান দিয়েছেন। রাক্ষস বলে কোথাও বাধা নেই। কবির বোধে এখনও মানবরস-সম্পর্কিত ধারণার স্পষ্টতা আসে নি উদ্ধৃত মন্তব্যে তারই প্রমাণ।

তবে মানবরসের অপ্রাচুর্যের অভিযোগটি মূলত সঠিক। মধুসূদনের মানববোধ জীবনঘটনার নৈমিত্তিকের বর্ণনায় তৃপ্ত নয়। সারা মধ্যযুগ ধরে বাংলা সাহিত্যে মানবতা দেবনির্ভর ছিল। মধুসূদন মানবতার মুক্তির প্রথম বাণীবাহক। কাজেই তাঁর মানবরস দেবদ্রোহী। আটশত বৎসর ধরে বাংলা সাহিত্যে দেবতাদের যে একাধিপত্য চলেছে, তাকে বিধ্বস্ত করে মানবস্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে না পারলে মানবরসের যথার্থ উৎসারণ সম্ভব নয়। মধুসূদনের মানববোধের দ্বিতীয় কথা হল চিত্তের মুক্তি বা ব্যক্তিহৃদয়ের স্বাতন্ত্র্য। বাইরের কোন আদর্শ—তা ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা নৈতিক যাই হোক না কেন—মানুষের জীবন বা মনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে না। কবির মানবতা এই মূল ব্যক্তিবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

তিলোত্তমাসম্ভবে এই বিদ্রোহ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দুই-ই অনুপস্থিত। কেবল তাই নয়, এ কাব্যে চরিত্রচিত্রণে নিপুণতা তো নেই-ই, সাফল্যেরও অভাব আছে।

ব্রহ্মার চরিত্রে একটা নিষ্ক্রিয় নিস্পৃহতার ভাব আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ অসুরদ্বয়কে উচ্চ বরদানে তিনি নিয়মনিষ্ঠ। ভাল মন্দ সৎ অসতের বিচার না করেই তপস্যাজাত অনিবার্য ফল হিসেবে এ ব্রহ্মার অবশ্য-দেয় সামগ্রী মাত্র। অমরত্ব দান সম্ভব নয়, কিন্তু তাদের অন্য বর দিতে কার্পণ্য তিনি করেন নি। দেবতার দল যখন স্বর্গ থেকে সুন্দ-উপসুন্দকে বিতাড়িত করতে ব্রহ্মার সাহায্য যাচ্ঞা করেছে তিনি তাদের একটি সংবাদ মাত্র পরিবেষণ করেছেন—

ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে।

দানবদের প্রতি কিছুমাত্র কটূক্তি তিনি করেন নি। তাদের উৎসাদিত করবার কোন পন্থা তিনি নির্দেশ করেন নি। যে বরে তারা দুর্বার তার মর্মার্থ মাত্র

জ্ঞাপন করেছেন—কোথায় এই দুর্দমতার সীমা। কিন্তু কি উপায়ে এই ভ্রাতৃভেদ সম্পাদন করা যায় সে সম্পর্কে তিনি নীরব। দানবদলনে বা তিলোত্তমা-নির্মাণে তাঁর ভূমিকা নেই। দেব ও দানবদের প্রতি সমান অপক্ষপাত তাঁর চরিত্রকে সর্বলোক-পিতামহের যোগ্য মাহাত্ম্য দিয়েছে। অতি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় এ চরিত্রের সাফল্য তাই অনেকটা স্বীকার্য।

দেবতাদের অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। তাদের ভূমিকা একান্ত অপরিসর। তারা প্রায় কেউই পূর্ণাবয়ব চরিত্র হয়ে উঠতে পারে নি। পবন, শমন, কার্তিক, কুবের প্রভৃতি দেবতাদের চরিত্রচিত্রণে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রতিবিম্বিত বলে কোন সমালোচক মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত মতামতের পার্থক্যের সূত্র ধরে চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করা যায় না। সুন্দ-উপসুন্দের হাত থেকে স্বর্গ-উদ্ধারে অসমর্থ হয়ে পবন এবং যম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে। তপ-তুষ্ট বিধাতার অতিমাত্রায় বরদানপ্রবণতায় ক্ষুব্ধ যম বলে—

অবএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—অতল জল তলে।

পবনের অভিমতও অনুরূপ—

দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর? দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্মমণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,
বাহুবলে—ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।

এরা উভয়েই অভিমানক্ষুব্ধ, আবেগকম্পিত। কিন্তু যমের নির্দয়তা পবনে নেই, সৃষ্টি তার কাছে বিপুল ও সুন্দর। তবুও বেদনায় অপমানে সে তাকে লণ্ডভণ্ড করতে উদ্যত।

কার্তিক, কুবের, বরুণ—এরা বাধা দেয়। কার্তিক বিধাতার বিধানে বিশ্বাসী। তার মতে—

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে;
অনাদি; অনন্ত যিনি, বোধগম্য, রীতি
তাঁর যে, সেই সুরীতি। কিসের কারণে,

কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে ? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে ;
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজাসহ ?

অম্বুরাশিপতির শরীরে ক্রোধ বাড়বাগ্নিসদৃশ জ্বললেও বিধাতার চরম শক্তির নিকট আপনাদের সামান্যতা সম্বন্ধে সে সচেতন—

এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন
তিনি বিনা ?

কুবের শমন-পবনের মতের বিরুদ্ধে, পৃথিবী ধ্বংস করিতে সে রাজি নয় এর অপূর্ব সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের জন্য।

মতামতের এই সব পার্থক্য এদের চরিত্রের সামান্য সংবাদ দেয়। যম বা বায়ুদেবের বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও হৃদয়ানুভববর্জিত প্রচণ্ড শক্তিমত্ততা এবং কুবের ও কার্তিকের বিপরীত মনোবৃত্তির পরিচয় এর মধ্য থেকে সংগ্রহ করা চলে। তার বেশি নয়। এদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি এখানে।

কিন্তু বিশ্বকর্মার স্বল্পপরিসর ভূমিকাটি উজ্জ্বল এবং তাৎপর্যবহ। হোমরের হেফাএস্টাস-এর (H?phaestus) প্রভাব এই চরিত্রের উপর পড়লেও এর মৌলিকতাও দৃষ্টি এড়াবার নয়। পবনের সঙ্গে সাক্ষাৎমাত্রই সে ধারণা করে নিল—

কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে ? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে তোমা
পাতি পীরিতির ফাঁদ ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি অলঙ্কার,—অতুল জগতে !
এই দেখ সুমেখলা, দেখি ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার !
এই দেখ মুক্তাহার, হেরিলে ইহারে,
উরজ-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ
মজে গো আপনি।—ইত্যাদি।

এর মধ্যে তার ইন্দ্রিয়ালু চিত্তের পরিচয় একাগ্র হয়ে উঠেছে। মনোভঙ্গির বহুল বিচিত্রমুখী বর্ণনার মধ্যে ধৃত হলে এ সম্ভাষণকে কেবলই সুহৃদ্‌মিলনের কৌতুকবচন বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু বর্ণনার আলোকসম্পাত অন্য প্রসঙ্গ

পরিহার করে এই একটিমাত্র অংশকে বেছে নেওয়ায় বিশ্বকর্মার অতিমাত্রায় কামচেতনাই কবির অভিপ্রেত বক্তব্য বলে মনে হয়। আর তিলোত্তমার কামোদ্রেককারী মূর্তির নির্মাতা হিসেবে বিশ্বকর্মার এই মানসভঙ্গিই সবচেয়ে সঙ্গত।

দেবচরিত্র-সৃষ্টিতে পরবর্তীকালে কবি গ্রীক-ভাবনার অনুসরণে যে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন, এখনও কবির রচনায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। হোমরের ভাবনা-কল্পনার প্রভাব কোথাও কোথাও সামান্যত পড়লেও, ব্রহ্মাকে জুপিটরের সঙ্গে উপমিত না করে ভারতীয় দেবকল্পনার প্রভাবজাত বলেই মেনে নিতে ইচ্ছা হয়। মেঘনাদবধের দেবতাদের ন্যায় এরা কিন্তু সম্পূর্ণত কবির সহানুভূতি হারায় নি। এদেব রাজ্যলাভের ষড়যন্ত্র তাই মেঘনাদবধের দেবতাদের কর্মতৎপরতার ন্যায় নয়। এরা আমাদের মনে ঘৃণা জাগায় না।

সুন্দ-উপসুন্দ এ কাব্যের অপ্রধান চরিত্র। একবারের জন্য মাত্র সক্রিয় ঘটনারাজ্যে তাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ঘটেছে, যদিও কাব্যারম্ভ থেকেই দেবতাদের স্বর্গচ্যুতিতে এবং বারংবার ভয়চকিত উল্লেখে তাদের বীরমূর্তির একটা প্রবল রূপ পাঠকচেতনায় স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত হয়ে যায়।

সুন্দ-উপসুন্দের উত্তরপুরুষ রাবণ যেখানে কাব্যের নায়ক এবং মধুসূদনের আত্মা-স্বরূপ, সুন্দ-উপসুন্দ সেখানে প্রতিনায়ক মাত্র। এর পেছনে নানা কারণ আছে। তার উল্লেখ অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে দু[illegible]ই করেছি। সম্ভবত আর-একটি কারণ হল এদের সুখস্বর্গের সর্বসার্থকতায় অক[illegible]প্র সংস্থিতি। মধুসূদনের রাবণ ভগ্ন লঙ্কার অধীশ্বর। কিন্তু সুন্দ-উপসুন্দ—

আনন্দ-সাগরে মগ্ন দিতিসুত আজি
মহাবলী। দৈববলে দলি দেব-দলে,
বিমুখি অমরনাথে সম্মুখ সমরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ,
অশ্ব; শত শত নারী—বি[illegible] বিনোদিনী
সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুম্ভ-নন্দন
জয়ী।

মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য বস্তুময় পৃথিবীর সর্বসুখ-কামনায়, সে কামস্বর্গে উত্তরণের অসামর্থ্যে, স্বপ্নকল্পনায় তার বহুবর্ণবিচ্ছুরিত চিত্রাঙ্কনে এবং তীব্র ট্র্যাজিক

হাহাকারে। সুন্দ-উপসুন্দে কামনার সিদ্ধি, ব্যর্থতার হাহাকার ও আত্মহনন নয়। মধুসূদন তাই সুন্দ-উপসুন্দে আপন চিত্তধর্মের উপযুক্ত আধার পান নি। বিশেষ করে স্নেহপ্রীতি প্রভৃতি একান্ত করুণকোমল পরিবারকেন্দ্রিক মানব-ধর্মের অসদ্ভাব এই দুটি চরিত্রকে কবির হৃদয়সামীপ্যে সম্পূর্ণ স্থাপিত করতে পারে নি।

তবে "এক প্রাণ দুই ভাই—বাগর্থ যেমতি" সুন্দ-উপসুন্দের কামার্থ দ্বন্দ্ব এবং মৃত্যুবরণ মধুসূদনের কবিসত্তার দ্বিধাবিদীর্ণতার দ্যোতনা আনে কি-না এ প্রশ্ন আলোচ্য। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য :

"মাইকেলের বৈশিষ্ট্য তাঁহার ঈষন্মুক্ত অধরোষ্ঠে; সে যেন সর্বদা নীরব ভাষায় নিজের মনের কথা বলিয়া চলিয়াছে।...সে হাহাকার সুন্দ-উপসুন্দের তিলোত্তমালাভের উগ্র বাসনায়; তিলোত্তমা নবজাত কাব্যলক্ষ্মী, যাঁহার অন্য নাম তিনি দিয়াছিলেন মধুচক্র, সেই কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা করিতে গিয়াই তাঁহার সর্বনাশ; কবি-সত্তাই দ্বিধাবিভক্ত সুন্দ-উপসুন্দ।"—

—[মাইকেল মধুসূদন]

কিন্তু কবিচিত্তের যে দ্বৈধের কথা আমি আগে বারবার নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি এখানে তার কিঞ্চিৎ প্রতিফলন থাকলেও তা বর্ণহীন ও অস্পষ্ট। কবি মেঘনাদবধ রচনাকালে রাজনারায়ণ বাবুকে এক চিঠিতে সুন্দ-উপসুন্দের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কথা জানান,

"I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader.…"

কিন্তু তিলোত্তমা রচনাকালে কবির অন্তর এ-বিষয়ে কতটা একাগ্র এবং দ্বিধাহীন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সম্ভবত এ নেহাৎই উত্তরভাবনা।

ইন্দ্রই এ কাব্যের প্রধান চরিত্র। কিন্তু চরিত্রহিসেবে সে-ই সবচেয়ে বেশি বিবর্ণ। তার মধ্যে বীরত্ব, স্বদেশচিন্তা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, কিন্তু উপকরণের অসদ্ভাব না থাকলেও ঐক্যবিধায়িনী প্রাণশক্তি এখানে সঞ্চারিত হয় নি।

এ কাব্যে কোনো কোনো ক্ষুদ্র চরিত্রচিত্রণে যে সীমাবদ্ধ সার্থকতা দেখেছি এ চরিত্রে তার অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ হল কাব্যের আদ্যন্ত চরিত্রটির প্রসার। এবং এ কাব্যে দীর্ঘকালব্যাপী কোন চরিত্র বা কাহিনী সৃষ্টির ধৈর্য মধুসূদন

দেখাতে পারেন নি। বিচিত্র বস্তুপুঞ্জের খণ্ড-সৌন্দর্যের বর্ণনায় এবং নবাবিষ্কৃত ছন্দের সঙ্গীতে মুগ্ধ কবিচিত্ত প্লটগঠন ও চরিত্রনির্মাণে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত শিল্পনৈপুণ্যের যে অতন্দ্র ভারসাম্য অপরিহার্য তা লাভ করতে পারে নি। ক্ষুদ্র চরিত্র স্বল্প পরিসরেই সমাপ্ত। নির্মাণকৌশলের এ ধৈর্য সেখানে অপ্রয়োজনীয়। এ কারণেই ইন্দ্রের চরিত্র কোন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য পায় নি। ইন্দ্রের দুশ্চিন্তা বা ব্যাকুলতা, স্বর্গচ্যুতির বেদনা ও স্বর্গপ্রাপ্তির উচ্ছ্বাস কেমন ছায়াময় বলে মনে হয়েছে। আমাদের চিত্তলোকে তা সৃষ্টি করতে পারে নি কোন আলোড়নের।

দৈব বা নিয়তির একটি অস্পষ্ট বোধ ইন্দ্রচরিত্রকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে এ কাব্যে। দেবগণের প্রতি ইন্দ্র বলেছে—

দৈববল বিনা, হায়, কেবা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
অজেয় অমর বীর কুলশ্রেষ্ঠ ?

কিন্তু এখনও এ বোধ জীবনজিজ্ঞাসার কোন গভীরতর প্রত্যয়ে যুক্ত হয় নি। মধুসূদনের নিয়তিচেতনা ট্রাজিক হাহাকারের সঙ্গে যুক্ত। এ কাব্যে ইন্দ্রের জীবনে যে পরাজয় ঘটেছে তা সাময়িক, সবব্যাপক অবক্ষয় নয়। এ দৈব তাই জীবনের উপরিতলকে স্পর্শ করেছে মাত্র, গভীরকে আলোড়িত করে নি॥

তিলোত্তমাকে সে যুগের কোনো কোনো সাহিত্যরসিক মহাকাব্যের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। যেমন মধুসূদনের কাছে লেখা এক পত্রে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেছেন—

> "I feel that my descendants (should I have any) will then be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the *First Blank Vrese Epic* in the language, is in their possession,…"

য়ুরোপীয় প্রথায় রচিত মহাকাব্য সম্বন্ধে কোনো প্রকৃত সংস্কার না থাকাই এ জাতীয় ধারণার কারণ বলে মনে হয়। মধুসূদন নিজে একবারও এ কাব্যকে অত সমুন্নত আখ্যায় ভূষিত করতে চান নি। একে অখ্যায়িকা-কাব্য হিসেবে গ্রহণ ও বিচার করাই সঙ্গত।

আখ্যায়িকা কাব্যের কোনো সুনির্দিষ্ট গঠনকৌশলের ধারণা প্রচলিত নেই। তবে এইটুকু মাত্র বলা চলে যে কাব্যহিসেবে এতে বর্ণনার প্রাচুর্য থাকবে ঠিকই, কিন্তু খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্যের মত এ বর্ণনার নিরঙ্কুশ হবার সুযোগ নেই। কারণ কাহিনীর মূল্য এখানে একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। ফলে এ-জাতীয় কাব্যের গঠনে কাহিনী ও বর্ণনার মধ্যে একটি আনুপাতিক সম্পর্ক রক্ষার প্রশ্ন উঠছে। এ অনুপাত গাণিতিক যে নয় তা বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। এবং এ অনুপাতের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সারা মধ্যযুগ ধরে আমাদের মঙ্গলসাহিত্যে ও অনুবাদে আখ্যানকাব্য-রচনার অনুশীলন চলেছে। বর্ণনা সেখানে প্রাধান্য পায় নি। ঘটনার বিবরণেই কবিদের চেষ্টার অধিকাংশ নিয়োজিত হয়েছে। এমন কি এ যুগে লেখা রঙ্গলালের পদ্মিনী কাব্যও এ বিষয়ে কোনো অভিনবত্ব স্থষ্টির করতে পারে না।

তিলোত্তমাসম্ভব রচনাকালে কবি ছন্দের সচেতন উল্লাসে মুগ্ধ। লক্ষণীয়, তাঁর যে সমস্ত পত্রে তিলোত্তমার উল্লেখ বা আলোচনা আছে সেখানে কবি প্রধানত ছন্দের প্রসঙ্গই তুলেছেন।[৬] প্রচলিত কাব্যধারার সঙ্গে এর যতিপাতের পার্থক্য এবং বোধগম্যতার দুঃসাধ্যতার কথা বলেছেন। কিন্তু এর কাব্যদেহ, চরিত্রসৃষ্টি, জীবনজিজ্ঞাসা সম্বন্ধে প্রায় কোনো মন্তব্যই করা হয় নি। সমকালে অন্য সমালোচকেরাও তাই করেছেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তিলোত্তমার যে সমালোচনা করেছিলেন তাতে সমাপ্তির অনুচ্ছেদে মাত্র কবিত্ব ও ঘটনাবিন্যাসের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলির বিস্তৃত আলোচনায় কেবল ছন্দোভঙ্গি, তার অভিনবত্ব ও শক্তির কথাই আলোচিত।

"ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অন্ত্যযমকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বৰ্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন।…"—[বিবিধার্থ সংগ্রহ]

'সোমপ্রকাশ'-এ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও ছন্দের সমালোচনার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দ্বারকানাথ লিখলেন—

"বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহা উপযোগী নহে।"……—[সোমপ্রকাশ]

অপর পক্ষে মেঘনাদবধ প্রসঙ্গে লিখিত কবির নিজের পত্রে এবং অন্যের আলোচনায় এ সমস্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ উঠেছে বারবার। এ কাব্যের কাহিনী-গঠন তাই কবির সচেতন মনের কাছে খুব গুরুত্ব পায় নি। ফলে তিলোত্তমার কাহিনী এবং বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সমর্থ হন নি কবি। কাহিনীর সূত্র একান্ত ক্ষীণ। বস্তুবর্ণনাই যেন কবির লক্ষ্য—আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে ছন্দের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে খণ্ডবস্তুর দর্শন ও উপভোগ। এ তথ্য উল্লেখযোগ্য যে কবি কাব্যটিকে তিন সর্গেই শেষ করতে চেয়েছিলেন।

কাব্যের চারটি সর্গে বিস্তৃত ঘটনা কয়েক পংক্তিতে বর্ণনা করা চলে। প্রথম সর্গে রাজ্যচ্যুত চিন্তাভারগ্রস্ত ইন্দ্রের নিদ্রাকর্ষণের নানা চেষ্টা, অবশেষে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার মিলন। দ্বিতীয় সর্গে ব্রহ্মলোকের বহির্ভাগে দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রের পুনর্মিলন এবং স্বর্গোদ্ধারের জন্য নানা পরামর্শ। তৃতীয় সর্গে ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রাদির সাক্ষাৎ ও সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যে শত্রুতা আনবার জন্য বিশ্বকর্মা কর্তৃক তিলোত্তমা-সৃষ্টি। চতুর্থ সর্গে তিলোত্তমার রূপদর্শনে সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্ব ও বিনাশ। কাহিনীটি একাগ্র, বাহুল্যবর্জিত, পার্শ্বকাহিনীর জটিলতায় বহুখণ্ড নয়। কাহিনীনির্মাণে যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টিপাতের অভাব সত্ত্বেও য়ুরোপীয় কাব্যপাঠের সংস্কার চেতনার গভীরতা থেকে এই জাতীয় সম্পূর্ণায়ত গল্পগঠনে কবিকে সাহায্য করেছে, কোনও শাখাপথে তাঁকে দিক্‌ভ্রষ্ট করে নি। কিন্তু ঘটনা (action), বর্ণনা (description) ও বিবৃতির (narration) মধ্যে ভারসাম্যই আখ্যানকাব্যের প্রাণ। এদেশে পরিচিত সংস্কৃত আখ্যানকাব্যে পূর্বোক্ত তিন উপাদানের সফল মিশ্রণ ঘটেছে। আবার বাংলা ভাষার মঙ্গলকাব্যে শুধুই দেখি ঘটনা-বিবৃতির প্রাধান্য। অন্য উপাদান প্রায় অনুপস্থিত। সেদিক দিয়ে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' কোনো উন্নততর শিল্পরীতি উপস্থিত করতে পারে নি। আধুনিককালের য়ুরোপীয় আখ্যানকবিতায় পূর্বোক্ত উপাদানগুলির ব্যবহার অনেক সুষম। এ কাব্যে প্রথম সর্গে ঘটনার অভাব সর্বাধিক। তার উপরে ইন্দ্রের নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা বা ইন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলন-কাহিনী কাব্য-প্রাণের সঙ্গে কি সমস্যার দিক থেকে কি তাৎপর্যের ইঙ্গিতে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত নয়। বর্ণনারই উদ্দেশ্যে এদের উপস্থাপনা। অবশ্য তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সর্গে ঘটনার কিছু আধিক্য ও গুরুত্ব আছে কিন্তু বর্ণনার অনুপাত যে অধিকতর তাতে সন্দেহ নেই। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের বৈশিষ্ট্য হল ঘটনার ক্ষীণসূত্রে

বর্ণনার উল্লাস। অবশ্য বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ঘটনা-বর্ণনার সামঞ্জস্য বুঝি সিদ্ধ।

আসলে চিত্ররচনার প্রাচুর্যে বর্ণনীয় বিষয় অনেক সময় আচ্ছন্ন। এবং ছন্দের প্রবাহ প্রবলভাবে অনুভব করায় চিত্রের উপরে চিত্র আপতিত এবং উপমার বা অলঙ্কারের অলঙ্করণে অস্পষ্টতা প্রকট। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। দেবশত্রু দুর্দান্ত দানবদল দৈববলে বলী হয়ে ঘোরতর রণে দেবতাদের পরাভূত করে স্বর্গপুরী মহাকলকোলাহলে পূর্ণ করেছে। একটি তুলনাত্মক চিত্র রচনা করে কবি এটি বোঝাতে চেয়েছেন—

দুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণ-কুসুম-লতা-মণ্ডিত-মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যাম অঙ্গ ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ।

দানবকোলাহল থেকে প্রলয়কালীন রুদ্রের নিশ্বাস, প্রবল প্লাবন, প্লাবনের জলে ছিঁড়েখুঁড়ে ভেসে যাওয়া ফুল লতা পাতার কথা এবং সেখান থেকে আরও দূরে ঋতুরাজ বসন্ত কর্তৃক নায়িকা ধরিত্রীকে সজ্জিত করার প্রসঙ্গে চলে গিয়েছেন কবি। মূল প্রসঙ্গ থেকে কবি বহুদূরে আমাদের নিয়ে গিয়েছেন। এর চিত্রসৌন্দর্য ও বর্ণনভঙ্গি উপভোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু আখ্যানের রসোপলব্ধিতে এই অতিপল্লবিত বিস্তার কিছু বাধার সৃষ্টি করে।

আবার অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতাদের পলায়নকে দাবানলদগ্ধ অরণ্যানী থেকে পশুকুলের পলায়নের সঙ্গে উপমিত করতে গিয়ে কবি বলছেন—

পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা,
সর্বভুক প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,

মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী,
মদকল নগদল, চঞ্চল সভয়ে,
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
আশুগতি ; মৃগাদন, শার্দ্দূল, বরাহ,
মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয় শরীরী,
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পালায় ভৈরব রবে ত্যজি বনরাজী,—
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ বেগে ধায় চারিদিকে—

দাবানলাক্রান্ত অরণ্যে কোলাহলমুখর পশুদের বিশৃঙ্খল পলায়নের একটা সামগ্রিক রূপ এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্‌ভাবে ভল্লুকের বিকটাকার, কুরঙ্গের রঙ্গরসভঙ্গ স্বল্পকথায় মূর্তিলাভ করেছে।

কখনও কবি শচীর আকাশপথে আগমনের বর্ণনা দিতে গিয়ে উপমার পরে উপমায় এক কল্পরাজ্য গড়ে তুলেছেন—

আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজ্জ্বলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গ
উঠিল অম্বরপথে ; কিম্বা ত্বিষাম্পতি
অরুণ-সারথিসহ স্বর্ণচক্র-রথে
উদয়-অচলে আসি দরশন দিলা।
শতেক যোজন বেড়ি আলোকমণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে,

চিত্রের গায়ে চিত্র জড়িয়ে বর্ণে রেখায় একাকার। মূল প্রসঙ্গ যে কোথায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, কবির সেদিকে নজর নেই।

এইরূপ অজস্র উদাহরণ এ কাব্যের যে-কোনো স্থান থেকে সংগ্রহ করা চলে।

মনে হয় বিশ্বে যত বর্ণনীয় সৌন্দর্য আছে তার উত্তমাংশ সঞ্চয় করতে চান কবি, চান উপভোগ করতে। নিসর্গবস্তু, অনৈসর্গিক কল্পনা বা মানব-দেহরূপ

ছাড়াও উপমা-অলঙ্কারের সূত্রে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কাহিনীর মহান বা কোমল সৌন্দর্য নানাভাবে ভাষারূপ পেয়েছে এ-কাব্যে।

আকৈশোর কবি হবার যে কামনা তাঁর হৃদয়ে সুপ্ত ছিল এখন তা ভাষাবদ্ধ হয়ে কাব্যরূপ পাবার সুযোগ লাভ করেছে। প্রথম ছবি আঁকতে শিখে শিশু যেমন আপন অভিজ্ঞতার যাবতীয় বস্তুকে রেখায় রেখায় ধরতে চায়, প্রথম কাব্যরচনার সুযোগেও বিশ্বসৌন্দর্যের সব কিছুরই অংশ সঞ্চয়ে শিশুসুলভ মত্ততা তিনি অনুভব করেছেন। সব মিলে এরা কিছু একটা না হয়ে উঠলেও কবির আপত্তি ছিল না, কিন্তু কবির অজ্ঞাতসারেই তাঁর প্রাণপুরুষ একে 'একটা কিছু' করে তুলেছেন—তা যতই অপূর্ণ, যতই অস্পষ্ট হোক না কেন॥

---

১ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বালকোচিত বিতর্কে একদিন মধুসূদন বলেছিলেন যে একটি সাহিত্যিক প্রতিভা একটি গাণিতিক প্রতিভার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। যদিও অঙ্কে কোনদিনই বিশেষ মনোযোগ ছিল না তাঁর, তবুও নিজের মতটি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় তিনি গোপনে অভ্যাস করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন রীজ সাহেবের ক্লাসে একটি দুরূহ সমস্যার সমাধান করে সোল্লাসে বললেন—"শেক্সপীয়র নিউটন হতে পারে, কিন্তু নিউটন কখনও শেক্সপীয়র হতে পারে না।" যে-কেউ বুঝতে পারে এ কথায় সত্য কিছু নেই, কিন্তু মধুসূদনের মন বুঝবার পক্ষে এ ঘটনা [illegible]তবহ।

২ আমার লেখা "নাট্যকার মধুসূদন" বই দ্রষ্টব্য।

৩ মধ্যযুগে— ......"The history of literature is in large part the history of the beneficence of individual princes and aristrocrats."—[Schucking: The Sociology of Literary Taste.]

আবার মধ্যযুগের অবসানে—"Historically regarded, the publisher begins to play a part at the stage at which the patron disappears, in the eighteenth century."—[Schucking: The Sociology of Literary Taste.]

মধুসূদনের সময়ে বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্রের বেশ খানিকটা প্রসার হয়েছে। কিন্তু "বাংলাদেশে প্রকাশকরা যখন যুগের তাগিদে আবির্ভূত হলেন, তখন তারা মধ্যযুগের পেট্রনের মতন পোষকতার ও দয়াদাক্ষিণ্যের মনোভাব নিয়ে এলেন, আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের 'এণ্টারপ্রেজার' বা উদ্‌যোগী ব্যবসায়ীরূপে এলেন না।"—[বিনয় ঘোষ: জনসভার সাহিত্য।] মধুসূদন আজীবন পেট্রন খুঁজেছেন। তার কারণ নতুন যুগকে বুঝতে না পারা নয়, দেশে উপযুক্ত প্রকাশকের অভাব।

৪ জন্ম মম দেবকুলে—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর মন্থনে।
ধর্মাধর্ম সকলি সমান মোর কাছে!
নরের যাহাতে ঘটে বিপরীত তাতে
হিত মোর পরদুখে সদা আমি সুখী।

৫ ব্যাসদেব-রচিত মহাভারতীয় কাহিনীই তিলোত্তমাসম্ভবের উৎস। তিলোত্তমার রূপ-নির্মিতির এই ভঙ্গি যে মধুসূদনের একান্ত নিজস্ব, মূল মহাভারত থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির সঙ্গে তুলনায় তা বোঝানো যেতে পারে। মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ে তিলোত্তমা সৃজনের নিম্নরূপ বর্ণনা আছে—

"ত্রিলোকমধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, যে কোন বস্তু অতীব রমণীয় বলিয়া খ্যাত, বিশ্ববিৎ বিশ্বকর্মা সেই সমস্ত বস্তু তথায় আনয়ন করিলেন। তিনি নির্মাণকালে সেই কামিনীর গাত্রে কোটি কোটি রত্ন সন্নিবেশিত করিলেন। বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত রত্ন-সংঘাত-খচিত সেই কামিনী ত্রিলোকস্থ সমস্ত মহিলাগণের অধিক্ষেপস্বরূপ হইল। তাঁহার গাত্রে এমন একটিও স্থান ছিল না যে দর্শকগণের দৃষ্টি যে স্থানে পতিত হইলে আসক্ত না হয়। ফলতঃ মূর্তিমতী লক্ষ্মীরূপা সেই কামিনী সর্বভূতের মনোনয়নহারিণী হইলেন। এই লোকললামভূতা ললনা রত্নসমূহের তিল তিল অংশ লইয়া নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার নাম তিলোত্তমা রাখিলেন।" [কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।]

এ বর্ণনায় সমুচ্চ গাম্ভীর্য থাকলেও ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর সৌন্দর্যের রূপনির্মিতি নেই। বহু উপমায় এবং সজ্জায় এ যুগের কবি কামলোকের যে একক নারীমূর্তি সৃষ্টি করিতে চেয়েছেন তার এমন সরল অলঙ্কারহীন বর্ণনা মহাকবিদের অতিসাহসেই মাত্র নিষ্পন্ন হতে পারে। কিন্তু দুটিমাত্র ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করে মহাভারতকার তিলোত্তমার কামনা-বাসনা-মথিত মূর্তির স্বরূপ প্রকাশ করতে চেয়েছেন—

"তিলোত্তমা অতি সাবধানতাপূর্বক ভগবান মহাদেব ও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিল। প্রদক্ষিণকালে সে মহাদেবের দক্ষিণপার্শ্বে গমন করিলে তদীয় অালোক-সামান্য লাবণ্য-দর্শনার্থ দক্ষিণদিকে তাঁহার এক মুখ নির্গত হইল এবং উত্তরদিকে গমন করিলে সে দিকেও আর একটি মুখ নির্গত হইল, ভগবান পুরন্দরেরও সর্বাঙ্গে অতি বিশাল সহস্র-লোচন আবির্ভূত হইল।" —[কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।]

৬ আমার লেখা 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী' বই দ্রষ্টব্য।

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

Mrs. Radha is not such a bad woman after all.—মধুসূদনের চিঠি।

॥ এক ॥

মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য কবির সমকালীন অপর তিনটি কাব্য থেকে বিষয় ও ভঙ্গিতে পৃথক। তিলোত্তমা মেঘনাদবধ কিংবা বীরাঙ্গনায় কবি প্রধানত পুরাণ-কল্পনা—বিশেষ করে রামায়ণ-মহাভারতের বিপুল গম্ভীরের রাজ্যে ভ্রমণ করেছেন। মধ্যে মাধুর্যের সুর যেখানে বেজেছে তারও সমুন্নত গাম্ভীর্য লক্ষ্য করার মত। ব্রজাঙ্গনার বিষয়বস্তু পুরাণাশ্রিত নয়। বাংলার মধ্যযুগের কাব্য-কল্পনার রাজ্য থেকে এর বিষয় সংকলিত। এবং এর মাধুর্যও অবিমিশ্র। ছন্দের দিক থেকেও অপর তিনটি কাব্যের সঙ্গে ব্রজাঙ্গনার পার্থক্য গুরুতর। এই কাব্য আদ্যন্ত মিত্রাক্ষরে রচিত। স্বভাবতই মধুসূদনের কাব্যসমালোচক ও জীবনীকারদের কাছে এটি একটি প্রধান সমস্যা হয়ে উঠতে পারত যে কবি কোন্ নিগূঢ় কারণে পদাবলীর ললিত-কোমল রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট। প্রশ্নটি অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

'মধুস্মৃতি' প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ সোম সহজভাবেই এই কাব্য রচনার কারণ নির্দেশ করে লিখেছেন,

"অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদনের চিত্ত নিধুবাবু, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের রচিত সঙ্গীতের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ টপ্পা-রচয়িতা নিধুবাবুর আদর্শে গীতিকা রচনা করিতে অভিলাষী হইয়া তিনি গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন, 'I mean to try Nidhoo's odes as soon as I get my Pandit.' কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অনুসরণে মধুসূদন দুই চারিটি সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই রচনা করেন নাই। তাঁহাদিগের রচিত সঙ্গীতে ভোগলালসার প্রাবল্য, রুচির হীনতা এবং বিলাসের আবিলতা উপলব্ধি করিয়া, তিনি ঐ শ্রেণীর গীতরচনা হইতে বিরত হন। এই সময়েই তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ

করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-কবিতার কলয়িত নিকুঞ্জ-কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে মধুস্থদনের কবি-হৃদয় পুলক-প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মনে মনে অভিনব গীতি-ছন্দে কোন গ্রন্থ-রচনার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিলেন, 'ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করিতে পার?' এই কথা শুনিয়া মধুস্থদনের গীতিকবিতা রচনার প্রচ্ছন্ন বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল।"

এবং তিনি কাব্যটি রচনা করলেন।

মধুস্থদনের কবিমনের গতি এত সরল রেখায় প্রবাহিত নয়। 'মধুস্মৃতি'র রচয়িতা কবিওয়ালাদের অতি অল্প কথায় বিদায় করেছেন। কবিওয়ালা অথবা টপ্পাগান-রচয়িতাদের প্রভাব এই কাব্যের উপরে কতটুকু তার কিছু বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। লক্ষণীয় যে, কবি নিধুবাবুর গানগুলিকে 'ওড' নামে চিহ্নিত করছেন এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যকেও বলছেন 'A Book of Odes'। জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করে কবির মনে বৈষ্ণব কবিতার রাজ্যে ভ্রমণের বাসনা হয়েছিল বলে মনে করার পেছনেও যথেষ্ট বস্তুভিত্তি নেই। বাংলাদেশের বৈষ্ণব কাব্য কবিকে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করলে তাঁর পত্রে এর সামান্য পরিচয়ও মিলত। জয়দেব সম্পর্কে পরবর্তী কালে লেখা সনেটটি অবশ্য উল্লেখযোগ্য। চতুর্দশপদী রচনাকালে সাধারণভাবে দেশীয় কবিদের প্রতি বেশ কয়েকটি কবিতায় যে শ্রদ্ধা তিনি জানিয়েছেন সেই মানস-রাজ্যে এখনও তাঁর প্রবেশ ঘটে নি। আর জয়দেব ছিলেন রাজার সভাসদ্ কবি। সেদিক থেকে মধুস্থদনকে আকৃষ্ট করার একটি 'বিশেষ যোগ্যতা' তাঁর ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, মধুস্থদনের কবি-মনে পেট্রন-খোঁজার পালার শেষ ছিল না। শেষজীবনে তাঁর একাধিক উক্তিতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার কামনা অভিব্যক্ত হয়েছে। কাজেই জয়দেবের মত ভাগ্যবান কবিকে শ্রদ্ধা জানানো নানা দিক থেকেই প্রয়োজনীয় বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা ছিল রাজনারায়ণ বসুর কাছে লেখা একটি চিঠিতেই তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলবে,

'I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! when you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had 'Bard' like your

humble servant from the beginning she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours."[১]

কাজেই এমন মনে হয় না যে বৈষ্ণব কবিদের কাব্যপাঠে তাঁর মুগ্ধ কবিহৃদয়ের উজ্জীবন হল এবং তিনি ব্রজাঙ্গনা রচনা করলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়েব অনুরোধের কিছু প্রত্যক্ষ মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু কবিচিত্তের অন্তর্লোকের আরও কিছু গূঢ় প্রশ্ন অন্বেষণযোগ্য।

মধুসূদনের কালে শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি কি দৃষ্টিতে তাকাতেন তার কিছু ইঙ্গিত উপরি-উক্ত পত্রে মিলবে। নতুন খ্রীষ্টীয় ও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের রুচিবোধ, প্রাচীন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তাদের কবিতাগুলির সৌন্দর্য-বিশ্লেষণের অভাব, কবিওয়ালাদের স্থূলরস সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর অতিপ্রচলন এবং অষ্টাদশ শতক থেকে কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের জীবনচর্চা এর জন্য দায়ী বলে মনে হয়। বিদেশী-ভাবাপন্ন মধুসূদন বা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী রাজনারায়ণের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি যে বিরূপতা তা অনেকখানি স্বাভাবিক। হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের অন্যতম পুরোধা বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন তাও লক্ষণীয়।

> "যে কৈলাসশিখরে তপস্বী কপর্দ্দীর রোষানলে ভস্মীভূত, সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনর্জীবনার্থ ধূমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন। পুরাণকারের অভিপ্রায় কদর্য নয়; ঈশ্বর-প্রাপ্তিজনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ইতি বাক্য স্মরণ রাখিয়া তাহাই পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। তাঁহার রোপিত ভগদ্ভক্তিপঙ্কজের মূল অতল জলে ডুবিয়া রহিল—উপরে কেবল বিকশিত কামকুসুমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে—তলায় না, তাহারা কেবল সেই কুসুমদামের মালা গাঁথিয়া ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম প্রস্তুত করিল। যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনমহোৎসব। এত কাল আমাদের জন্মভূমি মদনধর্মোৎসবভারাক্রান্ত।" —[কৃষ্ণচরিত্র]

অবশ্য কাব্যসৌন্দর্যের দিক দিয়ে বিচারে বঙ্কিমের হাতেই মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলী নতুন মর্যাদা পেল। কিন্তু বঙ্কিমের উপরি-উক্ত মন্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে সে সময় পর্যন্ত সাধারণভাবে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব

খুব অনুকূল ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বঙ্কিমের সমকালেই ইংরেজিশিক্ষিত কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মের স্বীকৃতি সূচিত হয়। নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলিতে তার প্রমাণ।

আমি কেবল এটুকুই বলতে চাই যে মধুসূদন যখন ব্রজাঙ্গনা রচনা করেন তখন সাধারণভাবে ইংরেজিশিক্ষিত সমাজ বৈষ্ণব প্রেমধর্ম তথা পদাবলী কাব্যকে সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু মধুসূদন কোনো কালেই ধর্মচিন্তাদ্বারা আচ্ছন্ন হন নি, এমন কি নিজের ধর্মান্তর গ্রহণকালেও নয়। তাই সহজ বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে বলতে পেরেছেন, 'ধর্মান্ধতা দূরে রেখে কাব্য পাঠ কর। শ্রীমতী রাধা আসলে মেয়ে খুব খারাপ নয়।' রাজনারায়ণ বসুর মত ব্যক্তির রুচিকে যে এ কাব্য আঘাত করেছিল তাঁর নীরবতাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। তাই মনে হয় ব্রজাঙ্গনার কবিতা লেখার সময়ে বৈষ্ণব ভাবাকুলতা কবিকে ততটা উৎসাহিত করে নি, বরং স্বজন ও বন্ধুমহলকে চমকে দেবার বাসনাই মধুসূদনের চিত্তে অধিক সক্রিয় ছিল। আর এমনি চমকে দেবার ইচ্ছার চাবিকাঠি মধুসূদনের বহু সৃষ্টির পেছনেই বর্তমান।

১৮৬১ সালে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হবার কিছু পরে ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হয়। তবে এর কিছু কিছু কবিতা যে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের সমকালে লিখিত এমন প্রমাণ আছে। তথ্যাদি বিশ্লেষণে মনে হয় ব্রজাঙ্গনার কবিতাগুলি লেখার সময়ে প্রথমদিকে তিলোত্তমার সমাপ্তি-অংশ, এবং শেষদিকে মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম অংশ ও কৃষ্ণকুমারী নাটক লেখা হচ্ছিল।[২] এ ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ, এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনার উৎস নির্ণয়ে সহায়ক। কবি যখন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে বিশ্বসৌন্দর্যের তিলতিল উত্তমাংশ সঞ্চয় ও তার অঙ্গাঙ্গী সংযোগে নতুন কাব্যমূর্তি রচনার দুরূহ সাধনায় ব্রতী, যখন মেঘনাদবধের রথরথী-অশ্বগজে প্রকম্পিত মেদিনীর চিত্ররচনায় একাগ্রচিত্ত এবং যখন বীরর্ষভ রাবণের ট্রাজেডির উঁচুসুরে বাঁধা কাব্য-অনুভূতির সব কটা তার বেদনার্ত, যখন কৃষ্ণকুমারীর সম্ভাব্য অকালমৃত্যুর ছায়াপাতে কবির কাব্য-কল্পনায় রুদ্ধশ্বাস মরুর উষ্ণতা, তখন ব্রজাঙ্গনার রচনা যে বিশেষ অর্থবহ হয়েই দেখা দেবে তাতে সন্দেহ কি? ব্রজাঙ্গনায় বেদনা আছে কিন্তু বিশ্বপ্লাবী হাহাকার নেই, ট্রাজেডির শুষ্ক আত্ম-অবক্ষয় নেই; প্রকৃতি আছে, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য-চয়নের ঐশ্বর্যাত্মিকা কল্পনা নেই।

ব্রজাঙ্গনার সুরটি বড় ক্লান্ত, বড় মৃদু। অথচ এই ক্লান্তি ও মৃদুতা চতুর্দশপদীর

সমজাতীয় নয়। চতুর্দশপদীতে কবির কাব্যজীবনের সমাপ্তি-বাণী উচ্চারিত, কিন্তু ব্রজাঙ্গনার সমকালে তো কবিপ্রতিভা সমুন্নতির স্বর্গসীমাকে স্পর্শ করেছে। চতুর্দশপদী কবিতার কালকে যদি কবি-জীবন-নাট্যের উপসংহার বলা যায়, তবে ব্রজাঙ্গনার কালকে এই নাটকের ক্লাইম্যাক্স আখ্যায় অভিহিত করতে হবে। তাই সঙ্গত প্রশ্ন—ব্রজাঙ্গনায় সেই আকস্মিক ক্লান্তি কেন, মৃদুতা কেন? মনে হয় তিলোত্তমা-মেঘনাদ-কৃষ্ণকুমারী সৃষ্টির হোমধূমে মাঝে মাঝে কবি মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তি বোধ করছেন। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হতে হতে মাঝে মাঝে শীর্ণ নদীর কুলুকুলু শব্দের কামনা জাগছে। ব্রজাঙ্গনা সেই কামনার ক্ষণিক স্বপ্ন। আর চতুর্দশপদীতে উজান বেয়ে সেই নদীপথে উৎসের দিকে ফিরে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখে মধুসূদন সমসাময়িককালে খ্যাতি এবং অখ্যাতি দুইই অর্জন করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছু-পূর্ববর্তী সাহিত্য-সমাজের একটা অংশের মনেরই প্রতিফলন। বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিও দীর্ঘকাল এর সঙ্গীত-রহস্য অনুধাবন করতে পারেন নি। এমন কি পরবর্তী কালে যাঁরা এর অনুসরণ করতে চেয়েছেন তাঁরাও এর তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। উদাহরণ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ এই হেমচন্দ্রই সমসাময়িক রসিকমহলে মধুসূদন অপেক্ষাও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ মেলে সেকালে শিক্ষিত-সম্প্রদায় অমিত্রাক্ষরকে কতটা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। দেখা যায়, একাধিক পত্রে রাজনারায়ণের মত সাহিত্য-পণ্ডিতকে মধুসূদন নানা উদ্ধৃতির সাহায্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যতিপাতের স্বরূপ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। লিখছেন—

> "My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is".

অমিত্রাক্ষরের দুরূহতা সম্বন্ধে নানা সমালোচনা তাঁর কানে আসত। এ বিষয়ে তিনি একবার এক পত্রে মন্তব্য করেন,

> "Good Blank verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the toughest of poets —I mean old John Milton."

অনুরাগী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই যখন এই অবস্থা তখন বিরুদ্ধবাদী এবং

সাধারণ পাঠকদের মনোভাব সহজেই কল্পনা করে নেওয়া চলে। অনেকেই এরূপ বিশ্বাস করতেন, এবং সর্বদাই মতামত ব্যক্ত করতেন যে, মিল দেওয়াটাই আসল কবিকর্ম। এবং মিত্রাক্ষরে লিখতে না পারাটাই অমিত্রাক্ষর আবিষ্কারের কারণ।[৩]

মধুসূদনের মধ্যে যে বালসুলভ জিগীষাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল তারই প্ররোচনায় তিনি সাহিত্যবোধহীন মনোবৃত্তির একটা মুখের মত জবাব দিতে চাইবেন—তাই-ই স্বাভাবিক। এই কাব্যই সেই জবাব। এ সময়ের নানা চিঠিতে মিত্রাক্ষরে কিছু লেখার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে পূর্বোক্ত কারণেই।—

"I have made up my mind to write (Deo Volente !) three short poems in Blank Verse, and then do something in rhyme ; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No ! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romantic tale in it…" —[রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রাংশ]

"If God spares me for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one, in the Ottava Rima[8] or stanzas of eight lines like his."—[রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রাংশ]

একই সময়ে লেখা অন্য চিঠিতে অবশ্য ব্রজাঙ্গনার ছন্দ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন যে 'মিত্রাক্ষর নিয়ে আমি কি করব ?' কবি-চিত্তের দ্বিধা এর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তিনি ব্রজাঙ্গনা লিখলেন এবং প্রকাশ করলেন। এবং দেখা গেল, মিলের বিচিত্রভঙ্গিতে এই কবিতাগুলির স্তবকসজ্জা অভিনব আকার ধারণ করেছে।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে সর্বসমেত আঠারোটি কবিতা আছে। তার মধ্যে কত বিচিত্র ধরনের মিলের প্রয়োগ করেছেন কবি, কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে তা দেখা যেতে পারে—

। ১ । নাচিছে কদম্বমূলে ॥ ক ॥ বাজায়ে মুরলী, রে, ॥ খ ॥
রাধিকারমণ ! ॥ গ ॥

চল, সখি, ত্বরা করি, ॥ চ ॥ দেখি গে প্রাণের হরি, ॥ চ ॥
ব্রজের রতন। ॥ গ ॥
চাতকী আমি স্বজনি, ॥ ছ ॥ শুনি জলধর-ধ্বনি ॥ ছ ॥
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন ? ॥ গ ॥
যাক্ মান যাক্ কুল, ॥ জ ॥ মন-তরী পাবে কূল ; ॥ জ ॥
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ ! ॥ গ ॥

।২। এসো, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে ! ॥ ক ॥
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে ॥ খ ॥
তব কূলে কল্লোলিনী, ॥ গ ॥ ভ্রমি আমি একাকিনী, ॥ গ ॥
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে, ॥ খ ॥
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে ! ॥ ক ॥

।৩। তরুশাখা উপরে, শিখিনি, ॥ ক ॥
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ? ॥ খ ॥
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে ॥ গ ॥ তোরও কি পরাণ কাঁদে ॥ গ ॥
তুইও কি দুঃখিনী। ॥ ক ॥
আহা ! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ? ॥ খ ॥
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি। ॥ ক ॥

।৪। বসন্তে-অন্তে কি কোকিলা গায় ॥ ক ॥
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ? ॥ খ ॥
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—॥ ক ॥
বংশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে ? ॥ খ ॥
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ! ॥ গ ॥
না হেরি শ্যামে ও-বাঁশী কাঁদিছে ? ॥ গ ॥

মোটামুটি এই তিন-চার ধরনের মিলের উপরে ভিত্তি করেই কোথাও একটি-দুটি চরণ বাড়িয়ে, কোথাও কমিয়ে, কোথাও চরণবিন্যাস একটু বদ্‌লে আঠারোটি কবিতায় মিত্রাক্ষর স্তবকসজ্জার চৌদ্দ-পনেরো রকমের বিচিত্রতা দেখিয়েছেন কবি।

অথচ এর কি কোনও প্রয়োজন ছিল ? আমি কাব্যগত প্রয়োজনের কথাই বলছি। 'Ottava Rima'-র আদর্শের জন্য এত বিচিত্রতা ঘটার কোনো কারণ নেই। ভাব-রসের সঙ্গে এর সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায় না।

তাই মনে হয় কবি যেন বাঙালি পাঠকদের নতুন ভোজে আমন্ত্রণের সচেতন চেষ্টায় এই কারুকর্মে ব্রতী হয়েছেন। এই কবিতাগুচ্ছ যেন সবাইকে ডেকে বলছে, কেবল অমিত্রাক্ষরে নয়, মিত্রাক্ষরেও কত অভিনবত্ব আনবার ক্ষমতা তিনি রাখেন।

কিন্তু কোনো কোনো কাব্য-নাটক যেমন কবির এই জিগীষা-উৎসে জন্ম নিয়েও সৃষ্টিপদ্ধতির মধ্যে কবির শিল্পী-সত্তাকে আলোড়িত করে তুলেছিল, ব্রজাঙ্গনার ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। ব্রজাঙ্গনা তাই ক্লান্ত কবি-মনের সাময়িক বিশ্রামকামনা ও আত্মপ্রচারমূলক কারুকর্মের চমৎকৃতিতেই সীমাবদ্ধ রইল ॥

॥ দুই ॥

মধুসূদন ব্রজাঙ্গনাকে ode বলে অভিহিত করেছেন। য়ুরোপীয় কাব্য-সাহিত্যে সুপণ্ডিত মধুসূদনের ওড-এর রূপলক্ষণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বোধ ছিল বলে মনে হয়। কবি সে ধারাটিকে সচেতন ভাবেই অনুসরণ করতে চেয়েছেন। লক্ষণীয়, কবি সাধারণভাবে লিরিক শব্দটি ব্যবহার না করে বিশেষভাবে বলেছেন 'ওড'।

> "I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ।"
>
> —[রাজনারায়ণ বসুকে লেখা কবির পত্রাংশ]

অথবা "The '*odes*' are out…"। মনে হয় সচেতন ভাবেই তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং এর বিশেষ অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই।

'ওড'-এর সংজ্ঞা-নির্ণয় Encyclopædia of literature (Ed. by Steinberg) বলছেন,

> "(i) an elaborate choral lyric, particularly in Greek tragedy ; (ii) any serious lyric expressing aspiration or addressed to a venerated person."

প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডিতে কোরাস-লিরিকগুলিই ওডের আদিরূপ। ছন্দের দিক থেকে এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য জটিলতায়। হ্রস্ব ও দীর্ঘ বিভিন্ন আকারের চরণের সহযোগে এর স্তবকের বিচিত্র গঠনকৌশল প্রথমাবধিই লক্ষণীয় ছিল।[৫] চরণের আকার-বৈচিত্র্য এবং স্তবক-নির্মাণে নানা জটিল কারুকর্ম ওডের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা দেয়।

পিণ্ডার ও অল্‌ক্‌ম্যানের ওডে সামান্য বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আঙ্গিক-গঠনে ঐতিহ্যানুসরণ আছে। পরবর্তীকালে সাফো ও এনাক্রেয়নের ওড নামে পরিচিত কবিতাগুলি কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে পৃথক। অবশ্য সাফো প্রমুখের ধারায় রচিত কবিতাকেই হোরেস ওড নামে অভিহিত করতে থাকেন। হোরেসের 'Carmen saeculare'-এ অবশ্য প্রাচীন গ্রীক কোরাস-সঙ্গীতের অনুসরণ আছে। এর কবিতাগুলি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে উদ্দেশ্য করে বলা। বিষয়বস্তু হিসেবে রোমের মাহাত্ম্য, তার নৈতিক জীবনের সমুচ্চ মানের গৌরব-কথাই গীত হয়েছে হোরেসের ওডে।

য়ুরোপীয় নবজাগৃতির সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়ায় প্রাচীন কাব্যরূপ পুনরাবিষ্কারের প্রবণতা বেড়ে গেল। অনেক কবিই ওড লিখতে লাগলেন। পেত্রার্ক রচিত ওডের দুই শ্রেণী। [ক] রিয়েনজীকে লক্ষ্য করে লেখা কবিতায় তিনি হোরেসের মত স্বদেশপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। [খ] লরার প্রতি লেখা ওডগুলিতে তাঁর প্রেমানুভূতিই ব্যক্ত।

সপ্তদশ শতক নাগাদ ইংরেজিসাহিত্যে ওদের দুটি বিশেষ ধরন দাঁড়িয়ে গেল। মার্ভেল প্রমুখ কবিদের অনুসরণে 'Horatian Odes' একটা সমুন্নত গাম্ভীর্য এবং শব্দব্যবহারের অতি-সংযমে প্রশংসিত হতে থাকে। অপর পক্ষে কাউলে, ড্রাইডেনের হাতে 'Pindarique Odes'-এর স্বাধীনতার শক্তি কেবলমাত্র উচ্ছৃঙ্খল পংক্তিবিন্যাসের রূপ ধারণ করে। অবশ্য আঠারো শতকে গ্রে-র রচনায় পিণ্ডারিক ওড আপন মূল সৌন্দর্য অনেকখানি ফিরে পায়। এই শতাব্দী পর্যন্ত উভয়শ্রেণীর ওডই যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।

কিন্তু উনিশ শতক থেকে উভয়শ্রেণীর ওডই লিরিক কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।—

"After this, the ode, greater or lesser, became accepted as a lyric, often longer than the average, in which a poet might pour out his most serious aspirations, and romantic poets of most centuries wrote such poems."—[C. M. Ing.]

বিষয়বস্তু হিসেবে স্বাদেশিক-চেতনা এবং ব্যক্তি-বেদনা এ-জাতীয় কবিতায় সমভাবে রূপায়িত হতে থাকে। এই যুগে ওড-রচয়িতাদের মধ্যে কোলরিজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স প্রভৃতির খ্যাতি সর্বাধিক।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত থেকে 'ওড'-এর প্রকৃতি বুঝে নেওয়া সম্ভব।—

১. কবির ব্যক্তিগত আশা-বেদনা বা স্বদেশচেতনার প্রকাশ হবে এ-জাতীয় কবিতায়। ওড তাই লিরিকের বৃহত্তর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উনিশ শতকে ওড আর লিরিক রূপাবয়ব ও রসাবেদনের দিক থেকে একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক নাটকের যুগের কথা ছেড়ে দিলে, খুব বড় রকমের পার্থক্য এদের মধ্যে কোনোকালেই ছিল না। সনেট ও লিরিকে ঘনিষ্ঠ সামীপ্য সত্ত্বেও রসাস্বাদে ও রূপনির্মিতিতে যে পার্থক্য ওডের সঙ্গে লিরিকের তা ছিল না।

২. ওডে সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে লক্ষ্য করে কবিতাটি বলা হয়। তবে এর ফলে তার সংলাপের মত হয়ে ওঠবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ব্যক্তিটি হৃদয়ের নিকট-রাজ্যের অধিবাসী। তাই তার কাছে হৃদয়োদ্ঘাটন আসলে আত্মগুঞ্জরণেরই সমান। আর জড় বস্তুকে লক্ষ্য করে বলায় তো গূঢ় আত্মপ্রকাশে কোনো বাধাই থাকে না।

৩. স্তবক-নির্মাণে জটিলতা ও বিচিত্রতা এর একটি প্রধান বহিরঙ্গ লক্ষণ। ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ চরণের নানারূপ সহযোগে এই বিশিষ্টতা আস্বাদ্য হয়ে ওঠে।

মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনায় উপরি-উক্ত লক্ষণগুলির সন্ধান মেলে কিনা তাই বিচার্য। সুহৃদ্ বা জড়বস্তুকে লক্ষ্য করে হৃদয়-বেদনার কথা বলা মধ্যযুগের বাংলা কবিতায়ও দেখা গেছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে অনুরূপ গুটিকয়েক কবিতা আছে। ধনপতির বিরহে খুল্লনার বেদনা ও মিলন-আর্তিকে এই কবিতাগুলির মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে। শারী-শুক, তরুলতা, ভ্রমর বা কোকিলকে সম্বোধন করে খুল্লনার জবানীতে এই কবিতাগুলি রচিত। উদাহরণ হিসেবে 'কোকিলের প্রতি খুল্লনা' নামক কবিতা থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হল—

কোকিল রে কত ডাক সুললিত রা।
মধুস্বরে দিবানিশি উগারহ নিত্য বিষ
বিরহিজনের পোড়ে গা॥
নন্দন-কাননে বাস সুখে থাক বারমাস
কামের প্রধান সেনাপতি।
কেবা তোরে বলে ভাল অন্তরে বাহিরে কাল
বধ কৈলি অনাথা যুবতী॥

আর যদি কাড় রা বসন্তের মাথা খা
মদনের শতেক দোহাই।
তোর রব সম শর অঙ্গ মোর জর জর
অনাথারে তোর দয়া নাই॥

বৈষ্ণব পদাবলীতে কিংবা কবিগানের 'সখীসম্বাদ'-এ এই-জাতীয় ভঙ্গি একেবারে অচলিত ছিল না।

মুকুন্দরামের বৃহৎ কাব্যের অন্তর্গত এই চারিটি কবিতার প্রতি মধুসূদনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল বলে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। তবে সখীসম্বাদের সঙ্গে কবি বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন।৬ ভাব ও রূপে আলোচ্যমান কাব্যে তার প্রভাব পড়া একেবারে অসম্ভব নয়।

মধুসূদনের কাব্যে কোনো সখীর প্রতি অথবা কোনো নিসর্গ-বস্তুর প্রতি রাধার উক্তিকে ধরে রাখা হয়েছে। যেমন, সখীর প্রতি রাধা—

১. চেয়ে দেখ, প্রিয় সখি, কি শোভা গগনে!
২. চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি,
৩. কি কহিল কহ, সই, শুনি লো আবার—
৪. ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে, ইত্যাদি

আবার, কোন নিসর্গ-বস্তুর প্রতি রাধা—

১. যমুনা-পুলিনে, আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন,
২. নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
৩. কনক-উদয়াচলে, তুমি দেখা দিলে,
হে স্থর-সুন্দরি। [উষার প্রতি]
৪. তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে?

এইরূপ যমুনার তটভূমি, জগৎজননী বসুন্ধরা, প্রতিধ্বনি, মলয়-পবন প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে রাধিকা তার হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করেছে। তবে এই প্রকৃতিও রাধার কাছে সখী বা সখার রূপ ধারণ করেছে। এ দিক থেকে সমগ্র ব্রজাঙ্গনা কাব্যই 'সখীসম্বাদ'।

ছন্দ-নির্মাণে মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার অভিনবত্ব, বিচিত্রতা ও জটিলতার কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বাংলা কবিতায় এ ধরনের স্তবক-সজ্জা

অদৃষ্টপূর্ব। অবশ্য গ্রীক, লাতিন, ইংরেজি বা ইতালিয়ান কোনো ছন্দোভঙ্গিরই যথাযথ অনুকরণের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। মধুসূদন জানতেন যে কোনো ভাষার ছন্দোভঙ্গিতে যতই অভিনবত্ব আনা হোক না কেন তার মূল ভাষাগত বৈশিষ্ট্যজাত কাঠামোটি অলঙ্ঘ্য। তাই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টির বেলায় বাংলা পয়ার ছন্দের চৌদ্দ-মাত্রিক কাঠামোটি বর্জন করেন নি, সশ্রদ্ধভাবে অনুসরণই করেছেন।

ব্রজাঙ্গনার কবিতাগুলিতেও পয়ার বা ত্রিপদীর মাত্রাভঙ্গির সাধারণ কাঠামোটি মূলত রক্ষিত হয়েছে। তবে মিল-প্রয়োগ ও স্তবক-নির্মাণের বিচিত্র জটিলতায় অদৃষ্টপূর্ব অভিনবত্বের সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশী ওডের প্রভাব এখানেই কার্যকর। বহু পংক্তির সহযোগে গঠিত দীর্ঘস্তবক এ কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। হ্রস্ব দীর্ঘ চরণে মিলের ব্যাপারটিও ওডের কথাই মনে করিয়ে দেয়। যেমন—'ভুবনমোহন'-এর সঙ্গে 'নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন'-এর মিল; কিংবা 'ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি', 'ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী' এবং 'আমি গো ফণিনী'-র মধ্যে মিল। আবার চৌদ্দমাত্রার চারটি মিত্রাক্ষর পংক্তির (ক খ খ ক) ঠিক মাঝখানে তৃতীয় স্থানে একটি আঠারো মাত্রার অমিল পংক্তি সহযোগে পাঁচ চরণের স্তবক-নির্মাণ জটিল কারুকর্মের পরিচয় বহন করে। য়ুরোপীয় ওডের আদর্শ যে এক্ষেত্রে অনেকখানি অনুসৃত তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু মধুসূদনের এই কবিতাগুলিকে কি পরিমাণে লিরিক বলা চলে তাই হল এদের ওড হিসেবে সার্থকতার চূড়ান্ত বিচার।

আমাদের দেশে মধ্যযুগ পর্যন্ত কবিতার প্রধানত দুটি ধারা প্রচলিত ছিল; কাহিনী-কাব্য এবং পদাবলী। আধুনিক কালে য়ুরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে পদ-সাহিত্যকে আমরা লিরিক বা গীতিকাব্য বলতে আরম্ভ করলাম। সেকালের সমালোচক-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমও লিখলেন,—

"বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী—ইহাই বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য। [বঙ্কিমকৃত ফুটনোট—'যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রবাবুর কাব্যসকল প্রকাশিত হয় নাই'।] অবকাশ রঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।"—[গীতিকাব্য : বিবিধ প্রবন্ধ] ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে কোনো অর্থেই গীতিকাব্য বলা যায় না। কিন্তু

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলী, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা এবং হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনী, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কি একই অর্থে গীতি-কবিতা? এদের গুণগত উৎকর্ষের কথা নয়, জাতিগত সাধর্মের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। পদাবলী ও ব্রজাঙ্গনায় কাহিনী নেই, চরিত্র-চিত্রণের প্রয়াস নেই। মানবানুভূতিই উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রকাশিত। কিন্তু কবির কবি-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কোথায়? কবির 'আমি' কি সেখানে অভিব্যক্ত? দ্বিতীয় জাতের কাব্যে কিন্তু রাধা বা কৃষ্ণের অনুভূতি নয়, কবির নিজের অনুভূতি-উপলব্ধিই অভিব্যক্ত হয়েছে। কবির এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আধুনিক কালের গীতি-কবিতার একটি কেন্দ্রীয় কথা। তাই পদাবলীকে সীমাবদ্ধ অর্থেই মাত্র গীতিকাব্য বলা যায়।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কবি-ব্যক্তিত্বের প্রথম প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটল মধুসূদনেরই সনেটে, এবং তাঁর 'আশার ছলনে ভুলি', 'রেখো মা দাসের মনে' এই দুটি ভাবে-রূপে খাঁটি লিরিক কবিতায়—ব্রজাঙ্গনায় নয়। ব্রজাঙ্গনা পুরানো ধরনের গীতিকবিতা। একে সীমাবদ্ধ অর্থেই গীতিকবিতা নামে অভিহিত করা যায়।

আমার মনে হয়, বিদেশী কাব্য-সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং রসবোদ্ধা হয়েও মধুসূদন বঙ্কিমেরই মত পুরানো ও নতুন গীতিকবিতার অন্তরের পার্থক্যটি অনুধাবন করতে পারেন নি। তিনি য়ুরোপীয় কাব্যাকৃতির অনুসরণে বাংলা সাহিত্যে নতুন ধরনের আখ্যানকাব্য, নতুন ধরনের মহাকাব্য, সনেট, ট্রাজেডি প্রভৃতির প্রবর্তন করেন। কিন্তু পুরাদস্তুর লিরিক (সনেট নয়, উচ্ছ্বসিত আঙ্গিকসহ) প্রবর্তনের কথা তিনি একবারও বলেন নি, সম্ভবত ভাবেনও নি। কারণ তাঁর ধারণায় বাংলা সাহিত্যে ও-বস্তুর অপ্রাচুর্য ছিল না। কাজেই পুরানো ধরনের গীতি-কবিতার অনুসরণ করেছেন তিনি ব্রজাঙ্গনায়, আঙ্গিকে য়ুরোপীয় 'ওড'-এর রূপ-বৈচিত্র্যকে আহ্বান জানিয়েছেন মাত্র। অথচ ছাত্রজীবনে কলকাতায় তিনি ইংরেজি ভাষায় বেশ কিছু খাঁটি আধুনিক গীতিকবিতা লিখেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে নি কারণ ও-ভাষায় এই জিনিস সুপ্রচুর।

যে দুটি খাঁটি গীতি-কবিতা তিনি লিখেছেন তার পেছনেও কোনো কাব্য-রচনার সচেতন পরিকল্পনা ছিল না। ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনায় অনুরুদ্ধ হয়ে 'আশার ছলনে ভুলি' এবং বিদেশ-যাত্রার মুহূর্তে 'রেখো মা দাসেরে মনে' রচিত। প্রাসঙ্গিক ভাবে রচিত হলেও কবির সমগ্র অন্তরাত্মার দীর্ণ ক্রন্দন এর মধ্যে

পরিবর্তনের যে ক্ষীণ সুরটুকু বেজেছিল, চতুর্দশপদী কবিতার কোনো কোনো সনেটে তা ধরা পড়েছে।

এদিক থেকে ব্রজাঙ্গনার বিষয়-বিন্যাস পাঠককে নতুনভাবে আশান্বিত করতে পারে যে মধুসূদনের এই কাব্যে নিসর্গ-দৃষ্টির একটি সুষ্ঠু পরিচয় মিলবে। কারণ পূর্বেই বলেছি যে এ-কাব্যে কবি রাধার প্রেমানুভূতির সাহচর্যে প্রকৃতির ফুল-পাখি-ঋতুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মোট আঠারোটি কবিতার মধ্যে গুটিবারো কবিতাই নিসর্গ-বিষয়ক বলে মনে হয়।

১. ঋতু-বিষয়ক—জলধর, মলয়-মারুত, বসন্তে (২টি কবিতা)। লক্ষণীয় যে কবির ঋতুবোধ বর্ষা ও বসন্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

২. কাল—উষা, গোধূলি।

৩. স্থান—যমুনাতটে, নিকুঞ্জবনে।

৪. ফুল—কুসুম, কৃষ্ণচূড়া।

৫. পাখি—ময়ূর, সারিকা।

এ তালিকাটি দেখে মনে হয়, কবি তাঁর পাঠকদের জন্য নিসর্গ-সৌন্দর্যের এক বিচিত্র ভোজের আয়োজন করেছেন। কিন্তু কবি পাঠকের নিসর্গ-সৌন্দর্যের ক্ষুধা আদৌ মেটাতে পারেন নি। আর কেন পারেন নি, তাই আলোচ্য কবিতাগুলির বিচারে দেখব।

নিসর্গ-সৌন্দর্যের আস্বাদ প্রকৃতির কোনো বিশিষ্ট বস্তুর উল্লেখের সাহায্যে ঘটে না। সেই বস্তুর চিত্রটি এক্ষেত্রে অপরিহার্য এবং স্বভাবতই কবি-চিত্তের বর্ণালী সম্পাতে তার চিত্রকল্প হয়ে ওঠা চাই। 'নারী তড়িতবরণা' বললে একটি মামুলি অর্থালঙ্কারের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছাই, কিন্তু কবি যখন বলেন 'মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেলি' তখন তার বস্তুসৌন্দর্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রেমভাব তথা রূপমুগ্ধতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আস্বাদ্য হয়। মধুসূদনের কবিতায় প্রকৃতিবস্তু আছে, তার চিত্র নেই।

'জলধর' কবিতায় তাঁর মেঘের প্রবল প্রাচুর্যের বর্ণনা নেই, নেই ঘন বর্ষায় রাধা-চিত্তের বিরহের ব্যঞ্জনা। কবি জলধর এবং চঞ্চলা চপলার প্রেম-মিলনের ছবি দেখেছেন—

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন!
মদন উৎসব এবে, মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন!

চপলা-চঞ্চলা হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে
তুষিছে তাহারে দিয়ে ঘন আলিঙ্গন।

রাধার কৃষ্ণ-মিলনার্তিই মেঘ ও বিদ্যুতের মধ্যে এই মিলন-চিত্রটিকে আরোপ করেছে। এ আরোপ স্বাভাবিক ভাবে ঘটে নি, এর কৃত্রিমতা দৃষ্টি এড়ায় না। নিসর্গবস্তুকে প্রাণদান করে মানবাচরণে অভ্যস্তরূপে আঁকলেই সে জীবন্ত হয়ে ওঠে না। ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া জড় বস্তুতে মানবরূপ বা ভাব দ্যোতিত হলে তার সৌন্দর্য স্বাদু হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ সমাসোক্তি অলঙ্কারে প্রায়ই অতিসচেতন কারুকর্ম এবং কৃত্রিম আরোপধর্ম লক্ষিত হয়।

মেঘদূত এবং গীতগোবিন্দের 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্'-এর নিগূঢ় সংস্কার বাংলা বর্ষা-কবিতায় প্রাচীন কাল থেকেই যে বিশিষ্ট ভাবরসের সৃষ্টি করে আসছে তার মধ্যে এক নিবিড় ব্যাকুলতা আছে। বৈষ্ণব কবিতার বর্ষাভিসার ও বর্ষাবিরহের মধ্য দিয়ে এই ভাবরসের সংস্কার প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধরসে পরিণত হয়েছে। বাংলার বর্ষার নানা রূপ। ইলশেগুঁড়ির খেয়াল-খুশির তরলতা, শ্রাবণ-ভাদ্রের ঘন অন্ধকার, একঘেয়ে ধারাবর্ষণ এবং মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-চমকের তীব্রতা আর শরতের প্রাক্কালে রোদের সঙ্গে এর শিশুসুলভ লুকোচুরি। কিন্তু সব মিলে ঐ নিবিড় ভাবঘন দৃষ্টিরোধকারী আচ্ছন্নতাই সত্য। রবীন্দ্রনাথ বাংলার বর্ষাপ্রকৃতির এই সামগ্রিক বস্তুরূপের মধ্য থেকেই তাঁর বর্ষাতত্ত্বটিকে—শাশ্বত সৌন্দর্য-বিরহের জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরেছেন, কোনো রূপক বা সমাসোক্তি অলঙ্কারের আশ্রয় না নিয়েই। মধুসূদনের বর্ষা মেঘ-বিদ্যুতের খেলার দিকটিকেই মাত্র ধরে রাখতে চেয়েছে। বাংলার বর্ষার সামগ্রিক রূপবোধ এর মধ্যে নেই, নেই কোনো বিশিষ্ট ভাব-ব্যাকুল জিজ্ঞাসাও। তুলনায় সনেটগুচ্ছে সঙ্কলিত 'মেঘদূত'-নামাঙ্কিত প্রথম কবিতাটি কিছু ভাব-গভীর।

বসন্তঋতুর কবিতা 'মলয়মারুত'-এ মেঘদূতের অনুসরণ স্পষ্টতর। মলয়-মারুতকে রাধা কৃষ্ণ-সকাশে দূতরূপে প্রেরণ করবার বাসনা প্রকাশ করেছে। ভাব ও রূপ-চিত্রের দিক থেকে এ কবিতা বৈশিষ্ট্যহীন। বসন্তঋতুর প্রকৃতি-চিত্র এখানে নেই, তার মিলন-পরিবেশ রাধার চিত্তে প্রবেশ করে বস্তু-বিচারে ভ্রান্তিরও সৃষ্টি করে নি। নববর্ষার আগমনে জড় ও জীবের পার্থক্য ভুলে গিয়েছিল যক্ষ। মধুসূদনের চিত্তে (এবং তাঁর সৃষ্ট রাধারও) প্রকৃতি-লোকের ঋতু-পরিবর্তন সেরূপ নিবিড় মন্ময়লোক সৃষ্টিতে বড় সমর্থ নয়। মায়ালোক-

সৃজন কিন্তু অনেকাংশে সার্থক ‘বসন্তে’ (১নং) কবিতায়। কবিতাটির প্রথম দিকে বাসন্তী-প্রকৃতি রূপে-গন্ধে-গানে-সৌন্দর্যসজ্জায় রাধার দু চোখে আশার মরীচিকাকে সত্য করে তুলে ধরল—

ফুটিল বকুল ফুল কেন লো গোকুলে আজি
কহ তা, সজনি ?
আইলা কি ঋতুরাজ ? ধরিলা কি ফুলসাজ
বিলাসে ধরণী ?
মুছিয়া নয়ন-জল চল লো সকলে চল,
শুনিব তমালতলে বেণুর সুরব ;—
আইলা বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।

বাসন্তী প্রকৃতিতে কবি কোনো মানব-ভাবকে আরোপ করেন নি। প্রকৃতির রূপে কোন প্রেম-মিলনের রূপক দেখে রাধার বিরহ-বেদনা তীব্রতর হয়ে ওঠে নি। বসন্তপ্রকৃতির ফুলে-গন্ধে, নদীর তরঙ্গে, জ্যোৎস্নার প্লাবনে মানুষের মনে প্রেম জেগে উঠছে। এখানে কোনো বিশিষ্ট নিসর্গ-দর্শন না থাকলেও এ কবিতা পড়ে পাঠকের বিশ্বাস জাগে যে ঋতুর মুখ্য কাজ প্রেম জাগানো—ফুল ফোটানো তার আনুষঙ্গিক কাজ মাত্র। নিত্যকার জীবনে যা জীর্ণ, বসন্তের আগমনে তা পুষ্পিত। যুক্তির বাধা আজ অপসৃত—বসন্ত এলে মাধব আসবেই। বসন্তই যে মাধব! রূপরচনাগত দুর্বলতা না থাকলে (সে বিষয় প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হয়েছে) এ কবিতার রসাবেদন খাঁটি নিসর্গ-কবিতার আস্বাদ বয়ে আনত।

‘বসন্তে’ (২নং) কবিতাটিও সীমাবদ্ধ অর্থে সার্থক। বসন্তের পটভূমিতে মিলন-চাঞ্চল্যের ভাবটি এর মধ্যে দ্যোতিত। এ কবিতাটিকে কিছুতেই ‘বিরহ’ নামাঙ্কিত সর্গে স্থান দেওয়া যায় না। কবি তাই করেছেন। আসলে ভাব-ভাষা-ছন্দে একটি আনন্দ-হিল্লোল এর সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত—

সখি রে,
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কল কল চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে।
চল লো, জুড়াব আঁখি, দেখি মধুসূদনে !

ব্রজাঙ্গনার অন্তর্ভুক্ত ঋতুকবিতার বৈশিষ্ট্য দুটি। প্রথমত, এদের মধ্যে

কোনো দার্শনিকতা নেই। দ্বিতীয়ত ঋতু-পর্যায়ের মধ্যে বসন্তের দিকেই তাঁর কবিচিত্তের যা কিছু আকর্ষণ।

প্রথমত। তত্ত্ব-দর্শনের কোনো জিজ্ঞাসা দ্বারা মধুস্থদনের কবি-চিত্ত কোনো কালেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে নি। জীবনের খুব গভীরে যেখানে তিনি প্রবেশ করেছেন সেখানেও দার্শনিকতা বা তত্ত্ববোধের প্রকাশ কম। প্রকৃতিকে তিনি দেখেছেন, প্রধানত কবিজন-অনুস্থত প্রথার বশবর্তী হয়ে, কিছুটা এর সৌন্দর্যের প্রতি সহজ আকর্ষণে। কিন্তু প্রকৃতির ঋতু-পর্যায়ের মধ্যে কোনো দার্শনিক ঐক্যস্থত্র—কোনো মুক্তিতত্ত্ব, অথবা প্রকৃতি ও মানবজীবনের মধ্যে কোনো যুগযুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তরের নিগূঢ় সম্পর্ক তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি এবং চানও নি। রাধা অনেক নিসর্গ-বস্তুর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলেও একটা একাত্মার ভাব প্রায় কোথাও ফুটে ওঠে নি।

দ্বিতীয়ত। বর্ষা ও বসন্ত ব্যতীত ঋতুচক্রের অন্যান্য অংশীদারদের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপহীন। এর মধ্যে আবার বর্ষার নিবিড় ঘন গহন মেঘসজ্জা তাঁকে ততটা আকর্ষণ করতে পারে নি, যতটা পেরেছে ঋতুরাজ বসন্ত। এর ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য-প্রাচুর্য এবং দেশে-বিদেশে যুগে যুগে কবিকুলের নিকটে এর প্রাবচনিক শ্রেষ্ঠতা মধুস্থদনের মনকে আহ্বান জানিয়েছে।

তৃতীয়ত। মানবাতিরিক্ত বা মানবনিরপেক্ষ প্রকৃতি মধুস্থদনের কাছে

'ঊষা' এবং 'গোধূলি' প্রকৃতি-রাজ্যে তুইটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত। নিশাবসানে প্রভাতের আগমন-বার্তা বহন করে আনে ঊষা। জড়িমা-জড়িত নিদ্রার অবসান হয় ধীরে। নতুন প্রত্যাশার মত 'শুভ্র অভ্র লালে লাল' (বিহারীলাল) পূর্বাকাশে ঊষা দেখা দেয়, যেন 'হাসিছে তুধের মেয়ে' (বিহারীলাল)। তার নবীন প্রফুল্লতা, সরল প্রাণময়তা, পার্থিব গ্লানির স্পর্শবিহীন সুষমা; কিন্তু পটভূমিতে অপস্রিয়মাণ শেষরাত্রির অন্ধকার যেন 'ফিরে ফিরে চায় তুহাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল (নজরুল)।' মধুস্থদনে ঊষার রূপবর্ণনা মাত্র এইটুকু—

কনক-উদয়াচলে, তুমি দেখা দিলে,
হে স্থর-স্থন্দরী!
কুমুদ মুদয়ে আঁখি, কিন্তু স্থখে গায় পাখি
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর-ভ্রমরী;

উষা 'মন্দ সমীরণ'কে বহন করে আনে, চক্রবাকীকে প্রিয়মিলনের পথ দেখায়, নিদ্রিত মানুষকে দেয় 'আশার স্বপন'—আর,

ভালে তার জলে, দেবি, আভাময় মণি
বিমল কিরণ।

সুর-সুন্দরী রূপে মধুসূদন উষাকে ব্যক্তিমূর্তি দিয়েছেন, তার কিছু রূপ-বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু উষাকালের ভাবরসের দ্যোতনায় অনেক দুর্বল ক্ষমতার অধিকারী বিহারীলাল যে সার্থকতা দেখিয়েছেন 'সারদামঙ্গল'-এর প্রথম কবিতায়, মধুসূদন কেন সেখানেও পৌছুতে পারলেন না? আসলে তাঁর মধ্যে মানবদৃষ্টিই মুখ্য হওয়ায় তিনি প্রকৃতির দিকে মোহাবিষ্ট নয়নে তাকাতে পারেন নি। যে উষা কুসুমকে সমীরণের, চক্রবাকীকে চক্রবাকের, পদ্মকে সূর্যের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ করে দেয়, রাধার প্রিয়-মিলনের পথও কি সে দেখিয়ে দেবে না? উষার যে কোনো স্বাভাবিক স্বতন্ত্র সৌন্দর্য আছে তা যেন ভাববারও অবকাশ ছিল না কবির। অপর পক্ষে বিহারীলালের মত কবিরা 'ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়, মানুষ জন্তুকে যত ডরি' বলে প্রকৃতির সন্ধ্যা-প্রভাত, সমুদ্র-পাহাড়, গভীর অরণ্য, আর শান্ত নদীর মধ্যে হারিয়ে যেতে চেয়েছেন; হরিণীদের গলা ধরে কাঁদবার কল্পনা করেছেন, আকণ্ঠ শাদ্বলে ডুবে থেকে কান পেতে জলের কল কল ধ্বনি শুনবার বাসনা প্রকাশ করেছেন।[৭] তাই এই প্রকৃতি-রাজ্যের নিজস্ব রূপ তাঁদের কাছে আপনাকে অনাবৃত করেছে। কিন্তু মধুসূদন মানবানুভূতির মধ্যেই নিমজ্জিত। প্রকৃতির অবগুণ্ঠন তাই তিনি ক্বচিৎ মোচন করতে পেরেছেন। এবং চতুর্দশপদীতেই-কেবল সুদূরের তারা তাঁকে আহ্বান জানিয়েছে।

নিসর্গ-কবিতা হিসেবে 'গোধূলি'র ব্যর্থতা আরও সর্বাত্মক। গোধূলির অস্পষ্ট কুহেলীভরা সৌন্দর্য এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। গোধূলি শব্দটিই মাত্র আছে, এর রূপ বা ভাবাবেশের চিহ্নমাত্র নেই এ কবিতায়।

মধুসূদনের ফুল সম্পর্কিত কবিতাও বিশিষ্টতাহীন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ফুলের সৌন্দর্য নিখিলের সৌন্দর্য-কেন্দ্রেরই একটি ইঙ্গিত। কুরচির মত ক্ষুদ্র ফুলের মধ্যেও তিনি শুনতে পান অনন্তের বীণা—

স্বর্গের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি—
কুরচি, পড়েছ ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।

জবা, আফিমের ফুল, আকন্দ প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ সত্যেন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টির বিশিষ্টতাকেই সূচিত করে। প্রমথ চৌধুরীর কাছে অতিপরিচিত গোলাপও বক্র-কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের সামগ্রী। আবার কুমুদরঞ্জনের জুঁই, ভুঁইচাঁপা, ঝুম্‌কা, তৃণকুসুম তাঁর সহজ সরল চিত্ত-প্রবণতা এবং ক্ষুদ্রের সৌন্দর্যে মুগ্ধতার পরিচয় বহন করে। মধুসূদনের 'কুসুম' নামে হলেও রূপে ফুল-সম্পর্কিত কবিতা নয়। দু-একবার ফুল তোলা ও মালা গাঁথার কথা আছে, এই মাত্র।

কেন এত ফুল তুলিলি, সজনি—
ভরিয়া ডালা ?

কিংবা

হায় লো দোলাবি সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?

প্রেম যেখানে নেই ফুলের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। প্রকৃতিতে যা ফুল, হৃদয়ে তাই তো প্রেম। তমালের তলে 'বনমালিয়া'র নৃত্য যখন স্তব্ধ, মালা গাঁথা তখন অর্থহীন। প্রথম তিনটি স্তবকে ফুলে প্রেমে মেশামেশি যে ঐকতান, তৃতীয় স্তবকের সমাপ্তির চরণ থেকে ষষ্ঠ স্তবকে কবিতাটি শেষ হওয়া পর্যন্ত তার আর উল্লেখমাত্র নেই, ভাব বা রূপগত প্রতিক্রিয়াও নেই। সেখানে প্রেমের পিঞ্জর ভেঙে পিকবরের পলায়নের কথা আছে, ব্রজগগনে ব্রজসুধানিধির অভাবে ব্রজভবনে ব্রজ-কুমুদিনীর বিলাপের কথা আছে, অক্রূরের ক্রূরতাকে লক্ষ্য করে অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে। কুসুমের সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়—সুরে, ভাবে কিংবা রসে ?

'কৃষ্ণচূড়া' কবিতাটিতেও কৃষ্ণচূড়া সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র। কৃষ্ণপ্রেমের স্মৃতি জাগিয়েই তার কর্তব্য-সমাপ্তি। ফাল্গুনে বনে বনে আগুন লাগানো কৃষ্ণচূড়ার রূপ কবি কি কোনোদিন চোখ ভরে দেখেন নি ? তার ইঙ্গিতটুকুও জীবন্ত নয় এ কবিতায়।

'যমুনাতটে' কবিতায় নদীটির মানবীরূপ এতই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে যে এর নদীরূপের কথা পাঠকের একটিবারও মনে পড়ে না। যমুনানাম্নী কোন নারী-সুহৃদের সঙ্গে রাধার একান্তে আলাপ বলেই এ কবিতাটিকে গ্রহণ করা চলে। 'পৃথিবী' কবিতায় বসুন্ধরার ঋতুকামিনী-রূপটিই অভিপ্রেত। একবারের জন্য তার বক্ষশোভিত নিবিড় অরণ্যানীর

যে প্রসঙ্গ উঠেছে সেখানেও অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষ এবং দাবানল-দগ্ধ বনস্থলের সঙ্গে রাধার বিরহবেদনার তুলনাই লক্ষ্য। 'নিকুঞ্জবন' কবিতায়ও স্মৃতির জ্বালাই প্রধান। অতীত মিলনের আনন্দ-পূর্ণ কেন্দ্র নিকুঞ্জের শোভা-সৌন্দর্যের দিকে কবির ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। 'গোবর্দ্ধন গিরি'র রূপচিত্রণ অংশত সফল। বিলাসী নৃপতির পরুষ মূর্তির একটি দ্যোতনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে দুটি স্তবকে। বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণীর নৃত্যে, বিহঙ্গিনীর গানে, প্রদীপ্ত সূর্য ও সুতারা শর্বরীর ছত্রধরা সেবায় এই পর্বতের প্রাকৃত রূপ অনেকখানি জীবন্ত।

পাখি বিষয়ে যে দুটি কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে তাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। রবীন্দ্রনাথ ময়ূরকে নিকটে দেখে সোৎসাহে বলেছেন—

ময়ূর, কর নি মোরে ভয়,
সেই গর্ব, সেই মোর জয়।

ময়ূর এখানে নিজের সৌন্দর্য নিয়েই যেন অতি স্বাভাবিকভাবে নিখিল সৌন্দর্যের প্রতীক। চণ্ডীদাস যখন বলেন—

এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে

তখন ব্যঞ্জনায় ময়ূর-ময়ূরী কণ্ঠের বহুবিচিত্র বর্ণের উজ্জ্বলতার ছবি ফুটে ওঠে। মধুসূদন ময়ূরীকে নবীন মেঘের বিরহে বিরস-বদনা করে এঁকেছেন—রাধার বিরহ-বেদনার ভাব-সাম্য সৃষ্টি করবার জন্য। আশ্চর্যসুন্দর পাখিটির বর্ণবিচিত্রতা কবির চোখে ভাল লাগার রঙ্ ধরায় নি—এটা বিস্ময়কর।

'সারিকা' কবিতাটিতে পাখিটির পিঞ্জরাবদ্ধ অসহায়তার কথা ব্যক্ত। কিন্তু বন্দীবিহঙ্গের প্রকৃতির নীলগগনে মুক্তপক্ষ বিহারের কল্পনাটি কোথাও বড় হয়ে ওঠে নি। সারিকার শুকের অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে, রাধার সঙ্গে তুলনার ভাবটিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। এই পাখির বন্দীত্বই কবির কাছে বড় কথা, পাখিত্ব নয়॥

॥ চার ॥

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে প্রকৃতি প্রেমকে সুন্দরতর করে তোলার সুযোগ পায় নি। কারণ এ কাব্যে প্রকৃতি একান্ত গৌণ, প্রেমই এর সর্বস্ব। নিজের অনুভূতি-উপলব্ধির প্রকাশে প্রকৃতিরাজ্য থেকে প্রেম তুলনার কিছু উপকরণ সঞ্চয় করেছে, এবং ক্বচিৎ বসন্তপ্রকৃতির উল্লাসকে পটভূমিতে আহ্বান জানিয়েছে, এই মাত্র।

মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য পাঠ করে সেকালের বহু ভক্ত বৈষ্ণব বিস্ময় বিহ্বল হয়েছেন, কেউ কেউ তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ছুটে এসেছেন, কেউ আবার তাঁকে শাপভ্রষ্ট মহাজন পদকর্তা বলে অভিহিতও করেছেন। কিন্তু মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা চলে না। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব দর্শন ও তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন বলেই মনে হয় না। বৈষ্ণব কবিতার ধর্মীয় ভিত্তির কোনো মূল্যই তাঁর কাছে ছিল না। রাধা ছিল তাঁর কাছে একান্তই মানবী—Mrs. Radha। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অবশ্য সবাই সমস্তরের উৎকর্ষের অধিকারী ছিলেন না। তাছাড়া সকলের কবিপ্রতিভার একমুখী প্রবণতাও ছিল না। চণ্ডীদাসের পদাবলীর রোমান্টিক অতীন্দ্রিয় আবেদন মধুসূদনের কবিপ্রতিভার বিরোধী। বিদ্যাপতির রাজকীয় রুচিবিলাস ও নাগর-বৈদগ্ধ্যের অতিচর্চায় মধুসূদনের মানস-সমর্থন ছিল না। জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের ধর্মবোধ তাঁর ছিল না, ছিল না জ্ঞানদাসের মত বস্তুরূপ নিংড়ে ভাবরস আবিষ্কারের দক্ষতা, ছিল না গোবিন্দদাসের আলংকারিক তত্ত্বসর্বস্বতা। নানা কবির বিচিত্র প্রবণতা, অজস্র অক্ষম কবির অতিসাধারণ স্তরের রচনা সব মিলিয়ে বিচার করলেও বৈষ্ণব পদাবলীতে যে গীতিরস, চিত্রাঙ্কনের যে সাফল্য, প্রেম-জিজ্ঞাসার যে আন্তরিক অকৃত্রিমতা, রাধা-চরিত্রের যে বিচিত্র ভঙ্গি দ্যোতিত, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা সে স্তরে কোনোকালেই পৌঁছুতে পারে নি। মধুসূদনের পক্ষে এটা খুব নিন্দার কথা নয় এই কারণে যে কবিকে তাঁর স্বক্ষেত্রে স্থাপন করে বিচার করা উচিত। যে বিষয়ে তাঁর কবি-প্রাণের উদ্বোধন হয় নি, সেখানে তাঁর ব্যর্থতা স্বাভাবিক।

কিন্তু কেন এ ব্যর্থতা? ব্রজাঙ্গনায় মধুসূদনের প্রাণের উদ্বোধন হল না কেন? তার কারণ একটি নয়, একাধিক। তবে প্রধানতম কারণ যে মধুসূদনের প্রেমবোধের বিশিষ্টতা তাতে সন্দেহ নেই।

মধুসূদনের মেঘনাদবধে প্রেমকথা আছে প্রমীলা ও সীতাচরিত্রকে অবলম্বন করে। আর বীরাঙ্গনা তো প্রধানত কয়েকটি প্রেমিকা নারীচরিত্রেরই বর্ণনা। কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থাৎ চরিত্রবিবিক্ত কেবল প্রেমানুভূতির প্রকাশে মধুসূদনের সাফল্য হয় নি কোনোকালেই। এমন কি মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গে মেঘনাদের বিরহে প্রমীলার ক্রন্দনোচ্ছ্বাস একান্তই মামুলি এবং কৃত্রিম উপমাচয়নে নিঃশেষিত। প্রমীলার চরিত্র-কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়েই

তার উপলব্ধি-অনুভূতি মাহাত্ম্য পেয়েছে। প্রেম মানবচিত্তের বিশেষ করে নারীপ্রাণের কি বিপুল শক্তি—মধুসূদন তা উপলব্ধি করেছিলেন। এবং বিচিত্র-প্রাণ নারীর চিত্তে এই শক্তি কত ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রিয়াশীল তাও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেমের অমূর্ত অনুভূতির ব্যাপারে তিনি বিশিষ্টতাহীন এবং কিছুটা স্থূলও বটে। গীতিকবিতার কারবার প্রধানত অনুভূতি নিয়ে। সেখানে তাই কিছু সূক্ষ্মতা, ব্যঞ্জনাময়তা রোমাণ্টিক আর্তি ও আকুলতার প্রয়োজন। তার ভাব-ভাবনার মধ্যে ব্যক্তিনির্বিশেষের সুদূরাভিসার প্রত্যাশিত। মধুসূদনে তা নেই। সর্ববন্ধনমুক্ত, প্রেমিকা নারীর চরিত্র-শক্তি কবির অভিপ্রেত হলে বিশুদ্ধ অনুভূতির দিকটি আবৃত হয়ে পড়ে। যেমন পড়েছে প্রমীলা-চরিত্রে এবং সমগ্র বীরাঙ্গনা কাব্যে। রাধার চরিত্র নয়, তার প্রেমই কবির আলোচ্য। অতি স্থূল কামনার প্রকাশে এবং কৃত্রিম বাচনভঙ্গিতে তা আমাদের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারে না। প্রকৃতি-পরিবেশের সাহচর্যে এই স্থূলত্ব বিদূরিত হতে পারত। কিন্তু কবি সে সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন।

'সারিকা' কবিতায় পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মুক্তি-কামনার মধ্যে রাধার বিদ্রোহী প্রাণ কুলধর্মের বন্ধন ছিন্ন করার বাসনা ব্যক্ত করেছে—

নিজে যে দুঃখিনী পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে ;—
আজিও পাখীর মন বুঝি আমি বিলক্ষণ
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে !
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধাবিনোদন !

কুল-মান-ধনের ব্রজ-কারাগার ছিন্ন করে সে দয়িত-মিলনে যেতে চায়। কবি রাধা-প্রেমের মধ্যে এই বিদ্রোহের ভাবটির আমদানি করে তার চরিত্রে ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্টতা আনবার ক্ষীণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কবি যথেষ্ট দ্বিধামুক্ত ছিলেন না। রাধার প্রেম যে পরকীয়া দু একবার এরূপ ইঙ্গিত থাকলেও প্রায়ই স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন—"Mrs. Radha"—

তবে যে সিন্দূরবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে।

অথবা,

পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি ?

কাজেই কুলমানধন বিসর্জন দেবার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবিত হয় নি।

আসলে রাধা-চরিত্রের কোনো একটি কেন্দ্রীয় প্রত্যয় তিনি মনের মধ্যে দাঁড় করাতে পারেন নি। কখনও তাকে গ্রাম্য নারীর মত সতীত্বের গর্ব করে অপরের সঙ্গে অকারণ কলহে প্রবৃত্ত হতে দেখা গিয়েছে—

লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী !
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর সীমন্তিনী !
অনন্ত, জলধি বিধি,
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন চিধি,
তবু তুমি মধু বিলাসিনী।

আবার—

হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুল-ফাঁদ,
পাতে লো ধরণী !
কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধনে লোভে সে রমণী ?

কখনও আবার কবিওয়ালাদের অনুসরণে ভাষা ও সুর দেহলালসার একটা গ্লানির স্তরে অবনমিত—

দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে ?

কিংবা,

বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে ?

কোথাও আবার ভারতচন্দ্রের অনুসরণে কামকেলির লঘুচটুল ভাষা ব্যবহার—

আমার প্রেম-সাগর দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু নিধি— দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি ? ধিক্ এ যুকতি ![৮]

যেখানে চরিত্র-জিজ্ঞাসার সৌন্দর্যে মেতে উঠতে পেরেছেন কবি সেখানেই তাঁর সার্থকতা; অথবা তাঁর সার্থকতা—যেখানে আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষ

প্রকাশ বা পরোক্ষ প্রতিফলন। প্রকৃতির কাব্য তিলোত্তমারও আংশিক সাফল্য ঐ দ্বিতীয় কারণেই। ব্রজাঙ্গনায় কবির আত্মপ্রতিফলনও ঘটে নি। রাধা-চরিত্রের অস্পষ্ট ছায়ারূপে অথবা কৃষ্ণের সঙ্গকামনায় মধুসূদন কোনোদিক থেকেই আপনাকে খুঁজে পান নি। তাই এ কাব্যের চরম ব্যর্থতা। মধুসূদনের কবিব্যক্তিত্ব মূলত অন্য ধাতুতে গড়া। কবির মধ্যে একটা বিপুল কর্মযজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড সর্বদা প্রজ্বলিত। এমন কি তিলোত্তমাসম্ভবেও কবি দেশী-বিদেশী কাব্যকানন থেকে সৌন্দর্য-চয়নের বিস্তৃত কর্মে অভিনিবিষ্ট। বৈষ্ণব কবিদের ভাবরাজ্যের কোমল ললিত গীতের পরিবেশে পরিভ্রমণে তাঁর স্বাভাবিক জাগরণ ঘটে নি, অর্ধ সুপ্তি ও তন্দ্রার রেশই কেবল বিস্তারিত হয়েছে।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের যে অংশ প্রকাশিত হয়েছিল কবি নিজে তাকে "প্রথম সর্গ। বিরহ" নামে অভিহিত করেছেন। রাধার প্রেম-বিরহের প্রকাশই এই কবিতাগুলির অভিপ্রায়। সাধারণভাবে বিরহের পটভূমিকায় প্রেমময়ী নারীর চরিত্র-চিত্রণের সার্থকতা মধুসূদনের করায়ত্ত ছিল—বীরাঙ্গনা কাব্যে তার প্রমাণ আছে। কিন্তু আলোচ্য কাব্যে বিরহবর্ণনা সাফল্য লাভ করে নি। বিরহ সম্পর্কে কোনো তত্ত্বচেতনা মধুসূদনের ছিল না। বিরহেই প্রেমের সার্থকতা বলে তিনি কোনোকালেই মনে করেন নি। এখানেও বিরহের বেদনাবোধ মিলনের তীব্র আর্তিকেই ব্যক্ত করেছে। প্রায়ই বিরহবেদনাকে আন্তরিক বলে মনে হয় না। মিলনকামনাটিকেই মনে হয় সত্য। বিরহ যেন কবিকৃত বিচ্ছেদ-যবনিকা মাত্র। রাধাকে জড়পুত্তলীবৎ তার সামনে অভিনয় করতে হয়েছে। ক্রন্দনে তাই প্রাণ নেই। তা যেন বানিয়ে বলা কথার মালা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক অলংকারের সঙ্কলন। কিন্তু এই যবনিকা উঠে গেলেই প্রাণ-চঞ্চলা নারীর লাস্যময় বাসনা ভাষারূপে অনেকটা সার্থকতা পেয়েছে।

'বংশীধ্বনি' কবিতাটি ঠিক বিরহ-বিষয়ক নয়। আসন্ন মিলনাকাঙ্ক্ষার স্ফূর্তি এর মধ্যে প্রকাশিত—

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।

চাতকী আমি স্বজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন ?
যাক্ মান, যাক কুল, মন-তরী পাবে কূল,
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ !

আবার বসন্তের ভ্রান্তি-উল্লাসেও প্রাণের স্পর্শ আছে। ('বসন্তে' কবিতা দ্রষ্টব্য)।

ব্রজাঙ্গনার দ্বিতীয় সর্গের প্রথম ও একক অসম্পূর্ণ কবিতাটিও প্রাণের চঞ্চলতাশূন্য নয়—

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে ?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥

উপরের আলোচনা থেকে রাধার প্রেমবিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা চলে।—

প্রথম। বিরহের ভাব-অনুভূতি একান্ত স্থূল ও কৃত্রিম ভাবে প্রকাশিত।

দ্বিতীয়। মিলনকামনা বা মিলনপ্রয়াস বর্ণনাই তুলনায় অধিক প্রাণচঞ্চল।

তৃতীয়। রাধার চরিত্রের কোন স্পষ্টমূর্তি এ কাব্যে রূপায়িত না হলেও, আভাসে তাকে ব্রজাঙ্গনা পল্লীবালিকা বলে ততটা মনে হয় না, যতটা মনে হয় বিলাসিনী নাগরী হিসেবে। প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনো অন্তর-সম্পর্ক নেই। বর্ষাবসন্তে-নদীতীরে-পর্বতকন্দরে তার পরিক্রমা, ফুল-পাখিদের সঙ্গে আলাপ তাই স্বতঃস্ফূর্ত বলে গ্রহণ করা চলে না॥

॥ পাঁচ ॥

প্রকৃতির প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গির বিচার করতে গিয়ে নিসর্গ-চিত্রাঙ্গনে তাঁর দক্ষতার সার্থকতা ও সীমানির্দেশের চেষ্টা করেছি। এখন সাধারণভাবে ব্রজাঙ্গনার রূপরচনারীতির কিছু পরিচয় নেওয়া যাক।

ব্রজাঙ্গনা গীতিকবিতা। আধুনিক কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আবেগানুভূতির প্রকাশ সেখানে নেই ঠিকই কিন্তু এর আত্মকেন্দ্রিক মানবানুভূতির উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি পুরানো ধরনের গীতিকবিতার রাজ্যে এর স্থানটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই ব্রজাঙ্গনার রূপধর্মে গীতিকবিতার আঙ্গিকলক্ষণ কতটা

অনুসৃত হয়েছে তার সন্ধান করা যেতে পারে। প্রাচীন বা আধুনিক কালের গীতিকবিতার দেহরূপে কতকগুলি মিল সহজেই চোখে পড়ে। একালের মত সেকালেও গীতিকবিতায় একটি ভাবকেন্দ্রেই কবির লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকত। স্তবকে স্তবকে সেই ভাবকেন্দ্রটিই যেন শতদলের এক-একটি দল মেলে দিত। এই ভাবগত অশিথিল ঐক্যরক্ষা করার জন্য সেকালেও কবিরা বেশ সতর্ক থাকতেন। পদাবলীর কবিতায় আয়তনের সংক্ষিপ্ততাই তার প্রমাণ। কোনো কোনো কবিওয়ালা দীর্ঘ আকারের কবিতা লিখেছেন কিন্তু ঘননিবদ্ধ ঐক্য রক্ষা করতে পারেন নি। রূপ-বিচ্যুতি ঘটেছে। একালে কবিরা কিন্তু রচনার আকার দীর্ঘায়ত করেও ভাব-রূপে নিবিড় ঐক্য বজায় রাখতে সমর্থ। এই রূপ-রচনাগত সিদ্ধি গীতিকবিতার সার্থকতার পক্ষে অনিবার্য, কারণ ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করার সুযোগ থাকায় গঠন-শিথিলতার ভ্রান্তিতে পড়বার আশঙ্কা এখানে প্রতিপদে।

মধুসূদনের কবিতাগুলির আকৃতি ক্ষুদ্র। আমাদের প্রাচীন পদাবলীর তুলনায় কিছু দীর্গ হলেও এদের দীর্ঘাকৃতি কবিতা বলা চলে না। কাজেই ভাবরস ও দেহরূপে এদের মধ্যে নিপুণ গঠন-সুষমা প্রত্যাশা করা যায়, বিশেষ করে মেঘনাদবধ কাব্য ও বীরাঙ্গনায় তিনি যে গঠন-ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু দু চারটি কবিতার অতি সাধারণস্তরের সাফল্য ব্যতীত কবির চেষ্টা এদিক দিয়ে ব্যর্থই হয়েছে। 'প্রতিধ্বনি', কৃষ্ণচূড়া', 'গোধূলি', 'বংশীধ্বনি' (১নং), 'বসন্তে' (২নং) প্রভৃতি কবিতায় ভাবরসে গভীরতা না থাকলেও রূপগত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে। একটিই অনুভূতি এর আদ্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু অধিকাংশ কবিতায় প্রসঙ্গচ্যুতি, দ্বিধা বা ত্রিধা বিভক্ত দেহরূপ, ভাবকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন স্তবকের প্রক্ষেপ ঐক্যানুভূতি তথা গীতি-আবেদনকে ব্যাহত করেছে। উদাহরণ হিসেবে 'ময়ূরী' কবিতাটির উল্লেখ করা চলে। প্রথম স্তবকে বিরস-বদনা ময়ূরীকে দেখে রাধার জিজ্ঞাসা, 'না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি হৃদয় কাঁদে ?' দ্বিতীয় স্তবকে শিখিনীর সঙ্গে রাধার সহমর্মিতার উল্লেখ। কিন্তু কারণটি ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। 'নবীন নীরদে প্রাণ তুই করেছিস দান—সে কি তোর হবে ?' তা হলে দেখা গেল, শ্যামচাঁদের বিরহে ময়ূরীর হৃদয় কাঁদে না। রাধার ধারণাটি ভ্রান্ত ছিল। দ্বিতীয় স্তবকে এই ভ্রান্তির স্বীকৃতি ছিল প্রয়োজনীয়। অন্যথায় আসল কারণের আবিষ্কার অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে ভাবগত কোনো

সাদৃশ্য নেই, কার্য-কারণের যোগ বা পারম্পর্যও নেই। এর পরে পঞ্চম (শেষ) স্তবকে আবার শ্যামচাঁদের অভাবে ময়ূরীর বেদনার উল্লেখ একেবারেই অর্থহীন। মাঝখানে তৃতীয় স্তবকে নবীন মেঘের সৌন্দর্য দর্শন এবং চতুর্থ স্তবকে কৃষ্ণরূপের বর্ণনা উভয়ের সাদৃশ্যকে ফুটিয়ে তুলেছে, কিন্তু পাঁচটি স্তবকে মিলে ভাবরস ও রূপের ঐক্য আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কোনো বিশেষ অনুভূতি পাঠকের মনে দানা বেঁধে ওঠে না।

'বসন্তে' (১নং) কবিতার গঠনে বিচ্যুতি এসেছে অন্যদিক থেকে। কবিতাটিতে ভ্রান্তিবিলাস ও বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে ভ্রান্তির মায়াজাল থেকে কঠিন পৃথিবীতে অবতরণের ভাব আছে। প্রকৃতির সুসজ্জিত মূর্তি দেখে রাধার মনে হয়েছে কৃষ্ণ এবার আসবেই "আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব"। এই ভাবটিকেই প্রকৃতিরূপের বর্ণনা ও ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তোলা হয়েছে পঞ্চম স্তবক পর্যন্ত। ষষ্ঠ স্তবকে মোহভঙ্গ— কল্পনাবিলাসের মায়াজাল ছিন্ন।—

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি
করি এ মিনতি !
কেন অধমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি ?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণ ?

কিন্তু এখানে ভ্রান্তিভঙ্গের তীব্র আর্তনাদ কোথায়? ভাষারূপে অনুভূতিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে না পারার প্রধান কারণ কবিতাটির রূপগঠনে এই স্তবকের যোগ্যস্থানের উপলব্ধির অভাব। আসলে ভাবের এখানে climax— রূপের ক্ষেত্রেও তাই হওয়া সঙ্গত। কিন্তু তা হয় নি। ব্যর্থতা এখানেই। এবং আরও ব্যর্থতা পরবর্তী স্তবকে ভ্রান্তিবিলাসের পুনরুল্লেখে—

চল, ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি—

ষষ্ঠ স্তবকে আকস্মিক ভ্রান্তিভঙ্গ-জনিত তীব্র আর্তনাদে climax এবং সপ্তম স্তবকে দীর্ঘস্থায়ী করুণ ক্রন্দনের উপসংহারই এই কবিতার প্রত্যাশাকে রক্ষা করতে সমর্থ হত।

প্রসঙ্গত একটি কথার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। রূপগঠনগত এজাতীয় বিচ্যুতি ভাবরসের অস্বাদকেও স্খলিত করে। কারণ এদের সম্পর্ক অদ্বয়। উপরের কবিতা দুটির দেহভঙ্গির আলোচনায় নিশ্চয়ই এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ ছাড়া কোথাও কোথাও মূল ভাবরসের সঙ্গে সম্পর্কহীন মন্তব্যের অনুপ্রবেশ ঐক্যবোধে বাধার সৃষ্টি করেছে। যেমন 'যমুনাতটে' কবিতায় রাধা প্রথমে যমুনার সমুদ্র-বিরহের বেদনার সঙ্গে আপনার কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনার সাদৃশ্য খুঁজেছে। তার পরে পতিমিলনে সৌভাগ্যবতী যমুনার সঙ্গে আপন অবস্থার পার্থক্যে বেদনানুভব করেছে। কিন্তু এর মধ্যে অকস্মাৎ—'তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী' 'ভিখারিণী রাধা এবে তুমি রাজরাণী' বা 'উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতী' এর মত মন্তব্য সৌন্দর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। মধুসূদনের 'ঐশ্বর্যবাদে'র সর্বাপেক্ষা দুবল এবং অসঙ্গত এই প্রয়োগ আমাদের ব্যথিতই করে।

কোথাও আবার পুরাণপ্রসঙ্গের উল্লেখ। পুরাণ ও মহাকাব্যের রাজ্য থেকে ভেসে এসে এসব প্রসঙ্গ মূল গীতিরসের প্রবহমানতাকে ব্যাহত করেছে এবং কষ্টকল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। 'বংশীধ্বনি' (২নং) কবিতায় কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে রাধার মন চটুল চাপল্যে নৃত্য করে উঠেছে, কিন্তু তার মধ্যে এই পুরাণ-কাহিনীর স্থান কোথায়—

> শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র রুষিয়া
> গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
> সাগরে অনেক নগ পশিয়া
> রহিল ডুবিয়া—জলধিভবে।
> সে শৈল-সকল শির উচ্চ করি
> নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী।

একটি কষ্টকল্পিত সম্বন্ধে এই স্তবকটিকে সমগ্র কবিতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ-চিত্রের অন্তর্নিহিত গাম্ভীর্য এই ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হবার নয় এবং এ-কবিতার সুরের পক্ষে অভিপ্রেতও নয়। রাধা পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত নয়। তার মুখে এজাতীয় প্রাচীন ঘটনার উল্লেখ ভাবকে কৃত্রিম করে তোলে। আবার 'পৃথিবী' কবিতায় দয়াবতী-বসুন্ধরার শান্ত কোলে বিরহ-তাপিত রাধা আশ্রয় চেয়েছে। [অবশ্য কবিতাটির মাঝখানে একটি স্তবকে পৃথিবীর সতীত্বের প্রসঙ্গ তুলে তার সঙ্গে কিছু কলহেরও অনাবশ্যক

সূচনা আছে।] এই আশ্রয়-কামনায় যুক্তি-বিস্তার ছাত্রের মত রাধা পৃথিবীর সহৃদয়তার পূর্বকাহিনীর প্রসঙ্গ তুলেছে—

দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে।
যবে দশানন অরি,
বিসর্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা, বরাননে।
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকি-রমণী।

যদিও বৈদেহীর বেদনার্দ্র কাহিনীর সুর রাধার মানসভাবের সঙ্গে সাধারণ সামীপ্য রক্ষা করেছে।

মহাকাব্যের রূপ-গঠনে এ ধরনের পুরাণ-কাহিনী উল্লেখের তাৎপর্য আছে। এর ভাবগাম্ভীর্য, কিছু বস্তুভার এবং পটভূমিগত বিস্তৃতি মহাকাব্যিক সমুন্নত রসাবেদনে সাহায্য করে। মধুসূদনের কবি-ভাষা মহাকাব্যের ক্লাসিক রীতির সুরে বাঁধা। গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্রেও কবি সর্বদা তার হাত থেকে মুক্তি পান নি।

কাব্যদেহ-নির্মাণে, উপমা-চয়নের প্রথানুগত্যে ও চিত্রাঙ্কণের প্রত্যক্ষ স্পষ্টতায় মধুসূদন চিরকালই ক্লাসিক-ধর্মী। তাতে অন্যত্র কাব্যদেহ-গঠনে ভাস্কর্যসুলভ সৌকর্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যঞ্জনাধর্মী গীতিকবিতা তাঁর পরধর্ম। মধুসূদনের কাব্যদেহে আলংকারিক অর্থে ব্যঞ্জনার অপ্রতুলতা না থাকলেও সত্যকার রোমান্টিক রহস্যোদ্ভেদকারী অস্পষ্টতা, ব্যাকুলতা ও সুদূরাভিসার নেই। আলোচ্য কাব্যের রূপনির্মাণে তুলনার ভাবটি অতি প্রকট। অধিকাংশ কবিতায় নিসর্গ বস্তুটির সঙ্গে রাধার বিরহবেদনা, মিলনবাসনা সাদৃশ্য বা বৈপরীত্যের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছে। পূর্বেই তা দেখেছি। উপমাদির অতিব্যবহার অন্য কাব্যের পক্ষে প্রচণ্ড ভার হয়ে দাঁড়ায় নি, এ কাব্যের ক্ষেত্রে কিন্তু তাই ঘটেছে।

কৃষ্ণকে ব্রজসুধানিধি, রাধাকে ব্রজ-কুমুদিনীর সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। নলিনীপ্রভাকর, অলি-কুসুম, কুসুম-সমীরণ, বারি বিহনে সফরীর প্রাণধারণ, ঋতু-ধরণীর প্রেমবিলাস, বদন-চন্দ্র, বিচ্ছেদ-পাহাড়ের আঘাতে প্রেমতরীর বিদীর্ণ-হওয়া, মেঘ-বিদ্যুতের মিলন-বিরহ প্রভৃতি সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের ব্যবহার প্রচুর। এরা মামুলি এবং প্রাণহীন। অতিব্যবহার এদের জীর্ণ

করেছে। রাধার প্রেমভাবের অকৃত্রিম বেদনা এর মধ্য দিয়ে দ্যোতিত হবার নয়। উপমাদির অপূর্বত্ব ও অভিনবত্বই আস্বাদ্য। অনেক সময়ে অবশ্য বস্তুসঞ্চয় পুরাতন হলেও বাচনভঙ্গির নবীনতায় তা প্রাণময় হয়ে ওঠে। আলোচ্য কাব্যে প্রায়ই তা ঘটে নি। দু একটি চিত্রে যে বিরল সৌন্দর্য-সার্থকতা মিলছে তা অধিক সংখ্যায় অনুসৃত হলে কাব্যটি উচ্চতর মর্যাদা লাভে সমর্থ হত। যেমন, যমুনা—

কুল কল কল কলে স্তুতরঙ্গ দল চলে,
যথা গুণমণি।
সুধাকর-কররাশি সম লো শ্যামের হাসি
শোভিছে তরল জলে…… .

এই চিত্রে অলঙ্করণে প্রচলিত বিধি কিছু ভঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি কৃষ্ণের যে দেহকান্তি ফুটে উঠেছে তা 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়া যায়।'

আবার 'গোবর্দ্ধন গিরি' কবিতাটিতে পর্বতের রাজকীয় গর্বোদ্ধত দৃঢ় মূর্তিটি দু-একটি স্তবকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

রাজা তুমি; বনরাজি ব্রততী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে;
কুসুম রতনে তব বসন খচিত;
সুমন্দপ্রবাহ—যেন রজতে রঞ্জিত—
তোমার উত্তরীরূপ ধরে;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত।

উপমাদির ভার থাকা সত্ত্বেও পর্বতের পুরুষরূপ প্রকাশ পেয়েছে! পর্বতের নর্মরূপের বর্ণনাই এখানে প্রত্যক্ষ, দৃঢ়তাবাচক একটি শব্দ বা উপমাও ব্যবহৃত হয় নি, তবুও ব্যঞ্জনায় পৌরুষ প্রকাশিত হয়েছে। এই সার্থকতার পেছনে পৌরুষের প্রতি কবির স্বাভাবিক মানসপ্রবণতাই কি দায়ী নয়?

অতিকথন বহুক্ষেত্রে চিত্ররসের আবেদনকে নষ্ট করেছে। বলা কথার চেয়ে না-বলা কথার শক্তি যে কখনও বেশি হতে পারে মধুসূদন আদৌ তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। তুলনীয় বস্তুগুলিকে অতি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন কবি।

নীচের কবিতার প্রথম দুটি ত্রিপদীতে যে ভাবের ব্যঞ্জনা, তৃতীয় ত্রিপদীতে একটি স্পষ্ট তুলনায় তা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে—

> আর কি পরিবে, কভু ফুলহার,
> ব্রজকামিনী ?
> কেন লো হরিলি ভূষণ লতার—
> বনশোভিনী ?
> অলি বঁধু তার কে আছে রাধার—
> হতভাগিনী ?

রাধার সঙ্গে লতার তুলনার ভাবটি মনোহর। নায়িকার তন্বী দেহের পেলব লালিত্য এবং প্রাণময় সবুজবর্ণ এই চিত্রে ব্যঞ্জিত। কিন্তু অলি-কুসুমের অতি পুরাতন উপমার অতি স্পষ্ট প্রয়োগে এই সামীপ্যের মায়ালোক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

ব্রজাঙ্গনায় আঙ্গিকের নানা কারুকর্ম আছে। জটিল ও বিচিত্র স্তবক নির্মাণে কবিপ্রাণ এক আনন্দচঞ্চল নৃত্যে মেতে উঠেছে। কিন্তু এ কৌশল কবিকর্মে উন্নীত নয়, এ কাব্যে কবির প্রাণের উদ্বোধন নেই। গীতিকবিতার দেহনির্মাণে ব্যর্থতায়, চিত্ররচনার স্থূলত্বে, মামুলি উপমাদির অতিভারে এবং প্রেমবোধের কৃত্রিমতায়, রাধার চরিত্রজিজ্ঞাসার অভাবে এবং কবির আত্ম-উপলব্ধির প্রতিফলন না ঘটায় এ কাব্যে কবির ব্যর্থতা প্রায় সর্বাঙ্গীণ। কবির চিত্তজাগরণের এ-জাতীয় সম্পূর্ণ অভাব তাঁর আর কোনো কাব্যেই ঘটে নি॥

১. একই সময়ে রাজনারায়ণ বসুকে অন্য একটি চিঠিতে তিনি লেখেন,

"In the present work you will see nothing in the shape of 'Erotic similes', no silly allusions to the loves of the lotus and the moon; nothing about fixed lightnings and not a single reference to the incestuous love of Radha."

২. আমার লেখা "কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী" বই দ্রষ্টব্য। সে গ্রন্থে এ বিষয়ে তথ্য-প্রমাণাদি উপস্থিত করা হয়েছে।

৩. এদেরই লক্ষ্য করে মধুসূদন একটি সনেটে লিখেছিলেন,—

> কে কবি ? কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
> শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
> সেই কি সে যমদমী ?

৪. প্রসঙ্গত "Ottava Rima"-র স্বরূপ কি দেখা যাক। ইতালিতে আবিষ্কৃত এই শ্রেণীর স্তবকসজ্জায় আটটি চরণ থাকে। প্রত্যেক চরণে ১১টি Syllable। এদের মিলের পদ্ধতি হল—কখ কখ কখ গগ। পরবর্তীকালে ইংরেজি কবিতায় এর বহুল প্রচলন হয়।

৫. Metrically these odes were miracles of complex structure, in which the smaller foot-units were finely wrought into 'cola' and lines of varying length and these into a 'strophe' which was balanced by 'antistrophe'.

—[C. M. Ing,]

৬. এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে—

"'মধুসূদনের পূর্ব-পরিচিত এক ব্রাহ্মণ কোন মোকদ্দমার জন্য তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন। মধুসূদন জানিতেন ব্রাহ্মণ 'সখীসম্বাদ' গান করিতে বিশেষ পটু। সঙ্গীতপ্রিয় ব্যারিষ্টার অগ্রে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দশ-পনেরোটি 'সখীসম্বাদ' শ্রবণ করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহার কাগজ-পত্র দেখিয়া মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন।" —[নগেন্দ্রনাথ সোম]।

৭.

কভু ভাবি কোন ঝরণার
উপল বন্ধুর যার ধার—
প্রচণ্ড প্রপাতধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার—
গিয়ে তার তীরতরুতলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব সম রব স্থির
কান দিয়ে জল কলকলে।
সে সময়ে কুরঙ্গিণীগণ,
সবিস্ময়ে মেলিয়া নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে
অশ্রুজল করিবে মোচন। —[বিহারীলাল]

ভাল ছিল শীতকাল সে তো কামানল-জ্বাল
হৃদয় সহিত শাল এবে হবে দুরন্ত।
না ছিল কোকিল-শব্দ ভ্রমর আছিল জব্দ
উত্তর বাতাসে স্তব্ধ বৃক্ষ ছিল জীবন্ত॥
এবে বায়ু সাপে-খেকো ভুবন করিলে ভেকো
কেমনে কামের ডেকো সঙ্গে লয়ে সামন্ত।
অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি
ভারতেরে ভুলাইলি আঃ আরে বসন্ত॥ —[ভারতচন্দ্র]

ষষ্ঠ অধ্যায়
মেঘনাদবধ | মধ্যাহ্নের সূর্য

এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিক ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য

॥ এক ॥

সাফল্যে এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও মেঘনাদবধই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য। বীরাঙ্গনার সুমার্জিত দেহলাবণ্য এবং ছন্দ-সঙ্গীতের পূর্ণতর মূর্তি এ কাব্যে নেই, চতুর্দশপদীর কিছু কবিতার মৃত্যুদীর্ণ দুর্লভ প্রশান্তিও হয়তো এখানে অপেক্ষিত। কিন্তু সবলতায়, উল্লাসে ও হাহাকারে মধুসূদনের কবিপ্রাণ এখানে সর্বাধিক মুক্ত। নিখিলের বিস্তারে তাঁর কাব্যপক্ষ এবং চিত্তপক্ষও এতখানি প্রসারিত হয় নি আর কখনও।

তিলোত্তমা কাব্যরচনার উৎসে কবিচিত্তের যে জিগীষা-বৃত্তি দেখেছি, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার যে তীব্র বাসনা সেখানে প্রকাশিত হয়েছে, মেঘনাদবধের সৃষ্টিমূলে তার কিছুমাত্র সক্রিয়তা নেই। ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনার পশ্চাতেও বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণা বিশেষ ছিল না। সে কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। পরবর্তীকালে চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনার যুগে বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণা ব্যতীত অপর কোনো কোনো মানসপ্রবণতা তাঁর সৃষ্টিমূলকে প্রভাবিত করেছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। মধুসূদনের কাব্যাবলীর মধ্যে মেঘনাদবধ এবং বীরাঙ্গনা কাব্যই মূলত বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণার সৃষ্টি।

নানা কারণে কবিরা কাব্য রচনা করেন। অনুরোধ-উপরোধে, সাময়িক পত্রের তাগিদে, অর্থের প্রয়োজনে আপনার ক্ষমতা প্রমাণার্থে, সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব একটা কিছু করবার বাসনায়, জাতীয় সাহিত্যের কোনো পরিকল্পিত উন্নতি সাধনের জন্য। এই সব প্রেরণার ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে, সাহিত্যিক মূল্য নেই। মধুসূদন সত্যকার কাব্যপ্রতিভার অধিকারী হলেও তাঁর চরিত্রের মধ্যে এত সব বিচিত্র প্রবণতা কাজ করত যাতে কাব্যরচনার মূলে

সর্বদা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণার কেন্দ্রটি খুঁজে পাওয়া যেত না। কাব্য-রচনার মত নাট্য-রচনার ক্ষেত্রেও প্রথমদিকে সমসাময়িক বাংলা রঙ্গমঞ্চের দাবি মেটানো এবং লোককে "অলীক কুনাট্যরঙ্গে" নিমজ্জিত হবার দুর্দশা থেকে রক্ষা করার বাসনা কাজ করেছিল। আবার শেষজীবনে রচিত নাটকদ্বয় প্রধানত অর্থাভাব দূরীকরণের বাসনায় জাত। নাটকের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণকুমারীর প্রেরণাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। প্রহসন দুইটির পশ্চাতে সংস্কারকের সমাজ-চেতনার বীজ ছিল বলেই মনে হয়। এইটুকু বলা যেতে পারে নিশ্চিতভাবে যে মেঘনাদবধ কাব্যেই কবিচিত্ত সর্ব-অশুদ্ধিমুক্ত হয়ে কাব্যিক উপলব্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হল। সাহিত্যিক মধুসূদনের প্রথম সর্ব বাহিরাবরণমুক্ত বিশুদ্ধ রসপ্রেরণার সৃষ্টি মেঘনাবধ কাব্য।

মনের দিক থেকে মেঘনাদবধ রচনাকালে কবি সর্বাধিক দ্বিধামুক্ত হয়েছিলেন। আপন ক্ষমতাকে যাচাই করে নেবার যে সাধনা তিলোত্তমায় নির্মাণের আগুন জ্বালিয়েছিল তা সিদ্ধ হয়েছে। আপন ক্ষমতার উদ্বোধনে কবিপ্রাণ ভরসার আশ্রয় পেয়েছে। এবারে ক্ষমতা যাচাইয়ের ছেলেমানুষি নয় আর। সৃজনের নিশ্চিত লক্ষ্যাভিমুখে পরমা গতি।

কাব্যরসিক, এবং দেশী-বিদেশী কাব্যসাহিত্যরসে পরিপুষ্টপ্রাণ, কবি-যশঃপ্রার্থী মধুসূদন যখন কলকাতায় এলেন তখন তিনি বিশিষ্ট ইংরেজি-জানা বাঙালী, ব্যর্থ ইংরেজি কাব্যের রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর প্রবেশাধিকার তখনও প্রমাণিত হয় নি। সম্ভবত ১৮৬০ সালের জুন-জুলাই মাসে তিনি মেঘনাদবধ কাব্য রচনা শুরু করেন। ১৮৫৮ সালের জুন-জুলাই মাসে শর্মিষ্ঠা নাটক রচিত হয়। সমকালের মানদণ্ডে উল্লেখ্য নাটক, প্রথম সার্থক প্রহসন রচনা করে মধুসূদনের আত্মশ্লাঘা কিছু তৃপ্ত হয়, ক্যাপটিভ লেডি রচনার পরে প্রতিকূল সমালোচনায় বিক্ষুব্ধ বিক্ষত হৃদয়ে আত্মশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ফিরে আসে। পদ্মাবতী নাটকে গ্রীক-পুরাণের কাহিনীর বাঙালী-করণ ঘটে। তিলোত্তমায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। তার মধ্য দিয়েও আসে নবপথিকৃতের সম্মানলাভ রসজ্ঞ সমালোচকদের প্রশংসা-বর্ষণে। তিলোত্তমার গাম্ভীর্যের পরেই ব্রজাঙ্গনার লালিতপেলবতায়ও তিনি হাত পাকান। ব্রজাঙ্গনার প্রথম দিকের কবিতাগুলি তিলোত্তমাসম্ভব শেষ হবার পূর্বেই রচিত। কাজেই মেঘনাদবধ রচনা আরম্ভের পূর্বে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে শুধুমাত্র প্রবেশের ছাড়পত্র পান নি, ইতিহাসসৃষ্টির মর্যাদা লাভ

করেছেন। মধুসূদনের কবিচিত্তের সম্পূর্ণ আবরণ মোচনের জন্য এই মর্যাদালাভ একরূপ অনিবার্য। মধুসূদনের মধ্যে জয়লাভেচ্ছু যে সত্তাটি চিরকাল বাস করত, জীবনের নানা কার্যে প্রবৃত্তি যুগিয়েছে সেই বিশেষ মনোবৃত্তিটিই। কবি পরবর্তীকালে বারবার যে যশোলাভের কামনা ব্যক্ত করেছেন, কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে যে অমরত্বের সাধনা করেছেন, ঐ জিগীষাবৃত্তিতেই তার উদ্ভব। কবির এই জিগীষাবৃত্তি আজ বহুলাংশে তৃপ্ত। কাজেই কেবলমাত্র সেই বৃত্তির প্রেরণায় বিচিত্রপথে ছুটে বেড়াবার প্রয়োজন অনেকখানি সংযত হয়েছে। ভারতীয় মহাকাব্য থেকে গ্রীক মহাকাব্য, আবার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজজীবন—কী বিচিত্র ভাববস্তু এককালে কবি কাব্য-ও নাট্যবদ্ধ করেছেন। তিলোত্তমার গাম্ভীর্য আর ব্রজাঙ্গনার কোমলতা, একের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, অপরের মিত্রাক্ষরের বিচিত্র জটিলতা একই সময়ে আয়ত্ত করার সাধনায় তিনি সিদ্ধ। স্রষ্টা-চিত্তের এই বহুমুখী গতি বিচিত্র বলে প্রশংসনীয়, ইতিহাস রচনার জন্য গৌরবমণ্ডিত। কিন্তু প্রকৃত রসসমৃদ্ধ সৃষ্টি একমুখী মনের ফসল। যে কটি বৎসর মধুসূদন সাহিত্যযজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন তার মধ্যে কখনই খুব নিশ্চিন্ত প্রশান্তচিত্ত তিনি হতে পারেন নি। একটা দ্রুততার ভাব তাঁর মধ্যে সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়। এই দ্রুতগতিতে কোন্ লক্ষ্যে তিনি পৌঁছুতে চান? অথবা এই দ্রুতগতি চলাই তাঁর লক্ষ্য? অতৃপ্ত দ্রুতগতি মেঘনাদ রচনাকালেও ছিল, কিন্তু এই কাব্যরচনাকালেই কবি কাব্যসাহিত্যের বিশুদ্ধ রসপ্রেরণা অনেকখানি নিশ্চিন্ত চিত্তে অনুভব করতে পেরেছিলেন। কবি এই কাব্য-রচনার প্রথম দিকে রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছেন—

> "But you know I am 'smit with the love of Sacred Song'. There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend! Night and day I am at them."

মেঘনাদবধ রচনাকালে মধুসূদন যশস্বী লেখক। বাংলা সাহিত্যে নতুনের দ্বার উন্মোচন করেছেন বলেও কোনো কোনো মহল থেকে ইতিমধ্যেই তিনি অভিনন্দিত হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর মত দ্রুতগামী ও অতিব্যস্ত লেখকের পক্ষে প্রস্তুতির সাধনা যথেষ্টই হয়েছে। গ্রীক পুরাণকাহিনীর বাঙালীকরণ যেমন অংশত সফল হয়েছে তেমনি ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর

নবরূপায়ণ অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে ; কবি-আত্মার ছন্দ-আধার অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারে নৈপুণ্য এসেছে, গম্ভীর-উদাত্ত এবং কোমলকরুণে অধিকার জন্মেছে। এই লগ্নে মেঘনাদবধ রচিত। এর চেয়ে মহালগ্ন তাঁর কবিজীবনে বোধহয় আর সম্ভব ছিল না।

মেঘনাদবধ রচনাকালে মধুসূদন বন্ধুদের, বিশেষ করে রাজনারায়ণ বসুকে, যে চিঠিগুলি লিখেছেন তার বিশ্লেষণ করে কবির মানসিক অবস্থার কিছু পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গের অর্ধাংশ সমাপ্ত হবার খবর দিয়ে তিনি রাজনারায়ণকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই লিখলেন—

> It is not that I am more industrious than my neighbours ; I am at times as lazy a dog as ever walked on two legs ; but I have fits of enthusiasm that come on me occasionally, and then I go like the mountain-torrent ! Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a Saint and teetotal prude, I never drink when engaged in writing poetry ; for, if I do, I can never manage to put two ideas together.

দ্বিতীয় সর্গের দুশ পংক্তি লেখা শেষ হয়েছে এই সংবাদ দিয়ে রাজনারায়ণকে তিনি লেখেন—

> I suppose you read the Bible. Well ! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see Meghanad finished by the end of the year.

ষষ্ঠ সর্গের সমাপ্তির সংবাদ দিয়ে তিনি লিখেছেন—

> A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed.

এই তিনটি পত্রাংশ বিশ্লেষণ করলে মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে মধুসূদনের

মনোজগতের কিছু নিগূঢ় সংবাদ মিলবে। প্রথমত, কবি মেঘনাদবধ কাব্য-রচনাকালে আবেগের অতি উত্তপ্ত ও প্রবল তাড়নায় প্রতি মুহূর্তে বিপুলভাবে তাড়িত হতেন। এই 'fits of enthusiasm'কে তিনি নিজে 'mountain-torrents'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। মেঘনাদের মৃত্যুর বর্ণনা তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে পর্যন্ত কি ভাবে নাড়িয়েছিল তার পরিচয় আছে উদ্ধৃত পত্রগুলির শেষেরটিতে। আবেগের এই প্রবলতা প্রশমিত হলে যে প্রশান্তস্তম্ভিত মানসিকতার উদ্ভব হয় সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির পক্ষে তা-ই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে পণ্ডিতেরা মনে করে থাকেন। কিন্তু জীবনের এই পূর্ণতম মুহূর্তেও সেই প্রশান্তি তাঁর চিত্তলোকে আসে নি। আবেগকম্পিত চিত্তই তাঁর স্রষ্টা-চিত্ত—কি মেঘনাদবধ রচনাকালে, কি চতুর্দশপদী রচনার যুগে। এই আবেগ-প্রগল্‌ভতার সূত্রেই যে তাঁর কাব্যের অনেক ত্রুটি এবং অসংযম ভেসে এসেছে একথা স্বীকার করে নিতে হয়। তেমনি একথাও না মেনে উপায় নেই যে মেঘনাদ রচনার সময়েই কাব্যলক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য তাঁর চিত্তসাগরে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল, অন্য কোনো কাব্যরচনাকালে এরূপ ঘটে নি। এ কাব্যের প্রেরণা সাহিত্যিক এবং আন্তরিক, কৃত্রিম ক্লাসিসিজ্‌মের অনুকরণ এতে নেই।

দ্বিতীয়ত, আগামী সদরপরীক্ষা দেবার সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়ে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য সমাপ্ত করবার সঙ্কল্প প্রকাশ করছেন। তাঁর জীবনে এঘটনাও বিস্ময়কর। এত একাগ্র কাব্যসাধনা মধুসূদনের কবিজীবনে দ্বিতীয়রহিত। সেখানে অর্থোপার্জনের সঙ্গে কাব্যসাধনার দ্বন্দ্ব সেখানে এত সহজে অর্থোপার্জনের পথ পরিহার করলেন যিনি, তিনি নিশ্চয়ই "smit with the love of sacred song."

কোনো কাব্য যদি বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণায় সৃষ্ট হয় তাহলেই তার শিল্পমূল্য অতি উচ্চ হবে এরূপ মনে করবার কারণ নেই। বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণাজাত রচনাও রচনাশক্তির দুর্বলতার জন্য উৎকর্ষলাভে অসমর্থ হয়েছে এরূপ উদাহরণ সুপ্রচুর। বাংলা সাহিত্য থেকেই একটি সর্বজ্ঞাত উদাহরণ উদ্ধার করা যায়। তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তী। তাঁর প্রেরণা ছিল বিশুদ্ধ সাহিত্যিক। স্বদেশহিতৈষণা কিম্বা লোকশিক্ষা অথবা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার-সাধন, সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন ধারা সৃষ্টির গৌরব এই নির্জনপ্রকৃতি মানুষকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আকর্ষণ করে নি। কিন্তু তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গলেও সার্বিক উৎকর্ষ পান নি, সামান্য ও বিক্ষিপ্ত সার্থকতাই

মাত্র দেখিয়েছেন। সাহিত্যিক প্রেরণার সঙ্গে নির্মাণ-ক্ষমতার যৌগপত্য প্রয়োজন। বিহারীলালের ব্যর্থতা তাই নবীনচন্দ্র-হেমচন্দ্র প্রমুখের তুলনায় অপেক্ষাকৃত জটিল। নবীনচন্দ্রের ব্যর্থতা রূপরচনার ব্যর্থতায় তো বটেই, কিন্তু তাঁর গলদ আরও গোড়ায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ ও বহুখ্যাত কাব্যের পেছনের প্রেরণা সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় এবং দার্শনিক—সাহিত্যিক নয়। আবার পাশাপাশি এ কথাও মনে রাখা উচিত যে কবির মনোরাজ্যটি বিশেষ জটিল বলেই বহুক্ষেত্রে সচেতন প্রেরণার অন্তরালে নানা অচেতন ও অর্ধচেতন সূত্র সক্রিয় থাকে। সাহিত্যিক প্রেরণা বিশুদ্ধ নয় এমন সৃষ্টিও উচ্চ মর্যাদা পেতে পারে। স্রষ্টার কবি-চিত্তের জাগরণ তাঁর অজ্ঞাতসারেও ঘটতে পারে।

এই তত্ত্বকথা অবতারণার কারণ হল একটা বিশেষ চিন্তার দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করা। মধুসূদনের মেঘনাদবধ রচনার প্রেরণা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, তাই-ই কাব্য-সাফল্যের চরম মাপকাঠি নয়। রূপরচনায় সেই বিশুদ্ধ প্রেরণাকে জাগ্রত রাখায় কবির সচেতনতা ও সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিচার প্রয়োজন। অবশ্য প্রেরণার বিশুদ্ধিও অনেকখানি রূপরচনার নিরিখেই ধরা পড়ে। আবার মেঘনাদবধের প্রেরণা যতখানি বিশুদ্ধ ও সাহিত্যিকই হোক না কেন, কবির কয়েকটি ব্যক্তিক প্রবণতা (যার সঙ্গে সাহিত্যিক বিশুদ্ধির কোনো অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই) যে কবির শিল্পদৃষ্টিকে এই কাব্যেও মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত করেছে এমন প্রমাণ আছে।

মোহিতলাল মজুমদার মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর বিশ্রুত গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন,

> "আমি এই গ্রন্থে মেঘনাদ-বধ কাব্যেরই বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছি, তার কারণ, উহাই মধুসূদনের একমাত্র কাব্যকীর্তি—যাহা শুধুই তাঁহার কবি-প্রতিভার নয়, তাঁহার কবি-জীবনের, বা তাঁহার অন্তরস্থ সেই কবি-পুরুষেরও পূর্ণ পরিচয় বহন করিতেছে।...অন্য কাব্যগুলির সম্বন্ধে প্রসঙ্গ-ক্রমে যাহা বলিয়াছি তাহার অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।"

আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন,

> মধুসূদনের মেঘনাদ-বধই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কীর্তি। তাহার পূর্বে বা পরে তিনি যাহা কিছু রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কবি-মানসের কাব্যকলা-কুতূহল প্রকাশ পাইয়াছে।...এই দুই কাব্যের (অর্থাৎ

ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনার) ভাব-কল্পনা খুব গভীর নহে—কাব্যকলার সংস্কার ও সমৃদ্ধিসাধনই ইহাদের একমাত্র সার্থকতা।”

মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে কবি আপনাকে সর্বাধিক ঢেলে দিয়েছেন একথা ঠিক। নানা চ্যুতি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই কাব্যই কবির শ্রেষ্ঠ রচনা এ সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কি শিল্পরূপের দিক থেকে কি কবি-আত্মার প্রতিফলনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কাব্যকবিতাগুলিকেও অস্বীকার করা যায় না। কবির অন্যান্য কাব্যের শিল্পসার্থকতার বিচার যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে করবার চেষ্টা হয়েছে এই কারণে যে তাদের অনেকের মধ্যেই এমন কিছু শিল্পলক্ষণ আছে যাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। (মধুসূদনের জীবনের উল্লাস, ট্রাজিক হাহাকার, প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে সুবিপুল ক্লান্তির মিশ্রণ, স্তিমিত কল্পনার পক্ষকামনা, কখনও অত্যুৎসাহ কারুনির্মাণ সব জড়িয়েই তাঁর কবি ব্যক্তিত্বের পরিচয়। মধুসূদনের কবিব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিচয় নিতে গেলে তাই মেঘনাদবধ কাব্য একান্ত-ভাবেই অপর্যাপ্ত বিবেচিত হবে। মধুসূদন মেঘনাদবধে আপনাকে ঢেলে দিয়েছেন অনেকখানি, কিন্তু সবটুকু নয়; অন্য কাব্যকবিতায় তাঁর আত্মা কেবল পুনরুক্তই হয়েছে, কোনো নবপ্রবণতা দেখায় নি, একথা ঠিক নয়। মধুসূদনের কবিব্যক্তিত্বের সামগ্রিক স্বরূপ এমন কি তাঁর কাব্যগুলির মধ্যেও মাত্র নেই।) কবির বাংলা ও ইংরেজি কাব্য (অপূর্ণ রচনাগুলিও এক্ষেত্রে অবহেলার বিষয় নয়), ইংরেজিতে লেখা পত্রাবলী, নাট্যগ্রন্থগুলির সমন্বিত বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া কবিকে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। কাব্যমূল্যের বিচারে এদের মধ্যে কারুর স্থায়িত্ব আছে, কারুর নেই—উৎকর্ষের তারতম্য আছে এদের মধ্যে। অবশ্য একথা ঠিক একখানা উৎকৃষ্ট কাব্য লিখেও কোনো কবি অমরত্ব লাভ করতে পারেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ অমরত্বের পক্ষে যথেষ্ট। (বর্তমান লেখকের বিবেচনায় বীরাঙ্গনা বা চতুর্দশপদীও সে পক্ষে অনুপযুক্ত নয়)। কিন্তু কবি আরও যা রচনা করেছেন তাকে অস্বীকার করা যায় কি করে ?

মেঘনাদবধের উৎকর্ষ ও গুরুত্ব স্বীকার করেও একে তাঁর প্রতিভার একক নিদর্শন, এবং কবি-আত্মার সামগ্রিক প্রতিবিম্বন বলে গ্রহণ করা যাবে না। এই কথাটি মনে রেখেই মেঘনাদবধের বিচারে অগ্রসর হতে হবে। অযথার্থ পরিপ্রেক্ষিত কাব্যজিজ্ঞাসাকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য অলিখিত থেকে গেছে, এইরূপ একটি কথা

সমালোচক মহলে শোনা যায়। অর্থাৎ তাঁর লিখিত কাব্যকবিতাগুলির মধ্যে মধুসূদনের প্রতিভার সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে নি। মধুসূদন সেই অলিখিত মহাকাব্যের মহাকবি। কিন্তু এজাতীয় চিন্তা অনেকটা মরীচিকা অনুসরণের মত। মধুসূদন কি লিখতে পারতেন তার আলোচনা প্রয়োজনহীন, মধুসূদন কি লিখেছেন তাই-ই বড় কথা। তাঁর শক্তি যেমন বিচার্য তেমনি লক্ষ্য করা দরকার তাঁর শক্তির সীমানা। দুর্বলতা আর সার্থকতা জড়িয়ে মেঘনাদবধই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য। এর চেয়ে মহত্তর কাব্য তিনি লিখতে পারতেন না, কারণ জীবনে অধিকতর ভারসাম্য তাঁর আসে নি। পূর্বেও যেমন তা সম্ভব ছিল না, পরেও নয়। প্রস্তুতির জন্য যে সামান্য কালক্ষয় তিনি করেছেন তাকে ন্যূনতম বলা যায়। আর মেঘনাদবধ রচনার পরে বীরাঙ্গনার সিঁড়ি ধরে চতুর্দশপদীতে ধীরে নেমে যাওয়া কিছু আকস্মিক মনে হলেও গানের সমে এসে থামার মত যেন সুনির্দিষ্ট। মেঘনাদবধ অন্য কোনো মহাকাব্যের ভূমিকা নয়। মেঘনাদবধের শেষে সর্গটি সমাপ্ত করার পরে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

> I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition.

মেঘনাদবধ কাব্য তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। একে ছাপিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, মহাকাব্যিক ধারায় অন্য কোনো চেষ্টা পুনরুক্তিতে পর্যবসিত হবে—এ প্রত্যয় কবির আছে। বন্ধুদের অনুরোধে মহাকাব্য লেখার চেষ্টা অবশ্য তিনি আরও করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর পত্রে আছে—

> ...many of our friends are at me to dash out again. But the question is of what subject; Jotindra proposes the battles of the Kaurava and Pandub princes: another friend, the abduction of Usha (ঊষাহরণ). Now I am for your (সিংহল বিজয়) ;......I am afraid, it will not be an easy thing to beat Meghanad, but there is no harm in trying.

মেঘনাদবধের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কিছু হতে পারে না—এ কেবলমাত্র কবির দুর্বল অপ্রত্যয়স্নেহ বলে মনে হয় না, এর পশ্চাতে তাঁর আত্মার বিশ্বাস উঁকি মারছে। তবু চেষ্টা করেছেন। কারণ "writer of occasional lyrics and sonnet" হয়ে বেঁচে থাকা তাঁর পক্ষে অসহনীয়। এই উদ্বেগের বশবর্তী হয়ে এবং বন্ধুদের

পরামর্শে তিনি অনেকগুলি মহাকাব্য আরম্ভ করেন। 'পাণ্ডববিজয়' কাব্যে কুরুরাজ দুর্যোধনের নিধন ঘটনাই কাব্যের মুখ্য বিষয়। বিজয়সিংহের 'সিংহলবিজয়' নিয়ে অন্য একটি কাব্যের গুটিকয়েক পংক্তিমাত্র লিখিত হয়। 'ভারতবৃত্তান্তে'র অন্তর্গত 'মৎস্যগন্ধা' এদেশে এবং 'দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর' য়ুরোপপ্রবাসকালে আরব্ধ হয়। য়ুরোপে আরব্ধ 'সুভদ্রাহরণে'রও মাত্র কয়েকটি পংক্তি লিখিত হয়। মহাকাব্য-রচনা বিষয়ে কবি যে নিঃশেষিতশক্তি এ দিয়ে তাই প্রমাণিত। এই কাব্যগুলির ভগ্নাংশ দেখে এদের মধ্যে প্রকাশিত জীবনবোধ ও রূপসার্থকতা সম্বন্ধে কোনো কথাই বলা যায় না। তবে এই স্বল্পসংখ্যক পংক্তিগুলির মধ্যেও মেঘনাদবধের অনুস্মৃতি লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে একাধিক কাব্যের প্রারম্ভে একান্তভাবেই মেঘনাদের অনুকরণে। যেমন পাণ্ডববিজয়ের প্রথম পংক্তিগুলি—

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দ্বাপরে
ধর্মরাজ—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নবরঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে,
কহ দেবি।

কিংবা সুভদ্রাহরণের প্রারম্ভ—

কেমনে ফাল্গুনি শূর স্বগুণে লভিলা
পরাভবি যদু-বৃন্দে চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায়;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী—
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে,
বাগ্দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।

অথবা দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের মুখবন্ধে—

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ নরসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধি দেববরে—
গাইব সে মহাগীতি। এ ভিক্ষা চরণে
বাগ্দেবি! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নহে পদাম্বুজে,
দয়ায় আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে!

এই তথ্যের সাক্ষ্যে নিশ্চিন্তচিত্তে বলা যেতে পারে যে মেঘনাদবধ কোনো মহত্তর, উৎকৃষ্টতর কাব্যের ভূমিকা মাত্র নয়।

অবশ্য মহাকাব্যধারা ব্যতীত অপর যে ধারার প্রতি মধুসূদনের প্রবণতা গভীর এবং সৃষ্টিতেও দক্ষতা কম নয়, সেই গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাঁর তথাকথিত অলিখিত শ্রেষ্ঠ কাব্য দেখা দিত এমন যুক্তি দেখানো যেতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যধারাকে একেবারে পরিহার করে মধুসূদনের সেই অপেক্ষিত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সম্ভব হত একথা কল্পনাও করা যায় না।

মেঘনাদবধই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য। অলিখিত কোনো শ্রেষ্ঠতর কাব্যের জন্য আর্তি ভিত্তিহীন।

মেঘনাদবধ ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্য প্রকাশিত হবার পরে একশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই এক-শ বছর ধরে নানা কারণেই বাংলাদেশের পাঠক-সমালোচকেরা মেঘনাদবধকে অবহেলা করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে মেঘনাদবধকে অবলম্বন করেই বাংলাদেশে সাহিত্য-সমালোচনার উদ্ভব। এই এক-শ বছর নানা ভঙ্গি ও পদ্ধতিতে মেঘনাদবধের মূল্যবিচারের চেষ্টা হয়েছে এবং বিচিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবিধার্থসংগ্রহের কালীপ্রসন্ন সিংহ, সোমপ্রকাশের দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং রাজনারায়ণ বসু মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচক। সমসাময়িক কালে বাংলাদেশের সাহিত্যরসিক সমাজ মেঘনাদবধ কাব্যকে কেন্দ্র করে স্পষ্ট দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই কাব্যটির প্রশংসা বা নিন্দায় এ দেশের শিক্ষিতসমাজে প্রচণ্ড কোলাহলের সৃষ্টি হয়েছিল। এই চাঞ্চল্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ শিক্ষিত বাঙালী পাঠকসমাজ এতদিনে জাতীয় ভাষায় এমন একটি কাব্যের সন্ধান পেয়েছে যাকে অবলম্বন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে। সেই জাগরণের ফল যাই হোক না কেন—নিরঙ্কুশ প্রশংসা বা নির্মম নিন্দা—এই কাব্যটির গুরুত্ব ও অভিনবত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে নি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ এই কাব্যকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন—

"বাঙ্গালা সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।…লোকে অপার ক্লেশ করিয়া জলধি-জল হইতে রত্ন উদ্ধার পূর্ব্বক বহু মানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে

গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি, এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই।"

রাজনারায়ণ বসু কাব্যটির দোষগুণ খুঁটিয়ে বিচার করেছেন। সমালোচনার প্রারম্ভে তিনি সাধারণভাবে প্রশংসা করেছেন—

"বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্ব্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে, তাঁহার 'মেঘনাদবধ' বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

তিনি কাব্যটির দোষগুণ বের করতে গিয়ে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা একালে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। ইতস্তত পংক্তিচয়ন করে তার বর্ণনসৌন্দর্যের প্রশংসা, বা উপমা-উৎপ্রেক্ষাদির প্রশংসা অথবা নিন্দা এবং শব্দ-চয়ন সম্পর্কে মন্তব্য করেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। বাংলা সমালোচনার শৈশবকালে এর চেয়ে গভীরতর বিচার অবশ্যই প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু রাজনারায়ণ বসুর বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্যের কল্পনার বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব এবং কবির জীবনবোধের আধুনিকতা সম্পর্কে একটি মন্তব্যও পাওয়া যায় না। তিনি এ কাব্যের প্রধান যে কয়টি দোষের উল্লেখ করেছেন তার পরিচয় নিলেই দেখা যাবে যে রাজনারায়ণ বসু একান্তভাবে বাইরের দিক থেকে কাব্যটির বিচার করেছেন; একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি হিসেবে, কবির ভাবনা কল্পনা প্রবণতার ব্যক্তিগত মৌলিকতার দিকটিকে নিশ্চিন্তভাবে অবহেলা করে গিয়েছেন। রাক্ষসদিগের প্রতি কবির অত্যধিক মমতা, কিংবা সরল-অসরল বর্ণনার মিশ্রণ, হিন্দুভাববিরুদ্ধ বর্ণনা, অথবা নীতিগর্ভ মহাবাক্যের অভাব কোনো কাব্যের দোষরূপে গণ্য হবার নয়। এই সব কারণে কোনো কাব্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কিছুই নির্ধারিত হয় না। রাজনারায়ণ বসু "বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা"য় এই কাব্যটিকে দু দিক থেকে আক্রমণ করেছিলেন। এই বক্তৃতা পূর্বোক্ত সমালোচনার বেশ কিছু পরে রচিত এবং প্রধানত নিন্দাবাদে পূর্ণ। কবির সম্পর্কে আপত্তি দুটি।—

এক। "জাতীয় ভাব বোধহয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেরূপ অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু-পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু-পরিচ্ছদের নিম্ন

হইতে কোট পাণ্টুলন দেখা দেয়। আর্যকুলসূর্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন, বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে।"

দুই। "মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে প্রাঞ্জলতার অত্যন্ত অভাব। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল...।"

এই অভিযোগ দুটি গুরুতর। কিন্তু এই অভিযোগের বিচারের মধ্যেই মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকৃত উৎকর্ষের বীজ লুকিয়ে আছে। কোন্ মনোভাব নিয়ে কেন তিনি রামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন না করে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ প্রমুখ রাক্ষসদের বর্ণনায় উল্লসিত হয়েছেন তা ভেবে দেখবার মত। রাজনারায়ণ বসু থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত জাতীয়ভাবের বিরোধিতার জন্য কবি বারংবার ধিক্কৃত হয়েছেন। কাজেই সাহিত্যিক উৎকর্ষের ও গভীরতার সঙ্গে জাতীয় ভাবের সম্পর্ক ভেবে দেখার মত। মোহিতলাল মজুমদারের মত সমালোচকও বিংশ শতকের মধ্যকালে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রেরণার মর্মমূলে খাঁটি বাঙালীয়ানা আবিষ্কারের জন্য খুবই যত্ন করেছেন। কিন্তু কোনো জাতির বিশিষ্ট ভাব-ভাবনাটি কি তার সম্যক্ ও নিরাসক্ত বিচার-বিবেচনা প্রয়োজন। একটা জাতির ভাবনা চিরকাল একখাতে প্রবাহিত হয় না। সমাজ-জীবনের গুরুতর পরিবর্তন জাতির চিন্তাকেন্দ্রকে বদলে দিতে পারে। উনিশ শতকের পূর্বকাল পর্যন্ত যে-সব ভাব-ভাবনা বাঙালীত্বের মূল বলে মনে করা হত, আজ তার অনেকগুলির নিঃসংশয়িত অবসান ঘটেছে। বাঙালীত্বের কোন্‌টি মর্মমূল—এক হাজার বছর পূর্ব থেকে অদ্যাবধি সমান শক্তিতে জাতিকে সঞ্জীবিত করে রাখছে, তা নিশ্চিত ও নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। তাই বলে অবশ্য জাতীয়ভাব ব্যাপারটিকে মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু সেই জাতীয়ভাব দেশকালপরিচ্ছিন্ন সত্য। কবিকে যেমন তা প্রভাবিত করে, কবিও তেমনি তাকে প্রভাবিত করেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য উনিশ শতকের বাঙালীর জাতীয় ভাবনা থেকে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু সমকালীন চেতনাকে বদলেছে অনেকখানি। তার ওপরে মধুসূদনের মেঘনাদবধ

মানব-চেতনার শাশ্বত কেন্দ্রে আঘাত করেছে, জাতীয় ভাবভাবনার সীমারেখায় নিঃশেষিত হয় নি।

ভাষা ও ভঙ্গির প্রাঞ্জলতার প্রশ্নটিও বিভ্রান্তিকর। রচনার প্রাঞ্জলতার উপর তার উৎকর্ষ নির্ভর করে না। আপামর জনসাধারণের কাছে যা অপ্রাঞ্জল শিক্ষিত রসিক মানুষের কাছে তা প্রাঞ্জল না হলেও আবেদনপূর্ণ হতে পারে। জটিল গভীর জীবনভাবনা শিল্পগত কারণেই হবে অপ্রাঞ্জল।

রাজনারায়ণ বসুর প্রবন্ধটির কিছু বিস্তৃত আলোচনা করা হল এই কারণে যে সমকালীন রচনার মধ্যে এটিই মেঘনাদবধের উল্লেখযোগ্য সমালোচনা। দ্বিতীয়ত, মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে এই সব বিচিত্র আলোচনার আলোকে একটি সঠিক সমালোচনা-পদ্ধতি আবিষ্কার করা সম্ভব।

সমকালীন উত্তেজনা কিছু স্তিমিত হয়ে এলে, বিশেষ করে হেমচন্দ্রের মত কবির আবির্ভাবের পরে, মধুসূদন ক্রমেই অবহেলিত হতে থাকেন। হেমচন্দ্র মহাকবির উচ্চাসন লাভ করেন। রাজনারায়ণ বসুর সমালোচনায় যে অভিযোগ করা হয়েছিল তার মধ্যে মেঘনাদবধের জনপ্রিয়তাহানির কারণ মিলবে। একদিকে হেমচন্দ্র-প্রমুখ সমালোচকেরা এ কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ ছিলেন। নতুন শিক্ষিতসমাজ স্কুল-কলেজে এই কাব্য পাঠ করতেন পাঠ্য হিসেবে।[২] স্বভাবতই সেখানে কাব্যটির সমাধি রচনা হত। উনিশ শতকের শেষ বিশ-পঁচিশ বৎসর মেঘনাদবধ কাব্যের ভাগ্যে অবহেলাই জুটেছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় এ কাব্যের অতি কঠিন বিরুদ্ধ আলোচনা করেছিলেন।

এই সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক এবং কাব্যরসবোদ্ধা বঙ্কিম-প্রমুখ দু-চারজনের রচনায় মেঘনাদবধের প্রকৃত তাৎপর্য অনেকখানি প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমের সমালোচনাটি অতীব মূল্যবান বিবেচনায় বিস্তারিত উদ্ধার করা হল—

"the Meghanadabadh is Mr. Dutta's greatest work. The subject is taken from the Ramayana, the source of inspiration to so many Indian poets. In the war with Ravana, Meghanada, the most heroic of Ravana's sons and warriors, is slain by Laksman, Ram's brother. This is the subject; and Mr. Dutta owes a great deal more to

Valmiki than the mere story. But nevertheless, the poem is his own work from beginning to end. The scenes, characters, machinery and episodes, are in many respects of Mr. Dutta's own creation. In their conception and development, Mr. Dutta has displayed a high order of art, and to do justice to it or even to give a suitable idea of it, would require a much more minute examination of the poem than the space at our command will allow. To Homer and Milton, as well as to Valmiki, he is largely indebted in many ways, but he has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken, and this poem is on the whole the most valuable work in modern Bengali literature. The characters are clearly conceived and capable of winning the reader's sympathy. The machinery, including a great deal that is supernatural, is skilfully and easily handled. The imagery is graceful and tender and terrible in turn. The play of fancy gives constant variety. The diction is richly poetic and the words so happily chosen as constantly to bring up by association ideas congruous to those which they directly express. Nor is the verse broken up into couplets complete in themselves, in the Sanskrit fashion, but abounding like Milton's in variety of pause, it seems to us musical and graceful, as well as a fitting vehicle for passionate feelings."

—Bengali Literature.

মেঘনাদবধের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রসঙ্গও বঙ্কিম তুলেছেন, তবে সেখানে অসাহিত্যিক দৃষ্টিকোণকে আমন্ত্রণ করা হয় নি। বঙ্কিম বা রমেশচন্দ্রের মত সাহিত্যের সাত-সাগরের নাবিকদের রস-বোধের কথা ছেড়ে দিলে একালের মেঘনাদবধ-সমালোচনা যে একান্ত দুর্বল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর

ছন্দের দোষ বলে যে লক্ষণগুলি নির্দেশ করেছিলেন সেগুলিই আসলে ঐ ছন্দের প্রধান শক্তি। আবার রামগতি ন্যায়রত্নের মতে মেঘনাদবধ অমিত্রাক্ষরে রচিত না হলেও এর রসাবেদনের কোনো ব্যত্যয় ঘটত না। এ-জাতীয় সমালোচকদের প্রশংসার মধ্যেও বিপদ আছে, কারণ প্রায়ই তা এমন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ষিত যা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যিক নয়।

উনিশ শতকের শেষভাগে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের যে বিস্তৃত আলোচনা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয় তার গুরুত্ব স্বীকার্য। তবে বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক গীতাবেদনের বিরুদ্ধে মেঘনাদবধের ক্লাসিক আদর্শকে তুলে ধরবার চেষ্টা দেখা দিতে থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এদিক দিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথপ্রবর্তিত কাব্যধারায় বাংলাদেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাহিত্যরসিকদের অসন্তোষ এই চেষ্টার পেছনে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, প্রকৃত কাব্যালোচনা ও কাব্যোৎকর্ষের বোধ ততটা করে নি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মধুসূদনের বাঙালীত্ব প্রমাণের দ্বারা পূর্ববর্তীদের অভিযোগ খণ্ডনে ব্রতী হয়েছিলেন। শশাঙ্কমোহন সেন ও মোহিতলাল মজুমদার মধুসূদনের মেঘনাদবধকে সাহিত্যমূল্যের বিচারে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেন। মেঘনাদ-বধের আলোচনায় মোহিতলালের গ্রন্থটির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বহু সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হওয়া গেলেও মেঘনাদবধ বিচারে তাঁর ঋণ গ্রহণ না করে উপায় নেই॥[৩]

॥ দুই ॥

মেঘনাদবধ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠেছে রামায়ণ-কাহিনী ও রামায়ণোক্ত চরিত্রগুলির রূপান্তর ঘটায়। মধুসূদনের যাবনিক ঔদ্ধত্য বলে তা নিন্দিত হয়েছে। কোনো কোনো মহল জাতীয় সংস্কৃতির এত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বিকৃতীকরণকে ধর্মভাবের দিক থেকে না দেখেও এ-জাতীয় পরিবর্তন রসসৃষ্টির বিঘ্ন স্বরূপ মনে করেছেন। এই পরিবর্তনের প্রকৃত স্বরূপটি বুঝে দেখা প্রয়োজন। মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন যে, গল্প ছাড়া কিছুই তিনি বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেন নি—

...in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as

little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem.)

এই ঋণের পরিমাণ স্থির করা দরকার। বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে কবি যেখানে বিচ্যুত হয়েছেন তার আলোকে কবিপ্রাণের জিজ্ঞাসা ও প্রবণতার পরিচয় মিলবে। এ প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত[৪] বাংলা রামায়ণের কথাও স্মরণ করা দরকার। এই গ্রন্থটি সুদূর মাদ্রাজ-প্রবাসেও কবির সাহচর্য করেছে।

মেঘনাদবধের কাহিনী-অংশ সংক্ষেপে এই: বীরবাহুর মৃত্যুর পরে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ কর্তৃক সৈনাপত্য গ্রহণ; নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞরত নিরস্ত্র বীরের লক্ষ্মণের হাতে মৃত্যুবরণ। ক্রুদ্ধ রাবণের যুদ্ধযাত্রা এবং শক্তিশেলে লক্ষ্মণের আহত হওয়া, ঔষধাদি আনয়ন করে লক্ষ্মণের জীবনদান, মেঘনাদের মৃতদেহ সৎকার। কাহিনীর এই মূল কাঠামোর মধ্যে নানা কাব্যিক ঘটনা-বিস্তার ও পল্লবিত বর্ণনার সমারোহ আছে।

বাল্মীকি-রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অশীতিতম সর্গে ইন্দ্রজিৎকে সৈনাপত্যে বরণের কাহিনী বিবৃত হয়েছে—

> অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মকরাক্ষবধে ক্রোধে অতিমাত্র জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন পূর্বক কটকটা শব্দ করিতে লাগিলেন। পরে স্থিরচিত্তে একটি কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, বৎস! তুমি সর্বাপেক্ষা অধিকবল, এক্ষণে দৃশ্য বা মায়াবলে অদৃশ্য থাকিয়া মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া আইস। তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রকে জয় করিয়াছ, রাম ও লক্ষ্মণ মনুষ্য, এই জন্য অবজ্ঞা করিয়াই কি তাহাদিগকে বধ করিবে না? অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ পিতৃ-আজ্ঞায় যুদ্ধ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন এবং নিঋ্‌তি দৈবত মন্ত্রে অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন।
>
> —হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -অনূদিত বাল্মীকি-রামায়ণ

মধুসূদনের কাব্য কিন্তু আরম্ভ হয়েছে বীরববাহুর মৃত্যুতে। বীরবাহুর মৃত্যুর পরেই মেঘনাদ সৈনাপত্যে বৃত হলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ঘটনাসজ্জা থেকেই মধুসূদন কাহিনীর এই অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। কৃত্তিবাসে আছে—

ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
বীরবাহু পড়ে বার্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥

শোকের উপরে শোক হইল তখন।
সিংহাসন হইতে পড়ে রাজা দশানন॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা কান্দিল বিস্তর।
লঙ্কাতে হইল কাল নর ও বানর॥
কুম্ভকর্ণ আদি করি বড় বড় বীর।
নর-বানরের বাণে ত্যজিল শরীর॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
নর-বানরের হাতে সংশয় জীবন॥......
ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মূর্ছিত।
হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিত॥...
মেঘনাদ বলে পিতা ভাবি তাই মনে।
নিস্তার না দেখি নর-বানরের রণে॥
লুকাইয়া থাকিলে আগুন দেয় ঘরে।
মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ করে॥
রাবণ বলে যুদ্ধে যাওয়া তোমার উচিত।
একবার যাহ পুনঃ পুত্র ইন্দ্রজিৎ॥

বাল্মীকির মূল রামায়ণ অপেক্ষা বাংলাদেশে কৃত্তিবাসের প্রচলিত বাংলাকাব্যের উপরই কবি এক্ষেত্রে বেশি নির্ভর করেছেন। বীরবাহুর মৃত্যুতে কৃত্তিবাসের রাবণ যে ভাষায় শোকপ্রকাশ করেছে তার বস্তুঅংশের সঙ্গে মধুসূদনের রাবণের বেদনার্তির মিল আছে। পার্থক্য যা আছে তা মূল ভাবকল্পনার, বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষাযোজনার। বস্তুঅংশ প্রায় অভিন্ন। অবশ্য মধুসূদন বীরবাহুর পতন এবং ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্যগ্রহণের মধ্যের ঘটনাংশেও আপনার কল্পনাকে মুক্তপক্ষ গতি দিয়েছেন।

বাল্মীকি-রামায়ণে অতঃপর ইন্দ্রজিতের আভিচারিক নিকুম্ভিলা যজ্ঞের বর্ণনা আছে। যজ্ঞ সমাপন করে সে যুদ্ধস্থলে উপনীত হল এবং তার বিক্রমে রাম-লক্ষ্মণসহ সমগ্র বানরসৈন্য বিব্রত হয়ে পড়ল। এই সময়ে ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা নির্মাণ করে সর্বসমক্ষে তাকে দ্বিখণ্ডিত করল। বানরসৈন্যেরা যখন বিমূঢ় হয়ে পড়ল তখন সে আবার হোমকামনায় নিকুম্ভিলা নামক দেবালয়ে গমন করল। বিভীষণ দুঃখদীর্ণ রাম ও লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিল, মায়াসীতার রহস্য উদ্ঘাটন করল এবং নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপ্ত হবার পূর্বে ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে

পরামর্শ দিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সব অংশে বাল্মীকির রামায়ণের অনুসরণ আছে, বিচ্যুতি এমন কিছু নেই। মধুসূদন এই অংশটিকে তাঁর কাব্যকল্পনা থেকে সম্পূর্ণত নির্বাসন দিয়েছেন। তাঁর প্রিয়পাত্র মেঘনাদকে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপিত করতে চান নি। এর মধ্যে কবির নাট্যরসবোধ লুকিয়ে আছে বলে মনে হয়। মেঘনাদকে যুদ্ধের ভূমিকায় একবারের জন্যও না দেখিয়ে তিনি পাঠকচিত্তে তার বীরত্বের এমন একটি সুস্পষ্ট বোধ মুদ্রিত করেছেন যা বিস্ময়কর। তার ওপরে মায়াসীতার কাহিনীটি তিনি অবশ্যই ইন্দ্রজিতের চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে রাজী ছিলেন না। কারণ তাঁর চেতনায় ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের চরিত্রের যে কল্পনা দানা বেঁধেছে তাতে আদিম কিন্তু সুসংস্কৃত পৌরুষের একটি বোধ আছে। চিন্তা-কীটের সেখানে প্রবেশ নেই। তাই কূট কাপট্য তার চরিত্রের পক্ষে অসঙ্গতই হত। ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্যগ্রহণ এবং নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণাদির সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের মাঝখানে মূল রামায়ণে যে যুদ্ধঘটনার বর্ণনা আছে মধুসূদন তাকে ঘটনা হিসেবে অস্বীকার করেছেন। এখানে সুদীর্ঘ তিনটি সর্গে তিনি সম্পূর্ণভাবেই আপনার কল্পনার বশীভূত, এমন কি ঘটনার কাঠামোও তাঁর নিজস্ব।

মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গে মধুসূদন মেঘনাদের মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন। মেঘনাদ এখনও যুদ্ধে গমন করেন নি। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তিনি অগ্নিপূজায় নিরত, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। মায়াবলে অদৃশ্য বিভীষণ ও লক্ষ্মণ সশস্ত্র যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে। লক্ষ্মণের হাতে নির্মমভাবে মেঘনাদ নিহত হলেন। মধুসূদনের সঙ্গে বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের সম্পর্ক সামান্যই।

বাল্মীকি-রামায়ণে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থল যুদ্ধক্ষেত্রের অতি নিকটে। রাক্ষস-সৈন্যপরিবৃত হয়ে ইন্দ্রজিৎ সেখানে আভিচারিক হোমকার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত। এমন সময়ে বিভীষণ, লক্ষ্মণ, হনুমান এবং অঙ্গদ আরও বহু বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করল। যজ্ঞ বিনষ্ট করতে লাগল। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ পরিত্যাগ করে উঠে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। মহাকবি বাল্মীকি লিখেছেন—

> অনন্তর বিভীষণ লক্ষ্মণকে লইয়া হৃষ্টমনে ত্বরিত পদে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশ পূর্বক লক্ষ্মণকে যাগস্থান দেখাইলেন এবং নীল-মেঘাকার ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ স্থানে মহাবল ইন্দ্রজিৎ ভূতগণকে উপহার দিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং এই

আভিচারিক কার্যবলে অন্যের অদৃশ্য হইয়া, শত্রুগণকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। এখনও ঐ মহাবীর বটমূলে যায় নাই। এই সময়ে তুমি প্রদীপ্ত শরে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত উহাকে বধ কর।

তখন লক্ষ্মণ শরাসন বিস্ফারণ পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিবৎ উজ্জ্বল রথে নিরীক্ষিত হইল। লক্ষ্মণ ঐ দুর্জয় বীরকে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, তুমি এখন আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ তথায় বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রে নির্বোধ! তুই এই স্থানে জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিস্। তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, বল্ এক্ষণে পিতৃব্য হইয়া, কিরূপে ভ্রাতৃপুত্রের অনিষ্টাচরণ করিবি। রে ধর্মদ্রোহি! সৌহার্দ, জাত্যভিমান, সোদরত্ব ও ধর্ম তোর কার্যাকার্যের নিয়ামক নয়। তুই যখন আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস্ তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তাহা হইলে ঐ নির্গুণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষকে আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ ক্ষয় হইলে পশ্চাৎ পরপক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হয়। রে রাক্ষস! তুই আমাদের আপনার জন, আমায় বধ করিতে তোর যেরূপ নির্দয়তা, আর এই কার্যে তোর যেরূপ যত্ন ইহা তদ্ব্যতীত আর কে করিতে পারে?

তখন বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! তুমি কি আমার স্বভাব জান না! বৃথা কেন এইরূপ গর্ব করিতেছ? তুমি অসাধু, পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার্থ এই রুক্ষ ভাব দূর করা তোমার কর্তব্য। আমি যদিও ক্রূর রাক্ষস-কুলে জন্মিয়াছি কিন্তু যাহা মনুষ্যের প্রথম গুণ সেই রাক্ষসকুলদুর্লভ সত্ত্বই আমার স্বভাব।...যে ব্যক্তি অধার্মিক ও পাপমতি, করস্থিত সর্পের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সুখ হইতে পারে। পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীদূষক ব্যক্তি জ্বলন্ত গৃহবৎ সর্বতোভাবেই ত্যাজ্য। যে দুরাত্মা পরস্বাপহরণ ও পরস্ত্রী-দূষণে রত এবং যাহার জন্য সুহৃদ্‌গণের সর্বদাই শঙ্কা হয় সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ভীষণ ঋষিহত্যা, দেবগণের সহিত বৈরিতা, অভিমান রোষ ও প্রতিকূলতা এই কয়েকটি দোষ আমার ভ্রাতা রাবণকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে বসিয়াছে।...এক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি ও রাবণ

তোমরা সকলে অচিরাৎ ছারখার হইয়া যাইবে। তুমি অভিমানী, দুর্বিনীত ও বালক, তোমার মৃত্যু আসন্ন, এক্ষণে যা তোমার ইচ্ছা আমাকে বল।··· আজ তুমি লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ কর, ইহার হস্তে আজ আর তোমার নিস্তার নাই।···

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের এই সমস্ত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্থিত হইল। উহার হস্তে খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। ঐ কালকল্প মহাবীর কৃষ্ণাশ্বযুক্ত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল এবং মহাপ্রমাণ সুদৃঢ় ধনু ও ভীষণ শর গ্রহণ পূর্বক দেখিল সম্মুখে লক্ষ্মণ মহাকায় হনুমানের পৃষ্ঠে উদয়গিরিশিখরস্থ সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -অনূদিত বাল্মীকি-রামায়ণ

অতঃপর মহাকবি লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ এবং শস্ত্রযুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। উভয়েই সশস্ত্র এবং রণনিপুণ। কাজেই এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলতে লাগল। কবির সে যুদ্ধবর্ণনা খুবই জীবন্ত—

তখন মহাবল ইন্দ্রজিৎ শরাসন আকর্ষণ পূর্বক লক্ষ্মণের প্রতি সুশাণিত শর পরিত্যাগ করিল। সর্পবিষবৎ দুঃসহ শর সকল পরিত্যক্ত হইবামাত্র সর্পেরা যেমন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দংশন করে সেইরূপ লক্ষ্মণের দেহে গিয়া আঘাত করিল। লক্ষ্মণ অতিমাত্র শরবিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া বিধূম বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।······মহাবীর লক্ষ্মণ পাঁচটি বাণ সন্ধানপূর্বক ইন্দ্রজিতের বক্ষে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় পতিত হইয়া উহার বক্ষে সূর্যরশ্মিবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্রজিৎ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিল এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া সুশাণিত তিন শর প্রয়োগ করিল। উহারা পরস্পর জিগীষা-পরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন। এই দুই বীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও দুর্জয়। উহারা অন্তরীক্ষগত দুইটি গ্রহের ন্যায়, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় এবং অরণ্যের দুইটি সিংহের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -অনূদিত বাল্মীকি-রামায়ণ

ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ চলাকালে বিভীষণ ও বানরসৈন্যগণ নিষ্ক্রিয় ছিল না। বিভীষণ বানরদের নির্দেশ দিয়ে, লক্ষ্মণকে উৎসাহিত করে এই যুদ্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের এই যুদ্ধের বর্ণনা যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাশীতিতম, একোননবতিতম, নবতিতম, এবং একনবতিতম সর্গ

জুড়ে বিস্তৃত। একনবতিতম সর্গে মহাকবি বিভীষণের সঙ্গেও ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখিয়েছেন—

> পরে বিভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিতের বক্ষে বজ্রস্পর্শ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদপূর্বক রক্তাক্ত হইয়া রক্তকায় সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।
>
> —হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণ

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ চলতে লাগল। শক্তিতে ও কৌশলে কারও ন্যূনতা প্রদর্শনই মহাকবির উদ্দেশ্য নয়। তবে লক্ষ্মণ যে দেবপ্রিয় ও দেবকুল-রক্ষিত বাল্মীকি তা বলেছেন—

> তৎকালে দেবতা গন্ধর্ব গরুড় উরগ ঋষি ও পিতৃগণ ইন্দ্রকে অগ্রবর্তী করিয়া লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।
>
> অনন্তর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার জন্য একটি অগ্নিস্পর্শ শর সন্ধান করিলেন। ঐ শরের পর্ব ও পত্র সুশোভন, উহা অনুক্রমে গোলাকার হইয়া গিয়াছে, উহা স্বর্ণখচিত ও সুসন্নিবেষ, উহা দেহবিদারণ, উরগবং ঘোরদর্শন, দুর্নিবার ও বিষম। পূর্বে সুরাসুরযুদ্ধে মহাবীর্য দেবরাজ ঐ শরে দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এই জন্য সুরগণ উহার পূজা করিয়া থাকেন। রাক্ষসেরা উহা দেখিবামাত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ঐ অমোঘ ঐন্দ্রাস্ত্র সন্ধানপূর্বক কার্যসিদ্ধির উদ্দেশে কহিলেন, অস্ত্রদেব! যদি রাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সত্যপরায়ণ ও ধর্মশীল হন, তবে তুমি ইন্দ্রজিৎকে সংহার কর। এই বলিয়া তিনি ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ইন্দ্রজিতের উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। প্রকাণ্ড মস্তক স্কন্ধচ্যুত ও রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িল।......সূর্য অস্তমিত হইলে যেমন রশ্মিজাল অদৃশ্য হয় সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ রণশায়ী হইলে রাক্ষসেরাও অদৃশ্য হইল। ইন্দ্রজিৎ নিষ্প্রভ সূর্য ও নির্বাণ অগ্নির ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত। ত্রিলোক নিঃশত্রু, নিরাপদ ও উৎফুল্ল হইল। ঐ পাপাত্মার বিনাশে ইন্দ্রদেব মহর্ষিগণের সহিত যার-পর-নাই হৃষ্ট হইলেন। অন্তরীক্ষে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল, গন্ধর্ব ও অপ্সরা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল, চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, ধূলিজাল অপসারিত, জল স্বচ্ছ, আকাশ নির্মল, দেব ও দানবেরা হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।
>
> —হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -অনূদিত বাল্মীকি-রামায়ণ

বাল্মীকির বর্ণনায় মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম্য আছে। মহাকবির সহানুভূতির কেন্দ্র অবশ্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়। পাপাত্মা ইন্দ্রজিতের প্রতি তাঁর সমাপ্তির ভৎর্সনা বেশ তীব্র। কিন্তু লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ বর্ণনায় কোনপক্ষকেই হেয় প্রতিপন্ন করার কোনো সচেতন চেষ্টা আদিকবির নেই। তুলনায় কৃত্তিবাসের রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ-নিধন-সংবাদ গৌরব ও মাহাত্ম্যবর্জিত। এই যুদ্ধঘটনায় কবি বানরদের অতিপ্রাধান্যে কিছু স্থূল হাস্যেরও যোগান দিয়েছেন। ইন্দ্রজিৎ-নিধনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ—

রামের চরণে বন্দি বানরগণ সঙ্গে।
বিভীষণ সহ তবে চলিলেন রঙ্গে॥
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল।
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল॥
রাক্ষসেতে দ্বার রাখে ধনুতে দিয়া চড়া।
হনু দাণ্ডাইল লয়ে পর্বতের চূড়া॥

পলায় রাক্ষসগণ হইয়া ফাঁপর।
লক্ষ্মণের সৈন্য ঢোকে গড়ের ভিতর॥
বাণ বরিষণ করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বানরেতে গাছ পাথর করে বরিষণ॥
বানর-তাড়নেতে রাক্ষসগণ ভাগে।
হনুমান উত্তরিল ইন্দ্রজিৎ-আগে॥
ইন্দ্রজিৎ দেখিয়া হনুর কোপ বাড়ে।
এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড-পাড়ে॥
সম্মুখে দাণ্ডায় বীর পরম সন্ধানী।
বৃক্ষবাড়ী মারি নিভায় যজ্ঞের আগুনী॥
হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তার করিল প্রস্রাব॥
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
ফলমূল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে॥
যজ্ঞদ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারিভিতে।
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্দ্রজিতে॥

এ বিবরণ ভক্তিমান বাঙালী পাঠকের পরম উপভোগের সামগ্রী হলেও বাল্মীকির মহাকবি-সুলভ কল্পনা এরূপ ঘটনার অবকাশ রাখে নি। এর দ্বারা এই যুদ্ধ-ঘটনাটিই যেন একান্ত লঘু হয়ে পড়ে এবং ইন্দ্রজিৎদের প্রতি কৃত্তিবাস-কবির তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ পায়। ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধতা বাল্মীকিতেও আছে, কিন্তু কাহিনীর গাম্ভীর্য ভেদ করে এভাবে আপনার বিদ্বিষ্ট মনোভাব প্রকাশ করার কথা তাঁর কল্পনাতেও আসে নি। এর পরে ইন্দ্রজিৎ-লক্ষ্মণ-সংগ্রাম এবং বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ-সংবাদকথনে কৃত্তিবাস মোটামুটি বাল্মীকির অনুসরণ করেছেন। তবে বিভীষণের চাতুর্যে চারদিক থেকে ঘিরে ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করার বৃত্তান্ত কৃত্তিবাসে আছে,—আর সেই প্রসঙ্গে হনুমানের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইন্দ্রজিতের পরাভবের কথাও উল্লাসভরে বর্ণনা করেছেন কবি কৃত্তিবাস ওঝা—

> সারথি দেখিতে পায় বীর হনুমানে।
> পবনবেগেতে রথ চালায় দক্ষিণে॥
> লাফ দিয়া হনুমান পড়ে তার রথে।
> চূর্ণ করে রথখান এক পদাঘাতে॥
> ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজা ফেলে চারিভিতে।
> অন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্দ্রজিতে॥
> শূন্যে যায় ইন্দ্রজিৎ দেখে হনুমান।
> দুই পায়ে ধরে তারে দিল এক টান॥
> অন্তরীক্ষে দুইজনে লাগে হুড়াহুড়ি।
> ভূমিতলে পড়ে দোঁহে করে জড়াজড়ি॥
> হেঁটে ইন্দ্রজিৎ পড়ে হনু তার পরে।
> বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে॥

বীর হিসেবে ইন্দ্রজিৎ যে আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়, নিকুম্ভিলা যজ্ঞের মায়া-বিস্তারই তার বীরত্বের একমাত্র উৎস এরূপ একটি বিশ্বাস কৃত্তিবাসের ছিল। এ জাতীয় ঘটনা উদ্ভাবনের পেছনে অনুরূপ উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসই সক্রিয়।

এর পরে লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিতে প্রবল যুদ্ধ চলতে লাগল। মাঝখানে ইন্দ্রজিৎ পলায়ন করে লঙ্কায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ করে দণ্ডায়মান বিভীষণ তাকে বাধা দেয়। অবশ্য ইন্দ্রজিতের প্রহারে

লক্ষ্মণের বিশেষ কাতর হবার কথা এবং লক্ষ্মণের দেবানুকূল্য লাভের ইঙ্গিত কৃত্তিবাসেও আছে, যদিও তা একান্ত সংক্ষিপ্ত—

দুজনে বরিষে বাণ দুজনে প্রবীণ।
বাণের কুহকে নাহি জানে রাত্রি দিন ॥
লক্ষ্মণ অশক্ত হইল প্রহারের ঘায়।
ব্রহ্মা বলে পুরন্দর করহ উপায় ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পুরন্দর করিলেন দান।
লক্ষ্মণ সে ব্রহ্ম-অস্ত্র পুরিল সন্ধান ॥
বাণেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ব্রহ্ম ভাবি ব্রহ্ম তোমায় করিল সৃজন ॥
যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু-অবতার।
তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার ॥
ইন্দ্রজিতা-মাথা কাটি পাড় ভূমিতলে।
নির্ভয়েতে নিদ্রা যাক্ দেবতা সকলে ॥
এত বলি ব্রহ্ম-অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিতার উড়িল পরাণ ॥
জাঠাজাঠি কত এড়ে অস্ত্র কাটিবারে।
লোহার পাবড়া মারে অস্ত্র নাহি ফিরে ॥
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ কেবা ধরে টান।
ইন্দ্রজিতার মাথা কাটি করে দুইখান ॥…
পড়িল মস্তক সহ মুকুট কুণ্ডল।
ইন্দ্রজিতার মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতল ॥
ইন্দ্রজিতার কাটামুণ্ড উপরেতে চড়ি।
কোন কপি লাথি মারে, কেহ মারে বাড়ি ॥
কীল লাথি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া।
জীয়ন্তে না পারে কপি মড়ার উপর খাঁড়া ॥

ইন্দ্রজিতের ছিন্নমুণ্ডকেও রেহাই দেন নি কৃত্তিবাস পণ্ডিত। এর সঙ্গে মধুসূদনের কল্পিত ঘটনা বা বর্ণনা-বিন্যাসের সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক নয়।

আর্য রামায়ণে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পরে রাবণ বেদনার্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন এবং লক্ষ্মণকে শক্তিশেলের দ্বারা মরণ-আঘাত হানেন। এই যুদ্ধের বর্ণনায় মধুসূদনের কাব্যের সপ্তম সর্গ পরিপূর্ণ। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের ঘটনাটিতে মধুসূদন সাধারণভাবে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণই করেছেন। রামায়ণে আছে—

…মহাবীর রাবণ ঐ জ্বলন্ত শক্তি লক্ষ্মণের প্রতি ক্রোধভরে নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। শক্তি ময়দানবের মায়া-নির্মিত অষ্টঘণ্টাযুক্ত ঘোরনিনাদী ও অমোঘ। উহা মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের দিকে বজ্রবৎ ঘোর গভীরনাদে যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রাম ভীত হইয়া কহিলেন, স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি, লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক। শক্তি! তোমার সমস্ত উদ্যম বিনষ্ট হইয়া যাক্, তুমি ব্যর্থ হও। অনন্তর ঐ উরগরাজের জিহ্বার ন্যায় করাল শক্তি বেগে আসিয়া নির্ভীক লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং নিক্ষেপবেগে বক্ষমধ্যে গাঢ়তর নিমগ্ন হইল। লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।…মহাবীর লক্ষ্মণ শক্তি দ্বারা গাঢ়তর বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া সসর্প শৈলবৎ দৃষ্ট হইতেছেন।

—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -অনূদিত বাল্মীকি-রামায়ণ

এই বর্ণনার সঙ্গে এমন কি উপমা প্রয়োগের দিক থেকেও মধুসূদনের কবিতার মিল লক্ষ্য করা যায়—

স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি! বজ্রনাদে উঠিলা গর্জিয়া,
উজ্জ্বল অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণ রিপুনাশিনী। কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর। ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।

মেঘনাদবধের এই সর্গের সুবিস্তৃত যুদ্ধবর্ণনায় বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনীর অনুসরণ আছে, তবে হোমরের প্রভাবই অধিক। যুদ্ধকাহিনীর সেই নানা প্রসঙ্গে আর্য রামায়ণের যে প্রভাব তা বর্ণনাগত, কাহিনীগত নয়।

শক্তিশেলে মূর্ছিত লক্ষ্মণকে পুনর্জীবিত করবার জন্য রামের নরকভ্রমণ মধুসূদনের কল্পনার ফসল। বাল্মীকি-রামায়ণে লক্ষ্মণের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করে দেয় বানর-চিকিৎসক সুষেণ। হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধের অন্বেষণে গেল; কিন্তু ঔষধ চিনে উঠতে পারল না, গোটা পর্বতটি নিয়ে চলে এল। কৃত্তিবাস হনুমানের গন্ধমাদন-অভিযানকে কেন্দ্র করে কালনেমি, ভরত প্রভৃতির উপাখ্যান আমদানি করেছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যে অতঃপর মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। এ সর্গের কল্পনা বিদেশী ভাবের সঙ্গে কবির মৌলিক ভাবনার মিশ্রণের ফল। বাল্মীকির মহাকাব্যে অনুরূপ কোনো প্রসঙ্গ নেই।

কিছু বিস্তৃতভাবে বাল্মীকি-রামায়ণ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর সঙ্গে মেঘনাদবধে বর্ণিত প্রধান ঘটনাংশের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। এর মধ্য থেকে মধুসূদনের কবিভাবনার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত কাব্যটি বহুলপরিচিত। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের জনসাধারণ এই কাব্য থেকে যুগপৎ আনন্দ এবং শিক্ষা সঞ্চয় করেছে। বাঙালীর চরিত্রগঠনে, ধর্মভাবের উদ্দীপনায়, উচ্চ-নীচ বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুর আদর্শরূপে গৃহীত হওয়ায় রামায়ণ কাব্যের বিশিষ্ট মূল্য বাঙালী হিন্দুর কাছে আছে। মধুসূদন সেই কাব্যের মূল ভাববস্তুকে আঘাত করেছেন। এই আঘাতের পেছনে বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা আছে—

> I despise Rama and his rabble, but the idea of Ravana kindles and elevates my imagination. He was a grand fellow.

কবি পুরাতন ভাবনাকে আঘাত করে নতুনকে আহ্বান জানিয়েছেন। সাহিত্যের ইতিহাস দেবদেউল থেকে অন্যত্র তার দৃষ্টিকেন্দ্র পরিবর্তিত করেছে। এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে। মাঝে মাঝে সমাজজীবনে যেমন পুরাতনের জীর্ণ সঞ্চয় ঘুচিয়ে দেবার দিন আসে, সাহিত্যরাজ্যে—ভাব-ভাবনার ক্ষেত্রেও তেমনি দিনকে অনেক সময় স্বাগত জানাতে হয়। কিন্তু বিদ্রোহী ভাবনার জন্ম দিলেই উৎসাহিত বোধ করবার কারণ নেই, কারণ সাহিত্যের অঙ্গীকার পুরাতনের সঙ্গে বিরোধে মাত্র নয়। চিন্তাগত এই বিদ্রোহকে মধুসূদনের

অন্তশ্চেতনার এক গূঢ় প্রবৃত্তিরূপেই বুঝে নিতে হবে, এবং সাহিত্যরাজ্যের সৌন্দর্যের মূল্যে তার স্থায়িত্বকে যাচাই করে নিতে হবে।)

রামায়ণ-মহাভারতের মত কাব্যগ্রন্থ জাতির জীবনে দীর্ঘকাল ধরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে আসছে। সেকালের সংস্কৃত কাব্যনাট্যে এই দুই মহাকাব্যের কাহিনী-উপকরণ প্রচুর গৃহীত হয়েছে। কালিদাসের রঘুবংশে রামায়ণ-কাহিনীর যে অনুসরণ তা কবিকে মৌলিকতাচ্যুত করতে পারে নি। বাল্মীকির কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে তিনি বর্ণনার ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছেন। কাহিনীকে যেটুকু পরিবর্তিত করেছেন তাতে বিরুদ্ধতা প্রকাশ পায় নি। কাজেই সমালোচকমহলে উচ্চকণ্ঠ আপত্তি ওঠে নি। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বৌদ্ধযুগের অবসানে যে পৌরাণিক অভ্যুত্থান ঘটল রামায়ণ-মহাভারতের মানুষী কীর্তি দৈবী ঘটনা বলে পূজিত হতে লাগল। অত্যল্পকাল মধ্যে ভারতীয় ধর্মবোধের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে এই দুই কাব্য কাব্যসৌন্দর্যের কিছু ঊর্ধ্বলোকে স্থাপিত হল। সাহিত্যবোধ ধর্ম-চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় কিছু বিপদ দেখা দেয়। য়ুরোপের সাহিত্যের ইতিহাসে তা ঘটে নি। হোমরের কাব্যাদির অনুসরণে য়ুরোপের কবিরা যা সৃষ্টি করেছেন কোনকালেই ধর্ম ও দেবমাহিমার নামে তার সমালোচনা হয় নি। এর কারণ দুটি। প্রথমত, য়ুরোপ প্রাচীন গ্রীকদের প্যাগান ধর্মসাধনায় বিশ্বাস হারিয়েছে বহুকাল। দ্বিতীয়ত, সেখানে সাহিত্য রসাস্বাদকে ধর্মের অধীন করা হয় নি কোনোদিন। ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে গোটা মধ্যযুগ ধরে সাহিত্য ধর্মের ভার বহন করেছে। তার রেশ আজও মেটে নি। সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষিত-সমাজের উপলব্ধিতে আজও সাহিত্যের পরনির্ভরতা সম্পূর্ণ ঘোচে নি। অধিকন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে আজও বাঙালী (তথা ভারতীয়) হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করে, কারণ খ্রীস্টান বা মুসলমান ধর্মের ন্যায় কোন নূতন ধর্মপ্রবাহে এদেশীয় হিন্দুর চিন্তা সেকালের সঙ্গে ছেদ ডেকে আনে নি।

কারণ যাই হোক, ফল হল এই যে, আমাদের সাহিত্যের উপকরণ-বিচার প্রায়ই বিভ্রান্ত হচ্ছে। সাহিত্য উপকরণের দাসত্ব করে না। স্বভাবের নিশ্চিন্ত নির্বিকার অনুকরণে সাহিত্যিক তৃপ্ত না হলে অভিযোগ করবার কিছু নেই। উপকরণ উপকরণই। কবি আপন জীবন-জিজ্ঞাসা ও কল্পনার বিশিষ্টতার সহযোগে তার যে রূপদান করেন তাই সাহিত্য; উপকরণের আস্বাদে তার আস্বাদ নয়, তার আস্বাদ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী। সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে এই

প্রসঙ্গ এত পুরাতন যে, বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত নাট্য-কাব্য-উপন্যাসে ইতিহাসকে কতখানি লঙ্ঘন করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন আসে। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাস নামক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি খাতির দেখানো নয়, ঐতিহাসিক রসসৌন্দর্যের সৃষ্টি করাই এ জাতীয় রচনার লক্ষ্য। কিন্তু ঐতিহাসিক রচনার ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত কজনই বা মেনে নিয়েছেন? ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসরণের যথার্থতা এখনও বহু ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক কাব্য-নাটকের উৎকর্ষের মাপকাঠি বলে ধরা হচ্ছে।

বাস্তব জীবন বা সমাজ, প্রকৃতি বা অতীত ঘটনা এক জিনিস, কাব্যাদি অন্য বস্তু। পূর্ববর্তী কোন কাব্য বা অন্য শিল্পকর্মকে সাহিত্যশিল্পে উপকরণ-রূপে গৃহীত হতে দেখা যায়। এখানে সমস্যাটি দ্বিমাত্রিক। প্রথমত, শিল্পের জগৎ মায়ার জগৎ। বস্তুময় উপকরণের সঙ্গে তার গোড়ায়ই রয়েছে পার্থক্য। দ্বিতীয়ত কাব্যাদি একটা সম্পূর্ণ মানবসৃষ্ট শিল্প। বাণিজ্যিক অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় finished product, কাঁচা মাল নয়। কাঁচা মাল দিয়েই দ্রব্য নির্মিত হয়। কিন্তু সাহিত্যরাজ্যে পূর্ণ রূপপ্রাপ্ত দ্রব্যকে অন্য দ্রব্য নির্মাণের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতেও দেখা হয়। অনেকের মতে এর ফলে শিল্পীর উপরে কতকগুলি নতুন ধরনের দায়িত্ব বর্তায়, সে দায়িত্ব হল কাঁচা-মালের ন্যায় পূর্বরচিত কাব্যটিকে যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার না করা, তার শিল্পরূপকে শ্রদ্ধা জানানো। প্রয়োগক্ষেত্রে দেখা যায় এই দায়িত্ববোধের দাবি আবার উপকরণরূপে ব্যবহৃত কাব্যটির মূল্যমানের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। মহাকবি বাল্মীকি দশরথজাতক বা বেসান্তরজাতকের সূত্র থেকে আর্য রামায়ণের কতটুকু উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন তা আজ গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শেক্সপীয়রের বহু নাটকের উৎসে যেসব পূর্বতন রচনা কাজ করেছে তার সঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটকগুলির তুলনার প্রয়োজন বড় কেউ অনুভব করেন না। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের মত কাব্যকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করলে সাহিত্যিক নিরঙ্কুশ মুক্তি ভোগ করতে পারেন কি? স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে—বাধা কোথায়? সে বাধা কি শিল্পসৌন্দর্যের? একটি নতুন রচনাকে স্বতন্ত্র, নূতুন রচনা হিসেবে কি উপভোগ করব না? কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক।

বাংলাদেশে আনুমানিক চতুর্দশ শতক থেকে রামায়ণের অনুবাদ চলে আসছে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পুরোদমে বহু বাঙালী কবি এই একান্ত জনপ্রিয় কাব্যটির অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছেন।[৫] সেকালে অনুবাদের আদর্শ বর্তমানকাল থেকে কিছু পৃথক ছিল। অনুবাদকেরা তখন মূলানুগ থাকার কোনো বিশিষ্ট রীতিনীতিতে বদ্ধ ছিলেন না। বাংলা অনুবাদগুলি মূলানুগ নয়। তাতে—

এক। মূল রামায়ণের বহু কাহিনী বর্জিত হয়েছে, বহু নূতন কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। সংযোজিত কাহিনীগুলির মধ্যে তরণীসেন-বধ, কালনেমি-হনুমান বিবাদ, ভরত-হনুমান-গন্ধমাদন সংবাদ, মহীরাবণ-অহীরাবণের কাহিনী, অঙ্গদ-রায়বার এবং আরও অনেকগুলির নামোল্লেখ করা চলে।

দুই। কাব্যসৌন্দর্যপূর্ণ বর্ণনার অনুল্লেখ। পম্পা সরোবরের স্বপ্নাতুর সৌন্দর্য বাঙালী অনুবাদকেরা নির্মমভাবে ছেঁটে দিয়েছেন। মহাকাব্যিক বর্ণনার গাম্ভীর্য প্রায়ই রক্ষা করা হয় নি। মাঝে মাঝে স্থূল হাস্য, কিম্ভূত রস, তরল-ভক্তির আবেগ বর্ণনার মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে।

তিন। মানববীর্য ও বীরত্বমহিমার মূল সুরটি পর্যন্ত ধর্মভাবনা দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়েছে। পুরুষর্ষভ রাম ভগবানের অবতারে পরিণত হয়েছেন। অলৌকিক আগেও ছিল, কিন্তু অনুবাদে তার পরিমাণ নায়কাদির ভগবত্তাকে অবলম্বন করে বহুল বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬]

চার। যেখানে মহাকাব্যিক আদিম রুক্ষ মানবতা চরিত্রগুলির কল্পনামূলে সক্রিয় ছিল, সেখানে এসেছে মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা ও নীতিবোধ। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন "Bengali Ramayanas" গ্রন্থে অনেক উদাহরণের মধ্য দিয়ে এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

"In the Ayodhya Kanda, Laksmana, infuriated at the banishment of Rama, exclaims before Kausalya, 'Here do I take the vow of Killing my old father, attached to Kaikeyi'. The vow of patricide is certainly a horror according to scriptures, but Valmiki did not see the characters through scriptures but by a mental vision in which he saw the incidents of the Ramayana as vividly as one sees the fruit myrobolan in one's hand.······When

Rama was called to the presence of his father Dasaratha, and Keikeyi, his step-mother, asked him if he would be prepared to keep his father's pledge, he said, 'I shall gladly give my kingdom and even Sita to Bharata of my own accord ; what do you say of the mere kingdom, when my father wills it ?'……We have it again in the Lanka Kanda that Rama at the sight of Sita returning to his presence after the great victory addressed her in a jealous fit and said, 'You may place your heart on Bibhisana, Sugriva, Lakshmana or Bharata'.……and Sita gives a well-deserved retort saying, 'How is it, oh hero, that you speak rude words like a vulgar man, which pain my ears ?' "

পাঁচ। রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে আপন ব্যক্তি-ও-গোষ্ঠীগত ধর্ম-চিন্তাকে প্রবেশ করিয়ে দেবার উদাহরণও বিরল নয়। কখনও শক্তিপূজক কবি রামকে দিয়ে চণ্ডীর পূজো করিয়েছেন, কখনও বৈষ্ণব ভাবনার দ্বারা লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রকে বৈষ্ণবী আখড়ায় রূপান্তরিত করেছেন।[৭]

ছয়। কোন কোন কবি আবার যুগরুচি এবং ব্যক্তিগত প্রবণতার ফলে মূল কাহিনীর মধ্যে নানারূপ পল্লবিত উপকাহিনী সংযোজিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে কবি দ্বিজ ভবানীর লক্ষ্মণ-চন্দ্রকলার বিদ্যাসুন্দরী কেলী-কলা বর্ণনার উল্লেখ করা চলে।

মধ্যযুগে এদিকে দৃষ্টি পড়ত না। কিন্তু কৃত্তিবাসের সুপ্রচলিত কাব্যেও যে বাল্মীকি-রামায়ণের নানা বিকৃতি আছে, সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা হয়নি আধুনিককালে। রামের কুলিশকঠোর পৌরুষ কৃত্তিবাসের কল্পনায় যে রোদন-প্রবণ কুসুমকোমল চরিত্রে পরিণত হয়েছে তা কোনো আপত্তি তোলেনি। কারণ কৃত্তিবাস রামকে দেবতা করে তুলেছেন। কাজেই সেখানে নিন্দার কারণ কেউ খুঁজে পান নি। আসলে সাহিত্যিক সৌকর্যের প্রশ্ন নয়, ধর্মচেতনাই এই সব ক্ষেত্রে সমালোচনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

অবশ্য অন্য একটি দিক থেকেও কিছুটা সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রাচীন কাব্যে অঙ্কিত কোনো কোনো চরিত্র তাদের বিশিষ্ট চারিত্রিক লক্ষণ নিয়ে

আমাদের মনে একটা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে যে সীতা-চরিত্রের করুণ, কোমল, পবিত্র সর্বংসহা মূর্তি কোনো ধর্মচেতনা-নিরপেক্ষভাবে একটি চরিত্র হিসেবেই স্থায়ী প্রভাব পাঠকচিত্তে মুদ্রিত করে। সীতা নামটির সঙ্গে এই চরিত্রবৃত্তিগুলি যেন অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। কেবল সাধারণ পাঠকই নয়, রসিক ব্যক্তিও নাম ও চরিত্রলক্ষণগুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। ফলে পরবর্তী কবি তাঁর কল্পিত সীতামূর্তি দ্বারা এই পুরাতন চিত্রকে যদি নির্মমভাবে আঘাত দেন তবে রসনিষ্পত্তিতে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য একটি বিশেষ নামের সঙ্গে একটা বিশিষ্ট সাহিত্যরসাস্বাদ বিজড়িত থাকাকে বেকন-কথিত Idol বলে গণ্য করা যেতে পারে। বিশুদ্ধ সাহিত্যসৌন্দর্যবোধ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র, এবং পূর্ববর্তী রচনা-নিরপেক্ষ সে রচনা যতই যতই মূল্যবান হোক না কেন। বলা হয়ে থাকে কোন পুরাতন ভাবাসঙ্গকে ভেঙে নতুন ভাবানুভব গড়ে তোলা চাই। যেখানে পুরাতনের ভগ্নমূর্তি মাত্র চোখে পড়ে, নতুন গঠন যেখানে অপূর্ণ বা অযোগ্য, সেখানে ব্যর্থতাই বড় হয়ে ওঠে। ভাঙার মধ্যে বিদ্রোহীর শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু গড়ার অভাবে শিল্পসৃষ্টিতে সে শক্তি পূর্ণতা পায় না। এই মতটি শ্রদ্ধার যোগ্য। কিন্তু এখানে আসল জোরটি পড়েছে কোথায়? গঠনের অপূর্ণতা ও অযোগ্যতার উপরে। কোন রচনায় শিল্পীর নির্মাণক্ষমতা যদি ব্যর্থ হয়, তবে তা কোন মহান মহাকাব্যের অনুসৃত বিষয় বা চরিত্র বলেই নয়, একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব উপকরণে নির্মিত বস্তু হলেও অসার্থক।

সীতার নামের সঙ্গে যে ভাবাসঙ্গ বিজড়িত তাকে সম্পূর্ণত অস্বীকার করে যদি পরবর্তী কবি তাকে দ্রৌপদীর তেজ ও শক্তির উপকরণে গড়ে তোলেন তাহলে সীতা সম্বন্ধীয় আমাদের বহু পুরাতন ও প্রায় বদ্ধমূল বোধ আহত হয়। কিন্তু এই নতুন চরিত্রটি শিল্পগুণে সমৃদ্ধ ও সার্থক হলে শিল্পরসিক পাঠকের আর আপত্তি করার সুযোগ থাকে না। সীতাকে নিয়ে এ-জাতীয় ব্যাপার কবি ঘটান নি। কিন্তু বহুধিক্কৃত এবং বীভৎস রসের আশ্রয় সূর্পণখা মধুসূদনের চেতনায় প্রগল্‌ভা ও যৌবনসমৃদ্ধা নারী রূপে ধরা দিয়েছে ("বীরাঙ্গনা কাব্যে")। আমাদের সংস্কার যাই বলুক সৌন্দর্যবোধ তাতে আপত্তি করে নি। এই শিল্পসার্থকতার প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তবে জনসাধারণের শিল্পবোধের তুলনায় সংস্কার অনেক গভীর এবং শিল্পরসিকের মধ্যেও প্রাচীনের প্রতি আকর্ষণ খুবই সুলভ। কাজেই এদের মূল্যায়নে কেবল সৌন্দর্যমান সর্বদা রক্ষিত হয় না।

রবীন্দ্রনাথের মত শিল্পী যখন "কাহিনী"র কাব্যনাট্যগুলির বিষয় ও চরিত্রমূল মহাভারতাদি গ্রন্থ থেকে সঙ্কলন করেছেন, তিনি কি আপন ভাবনা ও রূপচেতনার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে মূল গ্রন্থের সম্পূর্ণ পারতন্ত্র্য অঙ্গীকার করেছিলেন? তা করেন নি। ঘটনার পর্যায় এবং অনেক বেশি করে চরিত্রের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় প্রায়ই বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূলাতিক্রমণ মধুসূদনের মূলোৎপাটন থেকে গোড়ায়ই পৃথক। রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তিত করেছেন, উল্টে দেন নি। মধুসূদনের পরিবর্তনের পরিমাণমাত্র অধিক নয়, তিনি দৃষ্টিকেন্দ্রের বৈপরীত্য ঘটিয়েছেন।

মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল কবির ভূমিকা নিয়ে আসেন নি, কবি-বিদ্রোহীর ভূমিকা নিয়ে এসেছেন। এ বিদ্রোহের পেছনে চিন্তা-রাজ্যের কোনরূপ সংস্কারচেষ্টা নেই, এ তাঁর কাব্য তথা জীবন-জিজ্ঞাসার অন্তর্গূঢ় উপলব্ধি। বাল্মীকি-রামায়ণে রাম যেমন আদর্শ পুরুষ, বিরাট শক্তিমান ব্যক্তিত্ব; আর্য পিতার, সন্তানের, স্বামীর, নৃপতির আদর্শ মূর্তি, তেমনি কৃত্তিবাসে তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার। মধুসূদন নতুন যুগের মানুষ এবং নতুন ভাব-ভাবনার মানুষ। আর্য রাম যে মহান কীর্তি ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন আজ তা অর্থহীন; অপরপক্ষে কৃত্তিবাসের ভক্তিদ্রাবী ভগবৎচেতনায়ও তাঁর শ্রদ্ধা নেই। কাজেই এ কাহিনীর দিকে তিনি তাকিয়েছেন একটি সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে। সম্ভবত কৃত্তিবাসের রামায়ণের রামের দুর্বল, রোদনপ্রবণ ও বাঁকাশ্যাম মূর্তিই তাঁকে এ চরিত্রটি সম্বন্ধে প্রথম বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। দ্বিতীয়ত, খ্রীস্টধর্মাবলম্বী হিসেবে নয়, সেকালের হিন্দু কলেজের একজন দুর্দান্ত ছাত্র ও নব্যতন্ত্রীরূপে বাঙালীর এই দুর্বলতম সহানুভূতির কেন্দ্রে তিনি আঘাত দিতে চেয়েছিলেন। যাঁরা পূজিত তাঁরাই ধিক্কৃত হলেন, যারা নিন্দার্হ তারাই মাহাত্ম্য পেল। বিদ্রোহীর এই মনোভাব তিলোত্তমায় কেবল ছন্দসাধনায় সক্রিয় ছিল, এখানে তা ভাববস্তু ও চরিত্র-চিত্রণের ভিত্তিতে আশ্রয় নিল। তৃতীয়ত, রাবণের দুর্দম শক্তি কিন্তু তার নিয়তিলাঞ্ছিত সর্বনাশ কবির অন্তরের সঙ্গে সহজেই নিজের সামীপ্য ঘটিয়েছিল। রাবণ আর রামায়ণের একটি বীরমাত্র হয়ে থাকে নি, কবি-আত্মার প্রতিফলনে সে যেন স্বয়ং মধুসূদন হয়ে উঠেছে; বিপুল শক্তি, বিপুল কামনা কিন্তু বিপুলতর ব্যর্থতায় যে একই সময়ে স্বকাল ও চিরকালের মানব। চতুর্থত, রাবণ-ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর বীরত্বের যে উপকরণ মহাকবিরা উপ্ত রেখেছেন কিন্তু

যাকে কবিপ্রাণের ভালবাসার কণামাত্র দেন নি, সেই শক্তিধর কিন্তু স্রষ্টা কর্তৃক অবহেলিত, সমভাবে লেখক ও পাঠকের সহানুভূতিবঞ্চিত মানুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করার মধ্যে মধুসূদনের রোমান্টিক মানসের বিশিষ্ট প্রবণতা আছে বলে কোন কোন সমালোচক মনে করেছেন।[৮] পঞ্চমত, উনিশ শতকে জাতীয় স্বাধীনতাবোধের যে ধারণা বাংলাদেশে দানা বাঁধছিল, বিশেষ করে মধুসূদনের চেতনায় তার যে রূপ ধরা পড়েছিল, তাতে দেশ-আক্রমণকারী রাম-লক্ষ্মণের তুলনায় স্বদেশ-রক্ষাকারী রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতিই সহানুভূতির পাল্লা ভারী হবার কথা; বিভীষণ ধার্মিক ও পুণ্যাত্মা না হয়ে বিশ্বাসঘাতকরূপেই চিত্রিত ও প্রতিভাত হবার কথা। অবশ্য রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের কেন্দ্রীয় ঘটনাটি সর্বাধিক অস্বস্তিকর। সীতাহরণকে বীজস্বরূপ পাপ বলে গ্রহণ করলে সহানুভূতি ও ন্যায় বিচারের সব পাল্লা উল্টে যেতে পারে। কিন্তু মধুসূদনের কাছে সীতা একটি করুণ কোমল সৌন্দর্যের আধার হলেও কাব্যকেন্দ্র নয়। সীতাহরণের ঘটনায় কবির অস্বস্তি কি পরিমাণ কাব্যবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তা পরে লক্ষ্য করা যাবে। অবশ্য পাপস্পর্শহীন চরিত্রই কাব্যাদর্শ সে ধারণাও বদলাল মধুসূদনে এসে।

উপরি-উক্ত কারণগুলির মধ্যেই নিহিত আছে মধুসূদনের কবিপ্রাণের বিশিষ্ট প্রবণতার কথা যার জন্য রামায়ণের কাহিনীটি তাঁর কাছে একই কালে কাহিনীমূল ও বিদ্রোহীচিত্তের আঘাতের সামগ্রী রূপে দেখা দিয়েছিল। এই প্রবণতাগুলির সমন্বয়েই মধুসূদনের কবিচিত্ত তথা ব্যক্তিচিত্তের গঠন। তাই এদের বাইরে থেকে আরোপিত কতকগুলি সাময়িক মনোবৃত্তি বলে অবহেলা করা চলে না। মধুসূদনকে এই মনোভাবগুলির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে আদৌ দেখা চলে না। এগুলি নিয়ে অভিযোগ করা একরূপ অর্থহীন। এই প্রবণতাগুলির শিল্পরূপ সার্থক হলে সাহিত্যবোদ্ধার দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো আপত্তিই উত্থাপন করা চলে না।

রাবণ-চরিত্রে মূল থেকে বীজ গ্রহণ করে মধুসূদনের আপন আত্মার হাহাকার তার মধ্যে ভরে দিয়েছেন। রামায়ণের দুষ্কৃতকারী অনাচারী রাক্ষস হয়ে সে থাকে নি; পিতার স্নেহে, রাক্ষসকুলের হৃদয়বান পুরুষ হিসেবে, দুর্ধর্ষ বীর্যে এবং অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে যে নবরূপ দিয়েছেন কবি, তা নররূপ। রাবণ-চরিত্রসৃষ্টিতে কবি যে দুর্লভ সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে রসিক বাঙালীর মনে মধুসূদনের রাবণই একটা চরিত্র-সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আর্য-রামায়ণের সঙ্গে এর কল্পনাকেন্দ্রের বৈপরীত্য অতি উচ্চকণ্ঠ।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর যে কাহিনী মধুসূদন উদ্ভাবন করেছেন তার সঙ্গে বাল্মিকী-রামায়ণ বা কৃত্তিবাসের কাহিনীর পার্থক্য গোড়ায়। রাবণের মধ্যে কবি আপনার গূঢ় অন্তরকে খুঁজেছেন। কিন্তু রাবণের মত তাঁরও ভালবাসা যে চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তা হল ইন্দ্রজিতের। তিনি একাধিক পত্রে ইন্দ্রজিতের প্রতি তাঁর এই ভালবাসার উল্লেখ করেছেন। মেঘনাদের মৃত্যুবর্ণনার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"He is dead, that is to say, I have finished the VI Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him."

আবার অন্যত্র—

"Let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey army into the sea."

মেঘনাদের প্রতি অতি উঁচু সুরে বাঁধা এই মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হবার ফলে তার চরিত্র যে গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে তাতে সন্দেহ কি? মধুসূদন মেঘনাদের মৃত্যুর যে দৃশ্যটি কল্পনা করেছেন তা রামায়ণ থেকে তাই স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। মেঘনাদ একান্ত অসমযুদ্ধে লক্ষ্মণ কর্তৃক নিহত হয়েছেন। কৃত্তিবাস তার মৃত্যুর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মেঘনাদের বীরত্ব কিছু স্বীকৃতি পেলেও মৃত্যুর মাহাত্ম্য আদৌ রক্ষিত হয়নি। বাল্মীকি ইন্দ্রজিতের হত্যায় যে উল্লাস প্রকাশ করেছেন তা দেব-দ্বিজ-ধ্বংসকারী, যজ্ঞবিরোধী পাপাত্মার নিধনে, পুণ্যের বিজয়ে। কিন্তু মধুসূদন সে উল্লাস প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁর ব্যক্তিচিত্ত যেখানে প্রচুর অশ্রুপাত না করে পারে নি, পার্থিব সর্বব্যাপক বিপর্যয়ের চিত্রপরম্পরায় তাঁর বেদনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় কবি মধুসূদন মেঘনাদ ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ বর্ণনায় যে আপনার স্বতন্ত্র কল্পনার অনুসরণ করবেন এ খুবই স্বাভাবিক। অস্ত্রহীন বীরের পূজার উপকরণ নিয়ে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হওয়া এবং পরিশেষে মৃত্যুবরণ করায় কবির অভিপ্রেত কারুণ্য যেমন শতধারে বর্ষিত হয়েছে, নিয়তি-নিগৃহীত নিহত বীরের মাহাত্ম্যও তেমনি প্রস্তরদৃঢ় কাঠিন্যের সঙ্গে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। এর মূল্য হিসেবে আর্যবীর কিংবা অবতার-পুরুষ লক্ষ্মণের প্রতি যদি কিছু অবিচার করা হয়, কবি তাকে গ্রাহ্য করেন নি। মেঘনাদ-লক্ষ্মণের অসমযুদ্ধ

এবং লক্ষ্মণের মৃত্যু বর্ণনায় কবি মূল থেকে যে পরিমাণ বিচ্যুত হয়েছেন তাতে কবির অন্তর-পুরুষের উল্লসিত প্রকাশ ঘটেছে, এবং কবির রচনারীতির সফল নিপুণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রবিষয়ক পূর্বসংস্কার (রামায়ণ-কথিত) কোথায় ভেসে গিয়েছে। বিভীষণ-মেঘনাদ কথোপকথনেও একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির আরোপ ঘটেছে। পাপ-পুণ্যের স্থানে স্বদেশী ভাবনা, নতুন স্বাধীনতার চেতনা একটা সম্পূর্ণ অভিনব সুরের সূচনা করেছে।

এমন কি লক্ষ্মণের চরিত্রে পঞ্চম সর্গের সংযত বীর্যসাধনা ও ষষ্ঠ সর্গের কাপুরুষোচিত ব্যাধকল্প আচরণের বৈপরীত্যও বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার একান্ত অতীত নয়। কিন্তু রাম-চরিত্র সম্পর্কেই প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। এ প্রশ্ন রামের ভগবত্তা, অবতারত্ব, আর্য আদর্শ প্রভৃতির বিচ্যুতি থেকে আসে নি। এর পশ্চাতে আছে রামচরিত্রাঙ্কনে মধুসূদনের শিল্প-ব্যর্থতা। মধুসূদন যে নতুন ভাবনার আলোকে রামকে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সে বিষয়ে কোনো প্রাচীনতর মহাকাব্যের সংস্কার বা জাতীয় ভাবনা, কিংবা তথাকথিত সিদ্ধরস-বোধের আপত্তিই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ একক কবি হিসেবে তাঁর একমাত্র আনুগত্য আপনার কবি-কল্পনার তথা শিল্পবোধের কাছে। রাবণ-ইন্দ্রজিতের চরিত্রে, এমন কি লক্ষ্মণ-বিভীষণের ক্ষেত্রেও প্রাচীন মহাকবির আদর্শ মূর্তি ভেঙেও তিনি সৃষ্টি-সার্থকতা অর্জন করেছেন। মেঘনাদের মৃত্যু-বর্ণনায় ঘটনা ও পরিবেশগত সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে তিনি যে বাল্মীকি-কৃত্তিবাসকে একান্তভাবে লঙ্ঘন করেছেন তাও সর্বনিন্দার ঊর্ধ্বে। কারণ এসব ক্ষেত্রে কবি যা সৃষ্টি করেছেন শিল্পমূল্যে তার নৈপুণ্য ও ঔজ্জ্বল্য অন্য সব প্রশ্নকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু রামের চরিত্রসৃষ্টিতে সে সার্থকতা ঘটে নি। কবি প্রাচীন মহাকাব্যের আদর্শ ভেঙেছেন বলে নয়, তাঁর কাব্যের একটি বিশিষ্ট (বলা যেতে পারে প্রতিপক্ষীয় প্রধান) চরিত্রাঙ্কনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে সমালোচনার যোগ্য। মধুসূদন যে রামকে ঘৃণা করতেন, তাঁর শিল্পী-আত্মাকে তিনি সেই ঘৃণা থেকে উদ্ধার করতে পারেন নি। ঘৃণা-প্রীতি-নির্বিশেষে আপনার সৃষ্টিমাত্রের প্রতি স্রষ্টার যে ভালবাসা বিস্তারিত রামের ক্ষেত্রে মধুসূদন তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এই বিচ্যুতি শিল্পের, এবং সেজন্যই তা কাব্যকে আহত করেছে।

॥ তিন ॥

মধুসূদন সংস্কৃত রামায়ণ তথা কৃত্তিবাসী রামচরিতের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করেন নি। কিন্তু বাঙালীর ভাব-ভাবনা তাঁর চিত্তমূলে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যাতে মেঘনাদবধ পূর্ববর্তী সংস্কৃত বা বাংলা আকর কাব্য থেকে পৃথক হলেও বিজাতীয় হয়ে পড়ে নি। এ-জাতীয় একটি যুক্তিক্রম একশ্রেণীর শক্তিমান সমালোচকের মধ্যে দেখা যায়, এঁদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মোহিতলালের ভাষায়—

> "এই কাব্য-কাহিনীর ঘনঘটার ফাঁকে ফাঁকে বাঙালীর কুললক্ষ্মী, মাতা ও বধূর বেশে, কবিচিত্ত মথিত করিয়া ক্রন্দন-রবে দিক্‌দেশ বিদীর্ণ করিতেছে। সেই আলুলায়িতকুন্তলা রোদনোচ্ছনেত্রা অপরূপ মমতাময়ী মূর্তি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কবির চক্ষে বিরাজ করিয়াছে। বাঙ্গালীর কাব্যে সত্যকার সৌন্দর্য আর কি ফুটিতে পারে?—তাহার জীবনে আর আছে কি? সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া, মনুষ্যত্ব হারাইয়া, নারীর যে প্রেম ও স্নেহের আত্মত্যাগ সে এখনও প্রাণে প্রাণে অনুভব করে, এবং করে বলিয়াই এখন পর্যন্ত একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, সেই অনুভূতি মেঘনাদবধের কবির বাঙালীত্ব অটুট রাখিয়াছে, বাঙালীর গৃহসংসারের সেই পুণ্য-দীপ্তি—মধুসূদনের হৃদয়ে তাঁহার মায়ের সেই স্নেহ-ব্যাকুলতার অশান্ত স্মৃতি তাঁহাকে বিধর্ম হতে রক্ষা করিল।"

মধুসূদনের কাব্য-আলোচনায় এই বাঙালীয়ানার ব্যাপারে এককালে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। মধুসূদন যখন বিজাতীয় ভাবধারার সেবক ও বিধর্মী বলে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, হিন্দু জাতীয়তাবাদের সেই অতিউল্লাসের যুগে শিক্ষিত বাঙালীর মন এদিকে আকৃষ্ট করবার জন্য মধুসূদনের বাঙালীত্ব প্রমাণের তাৎপর্য ছিল।[৯] কিন্তু সাহিত্যবিচারের দিক থেকে এ পরিচয় অবশ্য-প্রয়োজনীয় ছিল না। সাহিত্যের মূল্যবিচারে জাতীয়-বিজাতীয়ের প্রশ্নটি অত্যন্ত গৌণ এবং কিছু সতর্কভাবে বিচার্য। এককালে ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালী কবি বলে অভিহিত হতেন। বঙ্কিমের উপন্যাসের ইংরেজিয়ানা অনেককেই ব্যথিত করত। আসলে বাঙালীর জাতীয়তাও পরিবর্তনশীল। বাঙালীর জাতীয় জীবনে ইংরেজি প্রভাব যেমন বাস্তব, তার সাহিত্যেও তা অপরিহার্য। ইংরেজি ভাব-ভাবনাকে বাদ দিয়ে আধুনিক বাঙালীর বাঙালীয়ানা কোথায় দাঁড়ায় বলা কঠিন। ইতিহাসের ধারায়

নানা বিদেশী প্রভাব জাতীয়জীবনের উপরে পড়ে। মোহিতলাল বাঙালীর চিরকালীন স্বভাবধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বর্তমান বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে তাকে আর বাস্তব বলে মনে হবে না। বাঙালী আজ স্বধর্মচ্যুত—একমাত্র এই নিন্দাবাক্যের সহায়তায় বাস্তবকে এড়ানো যাবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা, কোনো মহৎকবির আস্বাদই দেশকাল দ্বারা এতটা পরিচ্ছিন্ন নয় যে তার সাহায্যেই এর মূল লক্ষণ নির্ণীত হতে পারে। এ সম্পর্কে মধুসূদনের নিজের মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। নাটক প্রসঙ্গে গৌরদাস বসাককে যে পত্র তিনি লিখেছিলেন, তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে তা সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য—

> I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama. But if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you, if there be a foreign air about the thing ? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism, Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism ? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and modes of thinking ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a senile admiration of everything Sanskrit.

কবির এই পত্রে সাহিত্যরসের সর্বজনীনতার আদর্শ ঘোষিত হয়েছে। শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তা যে নতুন পথ ধরেছে সে চেতনার পরিচয়ও কবি দিয়েছেন। কবি জানতেন কবিগানের আসরে যে বাঙালী সমবেত হন তাঁরা তাঁর পাঠক নন। মধুসূদন যে বাঙালীদের কথা বলেছেন তাঁরা "think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and modes of thinking"—বাংলাদেশের সংস্কৃতি পরবর্তী কালে মূলত এই পথেই অগ্রসর হয়েছে।

তবে যে-কোনো কবিশিল্পীকেই মূলত স্বদেশ এবং স্বকালের উপরে ভিত্তি করে সর্বজনীনকে স্পর্শ করতে হয়। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের বহু চরিত্রের ভিত্তিতেই বাঙালীজীবনের চিত্র আছে। এই চিত্রের দিকে কবির আকর্ষণ শিল্পী হিসেবে। বাঙালীয়ানার প্রতি মমত্ববশত নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসা এবং রূপাবেদন নিখিলের আনন্দের সামগ্রী হলেও তার অন্তরে পল্লী-বাংলার চিত্রটি যেন জীবন্ত হয়ে আছে। রূপের মধ্য দিয়ে অরূপকে স্পর্শ করতে হয়। সর্বকালীন সর্বজনীনতার কোনো চেহারা নেই; দেশকালপরিচ্ছিন্ন চরিত্ররূপের ভিত্তিতে কবিকে বৃহত্তর আবেদন সৃষ্টি করতে হয়। মধুসূদনের শিল্পী-সত্তা অনেকখানি ভেসে গেলেও দেশকালের মূল থেকে উৎপাটিত হয় নি। তাঁর মেঘনাদবধে দেশীয় ভাবভাবনার প্রতি অশ্রদ্ধা যেমন আছে, তেমনি তাঁর শিল্পীপ্রাণের অভ্রান্ত লক্ষ্য দেশকালের জীবনসত্যকে বরণও করেছে।

মধুসূদন ভাবচেতনায় বিদ্রোহী কিন্তু কবি। তাঁর বিদ্রোহীচেতনা ও কবিচিত্ত যেখানে অন্বয়-সম্বন্ধযুক্ত সেখানেই শিল্পসার্থকতার চরম। যেখানে বিদ্রোহঘোষণা কবিপ্রাণতার সঙ্গে সম্পর্কহীন, সেখানেই অকারণে তিন-চতুর্থাংশ গ্রীক হবার সাধনা এবং সংস্কৃত ভাবভাবনা ও শিল্পরূপের শৃঙ্খলভঙ্গের প্রতিজ্ঞায় উত্তেজনা।

কবির মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদনের আত্মার এই সঙ্কটটি সর্বাধিক প্রকাশিত।

মধুসূদন বিদ্রোহী এবং মধুসূদন কবি। বলা হয় তিনি বিদ্রোহী কবি। এই বিদ্রোহ মধ্যযুগের ভাবভাবনার বিরুদ্ধে, ধর্মের আধিপত্যের বিরুদ্ধে, শিল্পরূপের কতকগুলি পুরাতন ও স্থূল বন্ধনের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিদ্রোহ এবং কবিত্বের মধ্যে কোনো অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। প্রচণ্ড বিদ্রোহী হলেও শৈল্পিক সার্থকতা অনায়ত্ত থাকতে পারে। ভাবরাজ্যের বিদ্রোহী আদৌ শিল্পী না হতে পারেন। শিল্পরাজ্যের বিদ্রোহী ইতিহাসে স্থান পেতে পাবেন গৌরবের, উৎকর্ষের মূল্য তাঁর নাও জুটতে পারে। আবার শিল্পী ভাব ও শিল্পরাজ্যে বিদ্রোহের বার্তা বহন করে প্রতিভার গুণে যুগপৎ ইতিহাসসৃষ্টি ও উৎকর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারেন। মধুসূদনের শিল্পীপ্রাণ স্বরূপত বিদ্রোহী। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহীচেতনা শিল্পীসত্তাকে সর্বদা মান্য করে নি। কখনও কখনও বিদ্রোহের কোনো কোনো সুর শিল্পবোধকে অস্বীকার করে আত্মঘোষণা করেছে। বিশেষ করে মেঘনাদবধ কাব্যে এ দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়।

কবি-বিদ্রোহী অমিত্রচ্ছন্দের আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এ ছন্দে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবল আন্দোলন প্রতিফলিত। পয়ারাদি ছন্দ থেকে বন্ধনমুক্তির কামনামাত্র নয়, প্রবাহিত ছন্দোস্রোতের গম্ভীর ও কোমলের মিশ্রণে কবির শিল্পী-প্রাণ এক বিচিত্র সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছে; রাবণ-ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার মধ্যে কবির বিদ্রোহবোধই তৃপ্ত হয় নি, মানবজীবন ও ভাগ্যের গভীরে প্রবেশ করায় কবিহৃদয় বেদনামথিত আনন্দ উপভোগ করেছে। কবির বিদ্রোহীচেতনায় এর উৎস, কিন্তু শিল্পবোধে এর স্থিতি। রাম-বিভীষণাদির চরিত্রের প্রতি কবির বিদ্বেষ বিদ্রোহমন্ত্রে দীক্ষিত। ভগবানের অবতার বলে রাম যে শ্রদ্ধা পেয়েছে তা কবি তাকে দেবেন না। পুণ্যাত্মার ছদ্মবেশে বিভীষণের স্বজনদ্রোহ তিনি সহ্য করবেন না। এই বিদ্বেষ কিন্তু সর্বদা শিল্পসার্থকতা পায় নি। অন্তত রামের চরিত্রে কবির বিদ্রোহী মনের পরিকল্পনার চিহ্ন আছে, শিল্পীহৃদয়ের সৃজনের সার্থকতা নেই। পরিকল্পনায় যা বিদ্রোহ, রচনায় তাইই প্রায় হয়ে উঠেছে শিল্প। যেখানে তা হয় নি সেখানেই ব্যর্থতা। সেখানে কবি কখনও চিৎকার করে ওঠেন—"আমি রামকে ঘৃণা করি", "আমার এ কাব্যের তিন-চতুর্থাংশ গ্রীক", "সংস্কৃত সাহিত্যরীতির কোনো বন্ধন আমি মানি না।"

॥ চার ॥

মেঘনাদবধ কাব্যের গঠনরীতি বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব এবং অনন্য। শুধুমাত্র ইতিহাসের দিক থেকেই নয়, আখ্যানকাব্যের রসাস্বাদের দিক থেকেও এর মূল্য অনেক। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যবিচার প্রসঙ্গে তার গঠনরীতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আখ্যানকাব্য হিসেবে তিলোত্তমাসম্ভবের বিচিত্র বিচ্যুতি আমরা লক্ষ্য করেছি। এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে কাব্যটির আস্বাদে কাহিনীকাব্যের রসাবেদন ব্যর্থ হয়েছে। গঠনরীতির নৈপুণ্য কাব্যের আস্বাদকে বিশিষ্ট করে তোলে, তার আবেদনকে সার্থক করে। মধুসূদনের মেঘনাদবধের গঠনে নিপুণতা আছে—সে নিপুণতার ইতিহাসনিরপেক্ষ রসাবেদন আছে। আবার কাহিনী-কাব্যের এ-জাতীয় নিপুণতা বাংলা কবিতার রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব।[১০] মধ্যযুগের বাংলা কাহিনী-কাব্য ছিল অতি শিথিলগঠন। মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনীবৃত্ত যে কেবলমাত্র কতকগুলি বহিরঙ্গ নিয়মের চাপে কেন্দ্রচ্যুত তাইই নয়, মূল কাহিনী-কল্পনায়ও প্রায়ই ঐক্যের অভাব দৃষ্ট হয়। মনসামঙ্গলের কাহিনী-ভিত্তিতে

চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বজাত একটি সমস্যার কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে ঘটনার ঐক্য নেই। টুকরো টুকরো ঘটনা কোন ব্যক্তির জীবনসূত্রে শ্লথভাবে সন্নিবিষ্ট। কাহিনীর যেমন ঐক্য নেই, তেমনি বর্ণনীয় ঘটনার প্রতিও অভ্রান্ত লক্ষ্য নেই কবির। এক ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে অনায়াসে পরিক্রমা চলে। বন্ধন নেই, বাধ্যবাধকতা নেই। কার্যকারণের কোনো কেন্দ্রবিদ্ধ শৃঙ্খলে ঘটনাবলী সংহত নয়। শিথিলবদ্ধ ও শ্লথগতি ঘটনার চারধারে বর্ণনসৌকর্যের পরিমণ্ডল দেশে বিদেশে যুগে যুগে আখ্যানকাব্যকে আস্বাদ্য করে তোলে যদিও সে আস্বাদ নিবিড় ঐক্য ও কঠিন গঠননিপুণতার উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে না। বাংলা কাহিনীকাব্যে গোটা মধ্যযুগ ধরে বর্ণনার সেই সৌন্দর্যও বড় দৃষ্ট হয় না, বরং কতকগুলি নীতি-নিয়মের আরোপে কাহিনীতে স্বভাবত যতটুকু আকর্ষণ থাকে তা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কখনও দীর্ঘস্থান জুড়ে দেবস্তুতি শ্লোকের পর শ্লোকে গড়িয়ে চলে, কখনও পতিনিন্দার স্থূলরুচিহাস্যে গল্পের খেই হারিয়ে যায়, কখনও চলে বারমাসীর গান, কখনও রন্ধনদ্রব্যের তালিকা। কখনও শাড়ির, কখনও অলঙ্কারের, কখনও অন্য কোন বস্তুর তালিকার পরে তালিকা পড়ে পাঠককে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, মনে হয় আকারপ্রকারহীন নামের অরণ্যে বুঝি পথ হারিয়ে গেছে। নাম বস্তুকে বিশিষ্ট করে, নাম তাই বস্তুরূপকে দেখবার আলো। কিন্তু সেই নামই মঙ্গলকাব্যে রূপহীন প্রাচুর্যের অন্ধকার। কখনও টুকরো ঘটনায় কোন ব্যক্তিজীবনের সূত্রে গাঁথা মালা Unity of impression-কে বহন করবার দায়িত্ব নিতে নারাজ। কখনও প্রধান গল্পটিকে খুঁজে পাওয়া গেলেও আরম্ভেরও আরম্ভ বর্ণনায় কবির যে-পরিমাণ উৎসাহ, যে-পরিমাণ আকর্ষণ গল্পের সমাপ্তিরও শেষের কথা বলায় সে-গল্পের মূল অংশের দিকে নজর দেবার সময়ই তিনি করে উঠতে পারেন না। কখনও আবার ক্ষুদ্র পার্শ্বকাহিনী কায়াবিস্তার করে মূলকাহিনীকে রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। কখনও পার্শ্বকাহিনীর সঙ্গে মূল গল্পের সম্পর্কের সূত্রটি আবিষ্কার করা যায় না।

বাংলাদেশের নিজস্ব কাব্যধারায় সুপ্রচুর আখ্যানকাব্যের সৃষ্টি হলেও তার ঐতিহ্যের মধ্যে অনুকরণযোগ্য শিল্পসার্থকতা ছিল না।[১১] অবশ্য মধুসূদন এই কাব্যধারার প্রতি কোনোদিন সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন এমন প্রমাণ চতুর্দশপদীর কয়েকটি সনেট ব্যতীত পূর্বে-পরে কোথাও মেলে না।

বরং ভারতীয় সংস্কৃত কাব্যাদির গঠনশৈলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠতর সেদিক থেকে ঐতিহ্যসূত্রে কোন সাহায্য কবি গ্রহণ করেছিলেন কিনা দেখা যেতে পারে। সেকালের সংস্কৃত কাব্যাদির গল্পগঠন-রীতির সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন,

"কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষেরই গল্প শুনিতে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। সকল সভ্যদেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস জীবনী ও উপন্যাস আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না, যদি-বা ভারতসাহিত্যে ইতিহাস উপন্যাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই। বর্ণনা তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার গল্পপ্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত হইলেও প্রশান্ত ভারতবর্ষের ধৈর্যচ্যুতি দেখা যায় না। এগুলি মূল কাব্যের অঙ্গ না প্রক্ষিপ্ত, সে আলোচনা নিষ্ফল , কারণ প্রক্ষেপ সহ্য করিবার লোক না থাকিলে প্রক্ষিপ্ত টিকিতে পারে না। পর্বতশৃঙ্গ হইতে নদী যদিও শৈবাল বহন করিয়া না আনে, তথাপি তাহার স্রোত ক্ষীণবেগ না হইলে তাহার মধ্যে শৈবাল জন্মিবার অবসর পায় না। ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না, কিন্তু যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমস্ত ভগবদ্গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই। কিষ্কিন্ধ্যা এবং সুন্দরকাণ্ডে সৌন্দর্যের অভাব নাই একথা মানি, তবু রাক্ষস যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল তখন গল্পের উপর অতবড় একটা জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলে সহিষ্ণু ভারতবর্ষই কেবল তাহা মার্জনা করিতে পারে। কেনই বা সে মার্জনা করে। কারণ গল্পের শেষ শুনিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র সত্বরতা নাই। চিন্তা করিতে করিতে, আশপাশ পরিদর্শন করিতে করিতে ভারতবর্ষ সাতটি প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং আঠারোটি বিপুলায়তন পর্ব অকাতরচিত্তে, মৃদুমন্দগতিতে পরিভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না।"

—কাদম্বরীচিত্র। প্রাচীন সাহিত্য।

হেক্টরবধ' নাম দিয়ে মধুসূদন হোমরের ইলিয়াড কাব্যের যে অনুবাদ করেছিলেন তার উৎসর্গপত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে ভারতীয় মহাকাব্য বিষয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে মধুসূদনের পাশ্চাত্যপ্রীতিমাত্র প্রকাশ পায়নি—

"মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্‌-রচয়িতা কবি যে সর্বোপরিশ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চপাণ্ডবের জীবনচরিত মাত্র; তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয়ম্‌ ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়?"

মধুসূদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিচার এখানে অবান্তর। কিন্তু লক্ষণীয় যে, কুমারসম্ভব-শিশুপালবধকে যেমন ইলিয়াডের সঙ্গে তুলনায় নস্যাৎ করেছেন রামায়ণ-মহাভারকে তা করেন নি। রামায়ণ-মহাভারতকে তিনি জীবনচরিত মাত্র বলেছেন, সঠিক মহাকাব্য বলেন নি। জীবনচরিতের ন্যায়ই এ দুটি মহাগ্রন্থে রাম এবং পাণ্ডবদের বহু কীর্তির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। একটি ঘটনাকেন্দ্রে, একটি বিশিষ্ট ভারকেন্দ্রে তা সংহত নয়, এদিক থেকে নিঃসন্দেহে ইলিয়াড তাঁর আদর্শ। রামায়ণ-মহাভারত নয়।

ইলিয়াডের গল্পগ্রন্থনের এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া যাক। হোমরের এই কাব্যের কাহিনীটি দৃঢ়বদ্ধ। দশ বৎসরব্যাপী ট্রোজান ও অ্যাকিয়ানদের যুদ্ধবিবরণ না দিয়ে একটা খণ্ডকালের উপরে মাত্র দৃষ্টি কেন্দ্রিত করেছেন কবি। যুদ্ধের কারণ অর্থাৎ প্যারিস কর্তৃক হেলেনের অপহরণ পরোক্ষ-ভাবে উল্লিখিত হয়েছে মাত্র, সে ঘটনার বিবরণ ইলিয়াডে নেই। আবার ট্রয়-সংগ্রামের পরিণতির যে কাহিনী গ্রীসের সেকালীন সভাকবি আর স্বভাবকবিদের মুখে মুখে ফিরত, দারুঅশ্ব সহযোগে সৃষ্ট সেই চাতুরিকাহিনীও হোমরের শিল্পদৃষ্টিতে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। এ কাহিনীর কেন্দ্রীর ঘটনা হেক্টরের মৃত্যু। কবি মধুসূদন তাই অনুবাদকালে এর নাম দিয়েছেন 'হেক্টরবধ'। যেমন মেঘনাদের মৃত্যু তাঁর যে কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা তার নামকরণ হয়েছে 'মেঘনাদবধ'। কিন্তু ইলিয়াড কাব্যের নায়ক হেক্টর নয়—আকিলিস। সমালোচকেরা ঠিকই বলেছেন, "It was the story of Achilles." আকিলিসের ক্রোধ ও রণত্যাগে কাব্যের আরম্ভ। দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং হেক্টরের নেতৃত্বাধীন ট্রয়ের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গ্রীকদের বারংবার বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও আকিলিসের ক্রোধের উপশম হয় নি। অবশেষে বন্ধু পাত্রক্লসের মৃত্যুতে আকিলিস ক্রোধোন্মত্ত হয়ে রণযাত্রা করল। হেক্টরকে বধ করেও তাঁর ক্রোধ শান্ত হল না, তাঁর মৃতদেহ তিনি নিয়ে এলেন

এবং নানাভাবে সেই দেহের অবমাননা করতে লাগলেন। অবশেষে হেক্টরের পিতা বৃদ্ধ নৃপতি প্রিয়ামের অনুরোধে তিনি হেক্টরের মৃতদেহ ফিরিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ প্রিয়াম পুত্রঘাতী আকিলিসের হস্তচুম্বন করে যখন হেক্টরের মৃতদেহ ফিরে চাইলেন আকিলিসের অন্তর বিদীর্ণ করে জীবনের ট্রাজিক উপলব্ধির যে বাণী প্রকাশিত হল—

> "We men are wretched things, and the gods, who have no cares themselves, have woven sorrow into the very pattern of our lives".

এবং এর সঙ্গে বিজড়িত হয়ে নিজের অকাল মৃত্যুর করাল কৃষ্ণচ্ছায়াপাতে যে দীর্ঘশ্বাস নির্গত হল, "only a single son doomed to untimely death", তাতে ট্রাজিক নায়ক হিসেবে আকিলিসের দাবিই সুপ্রতিষ্ঠিত। এই মহাকাব্যের গ্রন্থনৈপুণ্যের প্রশংসা করে সমালোচকেরা নানা কথা বলেছেন। জনৈক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত হল; কারণ এর মধ্য দিয়ে মধুসূদনের কাব্যদেহগঠনের আদর্শের সন্ধান মিলবে।—

> "the Iliad is a fine example of the Greek method of constructing a story or a play. In most cases, since the matter was traditional, the end was already known to the audience when they sat down to the beginning, and the author had to secure his effects by other methods than that of surprise. He could of course show a greater or lesser degree of originality in the details of his composition.······And in the case of the Iliad, Homer's first audiences must have been delighted by the daring humour with which he presented the comedy of Olympus; ···But apart from such innovations, Homer employs two devices, both of which are typical of Greek art. First, like the Attic dramatists, far from feeling that his hearers' foreknowledge is a handicap, he makes capital out of it by giving them confidential asides. ···The action of Iliad covers only fifty days in

a ten years' war. But by a skilful extension of the device I am discussing, Homer causes two shadows to add their sombre significance to every page, that of the past and that of what is yet to come. Secondly, Homer employs the device of delayed action. His hearers know what is coming, but not how or when. The sinister figure of Achilles is introduced at the beginning of the poem, but only to be withdrawn into the background till we reach Book IX." [১২]

গঠনশৈলীতে মধুসূদন সচেতনভাবে হোমরকে অনুসরণ করেছেন—বহুলাংশে আত্মস্থ করেছেন। এমন কি, কাব্যারম্ভেব "Let us begin, goddess of song" এবং কাব্যসমাপ্তিতে হেক্টরের মৃতদেহ সংকারান্তে স্তম্ভনির্মাণ মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে স্পষ্টই অনুসৃত হয়েছে। মধুসূদনের বিশিষ্ট সাহিত্যিক রুচি এবং য়ুরোপীয় কাব্য-নাটকাদি পঠনপাঠনের ফলেই গল্পগ্রন্থনের পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জন্মে এবং তাদের অনুরূপ কাহিনীকাব্য লিখবার উদ্দেশ্যে তিনি হোমরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। বাংলা কাহিনী-কাব্যের ইতিহাসে মধুসূদনের এই অভিনব পথপ্রদর্শন খুব ফলপ্রসূ হয় নি, কারণ আধুনিক কাহিনীকাব্যের চরমোৎকর্ষ মধুসূদনে ঘটবার পরে অতিদ্রুত তার সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যে। তবে কাহিনীগ্রন্থনে এই ঐতিহাসিক কৃতিত্ব পরবর্তী উপন্যাস-সাহিত্যকে অনেকটা সহায়তা করেছিল বলেই মনে হয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনীটি বাঙালী পাঠকের বহুপরিচিত। কিন্তু পরিচিত কাহিনীর মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টির চেষ্টায় হোমরাদি কবিকে গঠনরীতিতে যে সব কলাকৌশলের অনুসরণ করতে হয়েছে, মধুসূদনকে তা হয় নি। মূল রামায়ণের অতিক্ষীণ কাঠামোটি মাত্র গ্রহণ করে আপনার বিশ্বাসে ও বিদ্রোহে তিনি কাহিনীটির আবেদনকে সম্পূর্ণত বদলে দিয়েছেন। মৌলিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁকে বিশেষ করে কোনো কৌশল অবলম্বন করতে হয় নি। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে।

হোমরের আদর্শে মধুসূদন দীর্ঘকালস্থায়ী লঙ্কাযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণদান থেকে

নিরস্ত হয়েছেন। তার পূর্ববর্তী কার্যকারণসূত্র এবং পরবর্তী ফলাফলের প্রত্যক্ষ কাহিনী বর্ণনা না করে মাত্র কয়েকদিনের ঘটনাকে অবলম্বন করেছেন। বীরবাহুর মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে কাব্যের আরম্ভ, মেঘনাদকে সৈনাপত্যে বরণ করা হল সেই দিনই। সেদিন রাত্রিতে একদিকে স্বামীমিলনাকাঙ্ক্ষায় যেমন প্রমীলা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করল তেমনি অন্যদিকে আকাশের দেবতা এবং পৃথিবীর মানুষ মিলে নানা ষড়যন্ত্র ও সাধনায় মেঘনাদকে হত্যার ব্যবস্থা করল। সে হত্যাকাণ্ড ঘটল উষাকালে। পর দিবস ক্রোধোন্মত্ত রাবণের যুদ্ধযাত্রা, শক্তিশেলে লক্ষ্মণের প্রাণহরণ। সেই রাত্রে রামের নরকদর্শন এবং লক্ষ্মণের পুনরায় প্রাণ লাভ। পর দিবস মেঘনাদের মৃতদেহ-সংকার এবং প্রমীলার সহমরণ। মোট তিন দিন এবং দুই রাত্রির ঘটনা নিয়ে মেঘনাদবধ কাব্য রচিত। তার মধ্যে প্রথম রাত্রির বিস্তারে চারটি সম্পূর্ণ সর্গ এবং অপর একটি সর্গের কতকাংশ স্থান লাভ করেছে স্বচ্ছন্দে। বলা যেতে পারে মেঘনাদবধ প্রায় রাত্রির কাব্য। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম এবং অংশত ষষ্ঠ সর্গে রাত্রির কাহিনী স্থান পেয়েছে। এত স্বল্পকালপরিক্রমায় একটি বিপুলপ্রাণ (বিপুলাকৃতি না হলেও) মহাকাব্যের সৃষ্টি কবিক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এর পেছনে গ্রীক নাটক বিষয়ে এরিস্টটলের নীতিনিয়মের প্রভাব আছে—এরূপ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। এই আড়াই দিনের পরিসরে কবি আমাদের কেবল স্বর্গ-মর্ত-রসাতল পরিভ্রমণ করান নি, লঙ্কাকাণ্ডের সামগ্রিক ধ্বংসযজ্ঞের বোধটি আমাদের মনে সঞ্চারিত করেছেন। রাবণের আর্ত হাহাকারে এবং অভ্রান্ত ভবিষ্যৎদর্শনে যেমন একদিকে গম্ভীর ট্রাজেডির কালো ছায়া নেমে এসেছে, তেমনি সীতা-সরমা সংবাদে অথবা চিত্রাঙ্গদার ভর্ৎসনায় লঙ্কাযুদ্ধের পূর্বদ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। আদর্শ হোমরের হলেও মধুসূদন তাকে সম্পূর্ণই আত্মস্থ করে প্রকাশ করেছেন। মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে ঘটনার গতি এমন তরঙ্গিত, আবেগের সুর এমন উচ্ছ্বসিত ও নভঃস্পর্শী হয়ে উঠেছে যাতে যুগের জাতির বেদনা ও উল্লাস ভাষারূপ পেতে পারে।

নাট্য, কাব্য এবং উপন্যাসে গঠনের ঐক্য একইরূপ হবে না—এ কথা সহজেই বোঝা যায়। নাট্যকার, কবি (আখ্যায়িকা-কাব্যের) এবং ঔপন্যাসিকের ভাবদৃষ্টি ও রূপচেতনা যেমন বিভিন্ন, তেমনি কাহিনীকেন্দ্রিক এই তিনটি সাহিত্যধারার মধ্যে আস্বাদেরও স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। গল্প বস্তুটি সাহিত্যের

শৈশব থেকেই অতিপ্রচলিত। কিন্তু রূপকথার গল্পে কালের সূত্রে বাঁধা থাকে ঘটনার মালা। কোনো মানুষের জীবনের নানা ঘটনার উত্থান-পতন সেখানে, কখনও অস্পষ্টভাবে একটা সমস্যার শিথিল কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তন; কিন্তু অঙ্গগুলি তার সমস্যার ভিত্তিতে দৃঢ়প্রোথিত নয়। পরিণত কাহিনীতে কালসূত্র গৌণ হল, কারণের পরম্পরায়, যুক্তির বন্ধনে ঘটনা সংবদ্ধ হল। উপন্যাসে এই কারণবদ্ধ ঘটনাবলী—যুক্তিক্রম গল্পাংশের সূত্র চরিত্রসূত্রের সঙ্গে টানাপড়েনে বুনে যায়। যুক্তি এবং কারণ তাই ব্যক্তিচরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সাধারণত্ব বর্জন করে বিশিষ্ট হয়, জটিল হয়ে ওঠে। উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের গুরুত্ব সর্বাধিক, তাই প্লটের পাকে পাকে চরিত্রও সেখানে জড়িয়ে যায়। আখ্যানকাব্যে চরিত্রের গুরুত্ব থাকে, কিন্তু উপন্যাসের মত প্রাধান্য থাকে না। আখ্যানকাব্যের প্লটের একটি সূত্র তাই চরিত্রের ব্যক্তিবোধের উপকরণে নির্মিত নয়। বরং কাব্য বলে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের যে স্বাভাবিক অবকাশ এখানে আছে তাতে কাহিনীর কোনো কেন্দ্রবিন্দুতে অবিচল ও সংহত স্থিতি সম্ভব নয়, অভিপ্রেতও নয়। আখ্যানকাব্য যদি কাহিনীকেন্দ্রকে সবস্ব করে তুলে আদ্যন্ত একটি অতিসংহত প্লটের জন্ম দেয়, তবে তার নাটকীয় ঐক্যে মুগ্ধ হওয়া যায়, কিন্তু তার কাব্যত্ব বিসর্জিত হয়। কারণ আবেগ ঐরূপ কঠিন প্লটসবস্বতায় বাঁচতে পারে না, গল্পের কাছে বর্ণনা আত্ম-সমর্পণ করে বসে।

এই পরিপ্রেক্ষিতটি স্মরণে রেখেই মেঘনাদবধ কাব্যের গঠনশৈলীর নিপুণতা বিচার করতে হবে।

মেঘনাদবধের কেন্দ্রীয় ঘটনা মেঘনাদের মৃত্যু, কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাব রাবণের আত্মধ্বংসী আর্তনাদ—সব ধ্বংসের চেতনা। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণ আত্মধ্বংসের গভীর বেদনা অনুভব করেছে, সমগ্র লঙ্কাপুরীর আসন্ন সর্বনাশ লঙ্কার শ্রেষ্ঠ এই বীরের মৃত্যুর আগ্নেয় রেখায় যেন মুখব্যাদান করে ধরা দিয়েছে। ঘটনা ও ভাবের কেন্দ্রবিন্দু তাই সহজেই সমন্বিত হয়েছে। মেঘনাদের মৃত্যুতে কাহিনীর শীর্ষ। ছয়টি সর্গ ধরে নানামুখী সাধনা এবং ষড়যন্ত্র এই চরম মুহূর্তটিকে ঘনিয়ে তুলেছে। তার পরের তিন সর্গ জুড়ে ক্রমাবনতির পথ ধরে সমাপ্তিতে পৌছানো। প্রথম সর্গে মেঘনাদকে সৈনাপত্যে বরণ ঘটনা-হিসেবে প্রয়োজনীয়। বলা যেতে পারে ঘটনাবৃত্তের আরম্ভ এখানেই। কবি কাব্যারম্ভে বীরবাহুর মৃত্যুপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সর্গে কবির লক্ষ্য

যে মেঘনাদের সৈনাপত্য-গ্রহণের বর্ণনা সে বিষয়ে প্রথমাবধি কবির কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। কাব্যারম্ভের প্রথম বাক্যেই আছে—

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?

এই বীরবরের পরিচয়, রাঘবারি রক্ষকুলনিধি রাবণ কর্তৃক তাকে সৈনাপত্যে বরণ করে যুদ্ধে প্রেরণই এই সর্গের আলোচ্য ঘটনা। কিন্তু বাকি অংশটুকু কি কেবল মাত্র কাব্যকল্পনার অতিবিস্তার—কাহিনীর সঙ্গে কি তার সম্পর্ক একান্ত গৌণ? এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কাব্যপাঠকালে করা হবে। গঠনরীতির দিক থেকে এটুকুই বক্তব্য যে, বীরবাহুর (বাল্মীকি-রামায়ণের ন্যায় মকরাক্ষের নয়) মৃত্যুর বর্ণনা—বিশেষ করে রাবণের হাহাকারের মধ্য দিয়ে কবি প্রথমেই একটি সুগভীর ট্রাজেডির সুরে সমগ্র কাব্যসঙ্গীতের তারগুলো বেঁধে দিলেন। একটা গম্ভীর গভীর বিমর্ষতায় কাব্যটির পটভূমি প্রথমাবধি চিত্রিত হয়ে গেল। কাব্যের ভাবরসের দিক থেকে কিংবা পূর্ববর্তী ঘটনার কালানুক্রমিক সূত্র হিসেবে এর প্রয়োজন তো ছিলই, তাছাড়া মেঘনাদের সৈনাপত্যবরণের পশ্চাৎপটে রাবণের অপরপুত্রের মৃত্যুর ঘটনা গভীরভাবেই তাৎপর্যবহ। কবি অবশ্য এর মধ্যে মুরলা, লক্ষ্মী, বারুণির আবির্ভাব ঘটিয়ে নানা বর্ণনার সুযোগ করে নিয়েছেন। কাহিনীকে তা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করলেও কাব্যরসের দিক থেকে তারা অনিবার্য।

দ্বিতীয় সর্গে স্বর্গ ও দেবকাহিনী কিছু পল্লবিত বিস্তৃতি পেয়েছে। অবশ্য মেঘনাদের হত্যাসাধনের ষড়যন্ত্রের প্রধান লীলাকেন্দ্ররূপে মধুসূদন দেবস্থানকেই বেছে নিয়েছেন। কাব্যের মূল ঘটনার সঙ্গে এই সর্গের যোগ তাই অতি ঘনিষ্ঠ। বর্ণনায় ও কল্পনায় অবশ্য এমন বহু মুহূর্ত বা চিত্র বা চরিত্ররূপ গড়ে তোলা হয়েছে কাহিনী-ভিত্তির সঙ্গে যাদের প্রায় কোনো যোগাযোগই নেই। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গের মূল কল্পনা প্রয়োজনের আহ্বানেই কাব্যমধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ বর্ণিত। যে মেঘনাদের বীরত্বকে ঘিরে এত উল্লাস, যার মৃত্যুতে হাহাকার এত তীব্র, তার শুধু বীররূপের পরিচয়

পাঠকদের সহানুভূতিকে সম্পূর্ণত উদ্দীপ্ত করতে পরে না। নিজের বীরত্বে, পিতামাতার স্নেহে, স্ত্রীর প্রেমে সমন্বিত পূত বারিধারায় তার জীবনপাত্র পূর্ণ। বীর মেঘনাদের মৃত্যুতে শুধু নক্ষত্রপতনের দুর্দৈব সূচিত হয় নি, কবির কল্পনারাজ্যের এই পূর্ণকুম্ভ-বিদারণের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রমীলার প্রসঙ্গটুকু সংযোজনের কাহিনীগত প্রয়োজন অবশ্যস্বীকার্য। কবি প্রমীলার বীরাঙ্গনা-বাহিনীর রণোন্মত্তরূপের বর্ণনায় তাঁর ভাবাবেগ ও কল্পনাকে মুক্তি দিয়েছেন। তা কাহিনীর প্রয়োজনকে ছাপিয়ে গেছে কিন্তু কাব্যরসকে বিঘ্নিত করে নি।

চতুর্থ সর্গের কাহিনীগত প্রয়োজন নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কবি নিজেই এ বিষয়ে সচেতন,—

> "Perhaps the episode of Sita's abducation (Fourth book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it ?"

—রাজনারায়ণকে লেখা পত্রাংশ।

মোহিতলালও কবিকথিত শেষ পংক্তিটির সুরটিকেই অবলম্বন করে যুক্তি দেখিয়েছেন প্রধানত। "তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ সাগরের মধ্যস্থলে একটি স্নিগ্ধ শ্যামল প্রবাল-দ্বীপ"-রূপে এই সর্গটিকে তিনি গ্রহণ করেছেন, সুরের বৈচিত্র্যসাধনের দিক থেকে এর সার্থকতা বিচারের চেষ্টা করেছেন। এই সর্গটির কাব্যসৌন্দর্য, রসবৈচিত্র্য সৃষ্টির দিক থেকে এর অভিনবত্ব স্বীকার্য এবং আস্বাদ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাব ও কেন্দ্রীয় ঘটনার সঙ্গে এই সর্গটিকে মোটেই সম্পর্কহীন মনে হয় না।[১৩] প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার ভর্ৎসনায় সীতাহরণের যে প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে তাই-ই বিস্তারিত রূপলাভ করেছে চতুর্থ সর্গে। মেঘনাদের মৃত্যু কিংবা রাবণের লঙ্কারাজ্য-ধ্বংসের মূল কারণটি সীতাহরণ। সীতাহরণের সর্বজ্ঞাত এই ঘটনাটিকে বাদ দিয়ে ঘটনাসূত্রের গ্রন্থিমোচন আদৌ সম্ভব নয়। অথচ এই সীতাহরণের ঘটনাই মধুসূদনের রাবণমুখী কবিচেতনার পক্ষে সবচেয়ে অস্বস্তিকর বলে মনে হয়। আবার এই ঘটনাকে পরিহার করে লঙ্কাকাণ্ডের কোনো খণ্ড-অংশের রূপচিত্রণও সম্ভব নয়। সীতাহরণের সেই অপরিচিত কাহিনীর সূত্রটি কবি উন্মোচিত করেছেন চতুর্থ সর্গে। সীতাহরণ-কাহিনীর সংযোগে লক্ষ্মণের দুশ্চর সাধনা, দেবগণের সহিত তাদের নিগূঢ় ষড়যন্ত্র, যে কোনো উপায়ে মেঘনাদকে

হত্যা করবার সঙ্কল্প একটা কঠিন ভিত্তি পায়। চতুর্থ সর্গের উপস্থাপনায় কবি শুধুমাত্র লিরিক ভাবপ্রেরণায় মুগ্ধ, এবং সীতাচরিত্রের মাধুর্যে বিগলিতচিত্ত হন নি, আপন ভাবাদর্শের সঙ্গে সংগ্রাম করে. রাবণের তথা আপন কবিচিত্তের অস্বস্তি অতিক্রম করেছেন। সীতাহরণ মেঘনাদবধের গল্পগ্রন্থনের একটি প্রধান গ্রন্থি-প্রয়োজনীয় সূত্র। বিশেষত নায়কের পাপ এই চতুর্থ সর্গে ভর্ৎসনার রঙে অঙ্কিত। পাপবিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাবণের নায়কত্ব ও মহিমা প্রদর্শনই মেঘনাদবধের একটি সুগভীর নবীনতা।

পঞ্চম সর্গ অন্য সর্গের তুলনায় কিছু ঘটনাবহুল। মেঘনাদের মৃত্যুর সঙ্গে এর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। লক্ষ্মণ বিচিত্রভাবে আপনার সাহসিকতা ও ধৈর্যকে প্রমাণিত করেছে এই সর্গে। মেঘনাদকে হত্যা করবার জন্য দেবতার আশীর্বাদ লাভ করেছে।

ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যু। একে কেন্দ্রে রেখেই ঘটনাবর্ত। এটি কাব্য-কাহিনীর চরম মুহূর্ত। যা কিছু সাধনা, যা কিছু পরিবেশ-রচনা, যা কিছু কার্যকারণের সম্পর্কনির্ণয়ের চেষ্টা পূর্ববর্তী সর্গপঞ্চকে ঘটেছে (তাদের বর্ণনার পল্লবিত সৌন্দর্যকে বাদ দিয়ে) তা যেন এই ষষ্ঠ সর্গের দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করে আছে, প্রথম ও তৃতীয় সর্গ থেকে যথাক্রমে পিতা ও পত্নীর স্নেহ ও প্রেম-দৃষ্টিসম্পাত যেমন এই সর্গটিকে ঘিরে রেখেছে, বেদনার উৎসগুলিকে অবারিত করার জন্য যেমন নীরব প্রস্তুতি চলছে, তেমনি দ্বিতীয় ও পঞ্চম সর্গ থেকে উত্থিত দেব-মানবের যৌথ চেষ্টা মৃত্যুশায়ক উদ্যত করেছে এই ষষ্ঠ সর্গটির দিকে। চতুর্থ সর্গের ভূমিকা এক্ষেত্রে বড়ই বিচিত্র। মেঘনাদ তথা লঙ্কাপুরীর মূর্তিমতী ধ্বংসবীজ সীতা সেখানে উপস্থিত, কিন্তু চোখে তার করুণার অশ্রু। সীতাহরণ-কাহিনীতেই মেঘনাদের মৃত্যুর অনিবার্যতা যেন মুদ্রিত, অপরপক্ষে লঙ্কার এই ধ্বংসযজ্ঞের নিমিত্ত হওয়ায় সীতার কত মমতা।

সপ্তম সর্গ থেকে কাহিনীর গতির অবরোহণ। কিন্তু এই সর্গটির পরিকল্পনায় মধুসূদন গল্পগ্রন্থনে বিস্ময়কর মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। পাত্রক্লুসের মৃত্যুর পরে বেদনাহত আকিলিসের ক্রোধোন্মত্ত রণযাত্রা এবং হেক্টর-সংহারের সঙ্গে একে উপমিত করা চলে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে ইলিয়াড মহাকাব্যে পাত্রক্লুসের মৃত্যুর যে স্থান, মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের মৃত্যুর স্থান তার অনুরূপ নয়। পাত্রক্লুসের মৃত্যুতে নয়, হেক্টরের মৃত্যুতেই ইলিয়াডের ক্লাইম্যাক্স। কাজেই আকিলিসের যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধঘটনার উত্তেজিত প্রবলতা ও

প্রচণ্ড গাম্ভীর্য ঊর্ধ্বমুখে ক্লাইম্যাক্সের দিকেই কাহিনীকে নিয়ে যায়। মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের মৃত্যুতেই ক্লাইম্যাক্স—এর পরে আবার রণোল্লাসের চড়া সুর কেন? বাল্মীকি-রামায়ণেও ঘটনার ক্রম অনুরূপ। কিন্তু সেখানে কোনো বিশেষ কাহিনীকে সম্পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তোলার চেষ্টা নেই, অসংখ্য কাহিনী কালানুক্রমে এসেছে—কারণানুক্রমেও বটে। সেখানে মেঘনাদের মৃত্যুর মত আরও অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে। কিন্তু সমগ্র লঙ্কাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় শীর্ষবিন্দু মেঘনাদের মৃত্যুতে নয়, রাবণ-সংহারে। কাজেই কখনও দ্রুত কখনও ধীর লয়ে বেজে বেজে সঙ্গীত এখনও ক্রমোচ্চতার দিকেই ধাবিত। মেঘনাদবধে মেঘনাদের মৃত্যু ঘটায় কাহিনী চরমে উঠেছে। কিন্তু তার পরেও যুদ্ধঘটনার বর্ণনায় একটি সম্পূর্ণ সর্গ ব্যয়িত হয়েছে। যেখানে বেদনার্ত সুর নিম্নাভিমুখী হবে, কবি সেখানে তার যেন আরও চড়াসুরে উঁচু করে বাঁধলেন। ক্লাইম্যাক্স-মুহূর্তে যুদ্ধ হল না, হল নিষ্ঠুর ব্যাধোচিত হত্যা, আর অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের কালে কবি মহাযুদ্ধ সংঘটিত করে তুললেন।

সপ্তম সর্গের কাব্যসাফল্য নিয়ে এরূপ নানা প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে; কিন্তু এই প্রশ্নগুলিই তার পরিকল্পনার মধ্যে কাব্য-গঠনবোধের একটি অভিনব গভীরতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি রাবণের বেদনাকে যুদ্ধঘটনার ঘনঘটায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। মেঘনাদের মৃত্যুর পরের বিলম্বিত শোকাশ্রুবর্ষণকে দ্রুত অস্ত্রবর্ষণে রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু ঘটনাপ্রাচুর্য ও উচ্চ-কণ্ঠ যুদ্ধবর্ণনার মধ্যেও মেঘনাদের মৃত্যুর সুরটি একবারের জন্যও হারিয়ে যায় নি। নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার আকস্মিক অতি-ঔজ্জ্বল্যের মতই রাবণের এই যুদ্ধযাত্রা, মুমূর্ষু রোগীর সমাপ্তিপূর্বের উত্তেজনা মাত্র। রাবণের এই যুদ্ধে যেন নিয়তিকে রোধ করবারও আর চেষ্টা নেই, মেঘনাদের মৃত্যুর পরে তার প্রয়োজনও যেন ফুরিয়েছে। কেবল প্রতিহিংসার চেষ্টা—সে চেষ্টা নির্মম—নিষ্ঠুর, এমন কি দানবীয়ও। উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরে তিলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানের ইচ্ছাও যেন আর নেই। মেঘনাদের মৃত্যুর পরে হৃদয়াবেগের দিক থেকে ঐ একটিমাত্র কার্য অর্থাৎ লক্ষ্মণকে হত্যা করাই যেন অবশিষ্ট ছিল; পরেও তাকে যুদ্ধযাত্রা করতে হয়েছে, কিন্তু তা যেন মামুলি নিত্যকর্ম সম্পাদনে। এই যুদ্ধ-ঘটনায় রাবণের চিত্তরুদ্ধ শোকই অগ্ন্যুৎপাতের লাভা-স্রোতে প্রবাহিত। এর সুর যতই উচ্চকণ্ঠ ও ভয়ঙ্কর হোক না কেন, এখানে মেঘনাদমৃত্যুর পরবর্তী শোকোচ্ছ্বাসই অভিব্যক্ত।

অষ্টম সর্গটির ঘটনাসূত্র হল লক্ষ্মণের জীবনলাভ। লক্ষ্মণের জীবনপ্রাপ্তির বর্ণনার কি প্রয়োজন ছিল, মেঘনাদের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ কাহিনীতে লক্ষ্মণের জীবনলাভ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে জীবনপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে আর একটিবারও কাব্যকাহিনীর মধ্যে দেখা যায় নি। তবে কি কারণে তাকে বাঁচিয়ে তোলা হল? মধুসূদনের কাব্যকল্পনা কত অভ্রান্ত এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে তার প্রমাণ মিলবে। কত শক্তিধর কিন্তু কত অসহায় রাবণ, এই একটি কথা আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল। বীরপুত্র মেঘনাদকে রক্ষা করতেই সে শুধু অসমর্থ নয়, পুত্রের মৃত্যুব প্রতিশোধগ্রহণের সামান্য আত্মতৃপ্তিও তার আর মিলল না। 'বিধির এ বিধি'। মেঘনাদবধ যেমন রাবণের আত্মঅবক্ষয়ের ট্রাজিকবোধকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিল, লক্ষ্মণের জীবনপ্রাপ্তির সংবাদ তেমনি পুত্রের মৃত্যুর বেদনার সঙ্গে আপনার নিরুপায় অবস্থাকে মিলিয়ে এক মহাশূন্য হতাশান্ধকারে তাকে নিক্ষেপ করল। কিন্তু লক্ষ্মণের জীবনপ্রাপ্তির উল্লেখমাত্র যেখানে কাব্য-কাহিনীর ও ভাববৃত্তেব জন্য প্রয়োজন, কবি সেখানে বর্ণনার মোহে তাকে অনেক বিস্তৃত করে তুলেছেন এবং কাহিনীর এমন ক্ষীণসূত্রে রামচন্দ্রকে নরকে উপস্থিত করেছেন যার ক্ষীণতা বিশ্বাসের কিছুমাত্র সহায়তা করে না। আসলে নরকবর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য, তার জন্য এখানে তিনি সুযোগ করে নিয়েছেন। কাহিনীবিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র বিষয়েব বর্ণনাব পরিবেশ বারবার সৃষ্টি করে নিয়েছেন কবি। কিন্তু নরকবর্ণনায় কাহিনীকেন্দ্র থেকে তিনি এতটা দূরে প্রয়াণ করেছেন যে মেঘনাদবধের সঙ্গে এর সহজ সম্পর্ক কিছুতেই স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

নবম সর্গে মেঘনাদবধ-কাহিনীর উপসংহার ঘটেছে। এর বেদনামথিত স্বাভাবিকত্ব কাহিনীবৃত্তকে সুনিপুণ সম্পূর্ণতা দিয়েছে। প্রমীলা সহ মেঘনাদের মৃতদেহের সৎকারান্তে অবশিষ্ট রইল রাবণ। ভগ্নশাখ বৃক্ষের মত নির্জন প্রান্তরে চলল তার অমারাত্রির প্রতীক্ষা—বজ্রাহত হয়ে নিঃশেষিত হবার জন্য। মেঘনাদবধ কাহিনীবৃত্তের আরম্ভেই রাবণ সংশয়ান্বিত হয়েছে, নিজের পতন-সম্ভাবনাকে যেন দূরে দেখতে পেয়েছে, অন্তঃসারশূন্যতা অনুভব করছে; মেঘনাদবধকাহিনীর সমাপ্তিতে সেই অন্তঃসারশূন্যতা সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। মেঘনাদবধের নবম সর্গ যেন সমগ্র লঙ্কাকাণ্ডের উপসংহারের দ্যোতনাবাহী।

মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী-সজ্জায় মাঝে মাঝে কতকগুলি বিশিষ্ট কলাকৌশলের আশ্রয়ও নিয়েছেন। এগুলি মৌলিকতাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে আসে নি। কারণ মূল রামায়ণ থেকে সেই স্বাতন্ত্র্য তাঁর আপন কল্পনাভিত্তিতেই বিরাজিত। এই কলাকৌশলগুলি প্রধানত কাহিনীটিকে রমণীয় করে তুলবার জন্য ব্যবহৃত। একমাত্র সীতাহরণকথা বর্ণনায় তিনি রামায়ণের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন এবং সেখানে অনেকপরিমাণ সংস্থান-কৌশলে পুরাতন কথাবস্তুকে নবীনতা দিয়েছেন, অনেকখানি অবশ্য কল্পনার বৈশিষ্ট্যের সংযোগেও। সীতাহরণকথাকে কাহিনীর গোড়ায় উপস্থিত করে সোজাসুজি লঙ্কাকাণ্ডের কারণভিত্তি রচনা করা যেত। কিন্তু কবি প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার শোকসন্তপ্ত কণ্ঠে কয়েকটি কথায় তার ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে দীর্ঘকাল নীরব থেকেছেন। পাঠক যখন তিন সর্গের বিচিত্র কাহিনী-কথা ও বর্ণনাসৌন্দর্যে মুগ্ধ এবং সীতাহরণকথা এ কাব্যে আর স্থান পাবে না ভেবে একরূপ নিশ্চিন্ত তখন অকস্মাৎ সীতাহরণের কথা এসেছে—তাও সরমার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে। অতিপরিচিত, সর্বজ্ঞাত কাহিনীকে কিছুটা অপ্রত্যাশিত অবস্থায় উপস্থিত করে মধুসূদন নবীনতার স্বাদ এনেছেন। তবে এ-জাতীয় উদাহরণ বেশি নেই। মধুসূদনের কাব্যকাহিনী স্বভাবতই নতুন, নতুনত্বের জন্য কৌশল বা সংস্থান-সৌকর্যের আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় নি।

মধুসূদন কাহিনীনির্মাণে যে সব কলাকৌশল প্রয়োগ করেছেন তা নানারূপ চমৎকারিত্ব এবং গঠন-সৌকর্যের সৃষ্টি করেছে। প্রথমেই আসে মেঘনাদের কথা। মেঘনাদকে তিনি অত্যন্ত কৌশলে কাব্যমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়েছেন। লক্ষ্মী ও মুরলা দূতীর কথোপকথনে প্রথমে তার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কাব্যের প্রধান বিষয় যে মেঘনাদের মৃত্যু, প্রারম্ভের দ্বিতীয় বাক্যেই তা স্পষ্টভাষায় বলেছেন—

> কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
> ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
> ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?

কিন্তু সেই ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের প্রসঙ্গমাত্র উল্লিখিত হয় নি কাব্যের প্রথম ৫৯৫ পংক্তির মধ্যে। তার পরেও মাত্র উল্লেখই করা হয়েছে—

> সুধিলা মুরলা দূতী, "কহ দেবীশ্বরি,
> কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী

ইন্দ্রজিতে -- রক্ষঃকুল-হর্যক্ষ বিগ্রহে ?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে ;”

প্রকৃতপক্ষে মেঘনাদ কাব্যমধ্যে প্রবেশ করেছে আরও কিছু পরে। প্রথম সর্গের শেষ একশত পংক্তির কেন্দ্রস্থলে মেঘনাদই দাঁড়িয়ে আছে। এই বিলম্বিত অনুপ্রবেশ চরিত্রটি সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলেছে। এর পরেও কৌতূহলের পূর্ণ নিবৃত্তি হয় নি। দ্বিতীয় সর্গে মেঘনাদ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশের বর্ণনা। ৫২৩-তম পংক্তির পূর্ব পর্যন্ত মেঘনাদ অনুপস্থিত এবং ৫৫২-তম পংক্তি থেকে ঘটনাগতি লক্ষ্মণ-বিভীষণ, উমা-বিজয়া প্রভৃতি বিচিত্র পথে প্রবাহিত। এর পরে চতুর্থ সর্গে সীতা-সরমা-সংবাদে মেঘনাদের নামও উচ্চারিত হয় নি। পঞ্চম সর্গের প্রথমার্ধে মেঘনাদ-নিধনার্থ লক্ষ্মণের প্রস্তুতি, দ্বিতীয়ার্ধে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার অভিমুখে মেঘনাদের গমন বর্ণিত হয়েছে ; এমন কি ষষ্ঠ সর্গেও প্রথমার্ধ লক্ষ্মণের যজ্ঞাগার-অভিমুখে গমনের বর্ণনায় পূর্ণ, দ্বিতীয়ার্ধে মেঘনাদের উপস্থিতি। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে মাঝে মাঝে এই স্বল্প উপস্থিতি মেঘনাদ সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল শেষপর্যন্ত জাগিয়ে রাখে। এবং এই কৌতূহল-নিবৃত্তির পূর্বেই মেঘনাদ নিহত হয়। এই তৃষ্ণা শুধু পাঠকের নয়, সমগ্র লঙ্কাপুরীর, সেই তৃষ্ণা মেটিবার পূর্বেই মেঘনাদ অকালে প্রাণত্যাগ করে লঙ্কাপুরীর তথা কবির নিজের নয়নরঞ্জন মেঘনাদকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে কবি কাব্যদেহ গঠনে এক বিস্ময়কর চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কাব্য-মধ্যে মেঘনাদের প্রথম উপস্থিতির পর থেকে চতুর্থ ও অষ্টম সর্গ ব্যতীত অন্যত্র, মৃত্যুর পূর্বে কিংবা পরে, দিবসে কি রাত্রিতে, রাবণের শত্রুদলনে অথবা ইন্দ্রের মহাদেবপূজার অন্তরালে থেকেও মেঘনাদ সর্বদা উপস্থিত থেকেছে। দ্বিতীয় সর্গে লক্ষ্মীর উপদেশ—

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।

মহাদেবের নিকটে ইন্দ্রের গমন, রাম-লক্ষ্মণকে সাহায্য করার জন্য তার সদা উৎকণ্ঠিত চেষ্টা, নিদ্রা-বিশ্রাম বিসর্জন দিয়ে লক্ষ্মণকে উপদেশ-প্রেরণ সবকিছুর পশ্চাতে লক্ষ্মীর উপদেশের এই সুরটি বাজছে। দীপ্তচক্ষু শঙ্কা ইন্দ্রকে সারা দ্বিতীয় সর্গব্যাপী বিতাড়িত করে ফিরেছে। লক্ষ্মণের দেবালয়গমন, রুদ্রের

সন্তুষ্টি-বিধান সবকিছুর উপর অনুপস্থিত মেঘনাদের বীর্যকণা-বিচ্ছুরিত ভয়ঙ্কর ভীতি ছায়াবিস্তার করে আছে। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার বীরাঙ্গনা-মূর্তির ললাটদেশেও একটিই নাম সু-অঙ্কিত, তা মেঘনাদের।—

পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কারু হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?

বীরাঙ্গনা প্রমীলার এই তীব্র স্রোতস্বিনী মূর্তিতে যত বিস্ময় তার চেয়ে অধিক বিস্ময় জাগে এই নদীস্রোতে মেঘনাদরূপী সিন্ধুর গর্জনশব্দে। মেঘনাদের মৃত্যুর পরে সপ্তম সর্গের যুদ্ধে রাবণের নিক্ষিপ্ত প্রতিটি অস্ত্র মেঘনাদকে স্মরণ করে নিক্ষিপ্ত।—

স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি
সরোষে গর্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে;
"চালাও, হে সূত, রথ যথা বজ্রপাণি
বাসব।"

কিংবা—

"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চিরকম্পমান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে!"

আবার লক্ষ্মণের প্রতি রাবণ—

স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি!

মৃত মেঘনাদ যেন পিতার অস্ত্রমুখে উপস্থিত থেকে আদ্যন্ত এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর নবম সর্গে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তার স্মৃতির প্রাধান্য সবদিক দিয়েই অতিপ্রকট। মধুসূদনের এই কল্পনা নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব দাবি করতে পারে। এজাতীয় কৌশল সমগ্র কাব্যটিকে মেঘনাদ-কেন্দ্রিক এক আশ্চর্য ঘনপিনদ্ধতা দান করেছে। হোমরের ইলিয়াডে অনুপস্থিত আকিলিস সম্বন্ধে এইরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। একমাত্র তাঁর সঙ্গেই মধুসূদনের তুলনা করা চলে।

রাবণও কাব্যমধ্যে স্বল্পস্থান জুড়ে আছে। প্রথম সর্গের পরে দীর্ঘকাল রাবণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। সপ্তম সর্গে এবং নবম সর্গে আবার

রাবণ কাব্যমধ্যে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু যে সর্গগুলিতে রাবণের উপস্থিতি সেখানে চারপাশের অন্য চরিত্রগুলি গৌণ হয়ে গেছে। প্রথম সর্গের শেষে পিতাপুত্রের স্বল্পস্থায়ী সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে। কিন্তু মেঘনাদের মৃত্যুর পূর্বে রাবণকে আর একটিবারও পাদপ্রদীপতলে উপস্থিত করেন নি কবি। কবি আপনার সৃষ্টির মূল্য বুঝতেন—তার সীমাও সম্ভবত মেঘনাদবধ-রচনাকালে দৈবী-ক্ষমতাবশেই তিনি কতকাংশে জেনেছিলেন। রাবণ ও মেঘনাদকে পাশাপাশি অঙ্কিত করলে পাঠকের দৃষ্টিকে মেঘনাদের দিকে একাগ্র রাখা সম্ভব হবে কিনা এ সন্দেহ তাঁর ছিল। মেঘনাদের মৃত্যুর পরে দুটি সর্গেই রাবণ সর্বেসর্বা। অষ্টম সর্গের নরকদর্শনকে প্রক্ষেপ বলে মনে করা যেতে পারে।

মধুসূদনের প্রথমকাব্য তিলোত্তমাসম্ভবে ঘটনার বিবৃতি এবং বর্ণনার আনুপাতিক সামঞ্জস্যের অভাব দেখা গেছে। সে দিক থেকে মেঘনাদবধ কেবলমাত্র সার্থকতর রচনাই নয়, বলা যেতে পারে প্রায় ত্রুটিহীন। ঘটনার মধ্যে বর্ণনার প্রাচুর্য থাকলেও এবং মুহুর্মুহু কবি সেই বর্ণনার সুযোগ সৃষ্টি করে নেওয়া সত্ত্বেও তিলোত্তমার মত এখানে বর্ণনার আতিশয্যে ঘটনা আবৃত হয় নি। ঘটনার পারম্পর্য পরিচ্ছন্নভাবে অনুসরণ করা যায় প্রায় আদ্যন্ত। বর্ণনার সৌন্দর্য প্রায়ই ঘটনাসম্পৃক্ত কোন ভাবাবেগ গভীরভাবে মুদ্রিত করে দেয় পাঠকচিত্তে, কখনও পরিবেশ রচনা করে। অবশ্য ঘটনাবিবিক্ত বস্তুসৌন্দর্যে ভেসে যাওয়ার উদাহরণও সুপ্রচুর। তবে সে সৌন্দর্য-বর্ণনা ঘটনার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ভাসিয়ে নেয় নি তিলোত্তমাসম্ভবের মত। তার উপরে ভাষাভঙ্গিতে ও ঘটনাসংস্থানে নাট্যরসের সঞ্চার করে বিবৃতির একঘেয়েমিকে বারবার তরঙ্গিত ও জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। মেঘনাদবধেও তাই কোথাও আতিশয্য থাকতে পারে কিন্তু প্রাণহীনতা প্রায় কোথাও নেই। কতটুকু তিনি বর্ণনা করবেন, কতটুকু ঘটনার বিবরণ দেবেন আর কোথায় নিজে পশ্চাৎপটে সরে গিয়ে পাত্রপাত্রীর প্রত্যক্ষ সংলাপের সুযোগ করে দেবেন তা এত স্পষ্ট করে জানতেন মধুসূদন যে, এ দিক দিয়ে মেঘনাদবধকে প্রায় বিচ্যুতিহীন বলেই মনে হয়। এর বিস্তৃত পরিচয় কাব্য-পাঠকালে দেবার চেষ্টা করা হবে।

মেঘনাদবধ কাব্যের কালসংস্থান বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি। স্থান বিষয়েও কিছু মন্তব্য করা প্রয়োজন। কালের দিক থেকে মেঘনাদবধের স্বল্পবিস্তার লক্ষ্য করা হয়েছে, কিন্তু স্থানের দিক থেকে তার বিস্তার সুপ্রচুর। কালের স্বল্পতা এবং স্থানের বিস্তৃতির মধ্যে একটা বিপরীতের সংঘাত আছে। ঘটনাবিবৃতি ও বর্ণনার সূত্র ধরে তিনি অনায়াসে স্বর্গমর্তরসাতল পরিভ্রমণ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, একটি বিশিষ্ট সংঘটনস্থলকে কেন্দ্র করেই এই বিশ্বপরিক্রমা ঘটেছে। প্রথম সর্গে লঙ্কায় রাবণের অতুল রাজসভাই ঘটনাস্থল। সপারিষদ রাবণকে তিনি দুর্গপ্রাকারে নিয়ে গিয়েছেন, সেখান থেকে তাদের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে রণস্থলে। রাজসভার নিকটে রাজপথে যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা, তার শব্দের অনুসরণে জলতলে বারুণী-মুরলার রাজ্যে প্রবেশ। মুরলার মর্তে আগমন, লক্ষ্মী-মুরলা সংবাদ, ইন্দ্রজিতের প্রমোদকাননে ছদ্মবেশে লক্ষ্মীর গমন। অবশেষে রাজসভায় মেঘনাদের প্রবেশ। রাজসভাকে কেন্দ্র করে কবি বর্ণনা ও ঘটনার সূত্র চারদিকে দূরে ও নিকটে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আবার প্রয়োজনবোধে সব সূত্রগুলিকে রাজসভার কেন্দ্রে সংহরণ করে এনেছেন। চতুর্থ সর্গে অবশ্য স্থান অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছে। সীতার স্মৃতি-রোমন্থনের মধ্য দিয়ে একবার পঞ্চবটীবনে পাঠকেরা ভ্রমণ করে এসেছে।

স্থান প্রসঙ্গে মধুসূদনের একটি প্রবণতার প্রতি মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। ভ্রমণ বা গমন বা শোভাযাত্রার রূপাকৃতি (pattern) বহু ক্ষেত্রেই কবি অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয় সর্গের ঘটনা দুইটি যাত্রাকে অবলম্বন করেছে, ইন্দ্র ও ইন্দ্রপত্নীর ইন্দ্রালয় থেকে কৈলাস-শিখরে এবং কামসহ পার্বতীর কৈলাসশিখর থেকে যোগাসন-শিখরে যাত্রা। এ সর্গে অবশ্য পথ থেকে পথের প্রান্ত অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু তৃতীয় সর্গের প্রধান অংশ জুড়ে বীরাঙ্গনাদলসহ প্রমীলার লঙ্কাভিমুখে যাত্রার বর্ণনা আছে। পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণের চণ্ডীমন্দির অভিমুখে যাত্রা আর শেষাংশে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার অভিমুখে মেঘনাদের মহাযাত্রার ক্ষণটিকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। ষষ্ঠ সর্গের প্রথমাংশেও লক্ষ্মণ ও বিভীষণের যাত্রা মেঘনাদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। সপ্তম সর্গের প্রারম্ভে যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা, আর তার পর সমগ্র কাব্যটি জুড়ে রাবণের যুদ্ধক্ষেত্র-পরিক্রমা। অষ্টম সর্গে রামের নরকপ্রবেশ ও নরকপরিক্রমা। নবম সর্গে রাবণসহ রক্ষনাগরিকদের শোকযাত্রা এবং দুটি আত্মার মর্তলোক থেকে অলোকের দিকে পরম ও চরম যাত্রা। এ ছাড়াও প্রথম

সর্গে গমনাগমন সৈন্যদলের শোভাযাত্রা প্রভৃতির প্রচুর বর্ণনা আছে। চতুর্থ সর্গের কতকাংশ জুড়ে অপহৃতা সীতাকে নিয়ে রাবণের যাত্রার কথা আছে। সমগ্র কাব্যটি জুড়ে নানামুখে নানাপথে মানুষের যাত্রার চিত্র। শেষপর্যন্ত এক মহাশোকযাত্রার সুরে সব সুর মিলেছে। জীবন থেকে মৃত্যুমুখে জীব-জগতের চিরকালীন যাত্রা বুকভাঙা আর্তনাদের সঙ্গে মিশে চিত্রের মূল তন্ত্রীকে আন্দোলিত করতে লাগল।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে চলমানতা,[১৪] যে দ্রুতগতির দ্যোতনা তাঁর জীবনে ও সব কর্মে, তারই স্পন্দন কবির এই শ্রেষ্ঠ কাব্যের রূপাকৃতিটিকে একটি পথের চেহারা দিয়েছে কিনা ভেবে দেখবার মত।

॥ পাঁচ ॥

মেঘনাদবধের গঠনশৈলীর যে সূত্রগুলির নির্দেশ পূর্ব পরিচ্ছেদে করা হয়েছে তা সামনে রেখে এবারে কাব্যপাঠ করা যেতে পারে। কাব্যপাঠ প্রসঙ্গে কবির বর্ণনরীতি ও কল্পনাভঙ্গিরও কিছু পরিচয় নেওয়া যাবে।

মেঘনাদবধ কাব্যটি নয়টি সর্গে বিভক্ত। কাহিনীবৃত্তের দিক দিয়ে সর্গগুলি সমভাবে কেন্দ্রসামীপ্য পায় নি। কিন্তু কাহিনীকাব্য কাব্য বলেই (এবং নাটক নয় বলে) বর্ণনার ভূমিকা হিসেবে ও কবির ব্যক্তিহৃদয়ের এবং পাত্র-পাত্রীদের প্রাণের আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার জন্য তাঁকে সুযোগ তৈরি করে নিতে হয়। এ কাব্যেরও কোনো সর্গ ঘটনাপ্রধান, কোনোটি বর্ণনাপ্রধান, কোনোটি আবার নাট্যরসসমৃদ্ধ,—কোথাও ঘটেছে এদের নানা আনুপাতিক মিশ্রণ। কোনো সর্গে মধুসূদনের কাব্যকল্পনা অভ্রান্ত, কোথাও বাইরের প্রভাব আত্মস্থ, কোথাও আবার রূপরচনার নিপুণ সার্থকতা। অপরপক্ষে কোনো সর্গে বিদ্রোহের বাণীঘোষণায়—ইতিহাসসৃষ্টির সাধনায় কবির কল্পনা বৃন্তচ্যুত, কোথাও বাইরের প্রভাব ব্যক্তিপ্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অতিপ্রকট। এদের বিচিত্র পরিচয়ে মেঘনাদবধ কাব্যের আস্বাদ এবং বিচারের দ্বিধা-সমন্বিত পথে অগ্রসর হওয়া যাবে।

মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের নাম দিয়েছেন "অভিষেক"। মেঘনাদকে রাবণ সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন। সেই ঘটনাটি আলোচ্য

সর্গের কেন্দ্রীয় ঘটনা। নামকরণ সচেতনভাবেই করেছেন কবি। এর প্রযুক্তি সম্বন্ধে বিতর্ক নেই।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গটিকে সেকালীন অনেক রসবোদ্ধা কাব্যটির শ্রেষ্ঠ অংশ বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। মধুসূদনের কাব্যরসিক বন্ধুদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্গের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক চলত।[১৫] সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা কঠিন। কিন্তু বলা যায় যে কাব্যোৎকর্ষের দিক থেকে প্রথম সর্গটির স্থান অতি উচ্চে। এ সর্গটিকে শ্রেষ্ঠ বলা নিয়ে সংশয় জাগতে পারে কিন্তু তিনটি শ্রেষ্ঠ সর্গের মধ্যে এটি যে অন্যতম তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথম সর্গের আরম্ভেই মধুসূদন একটি নাটকীয় চমক এবং দ্যোতনার সৃষ্টি করেছেন।—

> সম্মুখ সমরে পড়ি বীর-চূড়ামণি
> বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
> অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
> কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
> পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
> রাঘবারি ?

পাঠকদের বীরবাহুর অকালমৃত্যুর সংবাদটি মাত্র দিয়ে কবি ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করলেন, পরবর্তী সেনাপতির প্রসঙ্গও তুললেন, কিন্তু তার পরে সরস্বতীবন্দনা, রাবণের রাজসভার বর্ণনায় সে প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হল। পাঠকদের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলে তার বিলম্বিত নিবৃত্তির মধ্য থেকে কবি কিছু নাট্যরস নিষ্কাশিত করেছেন। এইরূপ নাট্যমুহূর্তের আরও কিছু সন্ধান বর্তমান সর্গে মিলবে। বীরবাহুর যুদ্ধ ও মৃত্যুর কাহিনী বর্ণনা করছে ভগ্নদূত। রামচন্দ্রের যুদ্ধ-প্রবেশ বর্ণনা করতে করতে মধ্যপথে আকস্মিকভাবে থেমে গেল সে—

> "... ...কতক্ষণ পরে,
> প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
> কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
> বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
> খচিত,"—এতেক কহি নীরবে কাঁদিল
> ভগ্নদূত,...... ।

নাট্যচমক এখানে উদ্দাম হয়ে ওঠে নি, কিন্তু মৃদুতা সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব দৃষ্টি

এড়ায় না। এই কৌশলটি বেদনারসকে দানা বাঁধিয়ে তুলেছে। কখনও আবার অতিপ্রত্যাশিতকে এড়িয়ে গিয়ে অপ্রত্যাশিত অথচ অনিবার্য ফলাফলের সৃষ্টি নাট্যরসের জন্ম দিয়েছে। ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে রাবণের চিত্তদীর্ণ হাহাকারের আবেগতরঙ্গিত বর্ণনা সর্গের প্রারম্ভে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বীরবাহুমৃত্যুর বিস্তৃত বর্ণনা শোনবার পরে—

> এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
> মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
> কহিলা; "সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি,
> কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
> সংগ্রামে?..."

পূর্বের দীর্ঘ ক্রন্দনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাশা করা অসঙ্গত নয় যে এর পরে উচ্ছ্বসিত ও আবেগকম্পিত হাহাকার রাবণের কণ্ঠ থেকে নির্গত হবে। সেক্ষেত্রে ক্রন্দনের পরিবর্তে বীরত্বের উল্লাস ধ্বনিত হতে দেখে বিস্ময়ের চমক লাগবে প্রথমেই, কিন্তু রসবোধের দিক থেকে একে অনিবার্য বলে গ্রহণ করতে হয়। বেদনার হাহাকার আর বীরত্বের উল্লাসের বেণীবন্ধন ঘটেছে রাবণের চরিত্রে—বীর আর করুণের দ্বৈত উৎস থেকে এ কাব্যের রসধারা উৎসারিত।

প্রথম সর্গে বীর ও করুণ রসের দুটি তার সমানভাবে বেজেছে। মাঝখানে মেঘনাদ-প্রমীলার প্রমোদকাননের বর্ণনায় আদিরসের ব্যঞ্জনা এসেছে। আদিরসকে যদিও বা প্রাসঙ্গিক রস বলে অভিহিত করা যায়, বীর বা করুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কার সে বিষয়ে তর্ক করে সিদ্ধান্তে পৌছানো প্রায় অসম্ভব। সংস্কৃতানুগ রসশাস্ত্রের পথ ধরে আধুনিক কালের কাব্য-কবিতার বিচার করা যায় না। এই প্রথম সর্গেই রাবণ নামক ব্যক্তির যে চরিত্রচিত্র অঙ্কিত তাকে বীর ও করুণ রসের আলম্বনবিভাব বলে বর্ণনা করলে সব কথাই না-বলা থেকে যাবে। তবে বর্ণনীয় বস্তুর আস্বাদ ব্যাপারে রসবোধের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।[১৬]

বর্ণনায় বীর এবং করুণের প্রতিই কবির অধিক আকর্ষণ। বীর ও করুণের সমন্বিত সুর তাঁর কাব্যবীণায় যত সুন্দর ও গম্ভীর হয়ে বেজেছে এমন আর কোনোটিই নয়। অঙ্গরস হিসেবে প্রেমোপলব্ধি বা বাৎসল্য আমন্ত্রিত হয়েছে, তবে বীর বা করুণ অথবা বীর-করুণের সহগামী হিসেবেই। যেখানে অন্য রসসৃষ্টির রাজ্যে পদার্পণ করতে চেয়েছেন কবি, সাধারণত ব্যর্থতা বহন

করতে হয়েছে তাঁকে। অষ্টম সর্গের নরকবর্ণনা ব্যর্থ হয়েছে বীভৎস রসের সৃষ্টি-প্রচেষ্টায়। সপ্তম সর্গের দুর্বলতার কারণ অবশ্য রসসৃষ্টির বিশেষ প্রবণতার মধ্যে নয়, কাব্যকল্পনার কেন্দ্রে। সে বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হবে। প্রথম সর্গে মেঘনাদবধ কাব্যে কবি বীর ও করুণের যে যুগ্ম তারে আঘাত করেছেন প্রথম পংক্তিতে 'বীর-চূড়ামণি বীরবাহু'র 'অকালমৃত্যু'র সংবাদ দিয়ে, তাই-ই কখনও পৃথক হয়ে, কখনও ঐকতানে এই সর্গ জুড়ে আদ্যন্ত বেজেছে। রাবণের শত্রুহত্যার প্রতিজ্ঞায় যেখানে ভাষায় বীরভাব প্রকাশিত সেখানে ব্যঞ্জনায় অনুরণিত হয়েছে কারুণ্য, আর যেখানে প্রত্যক্ষ বেদনার্তি সেখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে বীরত্বগর্ভ পৌরুষের বেদনাবিদ্ধ মূর্তি। চিত্রাঙ্গদার আবির্ভাব যে ব্যথার সুরে চিত্ত ভরে দিয়েছে, সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধসজ্জা সেই ব্যথার কেন্দ্র থেকে বীর্যগম্ভীর [illegible]কে উৎসারিত করেছে। রাবণ-মেঘনাদের সংবাদে চিন্তা-শঙ্কা-সংশয়-কুণ্ঠিত কারুণ্যমিশ্রিত বীরত্বের সঙ্গে ভ্রূকুটিহীন সহজ সাহসিকতার আলোছায়ার জাল বুনেছেন কবি। মাঝখানে মেঘনাদের প্রমোদকাননের বর্ণনায় প্রেমরস সৃষ্ট হয়েছে। সেখানে বেদনা নেই, কিন্তু সে প্রেমও বীরত্বশূন্য নয়। প্রমীলার নারীরক্ষিবাহিনীর বর্ণনায় মধুসূদন শৃঙ্গার বীররসকে যুগপৎ আহ্বান করেছেন—

> প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
> দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
> ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
> দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে!
> বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
> রত্নরাজি তূণে শর মণিময় ফণী!
> উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
> রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
> তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর
> আয়ত-লোচন শর।

এর ভাবব্যঞ্জনায় শৃঙ্গার জয়যুক্ত হলেও বীরত্বের ক্ষীণ আবরণটি অস্বীকার করবার নয়। বীর-করুণের সমুন্নত গাম্ভীর্য আর বেদনা-হাহাকারের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে মেঘনাদের প্রমোদকাননের উপস্থাপনা। কিন্তু এ বৈচিত্র্যেও যেন সুর কেটে না দেয়। বীরভাবের ক্ষীণ আবরণটি যেন লঙ্কার সৈন্যসজ্জার একটি দূরাগত প্রতিধ্বনি।

এই স্বল্পবিস্তৃত শৃঙ্গাররসপ্রধান বর্ণনাটি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত কবি পাঠকচিত্তে যে ভাবরসের সুরটি স্থায়ী করে রাখতে চেয়েছেন তা সর্গ-সমাপ্তিতে ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্যে অভিষেককে উপলক্ষ করে বন্দীর বন্দনাগীতে অভিব্যক্ত হয়েছে—

নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।
রক্ষঃকুলরবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী !
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্তধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল !

এই বর্ণনায় লঙ্কাপুরীর যে বেদনার্ত অথচ বীর্যস্তম্ভিত মাতৃমূর্তি কবি এঁকেছেন তার মধ্যে ব্যঞ্জনায় দেশমাতৃকার বন্দনাগানের সুর বেজেছে। কবির কাম্যপুরী লঙ্কার কল্পনাভিত্তিতে কবির জন্মভূমির অতিবাস্তব চিত্রটি এখানে সত্য হয়ে উঠেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে সৈন্যদের রণসজ্জা ও পথ-পরিক্রমার একাধিক চিত্র আছে, যুদ্ধান্তে রণক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষও একটি চিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধবর্ণনা বড় নেই। হোমরের সবটাই যুদ্ধ বলে কবি একটি চিঠিতে তাঁর প্রিয় মহাকবি সম্বন্ধে অনুযোগ করেছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের সর্গে সর্গে যুদ্ধসজ্জা, যুদ্ধযাত্রার বর্ণবহুল সমারোহ, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধবর্ণনা একটি মাত্র সর্গে। আসলে মধুসূদন বীররসের শোভাযাত্রার তটস্থ দর্শক, অবগাহনকারী উপভোক্তা নন।

প্রথম সর্গে বীররসাত্মক রণসজ্জা ও পথ-পরিক্রমার যে বর্ণনাগুলি আছে তার রচনারীতির কিছু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। রাবণের আদেশে সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতির এই বর্ণনা প্রথমেই ধ্বনি-গাম্ভীর্যে পাঠকের শ্রুতিকে আকর্ষণ করে—

এতেক কহিলা যদি নিকষা-নন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,

সাজিল কর্ব্বূরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি ; সাদী যথা অশ্বিনীকুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে ;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে !

একটা কোলাহলমুখর প্রজ্জ্বলিতবীর্য শোভাযাত্রার সামগ্রিক চিত্র এখানে প্রকাশ পেয়েছে। পৃথক পৃথক করে কবি অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী, পদাতিক, ধ্বজবাহী সৈন্যদের কথা বলেছেন। কিন্তু অংশগুলি চিত্রধর্মের স্পষ্টতায় ধরা পড়তে পড়তে ছন্দসঙ্গীতে গর্জনমুখর প্রবাহে ভেসে গিয়েছে। পৃথকভাবে এর প্রতিটি অংশে রেখার বলিষ্ঠতায়, উপমার তীক্ষ্ণ যথার্থতায় চিত্ররূপ স্পষ্ট এবং জীবন্ত হয়ে আছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করে না দেখলে

যেমন শোভাযাত্রার ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র মূল্য অনুভূত হয় না, ব্যক্তি একটা বৃহৎ চলমান গোষ্ঠীর মধ্যে একাকার বলে মনে হয়, ঠিক তেমনি লক্ষ্য করে দেখলে তবেই বক্রগ্রীব কৃষ্ণ অশ্ব, স্বর্ণচূড় রথ, কনকশিরস্ত্রাণধারী, লৌহবর্মাবৃত, শালবৃক্ষসম, শূলধারী, কোষবদ্ধ শাণিত তরবারিসহ পদাতিকের স্বতন্ত্র চিত্র-রচনার নৈপুণ্যের প্রশংসা করতে হয়; কিন্তু এই গতিশীল অংশগুলি শোভাযাত্রার মধ্যে লীন হয়ে আছে; বিশেষভাবে লক্ষ্য না করলে, অংশের চিত্রসৌন্দর্য নয়, সমগ্রের একটা গতিময় সঙ্গীতই মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। মধুসূদন গাম্ভীর্য ও বীর্যের ভাবটিকে প্রকাশ করবার জন্য সংস্কৃত শব্দকোষ থেকে ধ্বনিসমৃদ্ধ, যুক্তাক্ষরবহুল শব্দসমষ্টি চয়ন করেছেন। কাঠিন্য, ক্রোধ, বীরত্বের ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইরূপ তৎসম যুক্তাক্ষরপ্রধান শব্দ-ব্যবহারের রীতি ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের কাল থেকেই চলে আসছে, মধুসূদনের শব্দগুলি অনেক বেশি মার্জিত, অশ্রুতপূর্ব, সুপ্রযুক্ত, একঘেয়েমি-মুক্ত এবং উপমাদির ভাবপ্রকাশক। মধুসূদনের একান্ত নতুনত্ব সেখানে নয়। তিনি শব্দৈশ্বর্যের সঙ্গে গতিকে যোগ করেছেন। তাঁর এ-জাতীয় চিত্রগুলি "রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে" শুধু নয়, গতির ব্যঞ্জনায়ও সমৃদ্ধ। এই গতিকে স্তব্ধ করে শোভাযাত্রার বীরদের ব্যক্তিপরিচয়ে কবির আকর্ষণ নেই। বিশাল শোভাযাত্রার অংশগ্রহণকারী বীরদের পরিচয় দিতে গিয়ে লক্ষ্মী বলেন—

ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণচূড়-রথে,
ভীমমূর্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষ-দলপতি,
প্রক্ষ্বেড়নধারী বীর, দুর্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা গদাধর যথা
মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন!

এভাবে চারজনের মাত্র নাম করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং মন্তব্য করেন—

অন্যান্য যত কত আর কব?

প্রথম সর্গের অন্তর্গত দুর্গপ্রাকার থেকে রাবণের রণক্ষেত্রদর্শন বর্ণন-সৌন্দর্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। রাবণের দৃষ্টির আলোকে এই দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। রাবণের কিছুপূর্বের তীব্র আর্তনাদের স্বর—

কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী, কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;···

এই রণক্ষেত্রবর্ণনার অন্তরেও সহজেই বেজেছে। এ কাব্যে রাবণের আবেগ-প্রাণতা কবির স্বয়ং আয়ত্ত বলে তার দৃষ্টির আলোক যেখানে বর্ষিত নয় সেখানেও কাব্যের মূল ট্রাজিক সুর বর্ণনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। দুর্গপ্রাকার থেকে লঙ্কাপুরী কিংবা রণক্ষেত্রের দৃশ্যে কবি distance view-এর বোধটিকে চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন। দর্শনীয় বস্তু থেকে দৃষ্টিকেন্দ্রের দূরত্বের ফলে বস্তুর খুঁটিনাটি ছবিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে না, একটা মোটামুটি সামগ্রিক বোধই প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিকেন্দ্রের উচ্চতার ফলে পার্শ্ববর্তী বস্তুসমূহের ঊর্ধ্বদেশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এই পরিপ্রেক্ষিত-বোধটি সুনিপুণ চিত্রকরের মত মধুসূদনের বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিষ্ঠাপূর্ণ বর্ণনা এখানে নেই। মোটা তুলির একটি-দুটি আঁচড়ে চিত্রের অংশগুলিকে তুলে ধরেছেন কবি, এবং প্রায়ই দু-চারটি অংশের বর্ণনার পরেই সমগ্র দৃশ্যটির একটি ভাবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। লঙ্কার কাঞ্চনসৌধ-কিরীট, পুষ্পবন-ঘেরা সারি সারি হেমহর্ম্য, কমলপূর্ণ সরোবর, দেবগৃহের হীরকময় শীর্ষদেশ, নানা রাগে রঞ্জিত বিপণিশ্রেণীর খণ্ড খণ্ড বর্ণনার পরেই একটি উপমাত্মক ভাবচিত্র—

এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে, চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।

একটি সমুদ্রের পৃথক পৃথক তরঙ্গের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখতে রাখতে অকস্মাৎ যেন অসীমবিস্তৃত অসংখ্য তরঙ্গের উত্থানপতনক্ষুব্ধ সমগ্রতা কবিদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে। খণ্ডের ও সমগ্রের এই সুষম নিপুণ উপস্থাপন বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছে। লঙ্কানগরীকে অবরুদ্ধ করে বানরসৈন্যসহ

রামের উপস্থিতিরও কয়েকটি খণ্ড চিত্র অঙ্কিত হয়েছে প্রথমে। উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দ্বারের অবরোধকারী বিপক্ষীয় সেনানায়কদের স্বতন্ত্র করে দেখেছে রাবণ, তার পরেই একটি সমগ্র ভাবস্রোত চিত্ররূপে ধরা পড়ে অংশকে আপনার মধ্যে লীন করে দিয়েছে—

শত প্রহরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমসমা!

যুদ্ধান্তে পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় কবি একটু ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রের নানা অংশের খণ্ডচিত্র অঙ্কন করেছেন প্রথমে, শকুনি-গৃধিনী, কুক্কুর-পিশাচদলের বর্ণনা দিয়েছেন, নানাজাতীয় সৈন্য, অশ্ব-হস্তী-অস্ত্রের স্তূপাকৃতি হয়ে পড়ে থাকার জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী ক্ষেত্রগুলিতে যেমন খণ্ডের বর্ণনা একটি অখণ্ড ভাবচিত্রে স্থিতিলাভ করেছে, এখানে তেমন ঘটে নি; এখানে খণ্ড খণ্ড সাধারণ চিত্রের বিস্তার থেকে একটি বিশেষ মানুষের চারদিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে দৃষ্টি—

পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ, রক্ষিতে কৌরবে।

এবং ব্যবহৃত উপমাটির গৌরবে মহাভারতীয় বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

প্রথম সর্গে দুটি ক্ষুদ্র ঘটনাংশকে কিছুটা বহিরাগত মনে হতে পারে। একটি চিত্রাঙ্গদার রাজসভায় আবির্ভাব এবং অপরটি বারুণী-মুরলা-লক্ষ্মী সংবাদ। চিত্রাঙ্গদার রাজসভায় আগমনের সঙ্গে মেঘনাদের অভিষেকের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও বীরবাহুর মৃত্যুর সূত্র ধরে এই মুহূর্তটির সৃষ্টি স্বাভাবিক ও সঙ্গত। চিত্রাঙ্গদার আগমনকে অবলম্বন করে মধুসূদন একাধিক কাব্যিক

প্রয়োজন নির্বাহ করেছেন; প্রথমতঃ সেতুবন্ধ সমুদ্রকে লক্ষ্য করে রাবণের উত্তেজিত আহ্বান—

উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতলজলে এ প্রবল রিপু।

তার পরেই যুদ্ধযাত্রার জন্য সৈন্যবাহিনীকে একই উত্তেজনার স্বরে প্রস্তুতির আদেশদান খুবই সঙ্গত হত। কিন্তু অত মামুলী ঘটনা-সংস্থানে এবং স্বর-বিন্যাসে মধুসূদন তৃপ্তি পান নি। তিনি তাই উত্তেজনার পরে রণসজ্জার আদেশ না দিয়ে একটি বেদনার্দ্র কাহিনী-অংশের উপস্থাপনা করেছেন। তীব্র উত্তেজনা অশ্রুতে ভিজিয়ে তীব্রতর করে তোলা হয়েছে। রাবণের যুদ্ধযাত্রার আদেশ এসেছে চিত্রাঙ্গদার সাশ্রুনেত্রে এইভাবে বিদায় গ্রহণের পরে—

এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদের লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে।

রসবিচিত্রতা সৃষ্টি ছাড়াও কিছু গুরুতর কাব্যগত প্রয়োজনে চিত্রাঙ্গদাকে কাব্যরাজ্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। রাবণ যা দেখতে চান নি, যা বুঝতে চাননি রাবণ-পরিবারের ও সেনামণ্ডলীর একটিমাত্র ব্যক্তিও, চিত্রাঙ্গদা তাকে দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে। রাবণ-পরিচালিত জীবন-শোভাযাত্রার অংশভাগিনী নয় বলেই, পথপার্শ্বে দাঁড়িয়ে সে সম্মুখের ধ্বংসকে ও পশ্চাতের কারণ উৎসকে দেখেছে। এই সামগ্রিক দৃষ্টি রাবণের বিরুদ্ধপক্ষের নেই, কারণ ক্রোধে-ক্ষোভে তাদের সত্যবোধ আচ্ছন্ন। চিত্রাঙ্গদার চরিত্রবিচার প্রসঙ্গে এ সমস্যার বিস্তৃততর আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি রসবৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আয়োজিত। রণসজ্জায় কম্পিত লঙ্কাপুরী থেকে তিনি পাঠককে মুহূর্তে জলতলে বারুণীর সজ্জাকক্ষে নিয়ে গিয়েছেন—

যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব;

মুরলা-লক্ষ্মী সংবাদের মধ্য দিয়ে রস ও রূপের বিচিত্র আস্বাদ সৃষ্টি ছাড়া অন্তপ্রয়োজন যা সাধিত হয়েছে তা গৌণ। কাব্যকাহিনীর সঙ্গে যে-সংযোগ দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে সেই সংযোগস্থলগুলি অনিবার্য নয়। লক্ষ্মীর এই উক্তি—

যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণলঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।

যথেষ্ট যুক্তিবহ বলে মনে হয় না। লক্ষ্মীর চরিত্রের পরিচয়ের দিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য হলেও ঘটনা-সন্ধিতে একে অপরিহার্য বলে মেনে নেওয়া চলে না।

সন্ধ্যার একটি বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় সর্গের সূত্রপাত। সন্ধ্যার চিত্রটি প্রথানুগ হলেও বিবর্ণ নয়। বর্ণনায় প্রকৃতি-অনুগ একটি প্রশান্তির সুর ব্যঞ্জিত হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র সর্গ পরিকল্পনার কালগত পটভূমি হিসেবেই মাত্র সায়ংকাল আমন্ত্রিত হয়েছে, সর্গে অনুষ্ঠিত ঘটনাবৃত্তে কোনো তাৎপর্যের ছায়াসম্পাতের চেষ্টামাত্র করে নি।

রাজনারায়ণ বসুকে মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ পাঠিয়ে কবি লিখেছিলেন,

"As a reader of the Homeric epos, you will, no doubt, be reminded of the fourteenth Iliad, and I am not ashamed to say, that I have, intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible."

ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গে জ্যুস-হীরীর যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে তার পরিচয় নেওয়া যাক। জ্যুসের সদাজাগ্রত দৃষ্টির ছায়াতলে ট্রয়-বিরোধী দেববৃন্দ যদৃচ্ছ গ্রীক সেনাপতিদের সাহায্য করতে পারছিল না। ট্রয়-শত্রু দেবেন্দ্রাণী হীরী দেবরাজ জ্যুসকে বশীভূত করে নিদ্রাভিভূত করতে চাইল, হোমর তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন—

"...She (Here) also saw Zeus sitting on the topmost peak of Ida of the many springs, and this sight filled the ox-eyed lady Here with disgust. She began to wonder how she

could bemuse the wits of aegis-bearing Zeus; and she decided that the best way to go about the business was this. She would deck herself out to full advantage and visit him on the mountain. If he succumbed to her beauty, as well might he, and wished to fold her in arms, she would benumb his busy brain and close his eyes in a soothing and forgetful sleep.······She began by removing every stain from her comely body with ambrosia, and anointing herself with the delicious and imperishable olive-oil she uses. It was perfumed and had only to be stirred in the palace of the Bronze floor for its scent to spread through heaven and earth. With this she rubbed her lovely skin; then she combed her hair, and with her own hands plaited her shining locks and let them fall in their divine beauty from her immortal head. Next she put on a fragrant robe of delicate material that Athene with her skilful hands had made for her and lavishly embroidered. She fastened it over her breast with golden clasps and, at her waist, with a girdle from which a hundred tassels hung. In the pierced lobes of her ears she fixed two earrings, each a thing of lambent beauty with its cluster of three drops. She covered her head with a beautiful new headdress, which was as bright as the sun; and, last of all, the lady goddess bound a fine pair of sandals on her shimmering feet."

—ই. বি. রিউ -অনূদিত হোমরের "ইলিয়াড"-এর গদ্যানুবাদ

অতঃপর হীরী দেবী আফ্রোদিতি ও নিদ্রাদেবের সহায়তায় জ্যুসকে বশীভূত করল এবং আপন অভীষ্ট চরিতার্থ করল। রুদ্রের নিকট থেকে রাক্ষসকুল-শেখর মেঘনাদের মৃত্যুর উপায় জানবার জন্য এবং তার অনুমতি লাভ করবার জন্য দেবী পার্বতীর মোহিনী বেশে মন্মথসহ যোগাসন শৃঙ্গাভিমুখে গমন এবং

আপন অভীষ্ট সিদ্ধির যে বর্ণনা কবি মধুসূদন দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে হোমরের অনুকরণ। অবশ্য যোগীশ্বরের ধ্যানভঙ্গের জন্য মন্মথের শরনিক্ষেপ কালিদাসের কুমারসম্ভবকে স্মরণ করায়।

হোমরের দ্বারা মধুসূদন নানাভাবে প্রভাবিত। কাহিনী-সংগঠন কিংবা উদাত্ত মহাকাব্যিক অনুভূতি বা সুস্থ মানববাদের অনেক শিক্ষা তিনি হোমরের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। কিন্তু কোন বিশিষ্ট স্থানে হোমরীয় কল্পনার বা কাহিনীর প্রত্যক্ষ অনুসরণ কবির প্রাণের উদ্বোধন ঘটায় নি। সপ্তম সর্গের যুদ্ধবর্ণনায় তিনি হোমরকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের ভাবনাকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, অষ্টম সর্গে নরক কল্পনায় ভার্জিলের প্রত্যক্ষ অনুস্মৃতি প্রাণহীন বর্ণনামালার জন্ম দিয়েছে। সাধারণভাবে য়ুরোপীয় ক্লাসিক সাহিত্য-চর্চায় মধুসূদনের রসজিজ্ঞাসা এমন একটা মার্জিত সমুন্নতি লাভ করেছিল যার ফলে তাঁর কাব্যসৃষ্টি বাংলা কাব্যধারার মধ্যযুগের বন্ধন চূর্ণ করে নব্য প্রত্যয়ে পৌঁছেছিল। মধুসূদনের কাব্যসাধনার বিস্ময়কর সাফল্য এবং অত্যুচ্চ উৎকর্ষের পেছনে বিদেশী সাহিত্যপাঠের অবদান অনেকখানি। কিন্তু মেঘনাদবধে যখনই কবি কোনো বিশিষ্ট ঘটনা বা বর্ণনায় অতিসচেতন পরিকল্পনা করে বিদেশী কাব্যের অনুসরণ করতে চেয়েছেন তখন তার কাব্যসার্থকতা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। উপমার ভঙ্গি, ছন্দের আদর্শ, বাচনের বিশিষ্টতার মধ্যে য়ুরোপীয় প্রভাবকে সম্পূর্ণত আত্মসাৎ করে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিচ্ছিন্ন কোন অংশের অনুসরণ শাশ্বত মূল্যে পৌঁছুতে পারে নি, প্রায়ই তাকে পরিহার্য বাহুল্য বলে মনে হয়েছে।

দ্বিতীয় সর্গের পার্বতী-মহেশ্বর সংবাদে মাত্র নয়, সমগ্র দেবকল্পনায়ও তিনি হোমরের অনুসরণ করেছেন।[১৭] রামচন্দ্রকে দেবকুলপ্রিয় করে আঁকবার চেষ্টা সর্বত্র বেশ প্রত্যক্ষ। রাবণের উপরে দৈবীরোষের অগ্নিবর্ষণ অব্যাহতভাবেই চলেছে। দেবরাজ ইন্দ্র, রাজকুললক্ষ্মী প্রভৃতির ষড়যন্ত্র, মায়া-চণ্ডী প্রভৃতির সহায়তা মেঘনাদবধে লক্ষ্মণকে সাফল্য দিয়েছে, রাবণের সর্বনাশকে সম্ভাবিত করেছে। ভারতীয় দেবতাদের কল্পনার সাত্ত্বিকতা, মানবদ্বন্দ্বে তাদের প্রত্যক্ষ-ভাবে অবতীর্ণ না হওয়াকে মধুসূদন তাঁর প্রয়োজনের অনুগ বলে মনে করেন নি। উপরন্তু নতুনত্ব সৃষ্টির মোহও তাঁর মধ্যে ছিল। তা ছাড়া ভারতীয় দেবতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো ধর্মীয়-সংস্কার বা বিশ্বাসের বশীভূত তিনি ছিলেন না। ফলে গ্রীক দেবতাদের অনুকরণে সাহিত্যিক অভিনবত্ব সৃষ্টির লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেন নি। কিন্তু তবুও মহেশ্বর-পার্বতী সংবাদ আমাদের বিশ্বাসকে জাগাতে

পারে না। মেঘনাদহত্যার ষড়যন্ত্রে মহারুদ্রের এই ভূমিকা অপরিহার্য ছিল এরূপ ধারণা তিনি জন্মাতে পারেন নি। মনে হয় নেহাৎই হোমর-অনুসরণের বাসনায় এই অংশ কাব্য মধ্যে সংযোজিত হয়েছে।

মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন,—

১. "I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Book to the rest, to a friend. He said your silence about Promila's entry into Lanka in the III Book surprised him. The silly fellow went on to say that the episode roused him like the clang of a martial trumpet!"

২. "Jotindra and his school call the Book III—Promila's entry into the city—'The most magnificent'."

সমকালীন এবং একালীন কাব্যপাঠকদের একটা বড় অংশ তৃতীয় সর্গের সমর্থক। এ সর্গের অভিনবত্ব যে বাংলা কাব্যের পাঠকদের চোখ ধাঁধাবে তাতে সন্দেহ নেই। মহাভারতের প্রমীলা-আখ্যান, মণিপুরের বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার কাহিনী, মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে বিশেষ করে ধর্মমঙ্গলে লখাই ডোমনী, কানাড়া প্রভৃতি বীরাঙ্গনার কথা আছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যেও বীরাঙ্গনার কাহিনী সুপ্রচুর। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের কুইনটাস অব স্মর্না রচিত "'Where Homer Ends", ভার্জিলের ' Aeneid", টাসোর "Liberation of Jerusalem"—প্রভৃতি অনেক কাব্যেও আমাজন বা বীরনারীদের কথা আছে। বাংলাদেশে এ বস্তু অপূর্ব না হলেও আধুনিক পাঠকের রুচির উপযোগী নব্যকাহিনীতে এর উপস্থাপনা তাদের উল্লসিত করবে এটাই স্বাভাবিক। মধুসূদনের বর্ণনাভঙ্গির সঙ্গে পূর্ববর্তী অন্যান্য কবিদের সামীপ্য দেখিয়ে লাভ নেই, তার মধ্য থেকে কবির কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে না। তবে মধুসূদন একটি ক্ষেত্রে আপন স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট মুদ্রিত করে দিয়েছেন। বীরনারীদের বীরাঙ্গনামূর্তির সঙ্গে নারীর দেহ ও মনোভঙ্গিকে সুকৌশলে যুক্ত করেছেন—

শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝনঝনি।

সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী।
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা ;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী ;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু-ঘুনু বোলে।

বীর ও শৃঙ্গারের এই জাতীয় মিশ্রণে সেকালের কোন কোন সমালোচক রসাভাস দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু নারীর বীরাঙ্গনামূর্তিতে তার নারীত্ব ঢাকা পড়ে না, বিশেষত পুরুষকবির দৃষ্টিতে। বীর রমণীদের রমণীয় রমণীত্ব কবি ভুলবেন কি করে? তদুপরি মধুসূদনের কবিদৃষ্টির ইন্দ্রিয়ালু ভাবনাও সর্বজ্ঞাত। বীরবেশে সজ্জিতা নারীর দেহ ও মনোভঙ্গির বিশিষ্টতা চিত্রণের সুযোগ তিনি অবশ্যই ব্যর্থ হতে দেবেন না।

তৃতীয় সর্গের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ প্রমীলা চরিত্র। এ প্রসঙ্গে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বীরাঙ্গনা সেনাবাহিনীর যাত্রা প্রমীলাচরিত্রের পটভূমি মাত্র।

মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গে মধুসূদনের কবি-আত্মার পূর্ণ জাগরণ কি করে ঘটল তা অনেকখানি রহস্যাবৃত। সীতার প্রতি কবিচিত্তের দুর্বলতার ফলে এ সাফল্য এসেছে এরূপ মনে করা হয়ে থাকে। সীতা-সম্পর্কে কবিচিত্তে কোমলতা এবং ভাবপ্রবণতার আধিক্য ছিল একথা ঠিক, কিন্তু এই যুক্তির বলেই রহস্যটি উন্মোচিত হয় না। মধুসূদনের বাঙালীয়ানাকে এর কারণ বলে কেউ কেউ নির্দেশ করতে চেয়েছেন ; কিন্তু এই বাঙালীয়ানা অন্যত্র আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিত হল কেন, সে প্রশ্নের উত্তর মেলে না।

মধুসূদনের শিল্পবোধে একটা সুসামঞ্জস্য ছিল। অন্তত মেঘনাদবধ কাব্যের বহু অংশে এই সিদ্ধি অনাবৃত ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। বিদ্রোহী কাব্য-সংস্কারের বাসনা, ব্যক্তিগত জিগীষাবৃত্তি শিল্পচেতনাকে আদৌ আচ্ছন্ন করতে পারে নি, তার প্রমাণ এ কাব্যে অজস্র ছড়িয়ে আছে। চতুর্থ সর্গে কবি আপন আত্মস্বরূপ রাবণকে ধিক্কৃত করেছেন, কিন্তু রাম-বিভীষণের মত মানুষের মুখে যে ভর্ৎসনা তাকে স্বয়ং কবি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন নি। শিল্পসৃষ্টি হিসেবে সেই ভর্ৎসনা শত্রুর ক্রোধ-ক্ষোভের প্রকাশ মাত্র হয়ে আছে। কিন্তু রাবণের দ্বারা অপহৃতা সীতার প্রতি কবির সুকোমল ও গভীর সহানুভূতি

রাবণকাহিনীর অন্য একটি দিক উন্মুক্ত করেছে। প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার মৃত গুঞ্জনে যে যবনিকা দুলছিল, সীতার বিবরণে তা উন্মোচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে শিল্পী মধুসূদনের জীবনজিজ্ঞাসার একটা গভীরতর দিক প্রকাশিত হয়েছে। মধুসূদনের কবিচিত্তের অন্তরে, আত্যন্তিক আত্মপ্রসারণ ও আত্ম-প্রতিফলন সত্ত্বেও, আত্ম-নিরপেক্ষ একটি ভাববীজ উপ্ত ছিল। প্রত্যক্ষ ক্লাসিক পদ্ধতির চিত্রাঙ্কনে এই ভাববীজের অপ্রত্যক্ষ প্রকাশ বারবার ঘটলেও সীতাকাহিনীর পরিকল্পনাকেন্দ্রে ও রূপায়ণসাফল্যে সেই বীজটি প্রকাশিত হয়েছে বলেই মনে হয়।[১৮]

সম্ভবত সীতাকাহিনী উপস্থাপনার পেছনে কবির সচেতন উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। প্রথমত, সীতাহরণ-কাহিনীটি বিবৃত করা। বীরবাহুর মৃত্যু, ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য সব কিছুর পেছনে ঘটনার দিক থেকে যে মূল কারণটি বিদ্যমান সেই সীতাহরণ এই সর্গে কৌশলে বিবৃত হয়েছে। উপরন্তু সীতাহরণের পর থেকে লঙ্কাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্তও সীতার স্বপ্নবিবরণের মধ্যে স্থানলাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, রসসৌন্দর্যে বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা। মোহিতলাল ঠিকই বলেছেন যে, সমগ্র মেঘনাদবধের রথরথী-অশ্ব গজে কম্পিত মেদিনীতে জন্ম-মৃত্যু-যুদ্ধ-হাহাকারের মধ্যে এই চতুর্থ সর্গে একটি কোমল শান্ত পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। এখানে ক্রন্দন আছে, কিন্তু অগ্নিস্রাবী বিশ্ববিদারী আর্তনাদ নেই, এখানে ক্রোধের কারণ আছে কিন্তু ক্রোধ নেই, বীরত্বের বর্ণনা আছে কিন্তু বীররসের প্রাধান্য নেই; এখানে প্রকৃতি মধুবর্ষী, রুদ্রডম্বরুর তালে তালে সে নৃত্য করে নি। এই রসবৈচিত্র্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্তমান সর্গে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

তৃতীয়ত, রাবণের পাপকে লুকিয়ে রেখে তার মহিমাময় ট্র্যাজেডি অঙ্কন না করে—পাপের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তার চরিত্র গৌরবের প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয় সর্গের পরে চতুর্থ সর্গের এই রূপ সৃজনের পেছনে পরিকল্পনার বাহাদুরি আছে, এবং তা যে কেবল বহিরঙ্গ বাহাদুরিই নয় গভীর শিল্পবোধের ফল উভয়ের সাফল্যের মধ্যে তারই প্রমাণ মিলছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্গে শুধু যে কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রটিতে ভাব ও বোধের বৈপরীত্য তাই-ই নয়, সমগ্র সর্গের আবেদন-রসেই সুরের এই বৈচিত্র্য চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে।

চতুর্থ সর্গে মধুসূদনের কবি-আত্মা যে জাগ্রত ছিল তার প্রমাণ আছে। অন্যথায় শিল্পসার্থকতার এই কাম্য-স্বর্গে পৌঁছানো যায় না। সেই জাগরণের কারণ পূর্বেই ব্যক্ত করেছি, এবারে তার স্বরূপ-লক্ষণের কিছু পরিচয় নেওয়া যাক।

মধুসূদনের চিত্ররচনায় বর্ণ ও ঐশ্বর্যময় শোভাযাত্রার প্রাধান্য। রাজসিকতায় তাঁর মনের তার বাঁধা, তুলির রঙেরও ঐ একই উৎস। কিন্তু সীতার অশোকবননিবাসিনী মূর্তির যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা একেবারে ভিন্নজাতের। যেমন—

১. হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী

২. মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !

৩. একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন।

৪. কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারা-রত্ন যথা !

৫. ···· পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশ দিশ !

এই চিত্রকল্পগুলি কখনও প্রত্যক্ষভাষায়, কখনও উপমায় এমন এক মায়ালোক সৃষ্টি করেছে মধুসূদনের কবিকল্পনার দিক থেকে যার অভিনবত্ব বিস্ময়কর। হীন-প্রাণা হরিণী অপেক্ষা বাঘিনীর ক্রুদ্ধবীর্যেই মধুসূদন চিরকাল অধিক আকর্ষণ বোধ করেছেন। সীতা-রূপ হীন-প্রাণা হরিণী কবিকে মুগ্ধ করেছে। এই চিত্রগুলির মধ্যে একটা পেলবতা, বিষণ্ণ একাকিত্ব, কচিৎ একটা সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন যেন ভেসে এসেছে। একটা সাত্ত্বিক ভাব-পরিবেশ রাজসিক চেতনামত্ত মধুসূদনের রচনায় সার্থক হয়ে উঠল কি করে তা ভাববার মত। মধুসূদনের রাজসিকতার মধ্যে বিপুলকে চাইবার যে প্রেরণা ছিল, ক্ষুদ্রকে—প্রাপ্ত বস্তুকে অগ্রাহ্য করে প্রাপ্তির অতীত লোকে পৌঁছুবার যে কামনা ও সাধনা ছিল তা সামান্য সুখ কেন, নিজের প্রাণকে পর্যন্ত অনায়াসে বিসর্জন দিতে পারে। এই ধরনের রাজসিকতা সাত্ত্বিকতারই অপর পিঠ। সাত্ত্বিকতার যে বাণী—অল্পে সন্তুষ্ট না হয়ে ভূমাকে কামনা করবার—তাই-ই যেন মধুসূদনের

রাজসিকতারও বাণী ছিল। সেক্ষেত্রে অবশ্য ভূমার অর্থের পরিবর্তন ঘটে যায়। সে 'ভূমা'-র অর্থ দাঁড়ায় না-পাওয়া বস্তুর জন্য সুবিপুল কামনা। সীতা-কাহিনীর চারপাশে সাত্ত্বিকতার যে একটা পূত পরিবেশ ব্যঞ্জিত হয়েছে কবি-আত্মায় তার মূল প্রেরণা এখানেই নিহিত।[১৭]

মধুসূদনের কবি-আত্মার রাজসিকতা থেকে সাত্ত্বিকতার ব্যবধানটি এই সর্গে একবার লঙ্ঘিত হয়েছে। কবিপ্রাণের কতকগুলি নিগূঢ় উপলব্ধি এই সূত্র ধরে চতুর্থ সর্গে প্রকাশিত হয়েছে। মধুসূদনের কাব্যে প্রকৃতির আমন্ত্রণ ঘটেছে বারবার। কোথাও উপমাদির প্রয়োজনে, কখনও পরিবেশ-রচনায়, কখনও মণ্ডনের উদ্দেশ্যে। তিলোত্তমায় প্রকৃতি-চিত্রণে রোমান্টিক সৌন্দর্যদৃষ্টি কতকাংশে প্রকাশিত হয়েছে। মেঘনাদবধে এবং অন্যত্র প্রকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় নি। কিন্তু চতুর্থ সর্গে প্রকৃতি যেমন মুক্ত মূর্তি লাভ করেছে তা দুর্লভ-প্রায়; একমাত্র চতুর্দশপদীর কয়েকটি মাত্র কবিতায় উৎসমুখী কবি এই বোধ-কেন্দ্রে পৌঁছেছেন।

আখ্যানকাব্যে প্রকৃতি-বর্ণনায় দুটি ভিন্ন রীতি প্রচলিত। এক। সুখদুঃখাদি মানবমনোভাবকে বহন করা। স্থান, ঋতু, প্রভাত-সন্ধ্যাদি কাল প্রভৃতির পরিবেশ সৃষ্টি। দুই। প্রকৃতির রূপমুগ্ধ বর্ণনা। প্রথমক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রয়োজন সিদ্ধ করে। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে কবির একটি বিশিষ্ট মুড ও সৌন্দর্যপ্রীতি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এমন একটা আস্বাদের সৃষ্টি করে যা আখ্যানাংশের অধীন নয়। প্রথম রীতির পরিচয় মেঘনাদবধে বার বার আছে। চতুর্থ সর্গেও সীতার বিষণ্ণ একাকিত্বের ছায়ায় অশোককাননের শোকমুহ্যমান চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—

> স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
> উচ্ছ্বাসে বিলাসী যথা! লড়িছে বিষাদে
> মর্মারিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
> শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
> তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
> ফেলিয়াছে খুলি সাজ!

পঞ্চবটীবনে রাম-সীতার সুখ-শান্তিময় জীবনের আনন্দস্পর্শে প্রকৃতিও আনন্দময়ী হয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু কাহিনীগত এই পরিচয়টুকু ছাপিয়ে প্রকৃতিসৌন্দর্যে সীতার ভাবাবেশে এবং রূপাঙ্কনের সহজ প্রাণময়তায় কবির মুগ্ধতার স্পর্শ যেন অনুভব করা যায়—

ভুলিনু পূর্বের সুখ। রাজার নন্দিনী
রঘুকুল-বধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি !
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী-সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর। নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রমা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
অহিংসক জীব যত।

সবচেয়ে বিস্ময়কর এর প্রথম পংক্তিটি। রাজার নন্দিনী পূর্বসুখকথা ভুলে গেল প্রকৃতি-সৌন্দর্যের সাহচর্যে—মধুসূদনের কাব্যে এরূপ ভাবনা অদৃষ্টপূর্ব। নানাদিক থেকে তাই মনে হয় যে চতুর্থ সর্গের কল্পনার উৎসেই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে।

কবি মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গের নামকরণ করেছেন "উদ্যোগ" সর্গ। দেবলোকে ইন্দ্র ইন্দ্রজিৎকে হত্যার চক্রান্ত করেছে, মায়াদেবীকে লক্ষ্মণের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছে লঙ্কাধামে, লক্ষ্মণ আপনাকে প্রস্তুত করেছে – তপশ্চর্যা সাহস ও কঠিন সংযমের মধ্য দিয়ে মেঘনাদকে হত্যার যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করেছে। একদিকে মানব-দেবতায় যখন এত চেষ্টা এত ষড়যন্ত্র এত সাধনা, মেঘনাদ তখন প্রমীলার আলিঙ্গনপাশে সুখসুপ্ত। রাত্রির তপস্যার কাঠিন্য লক্ষ্মণের, অন্ধকারের কূটচক্রান্ত দেবকুলের আর প্রশান্ত প্রভাতে নিশ্চিন্ত চিত্তে পত্নীর প্রেম-স্নিগ্ধ দৃষ্টির ছায়াতলে ধীর পদক্ষেপে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারাভিমুখে যাত্রা মেঘনাদের। লক্ষ্মণের ও মেঘনাদের বীরত্বের তুলনা যেন সহজেই ব্যক্ত হয়েছে এই সর্গে।

পঞ্চম সর্গে আরও কিছু বৈপরীত্য চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে। লক্ষ্মণকে প্রলুব্ধ করতে মায়া-নারীদের কাম-কলার প্রকাশ বর্ণবিহ্বল মাদকতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে—

দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপাতিত যেন!
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা। দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সারসে, মরি স্বর্ণপদ্ম যথা!

এরূপ কামবাসনা ও বিভ্রমবিলাসময় চিত্র মধুসূদনের কাব্যে অনেক আছে। মধুসূদন সাধারণত সুগভীর ও আন্তরিক প্রেমোপলব্ধির সঙ্গে এর পার্থক্য অনুভব করতে পারেন নি। কিন্তু মেঘনাদবধের পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণের এই কামবিজয় বর্ণনার অব্যবহিত পরেই মেঘনাদ-প্রমীলার দাম্পত্যপ্রীতির অপরূপ মাধুর্যকে ভাষারূপ দেওয়া হয়েছে—

প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায়রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্যকথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল!……
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!"

প্রমীলাকে ঊষার সঙ্গে একাকার করে ফেলায় কবিকল্পনার রূপবোধের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মিলছে। ঊষার স্নিগ্ধতা এবং স্বর্ণবর্ণ ঔজ্জ্বল্যের সমন্বয়ে প্রমীলার রূপ এবং চরিত্রবিশিষ্টতাকে যেন একটি অলঙ্কার প্রয়োগেই সম্পূর্ণত প্রকাশ করেছেন কবি। রমণীরূপের স্নিগ্ধমাধুর্য ও প্রগল্‌ভ কলাবিলাসের বৈপরীত্য এখানে ধরা পড়েছে।

লক্ষ্মণ এবং মেঘনাদ—প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বীরের উদ্যোগপর্বেই মাতৃসাক্ষাৎকার

ঘটেছে। লক্ষ্মণের মাতা অবশ্যই স্বপ্নচারিণী এবং মায়াময়ী। এদিক থেকে লক্ষ্মণকে ভাগ্যহীন বলে মনে হয়েছে। কিন্তু উভয় বীর যেভাবে মাতার আদেশ ও আশীর্বাদ লাভ করে যুদ্ধ-জয়ের উদ্যোগ করেছে তাতে একটা সমান্তরাল ভাবরেখা সৃষ্ট হয়েছে। উভয়ের কাছে মুহূর্তটি পরম লোভনীয়—তা সে স্বপ্নই হোক, কিংবা বাস্তবই হোক। অবশ্য জীবনের ঘটনাচক্রে উভয়ের ক্ষেত্রে এই পরম মুহূর্তটি এক রূপ ধরে আসে নি। একদিকে কপট সমরে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে দৈবীচক্রান্তে সৃষ্ট ছলনাজালে বিচলিত সরলমতি বীর লক্ষ্মণ, অন্যদিকে মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ও স্নেহপ্লাবনের স্পর্শধন্য ভাগ্যবান মেঘনাদ। বাইরের সমান্তরাল ভাবরেখাটির অন্তরালে বৈপরীত্যের সুরটি কানে প্রধান হয়ে বাজে।

মেঘনাদবধ কাহিনীবৃত্তের ক্লাইম্যাক্স ষষ্ঠ সর্গে। কেবল ঘটনার দিক থেকে এর গুরুত্ব নয়, রচনার দিক থেকেও এর সৌন্দর্য অতুলনীয়। ষষ্ঠ সর্গের বর্ণনাভঙ্গির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে কবির দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। রামচন্দ্রের শিবির থেকে লক্ষ্মণ-বিভীষণের লঙ্কাভিমুখে যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণের স্বার্থ ও প্রয়োজনবোধের বর্ণে বর্ণনাংশ চিত্রিত। তাদের ভীতি-সংশয়, আত্মবিশ্বাসের ও দৈববিশ্বাস সুরই সেখানে মুখ্য। কিন্তু বিভীষণ-লক্ষ্মণের লঙ্কা প্রবেশের পূর্ব মুহূর্ত থেকেই দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। লঙ্কায় রাজলক্ষ্মীর স্বতেজ হরণের সঙ্গে সঙ্গে—

গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা;
কল্লোলিলা জলপতি; কাঁপিলা বসুধা
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি।

এই সুরটি পশ্চাৎদেশে ধরে রেখেছেন কবি। কিন্তু সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে লঙ্কার অতুলবৈভব, মদমত্ত বীর্য ও অপরূপ সৌন্দর্য। বিভীষণের ভ্রাতৃদ্রোহ, লক্ষ্মণের পরম ক্রোধ ও শত্রুতাও যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য-বৈভব-বীর্যে। আর নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যবর্ণন লক্ষ্মণ-বিভীষণকে সম্পূর্ণত বর্জন করে মেঘনাদের দৃষ্টিকেন্দ্রকে আশ্রয় করেছে। ফলে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের ঘটনা ও বর্ণনায় চূড়ান্ত সাপেক্ষতা এসেছে। সমালোচকেরা লক্ষ্মণচরিত্রের নবরূপ দর্শনে আপত্তি প্রকাশ করেছেন। 'কিন্তু

কবির দৃষ্টি নিরপেক্ষ নয় এ কাব্যে। দু-একটি স্থানে সাময়িকভাবে যে নিরপেক্ষতা এসেছে তা যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়োদ্বোধক। অনিবার্য মৃত্যুর মুখে দণ্ডায়মান মহাপরাক্রান্ত কিন্তু নিরস্ত্র বীরের দৃষ্টিতে যে ঘৃণা-অবজ্ঞা ক্রোধ-ধিক্কার দানা বেঁধে ওঠে মেঘনাদ-লক্ষ্মণ-বিভীষণ-সংবাদের কল্পনামূলে কবিচিত্তে তাই সক্রিয় ছিল। সাপেক্ষতার অতিরেকের ফলে এ সর্গে কোনস্থলে রূপ কিছু শিল্পলক্ষণভ্রষ্ট হতে পারে। বিশেষত লক্ষ্মণ-প্রসঙ্গে এরূপ অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না, যদিও চরিত্রকল্পনা মূলত অভ্রান্ত।

ষষ্ঠ সর্গের প্রারম্ভে রামের শিবিরে ভীতির ও আতঙ্কের একটি ভাবপরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। লক্ষ্মণকে একাকী নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রেরণ করতে গিয়ে রামচন্দ্র আকুল হয়ে উঠেছে। আবার কিছু পরে লক্ষ্মণ লঙ্কার বৈভব ও বীর্যবত্তা দর্শনে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। এই আকুলতা যেমন স্পষ্টত মেঘনাদের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করছে, এই সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য-বীরত্ব-মুগ্ধতাও একটি নামের চারপাশেই আন্দোলিত। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের আবির্ভাব বহু পরে ঘটলেও কবি প্রথমাবধিই ঐ একটি ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে আছেন। লক্ষ্মণ অদৃশ্য থেকেই কেবল নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের দিকে এগোয় নি, সমগ্র বর্ণনার স্রোত এই সর্গের আরম্ভ থেকেই হোমরত ইন্দ্রজিতের দিকে ধাবমান। রাম বার বার সভয়ে উল্লেখ করেছে—

১. যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, উর্ধ্বশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে—

২. নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে! দুর্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি!

বিভীষণের অভয়বাণীর মধ্যেও ত্রাসের দূরাগত ছায়া পড়েছে—

দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।

কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের এই বীর্য আজ মৃত্যুর মধ্যে সমাহিত হবে। গল্পের চমক রক্ষার জন্য কবি সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে আবৃত করে রাখেন নি। বরঞ্চ মেঘনাদের বীরত্বের ও আসন্ন ধ্বংসের উল্লেখ বারংবার করেছেন। লক্ষ্মণ আশ্বাস দিয়ে দেবকুলের আশীর্বাদের উল্লেখ করেছে, বিভীষণ বলেছে—

দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ;
কাহারে ডরাও, প্রভু ? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।

আকাশ-সম্ভবা বাণী ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেছে অহি-শিখীর দ্বন্দ্বে শিখীর পরাজয় দেখিয়ে, শক্তীশ্বরী মায়া বলেছে—

নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।

লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয়ে বর দিয়েছে—

সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !

কবি পূর্বাহ্নে পরিণতি প্রকাশ করেছেন নিশ্চিন্ত চিত্তে। তিনি এটুকু ভাল করেই জানেন যে রামায়ণ-কাহিনার এই সর্বজ্ঞাত অংশটির পরিণতি বাঙালী পাঠকের অজানা নেই। তাকে আবৃত রেখে কাহিনার কৌতূহল কিছুই বৃদ্ধি করা যাবে না। তাই তিনি প্রথমাবধিই পরিণতিটিকে স্পষ্ট করে জানিয়ে রেখেছেন। তার পরে আশ্চর্য কারু-কৌশলে সেই সুজ্ঞাত পরিণতিই ঘটিয়েছেন, তবু তাকে পুরাতন বলে মনে হয় নি, বর্ণনার গুণে তার বেদনা পাঠকচিত্তের গভীরে সহজেই প্রবেশ করেছে।

অবশ্যম্ভাবী আজ ইন্দ্রজিতের মৃত্যু। দেব-মানবের চরম চেষ্টার ফল আজ ফলবেই। এই প্রত্যয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণার পরেই কবি লঙ্কাপুরীর সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য চিত্রণে মধুসূদনের সাফল্য সর্বাধিক। লঙ্কাপুরার এই বিস্তৃত চিত্রে মেঘনাদের উল্লেখ একবারও নেই। একবার মাত্র ঐশ্বর্য প্রাচুর্যের অধিকারী রাবণের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে স্বয়ং লক্ষ্মণের কণ্ঠে—

এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?

এ বৈভব কি শুধু বস্তুর সঞ্চয়ে, শক্তির মত্ততায়—লঙ্কারাজ রাবণের এই সম্পদেরই তো সারভূত বিগ্রহ মেঘনাদ। লঙ্কার সৌন্দর্য বর্ণনার প্রতিটি পংক্তিতে একটি নামেরই চারধারে ঝঙ্কার উঠেছে। এই ঝঙ্কারের সুরে যেন গোটা সর্গটি বাঁধা, সমগ্র লঙ্কাপুরী অনুরণিত। এরই স্পষ্ট বাস্তবমূর্তি দেখি লক্ষ্মণের যজ্ঞাগারে প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে দুজন পুরবাসীর কথোপকথনে—

কেহ কহে,—"চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে,
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে·

হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ।…' কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে ?
মুহূর্তে নাশিবে রামে, অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে ; চল সভাতলে।"

এই স্থির বিশ্বাসের বাণী শুনতে শুনতে লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করল। পাঠকও মেঘনাদের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কৌতূহলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি—কিভাবে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে হত্যা করল ?

পূর্বোক্ত কলা-কৌশলগুলি কাব্য-কৌতূহলকেই মাত্র সজাগ রাখে নি, একটি বৃহত্তর কাব্যিক প্রয়োজন মিটিয়েছে। পঞ্চম সর্গের সমাপ্তি-অংশেই মেঘনাদকে মাতার স্নেহ ও পত্নীর প্রেমের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় উপস্থিত করে তার প্রতি পাঠকের সহানুভূতিকে তীব্র ও আবেগোচ্ছল করে তোলা হয়েছে। প্রথম সর্গে বন্দীদের বন্দনাগানে, তৃতীয় সর্গে প্রমীলা-কাহিনীতে এবং সর্বশেষে পঞ্চম সর্গে কবির চেষ্টায় বহুপঠিত রামায়ণের ইন্দ্রজিৎ আচ্ছন্ন হয়েছে, সেখানে এক নতুন মেঘনাদের উদ্ভব ঘটেছে, পাঠকের সুগভীর ভালবাসায় যে অভিষিক্ত। ষষ্ঠ সর্গে কখনও মেঘনাদের দুর্মদ বীরত্বের প্রতি ভীতিব্যঞ্জক উল্লেখে, কখনও মেঘনাদের অবশ্যমৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণীতে, কখনও আবার শুধুমাত্র লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের বর্ণনায় কবি তাঁর অতি প্রিয় কেন্দ্রীয় চরিত্রটির চারধারে পাঠকের মমতাকে কেন্দ্রীভূত করে তুলেছেন।

মেঘনাদের বীরত্বের বহু উল্লেখ আমরা কাব্যমধ্যে পেয়েছি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে এই বীরবর যুদ্ধের অবকাশ পায় নি। অস্ত্রহীন, সম্বলহীন মৃত্যু -তাকে বরণ করতে হয়েছে। এর মধ্যে ঘটনাগত মাহাত্ম্য নেই, চরিত্রের গৌরব নেই। কিন্তু কবি বর্ণনায় এবং কল্পনায় কিছু সুযোগ সৃষ্টি করে এই সামান্য মৃত্যুকেও অনেকখানি মহিমা দিয়েছেন। বিভীষণের প্রতি ভর্ৎসনায় স্বাদেশিকতা, সৌজন্য এবং ঘৃণার একটা আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের অমার্জিত রূঢ়তার সঙ্গে তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে।

আবার মহাবীর মেঘনাদের এই অপঘাত-মৃত্যুতে ভাগ্যের নিষ্ঠুর লীলাই যেন আত্মপ্রকাশ করেছে। রাবণের ট্রাজিক বেদনার সমগ্রতার সঙ্গে এর সুরের আশ্চর্য ঐক্য আছে। সেদিক থেকেও কবির পরিকল্পনার সার্থকতা মেনে নিতে হয়।

ষষ্ঠ সর্গে অবশ্য বক্তৃতার কিছু প্রাধান্য আছে। কিন্তু পূর্বাপর নাট্য-রসোপযোগী চমক সৃষ্টি দ্বারা তিনি এই বক্তৃতার একঘেয়েমি দূর করেছেন। লক্ষ্মণকে আরাধ্য দেবতা অগ্নিরূপে ভ্রান্তি, লক্ষ্মণের ছদ্মবেশ পরিহার করবার জন্য তাকে বারংবার অনুরোধ, অবশেষে ভ্রান্তি-অপনোদন। এখানে পাঠক স্বভাবতই তীব্র নাটকীয় চমক প্রত্যাশা করতে পারে, এই ভ্রান্তিভঙ্গে মেঘনাদের ভীতত্রস্ত বিস্ময় খুবই স্বাভাবিক হতে পারত। কিন্তু মধুসূদন নাট্যরসকে তীব্রতর করে তুলেছেন মেঘনাদের দ্বারা লক্ষ্মণকে আতিথেয়তা গ্রহণে অনুরোধ করিয়ে। কিন্তু লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মেঘনাদের উত্তেজিত ভর্ৎসনা—

> ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
> লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই।

এবং

> চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
> নিক্ষেপিলা ঘোরনাদে লক্ষ্মণের শিরে।

মূর্ছিত লক্ষ্মণের দেহ থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে মেঘনাদ অস্ত্রাগারে যাবার জন্য পা বাড়াল, এবারের অভিজ্ঞতার আঘাত তীব্রতর—

> সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
> ভীমতম শূলহস্তে, ধূমকেতু সম
> খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে।

এর পরে মেঘনাদের বক্তৃতা, লক্ষ্মণের চেতন-প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু মধুসূদনের পরিমাণবোধ ছিল, স্থান কালের গুরুত্বও তিনি বুঝতেন। ঘটনার গতি যেখানে প্রবল সেখানে দীর্ঘকাল তাকে বক্তৃতার বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ পংক্তিতে বিস্তৃত এই বক্তৃতাংশে উপমার মালা ও আবেগের প্রবাহের এত আধিক্য যাতে শুষ্ক মঞ্চ-বক্তৃতা বলে একে গ্রহণ করা যায় না, যদিও এর বিষয় স্বাদেশিকতা। মেঘনাদের বাক্যে, লক্ষ্মণ-মেঘনাদের একান্ত অসম দ্বন্দ্বে, কিংবা মেঘনাদের মৃত্যুতে মধুসূদন তাঁর রচনা-শক্তিকে যে সংক্ষিপ্ততা ও সংযমে বেঁধেছেন তা অতি উচ্চ মহাকাব্যিক বর্ণনাভঙ্গির পরিচায়ক।[২০]

ষষ্ঠ সর্গে কাব্যের চরম শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে। এর পরে সপ্তম সর্গের আরম্ভে প্রকৃতি-বর্ণনায় এ প্রশান্তি কেন?

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্যমুখী।

কবি কি পাঠকঅন্তরের সুগভীর বেদনাকে এই শান্ত-সুন্দর নিসর্গদৃশ্যের সংঘাতে উদ্বেল করে তুলতে চান, অথবা মানব জীবনের মঙ্গলামঙ্গলনিরপেক্ষ নিষ্ঠুরা সুন্দরী প্রকৃতির বর্ণনাই কবির অভিপ্রেত? কবির উদ্দেশ্য যাইই হোক না কেন, তিনি যে পাঠককে মানসবিশ্রামদানের জন্য সপ্তম সর্গের উদ্ভাবনা করেন নি তা স্পষ্ট। মেঘনাদবধের সপ্তম সর্গ স্বল্পস্থায়ী অগ্নিগর্ভ বেদনা এবং বিস্তৃত যুদ্ধবর্ণনায় পূর্ণ। এই সর্গ-প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন—

> The nature of the story does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battles. I have, like Milton, only one. That is book VII and I hope I have succeeded, at least, to a respectable extent.

এই একটিমাত্র সর্গে তিনি যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে কবি হোমরের কাছে আপন ঋণ কিছু অপ্রত্যক্ষ ভাষায় হলেও একরূপ স্বীকার করেই নিয়েছেন। কিন্তু এই সর্গে হোমরের প্রভাবকে কবি আপন উপলব্ধি ও কাহিনী-কল্পনার সঙ্গে সমন্বিত করতে পেরেছেন কিনা, সে বিষয়ে সংশয় আছে। প্রশ্নটি কিছু বিস্তারিত বিচারের অপেক্ষা রাখে।

যুদ্ধবর্ণনায় মধুসূদন মোটামুটি সাফল্যলাভ করেছেন তাঁর নিজের এ দাবি অংশত স্বীকার্য। বীর্যবত্তা ও গম্ভীর সমুন্নতির সুরটি এ সর্গে স্থানে স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—

১. প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি।

২. স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি! বজ্রনাদে উঠিলা গর্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণ রিপুনাশিনী! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।

পূর্ববর্তী বাঙালী কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র ব্যতীত বীররসের সার্থক প্রকাশ বড় মেলে না। ভারতচন্দ্রেও যুদ্ধবর্ণনা প্রায়ই ভৌতিক তাণ্ডব ও কোলাহলের অট্টউল্লাসের রূপ নিয়েছে। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী'কাব্য ভারতচন্দ্রের অক্ষম অনুকরণের বেশি এগোয় নি। মধুসূদন যুদ্ধবর্ণনায় সপ্তম সর্গের আংশিক সাফল্য নিয়েও বাংলা কাব্যধারায় প্রায় একক। পরবর্তী কবিদের মধ্যেও এ ধারায় সাফল্য খুব উচ্চমার্গের নয়। হেমচন্দ্রে যুদ্ধবর্ণনায় ক্বচিৎ অতিনৈসর্গিক ভীষণতার স্পর্শ আছে। নবীনচন্দ্র কিন্তু একান্ত নিষ্প্রাণ। তবুও লক্ষণীয় যে, প্রকৃত যুদ্ধ অপেক্ষা যুদ্ধসজ্জার যে বর্ণনাটুকু আছে প্রথম সর্গের বর্ণনার সঙ্গে তার কোনো মৌলিক পার্থক্য না থাকলেও দু একটি বিশেষণের সংযোগে, একটি দুটি উপমা প্রয়োগে চিত্রকল্পনার সামান্য পরিবর্তনে সপ্তম সর্গের এই চিত্রটিকে ভয়ঙ্কর করে তোলা হয়েছে।

এখানে যুদ্ধবর্ণনায় কবি হোমরের অনুসরণের কথা বললেও ভারতীয় মহাকাব্যের যুদ্ধচিত্রকে একেবারে পরিহার করে গিয়েছেন বলে মনে হয় না। ভারতীয় মহাকাব্যে ধনু-শরে যুদ্ধই প্রাধান্য পেয়েছে। শূল-শেলের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম। শর দ্বারা শর ছেদন, শরের সাহায্যে গিরিশৃঙ্গ কর্তন প্রভৃতি বর্ণনার প্রাচুর্য ভারতীয় মহাকাব্যের যুদ্ধকাহিনীতে মেলে। কিন্তু হোমরের কাব্যে শূল-শেলের যুদ্ধেরই প্রাধান্য। শূল-যুদ্ধে অস্ত্র নিবারণের কথা

বড় নেই। অস্ত্র ব্যর্থ হতে পারে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তি আপন অস্ত্রে তাকে ছেদন করতে পারে না। বর্তমান সর্গে যুদ্ধবর্ণনায় ভারতীয় কাব্যেরই অনুসরণ ঘটেছে, হোমরের নয়। কিন্তু শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণের দেহকে অধিকার করবার জন্য রাবণের যে চেষ্টা তা একান্তভাবে গ্রীক যুদ্ধচিত্রের প্রভাবজাত। গ্রীক মহাকাব্যে শত্রুনিধনে গৌরবের চরমতা নেই, শত্রুর অস্ত্র-বর্মাদি হরণ, মৃতদেহের মুণ্ডচ্ছেদ ও বিবিধ লাঞ্ছনা উচ্চতর বীরত্বগৌরব বলে স্বীকৃত।[২১]

কিন্তু সপ্তম সর্গের আসল সমস্যা অন্যত্র। গ্রীক মহাকাব্যের অনুসরণে কবি দেবতাদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিয়েছেন। মধুসূদনের দেব-কল্পনায় গ্রীক প্রভাবের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সেই প্রভাববশেই তিনি দেবতাদের যুদ্ধক্ষেত্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দেবতাদের ষড়যন্ত্র বা রামচন্দ্র-লক্ষ্মণকে প্রত্যক্ষ সাহায্যদানও ভারতীয় দেববাদের দিক থেকে সঙ্গত নয়। কিন্তু মূল কাব্যকল্পনা সম্পর্কে কোনো বিরুদ্ধভাব পূর্ববর্তী সর্গগুলিতে পাঠকমনে সৃষ্ট হয় নি। বর্তমান সর্গে এইরূপ ঘটেছে। গ্রীক দেবতারা দুইদলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং গ্রীক ও ট্রোজান সৈন্যদের পক্ষ হয়ে সংগ্রাম করেছিল—

> "But now the fierce War-god, ranging everywhere, threw a veil of darkness over the battle to help the Trojans. He was carrying out the orders he had from phoebus Apollo of the Golden Sword."

—ই. ভি. রিউ -কৃত হোমরের ইলিয়াডের গদ্যানুবাদ

ট্রোজানদের পক্ষে যেমন অ্যাপোলো, আরেস, আফ্রোদিতি প্রভৃতি দেবদেবীর সমাবেশ ঘটেছিল, তেমনি আথেনী, হেরির সমর্থন ও সহায়তা ছিল গ্রীকদের প্রতি। দু-পক্ষের দেবদেবীর যুদ্ধের বর্ণনাও হোমর করেছেন—

> "Ares began the fight with what he meant to be a mortal blow. He thrust at Diomedes with his bronze spear over the yoke and the horses' reins. But Athene of the flashing eyes, catching the shaft in her hand, pushed it up above the chariot, where it spent its force in the air. Diomedes of the loud war-cry then brought his spear into play, and Pallas Athene drove it home

against the lower part of Ares' belly where he wore an apron round his middle. There the blow landed, wounding the god and tearing his fair flesh."

—ই. ভি. রিউ -কৃত হোমরের ইলিয়াডের গদ্যানুবাদ

মধুসূদন দেবতাদের ষড়যন্ত্রের কথা এতকাল বলেছেন। সপ্তম সর্গে দেবতাদের যুদ্ধে নামালেন। রাম-লক্ষ্মণকে রাবণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য দেবপতি ইন্দ্র প্রস্তুত—

স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে জগদম্বা, অম্বর প্রদেশে ;—
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেম্বাস রক্ষঃকুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি।—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে !

অতএব লঙ্কাপ্রদেশে দেবতারা সশস্ত্র হয়ে অবতীর্ণ হল। রাবণের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং দেবরাজ ইন্দ্র পরাজিত ও লাঞ্ছিত হল ; দেবতাদের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হল। রাবণ তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করল। লক্ষ্মণকে শেলাহত করে পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করল। আর—

হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

এ পর্যন্ত সহজবোধ্য এবং মূল কাব্যকল্পনার দিক থেকেও সঙ্গত। মধুসূদনের দেবতারা ঠিক ভারতীয় নয়, গ্রীক দেবতাদের মত তারা যুদ্ধে নামুক, প্রশ্ন তুলবার কিছু নেই। কিন্তু হোমরের অনুসরণে মধুসূদন এই যুদ্ধে দুই পক্ষেই দেব-আনুকূল্য দেখিয়েছেন। বসুন্ধরার অনুরোধে তাকে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধের ভয়ঙ্করত্ব কমাবার উদ্দেশ্যে বিষ্ণু গরুড়কে নিযুক্ত করলেন—

উড়ি নভোদেশে
গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,

কারণ দেবতারা হীনবীর্য হয়ে পড়লে সংগ্রামের ভীষণতা হ্রাস পাবে। কিন্তু দেবতাদের এই বীর্যহানি রাবণের দিক থেকে দৈবী সহায়তার সমতুল্য ; তদুপরি রাবণের দুঃখে দুঃখী রুদ্র তাকে স্বতেজে পূর্ণ করেছেন আজ। রাবণের পক্ষেও দৈবানুকূল্য আছে। প্রত্যক্ষভাবে দেবতারা তার দলে যোগদান না

করলেও গরুড় দেবতেজ হরণ করে, এবং রুদ্র স্বতেজে তাকে পূর্ণ করে প্রত্যক্ষ-ভাবেই সাহায্য করেছে। ইলিয়াডের অনুসরণে তাই ফাঁক রইল না কোথাও।

কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে মহাদেবের রাবণের প্রতি আনুকূল্যের কথা দু-একবার শোনা গেলেও তার সহায়তা লক্ষ্মণের প্রতিই বর্ষিত হয়ে এসেছে। সমগ্র কাব্য জুড়ে দৈবী-রোষ রাবণের প্রতি, সহায়তা নয়—প্রীতি নয়। রাবণের চরিত্র ও বীর্য সম্বন্ধে পাঠকের যে ধারণা পূর্ববর্তী সর্গগুলির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে তাতে গরুড় ও রুদ্রতেজের সাহায্যকে একান্তই পরিহার্য অতিরেক বলে মনে হয়। এই সাহায্য ছাড়া ইন্দ্রাদিকে পরাজিত করা কি আদৌ রাবণের পক্ষে অসম্ভব হত? তা ছাড়া দেবকুলপ্রিয় রামের বিরুদ্ধে স্বনির্ভর রাবণের সংগ্রামকাহিনী মেঘনাদবধ। রাবণ দেবদ্রোহী কিনা বলা কঠিন, কিন্তু দেবতারা রাবণদ্রোহী। ঊর্ধ্বতর মহত্তর কোন শক্তির সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপহীন মনুষ্যমহিমার মূর্ত প্রতীক রাবণকে দৈবী-সাহায্যে ভূষিত করায় মূল কবিকল্পনা বিচলিত হয়েছে। মধুসূদন আপন জীবনবোধের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে হোমরকে অনুসরণ করতে গিয়েছেন বলে তাঁকে এক্ষেত্রে আত্মস্থ করতে পারেন নি।

মধুসূদন অষ্টমসর্গে নরকবর্ণনা করতে চেয়েছেন। তিনি এক পত্রে লিখেছেন,

> "I have finished the sixth and seventh books of Meghanad and am working away at the eighth. Mr Ram is to be conducted through hell to his father, Dasaratha, like another Aeneas."

মধুসূদন নিজেই নরকদর্শন-পরিকল্পনায় ভার্জিলের নিকটে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। এ ঋণের পরিমাণ বিচার করা যেতে পারে। নরকের প্রবেশদ্বারে ভার্জিল বলেছেন,

> "Just before the porch, and in the opening of the jaws of Orcus, Grief and Avenging Pains have set their couch, and there ghastly Diseases dwell, and joyless Old Age, and Fear and Hunger that impels to crime, and squalid want, forms fearful to view, and Death, and Toil; next Sleep, Death's own brother, and the bad Delights of the

mind, and War fraught with doom, in the threshold before the eye; and the iron chambers of the Furies, and maddening Discord, her snake hair entwined with bloody wreaths."

—ঈনিড কাব্যের গদ্যানুবাদ

মধুসূদন মূর্ত দেহধারীরূপে রোগেদের স্থাপিত করেছেন নরকের প্রান্তদেশে; রণ, ক্রোধ, হত্যা, আত্মহত্যাকেও মানবমূর্তি দিয়ে অঙ্কিত করেছেন। এদের চিত্র-রূপে কারুনিপুণতা হয়তো আছে, কিন্তু বীভৎস রস যেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে সেখানে উপভোগ্যতা যে বহুলাংশে বিলুপ্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।[২২]

গলিত কালাগ্নিতে ভাসছে পাপী, রৌরব হ্রদে ডুবছে অবিচারী বিচারক, কুম্ভীপাকে, অন্ধতম কূপে অধর্মের সাজা চলছে। আর্তনাদে, দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ চতুর্দিক। কৃত্তিবাসের নরক বর্ণনার সঙ্গেও প্রসঙ্গক্রমে এর তুলনা করা চলে—

যমের দক্ষিণদ্বার ঘোর অন্ধকার।
রাত্রি দিন নাহি তথা সব একাকার॥
যত যত পাপী লোক সেই দ্বারে থাকে।
একত্র থাকিলে কেহ কারে নাহি দেখে॥
চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে।
নরকে ডুবায়ে সব যমদূতে মারে॥

হিন্দুর পৌরাণিক বিশ্বাসের সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্যকল্পনার কিছু সরল সাদৃশ্য আছে। তবে "বিলাপবনে"র এই কল্পনা—

এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপ-বনে, বিলাপি নীরবে।

ভার্জিলের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত।[২৩] ভার্জিলেরই ন্যায় তিনি যুদ্ধে নিহত বীরবৃন্দের সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন।[২৪] এদের কারও কারও সঙ্গে নরকে, আবার অনেকের সঙ্গে স্বর্গোদ্যানে রামের সাক্ষাৎ হয়েছে। তবে কামীদের প্রসঙ্গে মধুসূদন যে সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন তা গ্লানিকর হলেও তাৎপর্য-পূর্ণ। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' কাব্যে একটি সর্গে কামীর নরকের কাহিনী আছে। কিন্তু কবির কোনো বিশিষ্ট প্রবণতা তা থেকে বোঝা যায় না। ওই সর্গটি কাব্যে ৩৪টি সর্গের অন্যতম মাত্র। মধুসূদন তাঁর একটিমাত্র সর্গে কামার্ত

পাপীদের বর্ণনায় তুলনামূলক বিস্তৃতি দেখিয়েছেন এবং এই চিত্রগুচ্ছে তিনি কোনো পূর্বসূরিরই অনুসরণ করেন নি। এই প্রসঙ্গে পঞ্চম সর্গের লক্ষ্মণের কামবাসনা-জয়ের চিত্রটির কথা মনে পড়বে। এ বিষয়ে কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত করা কঠিন, তবে মধুসূদনের কবিচিত্তের কেন্দ্রে কাম ও প্রেমভাবের পার্থক্য কমই রক্ষিত হয়েছে। তাঁর বীরাঙ্গনার একাধিক নারীর বাসনাতেই কাম ও প্রেম মিলে একাকার। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনে ও প্রণয়ে প্রশান্তি ছিল কিনা সন্দেহ। উত্তেজিত প্রগল্ভ যৌবনকামনা ও শান্ত প্রণয়-সিদ্ধির মিলনের অভাবে তাঁর আত্মার গভীরে কোনো সংক্ষোভ সুপ্ত ছিল কি? সেই অবচেতনার রাজ্য থেকেই কি এই জাতীয় চিত্ররচনার অতিপ্রবণতা উৎসারিত?

নরকের বর্ণনায় ভার্জিলপ্রমুখ কবিরা যে সরল পৌরাণিক বিশ্বাসে অগ্রসর হয়েছেন, তার কণামাত্র মধুসূদনের ছিল না, থাকা স্বাভাবিকও নয়। আবার দান্তের নরককল্পনা যে দার্শনিক প্রত্যয়-সিদ্ধ তাও মধুসূদনের চরিত্রানুগ নয়। মধুসূদন দার্শনিক নন, পুরাণকাহিনীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিশ্বাসভক্তির নয়, সাহিত্যবোদ্ধার সৌন্দর্যতৃষ্ণার। এই কারণে তার নরকবর্ণনার কিছুটা অনুকরণ, কিছুটা প্রাণহীন চিত্ররচনা। কিন্তু এর একটি বর্ণনাংশে আকস্মিকভাবেই মধুসূদন মহাশূন্যতার—রূপরেখাবর্ণহীন, নিঃশব্দ, অন্ধকারহীন এবং আলোকহীন যে চিত্র এঁকেছেন মাত্র কয়েকটি পংক্তির পরিসরে, তার কল্পনার মৌলিকতা এবং রূপায়ণের সাফল্য বিস্ময়কর—

কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বনসুশোভিনী,
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জ ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু রোগিহাস্য যথা।

শেষ পংক্তিটিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ ভাষাশিল্পী মধুসূদনের আলোছায়ার সমাবেশে দর্শনীয় ভাবাবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা কত অসূচিভেদ্য নিপুণতায় পৌছেছিল। শৈবলিনীর স্বপ্ন নরক বর্ণনায় অনুরূপ দৃশ্যের উদ্ভাবন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং তা প্রধানত মধুসূদনের অনুসরণে।[২৫] রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু সাদৃশ্যও লক্ষ্য এড়ায় না—

নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হয়ে এই মহা-অন্ধকারলোক—
সূর্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন-মতন
নভস্তল—

—নরকবাস। কাহিনী।

এই বর্ণনায় মধুসূদনের কবিপ্রাণ হঠাৎ উদ্বুদ্ধ হল কেন? সে কারণটি এই চিত্রের পরেই প্রকাশ পেয়েছে। এই মহাশূন্যে বিচরণকারী প্রেতেদের কণ্ঠে তিনি অতৃপ্ত জীবনকামনা শুনতে পেয়েছেন,—

লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,
"কে তুমি, শরীরি? কহ কি গুণে আইলা
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি!
কহ কথা; আমা সবে তোষ গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয় জুড়াও বচনে!"

ইন্দ্রিয়াতীত মহাশূন্যে মানব-প্রেতদের কি সুগভীর রূপতৃষ্ণা! রূপময় পৃথিবীর প্রতি, মানুষের প্রতি, তার দেহরূপ, তার বাণীর প্রতি—সব মিলিয়ে প্রাণের প্রতি কি বিপুল ভালবাসা! ফেলে আসা জীবনকে হাত বাড়িয়ে ধরবার কি সুগভীর আকৃতি! মধুসূদনের মানবপ্রেম একটি নতুন অর্থে ও তাৎপর্যে সার্থক হয়ে উঠেছে এই কয়টি পংক্তিকে ঘিরে। এই প্রসঙ্গে হোমরের পাঠকদের 'ওডেসি' কাব্যের একটি স্থান মনে পড়বে। ওডেসিউস গ্রীক বীর আকিলিসের প্রেতকে বলেছিল—

'For in the old days when you were on earth, we Argives honoured you as though you were a god; and now, down here, you are a mighty prince among the

dead. For you, Achilles, Death should have lost his sting.' 'My lord Odysseus', he replied, 'spare me your praise of Death. Put me on earth again, and I would rather be a serf in the house of some landless man, with little enough for himself to live on, than king of all these dead men that have done with life.'

—ই. ভি. রিউ -কৃত হোমরের ওডেসির গদ্যানুবাদ

অবশ্য মধুসূদন এক্ষেত্রে আদৌ হোমরের দ্বারা প্রভাবিত হন নি, এদের ভাবলোকে কিছু সামান্য আছে, এই মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নরকবাস নাট্যকাব্যে নিশ্চিতভাবেই মধুসূদনের কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, যদিও রবীন্দ্রনাথের নিজ ব্যক্তিত্বের স্পর্শও সেখানে অননুভূত নয়,—

প্রেতগণ। (সোমককে) ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে। ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগ্যদের। পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীরে,
সদ্যছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির, তৃণের গন্ধ—ফুলের, পাতার,
শিশুর, নারীর, হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার
বহিয়া এনেছ তুমি—ছয়টি ঋতুর
বহু দিনরজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভরাশি।

মেঘনাদবধ কাব্যের ক্ষুদ্রতম অধ্যায় নবম সর্গে কিঞ্চিদধিক চার-শ পংক্তি আছে। কবি কাব্যকাহিনীকে গুটিয়ে এনেছেন; একটি ঘটনায়, একটি মনোভাবের কেন্দ্রবিন্দুতে তাকে এবারে সমাপ্ত করবেন। এ সর্গে তাই সংহতি ও সংক্ষিপ্ততার প্রায় আদর্শে পৌঁছেছেন কবি। রামচন্দ্রের নিকটে দূতপ্রেরণ ও সাত দিনের জন্য সন্ধিস্থাপন, সীতা-সরমার আলাপ-মাধ্যমে প্রমীলার সহমরণের সংবাদ দান, শোকযাত্রা, সংকার ও রাবণের আর্তনাদ। সীতা-সরমার আলাপও কিছুমাত্র কেন্দ্রচ্যুত নয়। রক্ষরমণীদের মধ্যে মন্দোদরী-চিত্রাঙ্গদা ও প্রমীলার সঙ্গেই পাঠক পরিচিত। তাদের মাধ্যমে প্রমীলার সহমরণ-

সংবাদ দানের সুযোগ ছিল না। কাব্যের শেষ সর্গে এই উদ্দেশ্যে নবচরিত্রের অনুপ্রবেশও সম্ভব নয়। সীতা-সরমার আলাপের মধ্যেই পাঠক প্রথম এই সংবাদ পান। সরমা রক্ষকুলের হয়েও রক্ষবংশধ্বংসে ততখানি বেদনাবিমূঢ় নয় (প্রমীলার সহমরণে সে কিন্তু শোকবিহ্বল), তাকেই কবি এই সংবাদদানে ব্যবহার করেছেন। এই সংবাদ পূর্বাহ্নে পাঠককে দেবার প্রয়োজন ছিল, অন্যথায় কিছু পরে অকস্মাৎ প্রমীলাকে সহমরণের বেশে দেখলে পাঠকের বোধ ও বুদ্ধি বিপর্যস্ত হতে পারত। নতুন কোনোরূপ নাটকীয় চমক গ্রহণের ক্ষমতা আর পাঠকদের থাকবার কথা নয়। এখন একটা বিলম্বিত বেদনার অনুরণন, একটা চিত্তদীর্ণ কিন্তু নিঃশব্দ শূন্যতাই প্রত্যাশিত।

মধুসূদনের কবিপ্রাণ বেদনার দহে স্নান করে নবম সর্গে বেদনা-উপলব্ধিরও 'বৈরাগ্য'চেতনায় উঠেছে। কবি যেন আর স্রোতাপন্ন নন, তীব্র ট্রাজিক হাহাকারে আর্ত নন আর, তিনি তটস্থ উপভোক্তা, সে উপভোগও অবশ্য দুঃখেরই। এই চেতনার স্পর্শেই রামচরিত্রও কবির দ্রোহবুদ্ধির উর্ধ্বে উঠেছে, একটা সুকুমার পুরুষোচিত মাহাত্ম্যে নতুন রূপ পেয়েছে। সীতার পূর্বেকার দয়া যেন আরও বিগলিত হয়ে প্রবাহিত। ফলে এই সর্গে সুর কোথাও কাটে নি। এমন কি রাবণের সংক্ষিপ্ত ক্রন্দনেও পূর্বের সেই আর্তনাদ নেই। ভেসে যেতে যেতে হাহাকার করে মানুষ, তার মধ্যে উদ্ধারের ক্ষীণ আশাও থাকে, সেটুকু যখন সমাপ্ত হয় তখন যে দীর্ঘশ্বাস ও নীরব অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় নবম সর্গে তারই সাক্ষাৎ পাই। কথা তাই স্বল্প হয়ে এসেছে, না-বলা কথার ব্যথার সুরই এখানে সর্বব্যাপী।

বিগলিত বেদনাধারার সমাপ্তিতে ক্রুদ্ধ সমুদ্রের গর্জনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবি—

> অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে!
> লড়িল মস্তকে জটা; ভীষণ গর্জনে
> গর্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ; ধক ধক ধকে
> জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে
> কল্লোলিলা ত্রিপথগা বরিষায় যথা
> বেগবতী স্রোতস্বতী পর্বতকন্দরে!
> কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে।

দুঃখের উৎসে যে ক্রোধের জন্ম, দুঃখে যার বিলুপ্তি তার ভাষারূপ অশ্রুরুদ্ধ

পাঠকচিত্তে অতলস্পর্শী গভীরতা ও গাম্ভীর্য সঞ্চারিত করে। কিন্তু পরমুহূর্তে সেই গম্ভীর গর্জনের বিলীয়মান শব্দস্রোতে উদাসী বাতাসের কারুণ্য ধ্বনিত হয়—

> করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
> ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
> বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে !
> সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে ॥

অবশ্য রুদ্ররোষ থেকে রামলক্ষ্মণকে বাঁচাবার জন্য পার্বতীর প্রচেষ্টা অন্যত্র তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারত, কিন্তু এ সর্গে তাকেই পরিহারযোগ্য রসাভাস বলে মনে হয়।

॥ ছয় ॥

কাব্যে কবির আত্মপ্রতিফলনের সুযোগ সর্বত্র সমান নয়। গীতিকবিতায় কবির আত্মার ক্রন্দন যেভাবে ধ্বনিত হয় আখ্যানকাব্যের বস্তুভিত্তিক আঙ্গিকে তার সুযোগ অল্প। কবির বৈশিষ্ট্য, জীবনদৃষ্টির একক মৌলিকতা কিংবা সৌন্দর্যচেতনা বা বিচিত্র প্রবণতার অনন্যতা আখ্যানকাব্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু কবির ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করতে পারে না। মধুসূদনের কবি-আত্মা অত্যন্ত আত্মপ্রকাশশীল। আখ্যানকাব্যের মধ্যেও তিনি আত্মরূপদর্শন করতে চেয়েছেন। বীরাঙ্গনা এবং ব্রজাঙ্গনা ছাড়া মধুসূদনের অন্য কাব্য এই আত্মভাববিচ্যুত নয়। এখানেই মধুসূদনের রোমান্টিক প্রবৃত্তির জয়—এমনও বলা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে একটি সঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে। কাব্যমধ্যে কবি-আত্মার প্রতিফলন খোঁজার সার্থকতা কোথায়? কবি-আত্মার নৈকট্য এর মধ্য দিয়ে লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু কবির 'আমি'র সামীপ্যে পৌঁছুনোই কি কাব্যানন্দ লাভের কোন নিশ্চিন্ত উপায়? কবির ব্যক্তি-আমির অভিব্যক্তি ভাষারূপে যদি সার্থকতা লাভ করে তবে তা যে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে এতে সন্দেহ করবার কারণ নেই। কিন্তু ভাষারূপে সার্থক হয়ে ওঠার শর্ত তাকে মেনে নিতে হয়। সাহিত্যে এই ছাড়পত্র ছাড়া উপভোগের রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি মেলে না। কল্পনা গভীর হতে পারে, অভিনব হতে পারে, কিন্তু ভাষায় তাকে রূপগ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে বিশেষ করে কবির ব্যক্তি-আমির

আলোচনার কোনো তাৎপর্য আছে কি? এ কি অন্য পাঁচটা উপকরণের মত একটা উপকরণমাত্র নয়? যে কবি আপন ব্যক্তিত্বকে অন্য পাঁচটি উপকরণের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে দেখতে পারেন, তিনি মহাকবি। তাঁর কল্পনাভঙ্গি Absolute Vision-এর সিদ্ধি লাভ করেছে। তেমন কবি পৃথিবীর কাব্যজগতে কমই আবির্ভূত হয়েছেন। অন্যান্য কবির কাছে তাঁর "আমি" একটা সাধারণ উপকরণ মাত্র নয়। বিশেষত মধুসূদনের মত কবি, যাঁর ব্যক্তিসত্তা ও কবি-আত্মা অতি নিকট রাজ্যের অধিবাসী, তাঁর আত্ম-উদ্ঘাটনকে অত্যধিক মূল্য দিয়ে গ্রহণ না করে উপায় নেই। এ বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদারের একটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য—

> "কিন্তু যদি কোথাও কোন কবি-শিল্পীর মধ্যে ব্যক্তি ও কবি দুইই সমান ও অভিন্ন হইয়া উঠে; ব্যক্তিকে কবি আচ্ছন্ন করে নাই বরং আরও অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছে; ব্যক্তিজীবনের যাহা-কিছু তাহা কবি-জীবনে রূপান্তরিত হইতেছে না,—এমনই প্রত্যক্ষ ও বাস্তব আকারে ব্যক্তি চিত্তকে বিদ্ধ করিতেছে যে, তাহার মধ্যে যে কবি আছে, ভাবকল্পনার যে অতিরিক্ত সচেতনতা আছে, তাহা ঐ বাস্তবের নিকটে, ঐ ব্যক্তির নিকটে আত্মসমর্পণ করে—কবিরও যেমন, ব্যক্তিরও তেমনই স্বতন্ত্র জীবন থাকে না, তবে এমন পুরুষের পক্ষে কাব্যরচনাই যে অর্থে আত্মকাহিনী-রচনা, তেমন আর কাহারও পক্ষে নয়। সেই কাব্য এমন একটি রসে অভিষিক্ত হইবে যাহা কাব্যরসও বটে, ব্যক্তি-জীবনের বাস্তব অনুভূতির অপূর্ব মমতা সেই রসকে তীব্র তীক্ষ্ণ করিয়া তোলে। কবি ও ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইলেও এখানে যেন এক হইয়া আছে।
>
> ইহা সত্য যে, সেইরূপ আত্মকাহিনী-রচনাতে লেখককে একেবারে আত্মহারা হইতে হইবে, অর্থাৎ এমন আত্ম-তন্ময়তার ভাবাবেশ চাই যে, নিজ হৃদয়ের সেই মরমোৎকণ্ঠা যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই উৎসারিত হইতে পারে। আপনাকে দেখার নামই আপনাকে প্রকাশ করা; যাহা মর্মমূলে জড়াইয়া আছে তাহার পাক খুলিয়া যাওয়ার একটা পরম স্বস্তিসুখও আছে। এক হিসাবে সেই কাব্য কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, কারণ তাহা আত্মার আত্মসৃষ্টি; তাহার বেদনা যেমন সত্য, আনন্দও তেমনই। কবি-জীবনের এমন অন্তরঙ্গ কাহিনী সাহিত্যে অতিশয় দুর্লভ।"
>
> —[শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র]

তাই মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে যে দুর্লভ উপলব্ধির প্রকাশ আছে তার অনুসন্ধান কর্তব্য। তার সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটেছে বলেই অবশ্য তা পাঠক-হৃদয়বেদ্য, কিন্তু আত্মকথন বলে তার মধ্যে অসাধারণ গভীরতা ও বিশিষ্টতা এসেছে।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে লঙ্কাপুরীর নানা বর্ণনা আছে। কখনও লঙ্কার রাজসভা, কখনও লঙ্কার প্রাসাদমালা, আবার কখনও তার রণসজ্জামত্ত সৈন্যবাহিনী, কখনও কর্মমুখর নর ও নারীকুল এ কাব্যে নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সে বর্ণনায় লঙ্কা যে রত্নরাজিতে সজ্জিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে মূল্যবান, কিন্তু কবির মনের ভাণ্ডার থেকে সঙ্কলিত বর্ণসম্পাত তার মূল্য অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কবি লঙ্কার রাজপুরীর বর্ণনা করে বলেছেন—

ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি.
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি

কাকলী-লহরী, মরি ! মনোহর, যথা
বাঁশরী-স্বরলহরী গোকুলবিপিনে !
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
সযত্নে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে ?

হরকোপানলে যে কামদেব ভস্মীভূত হয় নি এ সভার ছত্রধর যেন স্বয়ং তার প্রতিরূপ। এখানে প্রতিহারী যেন রুদ্রেশ্বর শূলপাণি। এ সভা নির্মাণে যে কবির মনের রঙ গভীরভাবে পড়েছে এর চেয়ে বড় প্রমাণ দিয়ে তা বোঝানো প্রয়োজনহীন। এই লঙ্কাপুরি শুধু 'কুসুমদাম-সজ্জিত,' 'দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম।' এই নগরী 'কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী', এর চারদিকে 'হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে', 'হীরাচূড়াশিরঃ দেবগৃহ' 'নানারাগে রঞ্জিত বিপণি, বিবিধ রতন-পূর্ণ।' একে উপমিত করা চলে নয়নলোভন কিন্তু 'পরাক্রমে ভীমা' কেশরী-কামিনীর সঙ্গে। কিন্তু এই বর্ণনার বিচিত্র সৌন্দর্যে, উপমার মাল্যগ্রন্থনেও কবি তৃপ্ত নন। কামনার কামস্বর্গকে ভাষারূপ দিয়ে কে কবে তৃপ্তি পেয়েছে ? কবি তাই আরও বলেন—

এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন '

যে দৃষ্টিকোণের অনুসরণে লঙ্কার এ সৌন্দর্যবর্ণনা কবি করেছেন তা রাবণের। তাতে মোহের ঘোর থাকবেই। কিন্তু এখানে রাবণের মোহঘোরে কবির বেদনা যুক্ত হয়ে তাকে এত গভীর ভাবে রাঙিয়েছে। রাবণের দৃষ্টির স্নেহসিক্ত কোমলতা অথবা লক্ষ্মণের দৃষ্টির বিস্ময়বিমূঢ়তা লঙ্কা-বর্ণনায় সমভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই স্রষ্টার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। লক্ষ্মণ যখন ইন্দ্রজিৎ-নিধনে চলেছে তখন লঙ্কাপুরীর যে ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য তার কাছে প্রতিভাত হয়েছে কবি তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথমে নগরের বর্ণনা—

ধীরে ধীরে চলিলা দুজনে ;
নীরবে। উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,

গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অশ্বশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য ? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে ?

পরে নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রাজপ্রাসাদের বর্ণনা—

ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন হীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূট শৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর।

লঙ্কার এই বিবিধ বর্ণনা থেকে কয়েকটি ভাব-সূত্র আহরণ করা চলে।—

এক. মেঘনাদবধ কাব্যে লঙ্কাপুরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। সে স্থানটি কেবলমাত্র ভাববস্তুর উপস্থাপনায় নয়, বর্ণনার বর্ণাঢ্য মায়াবিস্তারেও ; কাব্যটির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লঙ্কার বর্ণনাংশ যেমন উপস্থাপিত, তেমনি লঙ্কার বর্তমান দুরবস্থা, অতীতের গৌরব এবং ভবিষ্যতের চরম বিপর্যয়ের আভাস নানা প্রসঙ্গে উচ্চারিত। লঙ্কাপুরী একটি স্থান-পরিবেশ মাত্র নয়, এ কাব্যে সে একটি ভাবসত্য।

দুই. মধুসূদনের রাজনৈতিক চেতনা যথেষ্ট স্পষ্ট বা তীব্র ছিল না। তবে স্বাজাত্যবোধ সেযুগের সাধারণ ভাবপ্রেরণা হিসেবেই যে কবিচিত্তে প্রবিষ্ট হয়েছিল এমন প্রমাণ যথেষ্টই মেলে। মধুসূদনের কবিধর্ম এত বিশিষ্ট এবং সর্বগ্রাসী ছিল যে স্বাজাত্যচেতনাও হেম-নবীনের কাব্যের ন্যায় উচ্চকণ্ঠ নয় ; সাহিত্যধর্মচ্যুত হয়ে রাজনৈতিক মঞ্চবক্তৃতার কোনো আকর্ষণ তিনি অনুভব করেন নি। তবুও একথা ঠিক যে এক বিশেষ ধরনের স্বাদেশিকতা মধুসূদনের কবিচেতনার সঙ্গেই বিজড়িত হয়ে গিয়েছিল।[২৬] তাঁর পরিণত কাব্য-নাটকে আক্রান্ত দেশ বা পরাভূত জাতির প্রতি ভালবাসার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার মধ্যে কবির স্বদেশপ্রাণতার অনুসন্ধান করা একান্তভাবে অযৌক্তিক নয়।

'কৃষ্ণকুমারী'দের প্রতি কবির সহানুভূতির নানা কারণের মধ্যে এ কারণটিও তুচ্ছ নয় যে তারা বহিঃশক্তির দ্বারা অবরুদ্ধপ্রায়। জনার পুত্রহারা বেদনার পশ্চাতে মাহিশ্বতীপুরীর সদ্য পরাধীনতার লজ্জা ও অপমান যে একেবারে নেই তা মনে হয় না। 'হেক্টর-বধ' নাম দিয়েছিলেন তিনি তাঁর ইলিয়াড অনুবাদের। আক্রান্ত হেক্টরের সঙ্গেই কি পরাধীন দেশের এই কবিপ্রাণ নিজের অধিক সামীপ্য অনুভব করেছিল? মেঘনাবধ কাব্যে লঙ্কাপুরী চতুর্দিকে বানর-সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ। রাম-রাবণের যুদ্ধ দেশের স্বাধীনতারক্ষার যুদ্ধে পরিণত। বীরবাহুর গৌরব শুধু মাত্র সম্মুখসমরে মৃত্যু বরণ করায় নয়, রাবণের ভাষায়—

দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্মে হতপুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন?

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনার মধ্যেও এই সুর লক্ষণীয়—

১. তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী!

২. কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি?

'জন্মপুরে' এবং 'জাতি' শব্দ দুটির ব্যবহার লক্ষণীয়। জন্মভূমির গৌরব-বোধ, জাতি-প্রীতি প্রদর্শনের কর্তব্য কর্মের পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে যে লঙ্কাপুরী তার কথা প্রথম সর্গের সমাপ্তিতে প্রাণভরে বলেছেন—

নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার!

এ চিত্র পরাধীন ভারতবর্ষের কল্পিত মাতৃমূর্তির সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এ দেশমাতৃকার যে মূর্তি দেখে শিউরে উঠেছেন—

"ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'দেখ, মা যা হইয়াছেন।' মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, 'কালী'। ব্র। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনি পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!"

মধুসূদন বা বঙ্কিমের রাজনৈতিক চেতনা এক নয়, কাব্যবোধও ভিন্ন। দেশমাতৃকার এই নগ্নিকা কালীমূর্তির কল্পনা মধুসূদন কখনই করতে পারতেন না। দেশ-সম্পর্কে সেই সুতীক্ষ্ণ বস্তুবোধ তাঁর ছিল না। তিনি ঐশ্বর্যময়ীর দরবিগলিত অশ্রুধারায় দেশমাতৃকাকে কল্পনা করেছেন। লঙ্কাপুরীর পেছনে কবির স্বাজাত্যবোধ মাত্র নেই, কবির নিজ অভিজ্ঞতার এবং ভালবাসার বাংলাদেশের ছবি আছে।—

রাক্ষসবধূ; মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসী কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি!

লঙ্কাপুরীর বর্ণনায় কখনও এমনি প্রত্যক্ষত, কখনও উপমায় ভেসে আসে বাংলাদেশের কোমল ভাবাবেশ—

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব-বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে![২৭]

তিন. কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল এই যে লঙ্কাপুরী কবির কল্পনার কামস্বর্গ। মধুসূদনের কাব্যলোকে ঐশ্বর্যের বিদ্যুদ্দীপ্তি যে প্রকাশিত হবে তা খুবই স্বাভাবিক। আসন্ন ধ্বংসের অগ্নিবর্ণে সেই ঐশ্বর্য অস্তসূর্যের শেষ রশ্মিকে যেন বুকে ধরে রেখেছে, যেন এখনও যে চিতা জ্বলে নি তার আগুনে রক্তিমাভা ধারণ করেছে এই লঙ্কাপুরী। রবীন্দ্রনাথ বারবার দূরে উজ্জয়িনীতে স্বপ্নলোকে উড়ে গিয়েছেন, মেঘের পৃষ্ঠে ভর করে অলকাপুরীর মোক্ষধামে প্রয়াণ করেছেন—

অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল-শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে,

মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা—
শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশিরেখা
পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।

—মেঘদূত

এ বিরহবেদনা চিরন্তন সৌন্দর্যের জন্য বিরহ, চাওয়া-পাওয়ার অন্তহীন দ্বন্দ্বের রোমান্টিক আকুতি। রবীন্দ্রনাথের কাম্যলোক নিটোল, পরিপূর্ণ। মধুসূদনের কামনার স্বর্গটি আসন্ন ধ্বংসের সম্ভাবনায় অগ্নিগর্ভ ও কম্পিত। মধুসূদন যখন মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন তখন তাঁর কাব্যরচনক্ষমতা ও কবিপ্রতিভার যৌগপত্য পৌঁছেছিল চরমে, দ্বিধা ছিল সামান্যই। জীবনেও অপূর্ব ভারসাম্য দেখা দিয়েছিল। কবি তখনও কল্পনা করতে পারেন নি যে অচিরে তাঁর কবিচেতনার মূলতারটি অকস্মাৎ ছিঁড়ে যাবে, সেই ছিন্ন ব্যথার আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই বাজবে না বীণায়। সে চতুর্দশপদী কবিতার কাল আসতে এখনও কিছু বাকি। এখনও সৃষ্টিযজ্ঞে চলছে পূর্ণাহুতি; ভস্ম আর অঙ্গারাবশেষের দিন কবে আসবে কবি কি তা জানতেন? ব্যক্তি-মধুসূদন তা জানতেন না, কিন্তু কবির চেতনায় হয়ত তা ধরা পড়েছিল। কবির কাব্যে তাই কামস্বর্গের ছবি আর ফুটল না কোনো দিন, স্বর্ণলঙ্কার ভগ্ন ছবির বন্দনায় তাঁর শক্তি ফুরিয়ে গেল। স্বর্ণলঙ্কা আর তার নায়ক রাবণকে কবি নির্বাচন করেছিলেন তাঁর কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুটি নির্মাণ করবার জন্য। কাজেই অন্যরূপ করা যেত না। অনেক সাধনা চলল। পাপী রাবণকে বীরর্ষভ করে তোলা হল, রাক্ষসপুরী মাতৃভূমির মর্যাদা পেল। কিন্তু নিয়তি রুদ্ধ হল না। ঐ নির্বাচন যেন স্বয়ং নিয়তির হাতে করা। স্বর্ণলঙ্কা আর তার রাবণই যেন মধুসূদনের নিয়তি।

চায়. মধুসূদন "Albion's distant shore" -এর জন্য বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। এই লঙ্কায় কি সেই সমুদ্র-তরঙ্গধৌত দ্বীপের স্বপ্ন নেই? বিস্ময়কর, যে-লঙ্কায় কবি দেশমাতৃকার মূর্তিকল্পনা করেছেন সেই লঙ্কায় তিনি ইংলণ্ড দ্বীপের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু এই-ই মধুসূদন!

তাঁর কবি-জীবনের যে নিয়তি "Albion's distant shore", কবি-আত্মার সেই নিয়তি স্বর্ণলঙ্কা।

মধুসূদনের আত্মদর্শন স্বর্ণলঙ্কায়, স্বর্ণলঙ্কার অবক্ষয়িত নৃপতি রাবণে এবং অক্ষয়িত রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে। একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিচরিত্র হিসেবে রাবণের মূল্য এ কাব্যে অবশ্যস্বীকার্য। রাবণের ব্যক্তিত্ব ও ভাগ্যের প্রতিটি স্তর মধুসূদনের কবি-আত্মার প্রতিফলন-রূপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় সত্যচ্যুতি ঘটবে। কিন্তু মধুসূদন নিজেই অনেকাংশে রাবণ। রাবণের বীর্য ও দার্ঢ্য, তত্ত্বচিন্তা হীন ও পাপপুণ্যবোধহীন, সর্বস্নেহধন্য, প্রীতিপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে কবি-ব্যক্তি মধুসূদনের চরিত্র-মিল খোঁজা অর্থহীন। সেরূপ মিল থাকলেও তাকে গুরুত্ব দেওয়া অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু রাবণের ট্রাজেডির মধ্যে মধুসূদনের আত্মার ক্রন্দন যেন শোনা যায়। জীবনের যে ঐশ্বর্যমহিমময় পরিপূর্ণতা সে কামনা করেছিল প্রতিকূল দৈবের লীলায় তা হস্তচ্যুত হল। কামনার কামস্বর্গ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তাতে পৌঁছুবার পূর্বেই যেন স্বপ্নলোকের মত সব ধ্বংস হয়ে গেল। এই আর্তনাদ রাবণের এবং মধুসূদনেরও।

মেঘনাদের মধ্যে দানা বেঁধেছে সেই পরিপূর্ণতা যা কামনার কিন্তু প্রাপ্তির নয়। এই বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, চিন্তাভারমুক্ত এই দুর্ধর্ষতা, প্রেমে এবং বীরত্বে এই আদর্শ মূর্তি মধুসূদনের কামনার সামগ্রী ছিল। কবির অন্তরে ক্লাসিক চর্চার ফলে যে আদর্শ রাজ্য কল্পনার রঙে নির্মিত, রোমান্টিক স্বপ্নাবেশে তা চিরকালই অনায়ত্ত থেকে গিয়েছে। মেঘনাদের মৃত্যুতে তাই কবির শিল্পীপ্রাণের সঙ্গে সমস্বরে তাঁর ব্যক্তিপ্রাণও কেঁদেছে। কবির নিজের পত্রেই তার প্রমাণ আছে।

আত্মদর্শনের অপর দিক আত্মবিস্মরণ। মেঘনাদবধ কাব্যের মত গভীরে আপন আত্মার দর্শন মধুসূদন অন্যত্র লাভ করতে পারেন নি। আবার দুএকটি ক্ষেত্রে এ কাব্যে সুগভীর আত্মবিস্মরণেরও বিস্ময়কর উদাহরণ আছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে চিত্রাঙ্গদা-সংবাদ এবং সীতার পূর্বকথা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

কাব্যের প্রথম সর্গের বর্ণন ও গঠন সৌন্দর্যের দিক থেকে চিত্রাঙ্গদার রাজসভায় আগমনের মূল্যবিচার পূর্বে করা হয়েছে। কিন্তু সমগ্র কাব্যের ভাবকল্পনার দিক থেকে চিত্রাঙ্গদার কিছু গূঢ়তর সার্থকতা আছে। চিত্রাঙ্গদার চরিত্র এবং তার বক্তব্য বিশ্লেষণ করলেই সেই তাৎপর্যটি ধরা পড়বে।

চিত্রাঙ্গদার চরিত্র-পরিচিতি প্রসঙ্গে মোহিতলাল গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি সিদ্ধান্ত করেছেন—

"…কবি তাহার যে রূপলাবণ্যের আভাস দিয়াছেন, তাহাতে বুঝি, সে রাবণের মহিষী হইলেও এখনও বিগতযৌবনা নহে।…এই চিত্রাঙ্গদা রাবণের একাধিক মহিষীর একজন, এবং রাবণের সহিত তাহার বয়সের ব্যবধানও অল্প নহে। বহুপত্নীক স্বামীর প্রতি এরূপ পত্নীর যেরূপ মনোভাব হইয়া থাকে তাহা আমরা জানি।"

মোহিতলাল তাকে বলেছেন 'স্নেহানুগ্রহধন্য', 'স্বামিস্নেহবঞ্চিতা' 'রাবণের বিশাল রাজপুরীতে অবহেলিতা'। মোহিতলাল চিত্রাঙ্গদার চরিত্রের এই বিশিষ্টতা কল্পনা করে নিয়েছেন তার উক্তির দুই একটি অংশ থেকে। 'দীন আমি', 'কাঙ্গালিনী আমি', 'দরিদ্রধন-রক্ষণ রাজধর্ম' প্রভৃতি শব্দসমষ্টি থেকে এই তরুণী রাজ্ঞীর নিঃসঙ্গতা ও রাবণের প্রেম-বঞ্চিতা রূপটির কথা কবি-সমালোচকের মনে হয়েছে। কিন্তু কাব্যমধ্যে এরূপ চিন্তার উপযুক্ত ভিত্তি গভীরতর না হওয়ায় তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। যে শব্দ-সমষ্টির ইঙ্গিতে এই বোধে তিনি পৌঁছেছেন তা এ দিকেই সন্দেহাতীত ভাবে পাঠককে নিয়ে যায় না। একমাত্র পুত্রকে সদ্য হারিয়ে মাতার যে মনোবেদনা তার ভাষা হিসেবে ঐ কথাগুলিকে গ্রহণ করা চলে। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে রাবণের ব্যক্তিগত জীবনসম্পর্ক কিরূপ ছিল তার কোনরূপ ধারণা এই কাব্য আমাদের কাছে বহন করে আনে না।

তবে সমালোচকপ্রবর রাজ্ঞীর তারুণ্যের প্রতি যে ইঙ্গিত করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ।

> হেন কালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
> রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
> ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
> ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
> প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
> আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন!
> আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
> কুসুমরতনহীন বন-সুশোভিনী
> লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
> পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন!

বেদনাহত যৌবনলাবণ্যের এই বর্ণনা কবির সচেতন শিল্পদৃষ্টিকে এড়াতে পারে

নি বলেই মনে হয়। মাতৃহৃদয়ের শোকপ্রকাশে এই দেহ-সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ প্রয়োজনীয় ছিল না। কবি বিশেষ উদ্দেশ্যেই এ-বর্ণনার উপস্থাপনা করেছেন। এ পর্যন্ত সমালোচক মোহিতলালের সঙ্গে মতৈক্য হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি এই আবিষ্কারকে চিত্রাঙ্গদার ব্যক্তিগত জীবনের স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা অবহেলিতা মূর্তি অঙ্কনের কাজে লাগিয়েছেন। প্রৌঢ় বহুপত্নীক নৃপতির সুন্দরী তরুণীভার্যা সাধারণত অবহেলার সামগ্রী হয় না। তাই মনে হয় দাম্পত্যজীবনে সে স্বামীর স্নেহ হয়তো পেয়েছিল, কিন্তু প্রৌঢ় স্বামী ও নৃপতি রাবণ সুন্দরী তরুণী পত্নীর মনের নৈকট্য পায় নি। এদিক থেকে চিত্রাঙ্গদা নিঃসঙ্গ বটে।

চিত্রাঙ্গদার এই নিঃসঙ্গতা তাঁর জীবনদৃষ্টিকে একক করে তুলেছে। যে মানুষ শোভাযাত্রার অঙ্গীভূত সে জানে না যে বহু মানুষের এই সম্মিলিত যাত্রাভঙ্গি ঋজু না বক্র; যে ব্যক্তি স্রোতে ভেসে চলেছে সে বিচারহীন। পথের ধারে দাঁড়িয়ে দর্শক শোভাযাত্রার বহুভগ্ন বিচ্যুতি দেখতে পায়, তটস্থ ব্যক্তি ভাসমান স্রোতাপন্নের বিচারের ক্ষমতা রাখে। চিত্রাঙ্গদা শোভাযাত্রার যাত্রী নয়, স্রোতে সে গা ভাসিয়ে দেয় নি। তাই চিত্রাঙ্গদা রাবণকে বলতে পেরেছে—

কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ, কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !

একথা আকস্মিক আবেগসম্ভূত নয়, এর মধ্যে দীর্ঘকালীন চিন্তার সিদ্ধান্ত আছে। চিত্রাঙ্গদা এতকাল যা হৃদয়ে গোপনে পোষণ করেছে, আজ তা উচ্চকণ্ঠে আবেগোচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করেছে। লঙ্কাপুরীতে তার চিন্তার সঙ্গী ছিল না কেউ। একাকী এই দুর্ভর ভাবনা তাকে বহন করতে হয়েছে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর আঘাতে দীর্ঘকালসঞ্চিত সংযত চিন্তারাশি অভিযোগ-অশ্রুতে প্রকাশ পেয়েছে।

চিত্রাঙ্গদার কথাগুলির মধ্যে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় রাম-লক্ষ্মণাদির প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং লঙ্কাপুরীর প্রতি সুগভীর ভালবাসা। চিত্রাঙ্গদার মত নিঃসঙ্গতা তাই কারও নেই। এমন কি সরমাও সীতাকে পেয়েছে সঙ্গিনীরূপে, বন্দিনী সীতা পেয়েছে সরমাকে। রাবণের পত্নী চিত্রাঙ্গদা লঙ্কাপুরীর কল্যাণকামী, লঙ্কার ধ্বংসে বেদনায় সে আর্ত হয়ে ওঠে, সরমার ন্যায় উল্লাস বোধ করে না, সীতার ন্যায় সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। লঙ্কাপুরীকে ভালবাসলেও সে বড় একা, কারণ সে স্রোতাপন্ন নয়, তটস্থ। সমগ্র লঙ্কা চলেছে এক বিশাল শোভাযাত্রায়, সামনে যে অকালমৃত্যু মুখব্যাদান করে আছে তা তারা দেখতে পায় না, সাম্প্রতিক উল্লাস ও বেদনায় তারা কোলাহলমুখর। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে দণ্ডায়মান রাবণের শির কিছু উচ্চ বলেই সেই অন্তিম দৃশ্য সে স্পষ্ট দেখতে পায়। তাই তার কণ্ঠে ট্রাজিক হাহাকার। চিত্রাঙ্গদা পাশে দাঁড়িয়ে দেখে, শোভাযাত্রার মানুষ নয় সে।

রাবণের প্রতি মধুসূদনের ভালবাসা গভীর। সে ভালবাসা আত্মপ্রেমের মতই বিচারহীন। রাবণকে যারা সমালোচনা করে, নিন্দা করে তার কাজের, সেই রাম-লক্ষ্মণকে কবি ঘৃণা করেন ("I despise…"), সেই বানরসৈন্য-বাহিনীকে বলেন "দণ্ডক-অরণ্যচারী ক্ষুদ্র প্রাণী যত", আর বিভীষণকে স্বার্থপর দেশদ্রোহীরূপে চিত্রিত করেন। রাবণের প্রতি তাদের ধিক্কারবাণী শত্রুর শিবির থেকে উৎসারিত। বিরুদ্ধতা ভেদ করে, স্বার্থপরতা কাটিয়ে, সত্য-দৃষ্টির প্রশান্ত ঔজ্জ্বল্যে তা মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা রাবণমহিষী। লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্যে ও শক্তিতে তার গভীর বিশ্বাস, এর প্রতিটি ধূলিকণায় তার সুকোমল মমতা। তার কণ্ঠ থেকে এ কি বিচিত্র বাণী কবি শোনালেন! রাবণের এই অবক্ষয় অকারণ নয়। অন্যায় যা তা অন্যায়! যুগে যুগে পাপ-পুণ্যের ধারণা বদলে যায় কিন্তু সীমারেখা একেবারে মুছে যায় না। এই জিজ্ঞাসা থেকে মধুসূদনও অন্তরের গভীরে মুক্তি পান নি। চিত্রাঙ্গদার

ভাবাগ্নি রাবণকে তিনি অভিযুক্ত করেছেন, অথচ চিত্রাঙ্গদাকে কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করে ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করেন নি। বরং কবির স্নেহানুভূতি তার উপরেও অজস্রধারায় বর্ষিত হয়েছে।

মধুসূদনের কবিচেতনার কেন্দ্রে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি বীজাকারে ছিল এই ক্ষুদ্র চরিত্রের সংকীর্ণ ভূমিকায় তা সার্থকভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে বলা চলে।

•

প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদা এসে মধুসূদনের কবিচিত্তের একটি গুরুতর সমস্যাকে উদ্ঘাটিত করে দিল। কবিদৃষ্টির ভাষায় বলতে গেলে, সে সমস্যা নিরপেক্ষ এবং সাপেক্ষ দৃষ্টির দ্বন্দ্ব জাত। কবি নিশ্চিন্তভাবে সাপেক্ষ দৃষ্টির অনুসরণ করলে রাবণের ভাগ্য ও জীবনকে যেভাবে আত্মভাবের বশীভূত রাখতে পারতেন তা কিছুতেই পারলেন না। অন্তরের গভীর স্তর থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টির ক্ষীণ সুরটিতে যেন বেসুর বাজল। মধুসূদন রাবণকে নিয়ে সঙ্কটে পড়লেন।

কাব্যে কবিচিত্তের দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা সার্থকভাবে রূপে ধৃত হলে অভিনব আস্বাদ বহন করতে পারে। কিন্তু কবির রূপচেতনায় তথা কাব্যবোধে দ্বিধা থাকলে তা রচনাকে ত্রুটিপূর্ণ করে তোলে। রাবণ পাপ করেছে কিনা এ নিয়ে রাবণের অন্তরে দ্বন্দ্ব থাকলে তার তীব্র ট্রাজিক ফলাফল নিঃসন্দেহে আস্বাদ্য হত। কিন্তু কবি নিজে রাবণকে পাপী নয় বলে ঘোষণা করেও মনে পুরো স্বস্তি পাচ্ছেন না। একটি বিশেষ নারীমূর্তির বেশে তাঁরই অন্তরের নিরপেক্ষ কবিদৃষ্টি কবিকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। এই নারীমূর্তিই সীতা।

সীতা রাবণকে কতকগুলি কটূক্তি করে নিন্দামাত্র করে নি, অশোকবনে বন্দিনী সীতাই রাবণের বিরুদ্ধে উদ্যত তীব্র ধিক্কার। মধুসূদনের কবিচিত্তে সীতার প্রতি দুর্বলতা কেন ছিল বলা কঠিন, কিন্তু তার অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায় না।[২৮] একই কবিকল্পনা যুগপৎ প্রমীলা ও সীতার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে কি করে ভাবতে অবাক লাগে—বিশেষ করে মধুসূদনের মত কবির কল্পনা, যাঁর আকর্ষণকেন্দ্র সুনির্দিষ্ট। তাঁর মেঘনাদ-রাবণের প্রতি ভালবাসা এবং বিভীষণের প্রতি বিতৃষ্ণা ব্যাখ্যার অতীত নয়; কিন্তু প্রমীলা ও সীতার প্রতি সহানুভূতির সমান গভীরতা বিস্ময়কর। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলা এবং সীতা সমান প্রাধান্য পায় নি। কিন্তু কবির প্রীতি কার প্রতি অধিক সে সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা কঠিন। বীরাঙ্গনা কাব্যে তারা-জনা এবং ভানুমতী-দুঃশলার চরিত্র আঁকতে গিয়ে মধুসূদনকে একবার এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে

হয়েছিল। সে পরীক্ষায় তাঁর পরিকল্পনার ঔদার্য প্রকাশিত হলেও সৃষ্টির সাফল্য আসে নি। মেঘনাদবধে এসেছে। (সীতার কোমলতা, মৃদুমাধুর্য, প্রকৃতি-পটভূমির সঙ্গে একাত্মতা, চিত্তকারুণ্যে শত্রুমিত্রকে সমস্নেহে আপ্লুত করা মধুসূদনের কবিচিত্তের প্রণতিলাভ করল কি করে? বাল্মীকির আদর্শ থেকে অভিমানী মধুসূদন মূলত ভ্রষ্ট হন নি এক্ষেত্রে। অথচ মৌলিকতা সৃষ্টির জন্য সর্বত্র তাঁর কি গভীর আকুতি।[২৯] এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মোহিতলাল কয়েকটি কথা বলেছেন,

> "মধুসূদন, পুরুষের পৌরুষ ও মানুষের মনুষ্যত্ব-গৌরব সম্বন্ধে যে ভাবের ভাবুক হউন—মাতৃস্তন্যরসের মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই; আমাদের ঘরের সেই নারীমূর্তি, সেই সর্বংসহা ধরিত্রী-কন্যা, সেই আত্মমুগ্ধা, পরগতপ্রাণা, স্বার্থে দুর্বলা, ত্যাগে মহাবীর্যবতী মানবী-রূপিণী দেবীর মহিমা কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারেন নাই।...এই নারীই সেই নবযুগের বিদ্রোহী কবিচিত্তকে—তাঁহার কল্পনার বিপরীতমুখী আবর্তকে—একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দুর শাসনে রাখিয়া, এ কাব্যকে খাঁটি বাংলা কাব্য করিয়া তুলিয়াছে।"

মোহিতলাল মধুসূদনের কল্পনার কেন্দ্রস্থলে বাঙালীত্ব আবিষ্কারের যে প্রেরণা থেকে এই মন্তব্য করেছেন, বস্তুগত সাক্ষ্য দিয়ে তাকে সমর্থিত করেন নি। (সীতাচরিত্রের প্রতি কবির আকর্ষণের কারণ তাই অন্যত্র খুঁজতে হবে।)

প্রথমত। (সীতা মধুসূদনের একটি মনোহর লিরিক স্বপ্ন। স্বপ্নের মতই তা কোমল এবং মধুর এবং ক্ষণস্থায়ী। কঠিন পৃথিবীর সামান্যতম আঘাতেও তা যেন বিনষ্ট হয়ে যাবে। সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের রুদ্রগম্ভীর উন্মাদনা, ক্রূর চক্রান্ত, উদাত্ত যুদ্ধায়োজন যেমন চতুর্থ সর্গে এসে নিমীলিত নেত্রে বিশ্রাম কামনা করেছে তেমনি মধুসূদনের কবিকল্পনাও জীবনের আঘাতে-সংঘাতে উদ্দীপ্ত ও ক্লান্ত মহাকাব্যের গান গাইতে গাইতে, পর্বতের সূর্যোত্তপ্ত শিখর থেকে শীতল উপত্যকায় নেমে এসেছে।)

দ্বিতীয়ত। মধুসূদনের ব্যক্তিসত্তার প্রেমচেতনা প্রসঙ্গে অতৃপ্তি ও উত্তেজনার কথা বলেছি। দাম্পত্যজীবনের শান্তি সম্ভবত তিনি পেয়েছিলেন। প্রেমোপলব্ধির উত্তেজিত প্রগল্‌ভতাকে তার সঙ্গে সমন্বিত করতে পারেন নি। কবির গূঢ় বাসনালোকে এর ফলে একটি বিশিষ্ট স্তর সৃষ্ট হয়েছিল। সেখানে প্রেমের প্রগল্‌ভতা, দাম্পত্যের শান্তির সঙ্গে বিজড়িত,—আবেগকে স্তিমিত ও

গতপ্রাণ না করে যেখানে দাম্পত্য প্রশান্তি নিয়ে আসে, প্রেম যেখানে উচ্চকণ্ঠ অথচ উত্তেজিত দেহসর্বস্ব মাত্র নয়। কবি-আত্মা সেই নীড়ের সন্ধান করছিল। সীতা সেই নীড়। (মোহিতলাল-কথিত মধ্যযুগের গার্হস্থ্যাশ্রমের আদর্শ ঘরনী নয় সীতা; সেবায় শান্তিতে, কারুণ্যে যার চরম পরিচয়। কিন্তু মধুসূদনের কল্পনার সীতা বাল্মীকির অনুসারী হলেও মৌলিকতার স্পর্শবর্জিত নয়। মধুসূদনের সীতার প্রেমে কিশোরীর চাঞ্চল্য আছে,—

> অজিন (রঞ্জিত আহা, কতশত রঙে!)
> পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
> সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
> কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
> গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
> নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
> তরু সহ। চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
> দম্পতি, মঞ্জরিবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
> নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
> নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!

সীতার এ-জাতীয় আচরণ দেখে বিরক্ত হয়ে রাজনারায়ণ বসু তাকে উন্মাদরোগ-গ্রস্ত বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন।[৩০] কিন্তু এর মধ্যেই সীতাচরিত্রের প্রগল্‌ভতা প্রকাশিত। এ প্রগল্‌ভতা তাকে একেবারে তরল করে ফেলে নি, তার প্রশান্তি তথা কল্যাণ-মূর্তিকে অস্বীকার করে নি, একটি অতিরিক্ত প্রাণময়তা সীতা-চরিত্রে সঞ্চারিত করেছে। এই প্রেমকল্পনার রাজ্যের প্রতিই সম্ভবত মধুসূদনের দীর্ঘশ্বাস ধাবিত হত। এ রাজ্য লাভ করলে তিনি যে "হেথা নয় হেথা নয়" বলে অন্যতর কল্পলোকের দিকে যাত্রা করতেন না এমন কথা অবশ্য নিসংশয়ে বলা যায় না।)

তৃতীয়ত। মধুসূদনের কবিদৃষ্টি একটি ক্ষুদ্র অংশে যে বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষতার সামীপ্য ছিল, সীতা-চরিত্র অঙ্কনে এই একবার মাত্র তা সম্পূর্ণ রূপসাফল্য নিয়ে কাব্যাভ্যন্তরে স্থান পেল। এই দৃষ্টিই চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র-কল্পনার সুরটি বেঁধে দিয়েছিল, চতুর্থ সর্গের ভিত্তিমূলেই এই জীবনবোধ—এখানে তার পূর্ণতর, সার্থকতর রূপ।

চতুর্থত। বৈচিত্র্যের তৃষ্ণাও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। প্রকৃতির

স্নেহচ্ছায়াপ্রভাবিত কিশোরীর সরস প্রাণময়তা এবং সরল সর্বব্যাপী কারুণ্যের আধাররূপে নারীচরিত্র অঙ্কনের ইচ্ছাও কবিকে সীতাচরিত্র সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

উপরি-উক্ত চারটি কারণের সমন্বিত ফলেই সীতার সৃষ্টি। বাঙালী নারীর মমত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কবিকে এই রূপাঙ্কনে সাহায্য করতে পারে—তার অধিক নয়। কবি সীতাচরিত্রের যে বিস্ময়কর সুন্দর মূর্তি আঁকলেন সমগ্র কাব্যের বিশিষ্ট যুগবাণী জীবনবাণীর দিক থেকে সে মূর্তি হয়ে দাঁড়াল একটি জীবন্ত সঙ্কট।

মধুসূদন-কল্পিত সীতাচরিত্রে যে চঞ্চল প্রাণময়তার কথা বলা হল তা ছাড়াও কয়েকটি বিশিষ্ট উপকরণ এ ক্ষেত্রে আহৃত হয়েছে। এদের মধ্যে দু একটি পূর্বে বা পরে আর কবির মনের নৈকট্য বড় পায় নি। সীতাচরিত্রে কবি ঐশ্বর্য ও রাজকীয়তার উর্ধ্বে স্থিত প্রকৃতিপ্রীতিকে জয়যুক্ত করেছেন। রাজ্য হারিয়ে রামচন্দ্র ভিখারী মাত্র; সীতা কিন্তু গোদাবরীতীরের পার্বত্যপ্রকৃতির সৌন্দর্যোপলব্ধিতে রাজ্য-সম্পদকে সহজে অস্বীকার করতে পেরেছে—

ভুলিনু পূর্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী-সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রমা, আছে কি জগতে?...

সীতাকে কবি প্রকৃতির দুলালী বালিকায় পরিণত করেছেন। এ বিষয়ে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল দ্বারা মধুসূদন কিছু প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। মধুসূদনের মানসী শকুন্তলা হরিণশাবকের প্রতি মমত্ব দেখায় নি, তাপসী জায়া বনজ সজ্জাকে অবহেলা করেছে।[৩১] সীতা কিন্তু কানন-প্রকৃতির সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে গেছে,—

অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে : পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসি মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অমূল্য রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !

মধুসূদনের কল্পনার সীতা আসলে এই বনদেবী। মানবসংসারের জটিলতার ধারণা তার নেই, শত্রুমিত্রকে ঠিকমত চিনে সর্বদা সে পৃথক করে নিতে পারে না, ছলনা সে বোঝে না, তার আনন্দ, বেদনা, ক্রোধ, লজ্জা, করুণা সবই যেন অতি সহজে উৎস থেকে গলেপড়া ঝরণার জলধারার মত একান্তভাবেই প্রাকৃতিক। তার চারপাশে সমাজ নেই, সমাজ-চেতনাও খুব স্পষ্ট নয়, তাই তার সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রমীলার ন্যায় বীর্যময়ী রূপে জলে ওঠার প্রশ্নই সীতাচরিত্রপ্রসঙ্গে ওঠে না। মিথ্যাচার কিংবা কপটতার সঙ্গে তার সামান্যমাত্রও পরিচয় নেই। যে রাবণ তার সর্বনাশ করেছে, যার প্রতি নিন্দাবাক্য উচ্চারণে সে সঙ্গতভাবেই উচ্চকণ্ঠ, সেই রাবণকে তার অলঙ্কার-হরণের দায়ে সরমা যখন অভিযুক্ত করল তখন সে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে উত্তর করেছে—

বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে [illegible]রিল
বনাশ্রমে।

এই বনদেবী-রূপিণী নারী সবচেয়ে [illegible]শিষ্ট হয়ে উঠেছে লঙ্কাপুরীর প্রতি তার সস্নেহদৃষ্টিতে। মেঘনাদের মৃত্যু তার মুক্তিকে ত্বরান্বিত করেছে—তবুও সে ঘটনা শুনে যে খেদোক্তি সীতা করেছে—

কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা।
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী !
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীম ভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান ! হাদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ?
মরিবে দানববালা অতুল এ ভবে
সৌন্দর্য্যে !

তা সীতার চরিত্রের গভীরতম প্রদেশ যেমন আলোকিত করে তোলে তেমনি মধুসূদনের প্রকৃতিদৃষ্টির অন্তরালের একটি সুগভীর জিজ্ঞাসার যেন চকিত ইঙ্গিত দিয়ে যায়। সীতার এ কারুণ্য যেন সাধারণ মানবিক বৃত্তি মাত্র নয়। সে বৃত্তি আপন চরম সর্বনাশের মুখেও এমন বিস্ময়কর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে। সৃষ্টির উৎস থেকে যেন এই কারুণ্যধারা প্রবাহিত। প্রকৃতির উপাদান ও নির্মিতি ব্যতীত করুণার এ মূর্তি সম্ভব নয়। আদি প্রকৃতির যে দ্বৈতরূপের কথা তাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন এবং কবিশিল্পীদের ধ্যানে ও রূপচেতনায় যা বারবার প্রকাশ পেয়েছে সেই "Nature Maligna" এবং "Natura Benigna"—এর মধ্যে দ্বিতীয়টি যেন সীতাকে কেন্দ্র করে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সীতার এই শুভদা-বরদা মূর্তি বিস্ময়কর। এই কারুণ্যধারায় সে আপন বেদনার কারণকেও অভিশপ্ত করে নি, অভিযুক্ত করে নি; সর্ব অকল্যাণের জন্য নিজেকেই দায়ী করে বসেছে। জননী বসুন্ধরার কন্যা সীতা। মানুষ তাকে যে আঘাত করেছে সে আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করে আঘাত-কারীর দেহে মানুষের আপন হাতের ক্ষত দেখে সীতা অশ্রুবিসর্জন করেছে। পঞ্চবটীর প্রকৃতিপরিবেশ তাই শুধু মাত্র বর্ণনসৌন্দর্য ও পটভূমি রচনা করেই

ক্ষান্ত হয় নি, সীতাচরিত্রে একটি অভিনব ভাবচেতনার সঞ্চার করেছে, মধুসূদনের কবি-চেতনার নব দিগন্তের ইঙ্গিত দিয়েছে।

সীতাই মধুসূদনের হাতেগড়া একমাত্র চরিত্র যেখানে ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই তিনি নতুন কিছু গড়েছেন, যেখানে বিদ্রোহ না করেই তিনি মৌলিক হয়ে উঠেছেন।

এই দুই দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদনের আত্মদর্শনই শুধু ঘটে নি, কবির দর্শন সেখানে ব্যক্তি-আত্মার সীমা ভেদ করে বিস্তৃত হয়েছে।

॥ সাত ॥

ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, নারী বা পুরুষ, সরল বা জটিল সর্বশ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টিতে মধুসূদন সার্থকতা দেখিয়েছেন। কোথাও সাফল্যের ন্যূনতম মান প্রাণময়তায়ই তার সার্থকতার সীমা, কোথাও আবার জীবনজিজ্ঞাসার গভীরতম লোক তাঁর সৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত। পূর্বপরিচ্ছেদে দুটি চরিত্রবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মধুসূদনের চরিত্র-কল্পনার বিশিষ্টতা এবং সৃষ্টি-নৈপুণ্যের কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এবারে অন্য চরিত্রগুলির আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যেতে পারে।

উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক যে ভঙ্গি ব্যবহার করেন অথবা যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে নাটকের ক্ষেত্রে কাব্যমধ্যে তার অনুসন্ধান কর্তব্য নয়। গদ্যবাহন উপন্যাসে চিন্তা-যুক্তি বিশ্লেষণের ভূমিকা আছে, প্রত্যহের খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে একটি মানবচিত্ত ও ভাগ্যের অগ্রগতিকে আঁকবার সুযোগ আছে। পাত্রপাত্রীদের আত্মমগ্ন হয়ে হৃদয়ে অবগুণ্ঠিত ও গুঞ্জরিত ভাব-ভাবনাকে প্রকাশ করবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে। নাটকে অবগুণ্ঠিত চিত্তকথার গুণ্ঠন-মোচন হয় না। কর্মের প্রত্যক্ষতা চরিত্রকে প্রকাশ করবার প্রধান উপায়রূপে গণ্য হয়। নাটকীয় চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটনাবিবর্তনে, পাত্রের আচার-আচরণে প্রতিফলিত করতে হয়। নাট্যকার উপস্থিত না থাকায় বিশ্লেষণ তথা কার্যকারণ-যোগ আবিষ্কার সম্ভব হয় না। কাব্যের ভাষা আবেগের। বিশ্লেষণাদির স্বাভাবিক সুযোগ সেখানে কম। নাট্যোচিত ঘটনাপ্রাধান্য না থাকায় নাটকীয়

চরিত্রগুলির মত তারা স্বতঃপ্রকাশও নয়। তাই কবির চরিত্র-সৃষ্টি আবেগধর্মী হতে বাধ্য। কাব্যের পাত্রপাত্রী হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় বেদনাকে ব্যক্ত করে। এই অভিব্যক্ত হৃদয়ান্তঃপুরের সংবাদই কবির চরিত্রনির্মিতির প্রধান উপকরণ।

প্রথমে একান্ত ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির পরিচয় নেওয়া যাক। এরা কাব্যের মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। কোথাও কেউ গল্প-সূত্রকে ধরে রেখেছে, কেউ অপরিহার্য পার্শ্বচরের ভূমিকা পালন করেছে। এদের প্রতি কাব্যের বা কবির সতর্ক দৃষ্টি থাকবার কথা নয়। তবুও মধুসূদনের নির্মাণ-ক্ষমতা এদের বিরুদ্ধে প্রাণহীনতার অভিযোগ আনতে দেয় না। এ চরিত্রগুলি পুতুলমাত্র নয়।

ভগ্নদূত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দুঃসংবাদ বহন করে আনে। সংবাদটাই সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, তার প্রতিই কাব্যের দৃষ্টি; সংবাদবহনকারীর প্রতি দৃষ্টিপাতে রসনিবিড়তার হানি ঘটতে পারে। মধুসূদনের কাব্যের অন্যত্র স্থাপিত হলে ভগ্নদূত কর্তব্যসম্পাদন মাত্র করত বলেই মনে হয়। কিন্তু কাব্যের প্রথম সর্গের একেবারে প্রারম্ভে তার উপস্থিতি কবিকে তার প্রতিও নজর দিতে বাধ্য করেছে। কবির ও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার মত যথেষ্ট ঘটনা ও চরিত্রের অনুপ্রবেশ কাহিনীমধ্যে তখনও হয় নি। মধুসূদন ভগ্নদূতের চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন, রাজসভার সাধারণ মনোভাবের সুরটি এই ব্যক্তিব মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। ভগ্নদূতের চরিত্রটি সরল, কিন্তু জীবন্ত। সে বীর, এবং রাজভক্ত। কিন্তু শুধু ভক্তি নয়, শুধু কর্তব্য নয়, লঙ্কাপুরীর দুঃখে, রাবণের পুত্রহারানোর বেদনায় সে সহানুভূতিশীল মাত্র নয়—বীরবাহুর মৃত্যুর বেদনা তার হৃদয়গভীর থেকে উৎসারিত।

এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী স্মরিয়া
পূর্বদুঃখ !

এই বেদনার স্পর্শটুকুই তাকে প্রাণবন্ত হতে সর্বাধিক সাহায্য করেছে।

রামের মানবেতর সহচরদের মধ্যে হনুমান কিছুটা স্পষ্ট, কিন্তু ভগ্নদূতের নীরব ক্রন্দন যে প্রাণউৎস উন্মোচন করেছে হনুমানে তা ঘটে নি। হনুমান রামের "rabble"-এর দলে। তাদের প্রতি মধুসূদনের ঘৃণা সোচ্চার। মহাকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রের সঙ্গে কতকগুলি মানবেতর সঙ্গী দিয়েছেন বলে তিনি এক স্থানে দুঃখপ্রকাশও করেছেন। স্রষ্টা-চিত্তের এতখানি ঘৃণা সরিয়ে

হনুমানের চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠা কিছু কঠিন, সন্দেহ নেই। তবুও হনুমান প্রাণহীন নয়। তবে সে বড় মামুলী। তার বীরত্বের দম্ভ বা তার মার্জিত রুচি ভদ্রতাও এই অতি সাধারণের সীমা থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে নি। প্রমীলার নারীসৈন্যের প্রতি সে মোটামুটি য়ুরোপীয় ভদ্রব্যক্তির মতই আচরণ করেছে। কিন্তু যে দুটি চরিত্রগুণে বাংলা রামায়ণে হনুমান বিশিষ্ট এবং বলা যেতে পারে সবিশেষ জনপ্রিয় সেই ভক্তি আর স্থূলবুদ্ধি বর্বরতা মধুসূদনে না মেলাই স্বাভাবিক।

এদের তুলনায় রাবণের সচিব সারণ-চরিত্রে ব্যক্তিলক্ষণ কিছু অধিক স্পষ্ট। প্রথম সর্গে তার নীতিবাক্যে রাবণকে প্রবোধ দেবার চেষ্টার মধ্যে প্রাণলক্ষণ অধিক আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু নবম সর্গে একটিমাত্র বাক্যের আলোকে এই চিন্তাশীল মহাপ্রাজ্ঞ মানুষটির স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাবণের আদেশে রামের নিকটে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রীবর মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সাতদিনের যুদ্ধ-বিরতি প্রার্থনা করে। রাম সম্মত হলে সে বলে—

নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে !
উচিত এ কর্ম তব, শুন মহামতি।
অনুচিত কর্ম কভু করে কি সুজনে ?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ;
নরদলপতি তুমি, রাঘব ! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে !
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে !
বিধির নির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু ;
খগেন্দ্রে নগেন্দ্র বৈরী ; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে ?

এই সত্যবোধ বিস্ময়কর। বিধির লীলার রহস্য উদ্ঘাটনে অক্ষম এই স্বল্পভাষী ব্যক্তিটি রাবণের অতি বিশ্বস্ত প্রধান মন্ত্রী হয়েও রামকে যে দৃষ্টিতে দেখেছে তা বিকারহীন, স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল। কাব্যের মধ্যে রাজসভার প্রসঙ্গ একাধিকবার

এসেছে এবং দীর্ঘস্থান অধিকার করে রেখেছে, কিন্তু একবার কয়েকটি কথায় সে রাবণকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে বীরবাহুর মৃত্যুর পরে, মেঘনাদের মৃত্যুর পরেও তার নীরব উপস্থিতি আমরা অনুভব করেছি ; কিন্তু সান্ত্বনার বাণী সে আর উচ্চারণ করে নি। সান্ত্বনা সেদিন ভাষা হারিয়েছে। সারণের এই সত্যোপলব্ধির সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার বোধের পার্থক্য আছে। চিত্রাঙ্গদা রাবণের কৃতকর্মের ফল হিসেবে এই বিপর্যয়কে দেখেছে, সারণ বিধির বিধানের কার্য-কারণ আবিষ্কার করতে না পেরে বিমূঢ়। সে ধীর ও প্রজ্ঞাকুশল মননে রামের যে চরিত্র-স্বরূপ অনুভব করেছে তা তার স্রষ্টা মধুসূদনের সচেতন বাসনাকেও ছাপিয়ে গেছে। এইজন্য মনে হয় এই চরিত্রটির কল্পনামূলে কবির নিরপেক্ষ দৃষ্টিই সক্রিয়।

ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির মধ্যে সরমার নামও উল্লেখ করা চলে। কবি মধুসূদন তাকে "রক্ষোকুল রাজলক্ষ্মী" বলে অভিহিত করলেও তার চরিত্র যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। স্বামী বিভীষণের মতই রাবণের প্রতি তার ঘৃণা। সীতার প্রতি প্রীতিতে, প্রমীলার সহমরণে দুঃখবোধে তার চরিত্রের নারীসুলভ কোমলতা প্রকাশিত হয়েছে এইমাত্র।

মেঘনাদবধ কাব্যের অধিকাংশ দেবচরিত্র রচনা হিসেবে সার্থক নয়। কোথাও বিদেশী কাব্যকল্পনার প্রভাবে, কোথাও সচেতন বিদ্বেষে চরিত্রগুলি বিকৃত হয়েছে।

ইন্দ্রের চরিত্রে ভীতি এবং ষড়যন্ত্রকুশলতার মিশ্রণ ঘটেছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুচিন্তা তার চোখের নিদ্রা হরণ করেছে। যুদ্ধস্থলেও সে কাপুরুষ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। ইন্দ্র-চরিত্রে কোথাও বীর্যবত্তার কিছুমাত্র অবকাশ কবি রাখেন নি। তবে ইন্দ্র কর্মকুশল ব্যক্তি। পার্বতীকে অনুরোধ করে মহাদেবের অনুমতি আদায় করেছে, যথাকালে প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি লক্ষ্মণের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু সব মিলে তার কোনো বিশিষ্টমূর্তি ফুটে ওঠে না।

পার্বতীর চরিত্রে গ্রীক দেবরাজপত্নীর ছায়াপাত আছে। তবে হীনস্বভাবা হীরীর চরিত্রে যে আচরণ স্বাভাবিক, তা পার্বতীর পক্ষে সঙ্গত কিনা এরূপ প্রশ্ন উঠতে পারে। পার্বতীর সংক্ষিপ্ত চরিত্রে কচিৎ দেবসুলভ নিরপেক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। রাবণ-মেঘনাদের বিরুদ্ধে ইন্দ্র ও শচী যখন তাকে বারবার উত্তেজিত করতে চেয়েছে তখন—

হাসিয়া কহিলা উমা ; "রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব জিষ্ণু ! তুমি হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।"

তাদের আসল উদ্দেশ্য সে বুঝেছে। কিন্তু অতি দ্রুত এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির ফাঁদে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। অবশেষে নটীসুলভ সজ্জায় সে মহাদেবকে ভুলিয়ে আপনার লক্ষ্যসাধনের ব্যবস্থা করেছে। এই চরিত্রের যে দুটি পূর্বতন সংস্কার বাঙালীপাঠকের চিত্তে আছে তা হল,—এক। গ্রাম্য বাঙালীবধর দারিদ্র্যক্লিষ্ট কলহমুখরতা (শিবায়ন কাব্য এবং অন্যত্র মঙ্গল কাব্যের নানাস্থানে চণ্ডী বা পার্বতীর এই মূর্তিই উপস্থাপিত।) দুই। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী প্রভৃতিতে কথিত দেবীর দানবদলনী, মহিষমর্দিনীমূর্তি। মধুসূদন পূর্বসংস্কার ভাঙবার অবকাশ পান নি এই চরিত্রের ক্ষুদ্র পরিসরে, অথচ নতুন একটি বোধ আরোপ করেছেন, সহজভাবে পাঠকের পক্ষে একে গ্রহণ করা তাই কঠিন। আবার এই পার্বতী যখন যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের শরে কার্তিকেয়কে আহত হতে দেখে আকুল হয়ে উঠেছে—

বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে।

তখন তার দেবপরিচয় একেবারে ছিন্ন হয়ে বাঙালী জননীর দুর্বল মূর্তি আত্মপ্রকাশ করেছে।

মহাদেবের দুএকটি চিত্রে রুদ্রত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। তার চরিত্রগাম্ভীর্যের একটা ব্যঞ্জনাও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অংশগুলির মধ্য থেকে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়। এ কল্পনায় অবশ্য মধুসূদনের মৌলিকতা কিছু নেই। কিন্তু প্রচলিত বোধটিকে তিনি সার্থক ভাষারূপ দিয়েছেন। এই গম্ভীরচরিত্র দেবাদিদেব কিছু অধিক মাত্রায় স্ত্রীবশ। মধুসূদন মহাদেবের স্ত্রীবশ্যতা অঙ্কনেও পুরাণানুমোদিত পথেই পরিক্রমা করেছেন। গ্রীকদেবরাজ জ্যুসের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বড় দেখা যায় না।[৩২]

লক্ষ্মী-চরিত্রটির সব অংশ বোধগম্য নয়। লঙ্কার সর্বনাশে সে দুঃখ প্রকাশ করেছে—

বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন !

আবার—

হায় সখী, বীর শূন্য স্বর্ণলঙ্কাপুরী !

এর পরেই সে লঙ্কাযুদ্ধে ষড়যন্ত্রী দেবতাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। লঙ্কার ধ্বংসমুখিতাকে প্রাক্তনের ফল বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছে এবং সেই ফলকে ত্বরান্বিত করবার জন্য মেঘনাদকে প্রমোদ-উদ্যান থেকে লঙ্কাপুরে আহ্বান করে এনেছে, ইন্দ্রাদির চেষ্টায় প্রেরণা যুগিয়েছে। মনে হয় তার কণ্ঠে লঙ্কাপুরীর প্রতি সহানুভূতির যে সুরটি কচিৎ বেজেছে তা আসলে কবির কণ্ঠস্বর। লক্ষ্মী ধনদাত্রী দেবতা। মধুসূদন ব্যক্তিজীবনে এই দেবীর উপাসনা করেছেন, কিন্তু প্রসাদ পান নি। লক্ষ্মী রাবণাদি কর্তৃক রক্ষপুরীর রাজ-লক্ষ্মীরূপে পূজিতা হয়েও তাদের সর্বনাশ সাধনের নিশ্চিত ব্যবস্থা করে যে হীনতার পরিচয় দিয়েছে কাহিনীগ্রন্থনে তাকে অনিবার্য বলে মনে করা যায় না। তাই কল্পনা করা সম্ভবত অন্যায় নয় যে, উক্ত দেবীর প্রতি কবি-অন্তরে যে বিরূপতা পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা-ই এই চরিত্রকল্পনায় প্রেরণা দিয়েছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের আটটি চরিত্রের কাহিনীর উপর গুরুতর প্রভাব আছে। কবির মনোভঙ্গির বাহন হিসেবেও তারা কাব্যকল্পনায় মুখ্য স্থান দখল করেছে। এর মধ্যে পুরুষচরিত্র পাঁচটি, গুরুত্ব অনুসারে তাদের একটি ক্রম রচনা করা যায়—বিভীষণ, রাম, লক্ষ্মণ, মেঘনাদ ও রাবণ। তিনটি নারীচরিত্র প্রাধান্য অনুযায়ী এইভাবে সাজানো চলে—মন্দোদরী, সীতা ও প্রমীলা। সীতাচরিত্রের মোটামুটি বিস্তৃত পরিচয় পূর্ব পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। এবারে একে একে অন্য চরিত্রগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

বিভীষণের চরিত্র খুবই সরল হতে পারত। কবি তার আয়োজনও সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তা একটু জটিলতার দিকে মোড় ঘুরল। মূল রামায়ণে বিভীষণ পুণ্যাত্মা। পাপী ভ্রাতার পক্ষ পরিত্যাগ করে সে বনজীবনের দুঃসহ ক্লেশ বরণ করে নিয়েছে, আত্মীয়বন্ধুদের নিজ অঙ্গ-ক্ষতের ন্যায় অস্ত্রোপচারে বাদ দিতে চেয়েছে। কিন্তু রাবণের পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের অভিযানের চিত্র আঁকায় তিনি খুব উৎসাহ বোধ করেন নি। তার কারণগুলি পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। বিশেষত উনিশ-শতকের নবোদ্বুদ্ধ স্বদেশ-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে আক্রান্ত স্বদেশকে পরিহার করা বিশ্বাসঘাতী

দেশদ্রোহিতারূপেই পরিগণিত হয়েছে। মেঘনাদের সুতীব্র ভর্ৎসনায় বিভীষণ-চরিত্রের এই দিকটির কোথাও কবি কিছুমাত্র ফাঁক রাখেন নি।

মধুসূদনের বিভীষণ দেশদ্রোহীই মাত্র নয়, সে 'জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি' প্রভৃতিকে বিসর্জন মাত্র করে নি ; রাবণের কর্মফলেই লঙ্কার বিনাশ আসন্ন এই পুণ্যমাখা বাণীর অন্তরালে তার অন্তরে এক নিদারুণ লোলুপতা বাসা বেঁধে আছে। অতি হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সে রক্ষপক্ষ পরিহার করে রামচন্দ্রের আশ্রয় নিয়েছে। স্বপ্নে রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী তাকে দেখা দিয়ে বলেছে—

কিন্তু তোর পূর্ব কর্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূন্য রাজসিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ
তুই ! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে
যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার ! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ !

মনের গূঢ় কামনাই স্বপ্নে মূর্তি ধরে। বিভীষণের কামনা-কেন্দ্রের পরিচয় উদ্ধৃত স্বপ্নদর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়। এই হীন স্বার্থবোধ বিভীষণকে মনের দিক থেকে কাপুরুষতায় অবনমিত করেছিল। মেঘনাদ-বিভীষণ সংবাদে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিভীষণের চরিত্রের এ পরিচয় সরল। কিন্তু কবি মেঘনাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তার মনের একটি ছবি এঁকে কিছু জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে বিভীষণ যেমন নিজ হাতে মেঘনাদকে অস্ত্রাঘাত করেছে এ-কাব্যে সে তেমন করে নি। মেঘনাদের মৃত্যুর পরে মধুসূদন তার মুখে এই কথাগুলি বসিয়েছেন—

কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে ;—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি ভীমবাহু ;
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায় ? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?

শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ?
সুরবালা-গ্লানিরূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী ? নিকষা সতী বৃদ্ধা পিতামহী ?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলে ? উঠ, বৎস ! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ
প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার ! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে !
হে কর্ব্বূরকুলগর্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগতনয়নানন্দ ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;
গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হ্রেষিছে ভৈরবে ;
সাজে রক্ষঃঅনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম !
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !”

বিভীষণের মুখে তার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এ জাতীয় কথার সংযোজন কি পরিমাণ সঙ্গত হয়েছে সে প্রশ্ন জাগতে পারে। মনে হতে পারে কথাগুলি স্বয়ং কবির কথা, বিভীষণের জবানীতে বলা হয়েছে এই মাত্র, বিভীষণের চরিত্রের সঙ্গে এর কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ভাষা কবির হলেও কথাগুলি বিভীষণেরই, কবির নয়। বিভীষণের চরিত্রের সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি ও স্বদেশদ্রোহী হীনতার অন্তরালে একটি স্নেহস্নিগ্ধ চিত্ত কোথায় লুকিয়েছিল, আজ আকস্মিক আঘাতে মনের উপরের নিত্যকার যবনিকা উঠে গেল, বেদনার্ত একটি হৃদয় স্বার্থের আবরণ ছিন্ন করে আত্মপ্রকাশ করল। এই আত্মপ্রকাশ আকস্মিক হতে পারে, হতে পারে সাময়িক, এর পরে আবার প্রাত্যহিক স্বার্থচর্চা ও ষড়যন্ত্র চলতে পারে, তাই বলে ঐ ক্ষণিকের প্রকাশ মিথ্যা নয়। ওর সংযোগে একটা মানুষ যেন অপূর্ণতার আভাস নিয়ে আসে। স্বার্থক্লিষ্ট-দেশদ্রোহী বিভীষণ ছিল নিটোল, অভঙ্গ—এক অর্থে পূর্ণ। মেঘনাদের

মৃত্যুতে তার এই ক্রন্দন চরিত্রে অস্পষ্টতা এনেছে, তার নিটোলতা বিচলিত করেছে। কিন্তু এই ক্রন্দনের সুর তার মনুষ্যত্বকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে—তার 'পূর্ণ'তাকে ভেঙে অপূর্ণতার ইঙ্গিত দিয়েছে। এই অপূর্ণতাই মনুষ্যত্বের বীজ। কেবল ভাবকল্পনার দিক থেকে নয়, রচনাভঙ্গিতেও এই আকস্মিকতা অবিশ্বাস্য থাকে নি, মেঘনাদের মৃত্যুর তীব্র আঘাত উপযুক্ত কার্যকারণ-শৃঙ্খল রচনা করেছে এবং কাব্যের পক্ষে এই যথেষ্ট, উপন্যাসে হয়তো অধিকতর বিশ্লেষণ অপরিহার্য হত।

মধুসূদনের রামচরিত্রের সাফল্য সম্বন্ধে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে। কৃত্তিবাসের রামচরিত্রের দোহাই দিয়ে লাভ নেই, সে রামায়ণের ভাবরস সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় পদার্থ। মেঘনাদবধের উদাত্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে রামের বীর্যহীন ক্রন্দনের স্বর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পারে না। এ কাব্যের রামচরিত্রই শুধু অবিশ্বাস্য নয়, সমগ্র কাব্যরসের দিক থেকে এ চরিত্র বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। আসলে রামের প্রতি যে ঘৃণার মনোভাব নিয়ে তিনি কাব্যরচনা শুরু করেছেন তা বিশিষ্ট উদ্দেশ্যপ্রবণতাকে এত প্রাধান্য দিয়েছে যে কোনো ব্যক্তির নিজত্ব তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবার নয়। যে-কোন ধরনের রচনায়, শিল্পীর দৃষ্টির বিশিষ্টতা যেরূপই হোক না কেন, কিছু পরিমাণ নিরপেক্ষতা প্রয়োজন। তা না হলে চরিত্রগুলি স্রষ্টার মনোভাবের রঙে রঞ্জিত হয়ে যাবে। সব ব্যাপারটা প্রাণবন্ত মানুষের কাহিনী না হয়ে পুতুলনাচের কথায় পরিণত হবে।[৩৩] রামচরিত্র সৃষ্টিতে স্রষ্টার সেই ন্যূনতম নিরপেক্ষতা নেই।

রামচন্দ্র সম্পর্কে রাবণের মন্ত্রী সারণ বলেছে,

কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে।

রাবণের সঙ্গে বিদ্যা-বুদ্ধি-বাহুবলে তার সমকক্ষতার কথা স্বীকার করেছে রাবণেরই প্রধান মন্ত্রী। এই সাক্ষাৎকারে রামচরিত্রের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে বীর্যস্তম্ভিত মাহাত্ম্যের স্বর আছে। সারণের কাছে সে বলেছে—

পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি কহিনু তোমারে!

রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয় ? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে।
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর !

রামচরিত্রের অন্তরে এই যে ক্ষমাশীলতার ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি তাতে সীতার জীবনাদর্শের কিছু সালোক্য লক্ষ্য করি। অবশ্য সীতার চরিত্রের সঙ্গে এর গোড়াকার পার্থক্য আছে। সীতার করুণা যেন প্রকৃতিজাত—সহজ ও সর্বব্যাপী। রামচন্দ্রের এই করুণা বীরের সহানুভূতি স্পন্দিত চিত্তের ফল।

কিন্তু রামচন্দ্রের আচার-আচরণে অন্যত্র এই বীরের চিহ্নমাত্র নেই।

আবার প্রমীলার দূতীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রাম যা বলেছিল তার মধ্যেও বীরের প্রশান্তচিত্ত,—কিছু বিস্ময়, কিছু কৌতুক মিশ্রিত মনোভাব চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে—

শুন, সুকেশিনী,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা ; কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে !
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপনা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্বাদ করি !

মধুসূদন অন্যত্র রামের দারিদ্র্য দিয়ে তাকে ব্যঙ্গ করেছেন, এখানেও সেই প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু রামের ব্যক্তিমাহাত্ম্য, তার আশীর্বাদভঙ্গি এই দারিদ্র্যের উপরেও সাত্ত্বিক শুভ্রতা বিস্তার করেছে। এই ভাব-চেতনাকে রামচরিত্র অঙ্কনে অন্যত্র অনুসরণ করা হয় নি। উপরন্তু কয়েক পংক্তি পরেই রামচন্দ্র বিভীষণকে বলেছে, দূতীর আকৃতি দেখে ভয়ে যুদ্ধসাধ সে ত্যাগ করেছিল, কারণ ঐরূপ বাঘিনীকে ঘাঁটানো মূঢ়তা। এইভাবে কোথাও রামচরিত্রে কোন সম্ভাবনা গড়ে উঠলেও সচেতনভাবে মধুসূদন তা ভেঙে দিয়েছেন।

মধুসূদনের সচেতন কল্পনা রামের যে মূর্তি অঙ্কন করেছে তার মধ্যে দুটি লক্ষণই প্রাধান্য পেয়েছে,—একটি বীর্যহীন হৃদয়দৌর্বল্য এবং অপরটি রাজ্য-সম্পদ হারানোয় একটা হীনমন্যতা।

হৃদয়দৌর্বল্য রাবণেরও ছিল। পৌরুষের সঙ্গে এর কোন স্বাভাবিক বিরোধ নেই। রাবণের চিত্তধর্মের আধিক্য তার বীর্যের সঙ্গে সহজে সম্পর্কিত —যেন বিদীর্ণ পৌরুষের ফাটল দিয়ে স্বচ্ছ ঝরণাধারা নেমে এসেছে; রামের হৃদয়দৌর্বল্যে বদ্ধ জলাশয়ের সামান্যতা ও স্তিমিত প্রাণশক্তির পরিচয় প্রকট। হৃদয়ানুভূতি মানবের একটা মহৎ গুণ। কর্মজগতের দুর্বলতা চিত্তধর্মের প্রবলতায় গৌণ হয়ে যায়। শুধুমাত্র বীরের হৃদয়বেদনাই যে শ্লাঘ্য তা নয়। হৃদয়ের নিজের মধ্যেই এমন শক্তি আছে যা অপর কোনো বৃত্তির সমর্থননিরপেক্ষ ভাবেই মর্যাদা লাভের অধিকারী। বাংলা আগমনী বিজয়া-গানে বিগলিত-স্নেহ জননী-চিত্তের যে পরিচয় আছে তার মাহাত্ম্য অস্বীকার করবে কে?

রামচন্দ্র বীর হিসেবে আপনাকে কাব্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। কিন্তু প্রথম সর্গে পর্যুদস্ত ও যুদ্ধপ্রত্যাগত আহত ভগ্নদূতের আতঙ্কিত দৃষ্টিতে রামচন্দ্রের যে মূর্তি চিত্রিত প্রকটিত—

> অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ সরোষে
> কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
> বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
> কুমারে!

তা কাব্যমধ্যে অনুসৃত হয় নি। রাবণ যে দৃষ্টিতে তাকে দেখতে চেয়েছে—

> অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
> কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী

বধিল সম্মুখরণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?

সেই দৃষ্টিকেই কবিও বরণ করে নিয়েছেন।

রামচরিত্রের আত্মবিশ্বাসহীনতা প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে নানাস্থানে। গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ থেকে শুরু করে স্বর্গসম্পৃক্ত যে-কাউকে সে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করছে। কখনও মানবজীবনের "অজ্ঞতা"য় দুঃখ প্রকাশ করছে, কখনও বিভীষণের সাহায্যপ্রার্থনায় বলছে "নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।" "দেবকুল-আনুকূল্যে"র জন্য তার গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু তার এই দুবল পরনির্ভরতা চরম হীনতায় পৌঁছেছে দেবসহায়তায় ও দেবঅস্ত্রে সজ্জিত লক্ষ্মণ-বিভীষণের নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা করতে যাবার কালে—

নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে। দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি
... ...
কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।

এই ক্ষীণপ্রাণ দুর্বলতার সঙ্গে মিশেছে নিজের দারিদ্র্য, রাজ্যসম্পদ হারাবার জন্য হীনম্মন্যতা। বারবার সে নিজেকে "ভিখারী রাঘব" বলেছে, আক্ষেপ করেছে তার বর্তমান দারিদ্র্যের জন্য। সর্বত্যাগী বলিষ্ঠতা নয়, সব-হারানোর ক্রন্দনই ধ্বনিত হয়েছে তার কণ্ঠে। অবশ্য এ আক্ষেপ যতটা প্রত্যক্ষ ভাষায় ব্যক্ত তার চেয়ে অধিক পরোক্ষ সুরে অনুরণিত।

সব মিলে মধুসূদনের রাম মাহাত্ম্যহীন। কিন্তু বীর্য ও গৌরবের সম্ভাবনা তার চরিত্রেও ছিল। রামচন্দ্রের যে চিত্র কবি এঁকেছেন তাতে কবির বিদ্বিষ্ট মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন যতটা, ততটা স্বাধীন চরিত্রবিকাশ প্রকটিত নয়।

লক্ষ্মণের প্রতি কবির ক্রোধ কিছু অধিক হবার কথা। তাঁর প্রিয়পাত্র মেঘনাদকে সে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করেছে। কিন্তু কবির ঘৃণার ভাণ্ডার

রামচন্দ্রের প্রতি বর্ষিত হয়েই অনেকখানি শূন্য হয়ে পড়েছে। লক্ষ্মণে তাই সচেতন কালিমালেপনের পরিমাণ কম।

লক্ষ্মণ-চরিত্রে বীরত্ব ও দেবভক্তি সমন্বিত হয়েছে। দেবভক্তি ছাপিয়ে তার বীরত্ব প্রকাশ করবার প্রয়োজন যেমন হয়নি, তেমনি দেবনির্ভরতা তার সাহসিকতাকে বর্ধিতই করেছে, সঙ্কুচিত করে নি।

লক্ষ্মণের বীরত্বে স্বয়ং রাবণ যে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছে এ বিষয়ে তার চেয়ে মহত্তর প্রমাণ আর কিছু হতেই পারে না,—

বাখানি
বীরপনা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরী!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই;

পুত্রহত্যাকারী লক্ষ্মণের প্রতি শোকাতুর রাবণের এই উক্তি বীরত্বের প্রতি বীরের হৃদয়ের স্বাভাবিক অর্ঘ্য, এ যেন ব্যক্তি-স্বার্থের উর্ধ্বলোকে অবস্থিত। লক্ষ্মণ-চরিত্র নানা মহৎ বৃত্তিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে কাব্যের পঞ্চম সর্গে। একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যমুখিতা থেকে কোন শক্তি, কোন ভীতি, কোন মোহ তাকে বিচ্যুত করতে পারে নি। পথের বিপদে সে বাধা মানে নি; শ্বাপদসঙ্কুলতা, বজ্র-দাবাগ্নিকে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে সে অটল সাহসে উপেক্ষা করেছে। এমন কি চণ্ডীর উদ্যান-দ্বারে দণ্ডায়মান রুদ্রকে পর্যন্ত সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছে—

ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে!
সতত অধর্ম কর্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ, বিলম্ব না সহে!
ধর্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে,
সত্য যদি ধর্ম, তবে অবশ্য জিনিব!

মহাদেবের প্রতি এই যুদ্ধের আহ্বানে দেববিরোধিতা প্রকাশ পায় নি, ঔদ্ধত্য দেখা যায় নি। দেবভক্তি, ধর্মের প্রতি একান্ত বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যে অবিচল চিত্তই এর মধ্যে অভিব্যক্ত।

লক্ষ্মণ-চরিত্র সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা কাব্যটির বিভিন্ন সর্গের মধ্য দিয়ে লাভ করা যায়। বিশেষ করে পঞ্চম ও সপ্তম সর্গে তার চরিত্রের মাহাত্ম্য

উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদকে হত্যা করার সময়ে তার কাপুরুষতার যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তা কি পঞ্চম সর্গের স্বাভাবিক বিকাশ? আবার ষষ্ঠ সর্গের এই অমানবোচিত হীনতাই কি সঙ্গতভাবে বিবর্তিত হয়ে সপ্তম সর্গের বীরত্বে উদ্ভাসিত? পঞ্চম ও সপ্তম সর্গে লক্ষ্মণের যে সুষম চরিত্র-মূর্তি প্রকটিত ষষ্ঠ সর্গ যেন তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত।

এই প্রসঙ্গে হোমর-বর্ণিত হেক্টরের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। হেক্টরের মত মহাবীর, গ্রীক প্রধান সেনাপতিদের হৃদয়ে পর্যন্ত যে প্রবল ভীতির সঞ্চার করে, সে যখন ক্রুদ্ধ আকিলিসের সম্মুখে পড়ল,—

> "Hector looked up, saw him, and began to tremble. He no longer had the start to stand his ground. He left the gate, and ran away in terror. But the son of Peleus, counting on his speed, was after him in a flash. Light as a mountain hawk, the fastest thing on wings, when he swoops in chase of a timid dove, and shrieking close behind his quarry darts at her time and again in his eagerness to make his kill, Achiles started off in hot pursuit; and like the dove flying before her enemy. Hector fled before him under the walls of Troy, fast as his feet would go."

আপাতদৃষ্টিতে হেক্টরের পক্ষে এই ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন কিছু অসঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু আকিলিসের উপস্থিতি আকস্মিকভাবে তাকে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছিল এরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নয়। এই বিকারগ্রস্ততার কারণ সমগ্র কাব্যমধ্যেই উপ্ত আছে। লক্ষ্মণের মত বীরের ক্ষেত্রেও অনেকটা একই রূপ ব্যাপার ঘটেছিল। মেঘনাদ-লক্ষ্মণের পূর্বযুদ্ধের কোনো চিত্র এই কাব্যমধ্যে নেই। কিন্তু মেঘনাদকে হত্যা করবার জন্য সমগ্র কাব্য জুড়ে দেবে-নরে-বানরে মিলে যে ব্যাপক ও জটিল আয়োজন করেছে, তৃতীয় সর্গে মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, বারবার রামের কণ্ঠে যে আশঙ্কার সুর বেজেছে, মেঘনাদে যে নিশ্চিন্ত জয়ের আশা ধ্বনিত হয়েছে সব মিলে আতঙ্কের একটি ঘনীভূত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ্মণের যে বীরত্ব পূর্বে এবং পরে প্রকটিত তারও লক্ষ্য স্বয়ং মেঘনাদ। মেঘনাদকে যে হত্যা

করবে তাকে বীরত্বগৌরবে মণ্ডিত করতেই হবে, তার বীরত্ব পরোক্ষভাবে মেঘনাদের গৌরবেরই দ্যোতনা। পঞ্চম সর্গে কাম-প্রলোভন, ভীতিপ্রদর্শন সব কিছু উপেক্ষা করে, রুদ্রকে সংগ্রামে আহ্বান করে লক্ষ্মণ যে সাহসিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তার পেছনেও একটি উদ্দেশ্যই স্পষ্ট—তা হল মেঘনাদকে হত্যা করার যোগ্যতা অর্জন। লক্ষ্মণের মনের মধ্যে মেঘনাদ সম্বন্ধে ভীতির একটি গূঢ় বীজ পূর্ব থেকেই উপ্ত ছিল। পরিবেশের আতঙ্কের আবহাওয়া তাকে গভীর করে তুলেছে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে মেঘনাদের সম্মুখীন হয়ে লক্ষ্মণের সেই আতঙ্ক আতঙ্কবিকারে পরিণত হয়েছে। এর যে সঙ্গত কারণ ছিল, তাতেও সন্দেহ থাকে না যখন দেখি অস্ত্রহীন মেঘনাদের কোষার আঘাতেই লক্ষ্মণ গুরুতর রূপে আহত হল। লক্ষ্মণের কথা ও আচরণের মধ্যে এই আতঙ্কবিকারের চিহ্ন স্পষ্ট; তার এসব যুক্তি তাই বিকারগ্রস্তের উক্তি মাত্র—

> আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
> ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি
> অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
> তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
> তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!

লক্ষ্মণের চরিত্রের যে স্বাভাবিক পরিচয় কবি মধুসূদন আমাদের দিয়েছেন তাতে এরূপ মনোবৃত্তি তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু মেঘনাদের উপস্থিতি লক্ষ্মণের সাধারণ চরিত্রবৃত্তিগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। লক্ষ্মণ কিন্তু রাবণের ন্যায় মহাবীরের সামনেও অটল, মহাদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করতে তার দ্বিধা নেই। কিন্তু মেঘনাদ তার কাছে একটি সম্পূর্ণ পৃথক নাম—একটি পৃথক অস্তিত্ব।[৩৪]

প্রধান তিনটি নারীচরিত্রের (তার মধ্যে সীতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে) মধ্যে মন্দোদরী অন্যতম। চরিত্রটি সুচিত্রিত কিন্তু অভিনবত্বহীন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জটিলতা তার মধ্যে নেই। সহজ দু একটি লক্ষণে তাকে পরিচিত করানো যায়।

মন্দোদরী রাজেন্দ্রাণী। লঙ্কাপুরীর বিনাশে বেদনার্ত তার হৃদয়—

> এ কনকলঙ্কা মোর মজালে দুর্মতি।

তবে এ আক্ষেপ রাবণের অনুরূপ হাহাকারে পরিণত হয় নি। মন্দোদরী রাবণের ন্যায় অজ্ঞাত নিয়তির রোষপ্রবাহে লঙ্কার আসন্ন সম্পূর্ণাঙ্গ ধ্বংসের ছবি প্রত্যক্ষ করে না। লঙ্কার ধ্বংস তার হৃদয়ে বেদনার সৃষ্টি করলেও তার ব্যাপকতা অধিক নয়। রাবণের দৃষ্টিকোণের গভীরতা এবং বিস্তৃতি আয়ত্ত করার শক্তি তার নেই, চিত্রাঙ্গদার মত একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণকে বরণ করবার প্রবৃত্তি এবং মানসিকতাও তার নয়। মন্দোদরী লঙ্কেশ্বরী, কিন্তু সে শুধু লঙ্কেশ্বর রাবণের প্রধান মহিষী হিসেবেই। তার আসল গৌরব মাতৃত্বের।[৩৫] তার মাহাত্ম্য কবির বর্ণনায় চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে—

শরদিন্দু পুত্র ; বধূ শারদ-কৌমুদী
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী।

পুত্র-পুত্রবধূকে কেন্দ্র করে স্নেহপ্রীতির নিটোল কোমল রাজ্যের সে অধীশ্বরী। বিভীষণের প্রতি তার ধিক্কার পুত্রের বিপদাশঙ্কায়—

কালসর্প-সম
দয়াশূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে;
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু!

সূর্পণখার প্রতি তার বিরূপ মনোভাবের মূলেও পুত্রস্নেহই সক্রিয়—

মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে।

—মন্দোদরীর এই কোমল আশঙ্কাতুর মাতৃহৃদয়ে পরুষভাব কোথাও কিছুমাত্র নেই। এমন কি বিভীষণ ও সূর্পণখার প্রসঙ্গে যে নিন্দাবাদ সে করেছে তার ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণই নারীসুলভ। অথচ এই নারীহৃদয়ের ভীতিকম্পিত ভাবটি গাম্ভীর্যকে পরিহার করে হীনতার স্তরে অবনমিত হয় নি। স্বল্পবাক্ গাম্ভীর্য মন্দোদরীর বাৎসল্যের উপরে রাজকীয় মর্যাদা এনে দিয়েছে।

মন্দোদরীর চরিত্রাঙ্কনে কোনরূপ অভিনবত্ব সৃষ্টির চেষ্টা না করলেও মধুসূদন রচনানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে বিগলিত স্নেহধারা

চিত্রিত করতে গিয়ে ভাবপ্রবণতার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসা স্বাভাবিক সেখানে মধুসূদন বিস্ময়কর সংযম দেখিয়েছেন। মেঘনাদের মৃত্যুতে তাকে যে ভূমিকায় উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে বাক্যকে একেবারে পরিহার করেছেন কবি। দেবারাধনায়, আশঙ্কাতুর হৃদয়-উদ্ঘাটনে অথবা নির্বাক আর্তিতে মন্দোদরী মাতৃত্বের পূর্ণমূর্তি এবং তা রাজকীয় গাম্ভীর্যে তথা ক্লাসিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

মেঘনাদবধ কাব্যে কোনো নায়িকা নেই। প্রমীলা কাব্যটির মুখ্য নারীচরিত্র, নায়িকা নয়। এই চরিত্রটি অঙ্কনে মধুসূদনের শিল্পবোধ এবং নবত্বসৃষ্টি সম্মিলিত হয়েছে। পূর্ববর্তী তিলোত্তমা কাব্যে তিনি নারীর যে মূর্তি কল্পনা করেছেন তার মধ্যে বিশ্বাতীত একটা আদর্শের ব্যঞ্জনা আছে। বিশ্বাতীত সৌন্দর্য-সত্তার শাশ্বত রূপের প্রতি মধুসূদনের পরিণত কবিচিত্তের আকর্ষণ এত গভীর হবার কথা নয়। তিনি নারীর মানবীমূর্তি গড়তে চাইলেন। এই মূর্তিসৃষ্টিতে নতুন যুগের আদর্শ যে তাঁকে প্রেরণা যোগাবে এ খুবই স্বাভাবিক। একমাত্র প্রমীলা-চরিত্রেই এই নবযুগের কল্পনা প্রতিফলিত। মন্দোদরী, সীতা বা সরমা-চরিত্রে মধুসূদন এ দেশীয় চিরাচরিত নারীকল্পনাকেই অনুসরণ করেছেন।

মধুসূদন নারীর মুক্ত স্বরূপ আঁকতে চেয়েছেন। পরিবারপ্রথা ও সামাজিক বিধিনিষেধের বন্ধনের প্রতিবাদে তার ব্যক্তিত্বের রূপ তিনি উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন। এইকালে বাংলাদেশে সাধারণভাবে মানবচিত্তের ও চিন্তার মুক্তি-আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। নারীকে কেন্দ্র করেও সমাজসংস্কার ও শিক্ষামূলক নানা প্রচেষ্টা চলছিল।[৩৬] এই আন্দোলনগুলির প্রতি মধুসূদনের মনের সমর্থন ছিল। তবে একজন শিল্পী হিসেবে তিনি উপলব্ধির রাজ্যে একটা উল্লাস অনুভব করেছিলেন মাত্র, আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। এই উল্লাস প্রমীলা-চরিত্র-কল্পনার পেছনে সক্রিয় ছিল।

সহচরীসহ প্রমীলার বীরাঙ্গনামূর্তি কবি এঁকেছেন—

একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিল্য, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গমে
সাদিবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে

কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ,
পর্বত-গহ্বরে সিংহ ; বন-হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত ।

কবি তাঁর এই বীরাঙ্গনাবাহিনী দিয়ে যুদ্ধ করান নি। প্রকৃত সংগ্রামের কোনরূপ সঙ্কল্পও কবির ছিল না। রামের বাহিনীর সঙ্গে প্রকৃত যুদ্ধের কোন সঙ্গত কারণও ছিল না। কবি আসলে সঙ্গিনীগণসহ প্রমীলার যুদ্ধবেশ ও যাত্রার একটি উল্লসিত বর্ণনার সুযোগ করে নিয়েছেন এখানে। প্রাচীন কাব্যাদিতে বর্ণিত বীর রমণীদের সঙ্গে তাই প্রমীলার তুলনামাত্র হয় না।

টাসোর "জেরুসালেম ডেলিভার্ড" কাব্যে ক্লরিণ্ডার সঙ্গে প্রমীলার সাদৃশ্য অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। ক্লরিণ্ডার যুদ্ধসজ্জা—

Clorinda on the corner town alone,
In silver arms like rising cynthia shone,
Her rattling quiver at her shoulders hung,
Therein a flash of arrows feathered weel.
In her left hand her bow was bended strong,
Therein a shaft headed with mortal steel,
So fit to shoot Latona's daughter stood,
When Niobe he killed and all her brood.

আবার "ঈনিড" কাব্যে অঙ্কিত ক্যামিলার বীরাঙ্গনামূর্তি অনেকটা একই রকম—

Last marches forth for Latium's sake
Camilla fair, the Valscian maid,
A troop of horsemen in her wake,
In pomp of gleaming steel arrayed,
Stern warrior-queen ! those tender hands
Ne'er plied Minerva's ministries ;
A virgin in the fight she stands,
Or winged winds in speed outvies ;

মহাভারতের প্রমীলার কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। মধুসূদনের অবশ্যই

মনে পড়েছিল। নামটিতেই তার প্রমাণ। কাশীরামের মহাভারতে প্রমীলা আপনাদের বীরপনার পরিচয় দিয়েছে—

আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভুবনে।
মোর ভয়ে কাঁপয়ে যতেক দেবগণে॥
পার্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি।
হাতে অস্ত্র কেহ না আইসে মোর পুরী॥
যতেক অবলা দেখ বিক্রমে বিশাল।
আমার ভয়েতে কাঁপে অষ্টলোকপাল॥

এরূপ উদাহরণ আরও বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু বীরাঙ্গনা নারীর এরূপ বিদেশী রূপ, বা মহাভারতীয় প্রমীলা, ধর্মমঙ্গলের লখাই ডুম্‌নি প্রভৃতি দেশীয় আদর্শের সঙ্গে মধুসূদনের পার্থক্যটি স্পষ্ট। মধুসূদনের প্রমীলায় যুদ্ধ গৌণ। প্রকৃত যুদ্ধে প্রমীলাকে তিনি অবতীর্ণ করান নি। যুদ্ধসজ্জার উল্লাস ও বৈচিত্র্য তিনি উপভোগ করেছেন। দ্বিতীয়ত, প্রমীলার উদ্দেশ্য স্বামী-সন্দর্শন, স্বামীর শত্রুকে পর্যুদস্ত করা নয়। বিরহক্রন্দনই তার রণযাত্রার উৎস, প্রিয়-মিলনে তার যুদ্ধসজ্জা-বর্জন। মূলত প্রমীলা বীরনারী নয়, বীরত্বের রূপটি সম্পূর্ণ বহিরাগত না হলেও ভিত্তির অন্যরূপের উপরিভাগের একটি নাতিস্থূল আস্তরণ। তার চরিত্রে এর কিছু সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তার এই রূপ একান্ত অনিবার্য ছিল না।

প্রমীলার মূল পরিচয় তার প্রণয়ে। নবযুগের নারীমুক্তির এই চরিত্র-উপলব্ধিই প্রমীলা-কল্পনার উৎস। হৃদয়কে সর্বাপেক্ষা ঊর্ধ্বে আসন দেওয়া, আপন ব্যক্তিত্বের নির্দেশ সানন্দচিত্তে মেনে নেওয়াই এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ। প্রমীলায় এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রণয়বৃত্তিকে অবলম্বন করে বিকশিত। মেঘনাদের প্রতি সুগভীর ভালবাসাই তার চরিত্রের মূল বীজ। বলা যেতে পারে এই প্রেমেই তার অস্তিত্ব। প্রমীলা-মেঘনাদের এই প্রেমের অতি মধুর এবং একান্ত সংক্ষিপ্ত চিত্র আছে পঞ্চম সর্গে। তৃতীয় সর্গে মেঘনাদের বিরহে যখন আলঙ্কারিক ভাষায় প্রমীলা তার বেদনা প্রকাশ করেছে তখন অবশ্য এই প্রেমানুভূতির গভীরতা যথাযোগ্য রূপ পায় নি। তাকে কবির অনুভূতি প্রকাশের ত্রুটি বলে গ্রহণ করাই শ্রেয়। মেঘনাদ-প্রমীলার প্রেম অতি সহজ, দেহ-প্রাণ-মনের সুস্থ স্বাভাবিক মিলনানন্দ ও মিলনাকুতি। এর মধ্যে দার্শনিকতা নেই, কোনো তত্ত্বের প্রকাশ নেই, কিন্তু এর গভীরতায় সন্দেহ

প্রকাশ করা চলে না। এই সরল ও গভীর দাম্পত্য প্রণয়ের মাঝখানে কবি দু-বার বিরহের তীর নিক্ষেপ করেছেন। একবার বিচ্ছেদ সাময়িক, অন্যবার বিরহ চিরন্তন। কিন্তু প্রমীলার হৃদয়ে কবি যে ব্যক্তিগত বীর্যবত্তার বীজ উপ্ত করেছেন, তার প্রণয়ে যে চিত্তমুক্তির প্রবল শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন তা সাময়িক অথবা চিরন্তন কোন বিচ্ছেদকেই মেনে নেয় নি। বিরোধী সৈন্যবাহিনী তার মিলনপথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। এমন কি নিজের মৃত্যু দিয়ে সে মৃত্যুকে জয় করেছে। মৃত্যুর অবগুণ্ঠন থেকে প্রেমকে উদ্ধার করতে চেয়েছে। তার বীরাঙ্গনা মূর্তি এবং সহমরণযাত্রী রূপ মূলত একই চরিত্রভিত্তি থেকে জাত। হৃদয়ের বিপুল প্রবাহ, বাসনার নিঃশঙ্কগতি কোন বিরোধী শক্তির কাছেই মাথা নত করবে না, তা সে বাধা মানবিক হোক বা স্বয়ং মৃত্যুর হাত থেকেই নেমে আসুক। কিন্তু প্রীতির বন্ধন সে অস্বীকার করে না তাই মেঘনাদের সঙ্গে যজ্ঞাগারে না গিয়ে শাশুড়ীর নিকটেই অবস্থান করেছে। এই সলজ্জ অবস্থান তার চরিত্রের মাধুর্যকে বাড়িয়েছে, তার হৃদয়ের অপ্রতিরোধনীয় উদ্দেশ্যমুখিতাকে খর্ব করে নি।

বীরাঙ্গনা কাব্যেও নারীচরিত্রে এই বিশিষ্ট হৃদয়প্রাধান্যকেই মূল্য দিয়েছেন কবি। প্রমীলায় তার সূত্রপাত। সূত্রপাত বলেই প্রমীলার চারিত্রবীর্যকে রণসজ্জায় প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। এ-জাতীয় বীরসজ্জা ছাড়াই নারী-চরিত্রের হৃদয়প্রাধান্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন বীরাঙ্গনা কাব্যে।

মেঘনাদ চরিত্রটিতে স্রষ্টার ভালবাসা এবং শিল্পীর সংযমের যৌগপত্য ঘটেছে। চরিত্রটিতে জটিলতা অল্প, অপ্রত্যক্ষ রহস্যময়তা নেই বললেই চলে। দৃঢ় পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের মত মানুষটিকে ঋজু, প্রত্যক্ষ, প্রাণবন্ত ও বলিষ্ঠ বলে মনে হয়। মেঘনাদের চরিত্রটিকে ঘিরে কবির বীর্য ও কোমলতার আদর্শ যেন সহজে দানা বেঁধে উঠেছে।

মেঘনাদের চরিত্র ক্লাসিক আদর্শের বলে মোহিতলাল যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সত্য। রোমান্টিক মননাতিরেকের ফল যদি নিম্নরূপ হয়ে দাঁড়ায়—

> "তখন সমস্ত দিন এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে, আমার কেবল কতগুলা পাতা হইল কেন, পাখা হইল না কেন? প্রাণপণে সিধা হইয়া এত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তবু কেন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইতেছি না? ঐ দিগন্তের পরপারে কী আছে? ঐ

আকাশের তারাগুলি যে গাছে শাখায় ফুটিয়া আছে সে গাছ কেমন করিয়া নাগাল পাইব? আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, এ কথা যতক্ষণ না স্থির হইবে ততক্ষণ আমি পাতা ঝরাইয়া, ডাল শুকাইয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে থাকিব। আমি আছি অথবা আমি নাই, অথবা আমি আছিও বটে নাইও বটে, এ প্রশ্নের যতক্ষণ মীমাংসা না হয় ততক্ষণ আমার জীবনে কোনো সুখ নাই। দীর্ঘ বর্ষার পর যেদিন প্রাতঃকালে প্রথম সূর্য্য ওঠে সেদিন আমার মজ্জার মধ্যে যে একটি পুলক সঞ্চার হয় সেটা আমি ঠিক কেমন করিয়া প্রকাশ করিব, এবং শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি যেদিন হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস ওঠে, সেদিন ইচ্ছা করে—কী ইচ্ছা করে কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে!"[৩৭]

—রবীন্দ্রনাথ : মন। পঞ্চভূত

তবে মেঘনাদে মনের ভাগ অল্প একথা স্বীকার করে নিতে হয়।

কিন্তু মনহীন বর্বরতা মেঘনাদে নেই। রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়াড-ওডেসীর মত স্বভাবজ মহাকাব্যে যে সব চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তারা নিঃসন্দেহে ক্লাসিকতার আদর্শ। তাঁদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের চিন্তা বা অনুভূতি ভারসাম্যকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে অগ্রসর হয় নি। ক্লাসিকতার লক্ষণ যদি ভারসাম্য রক্ষা হয় তবে মেঘনাদ চরিত্রটি সম্পূর্ণই ক্লাসিক। যে ভাষায় সে প্রিয়া-সম্ভাষণ করেছে তাতে সর্বত্র এমন মাধুর্য ও সংযম প্রকাশিত যে বিস্মিত হতে হয়। যেখানে আবেগ তরঙ্গিত এবং ফেনিল হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা প্রতিপদে সেখানে বিচ্যুতিহীন যে কঠিন সংহতিবোধের পরিচয় মধুসূদন দিয়েছেন তা দীর্ঘকাল ক্লাসিক-চর্চার সুবর্ণ ফলরূপেই গ্রহণীয়। অথচ ঐ মুষ্টিমেয় শব্দ ও কচিৎ একটি দুটি উপমার ব্যবহার হৃদয়ের গভীর রসাবেশকে সম্পূর্ণভাবে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছে। পত্নীর বীরাঙ্গনাবেশ দর্শনে যে কৌতুক মেঘনাদ করেছে—

'অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ কহিলা কৌতুকে ;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে ; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!"

এই প্রণয়কৌতুকও ভাবাবেগের আতিশয্যে, রসিকতার প্রগল্‌ভ প্রাচুর্যে তরঙ্গিত হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু কবি নিজের ভাষাকে সংযমে বেঁধে মেঘনাদের চরিত্রের ভাবাবেগের গভীরতা ও সরসতার প্রাচুর্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেখিয়েও তার সামগ্রিক ভারসাম্যকে একটুও বিচলিত করেন নি। এ কাব্যের প্রধান নারীচরিত্র প্রমীলা রোমান্টিক প্রণয়াবেগের বন্ধমুক্ত উচ্ছ্বাসে স্রোতস্বিনীর গতিবিশিষ্টা। কিন্তু তার প্রণয়ী মেঘনাদের সংযত চরিত্র দেখে মনে হয়, বরফের মত স্তম্ভিত হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়ে এই নারীর বিগলিত চিত্তধারা প্রবাহিত। এদের মধ্যে বিরোধ তো নেইই—একে যেন অপরের পরিপূরক। একের তুষার অপরের ধারাস্রোতের উৎস, অপরকে জলপ্রাচুর্যে পূর্ণ করেই একের জমাট-বাঁধা বরফরাশির সার্থকতা।

এই জাতীয় চরিত্র হৃদয়াবেগকে অতিপ্রাধান্য দেয় না, চিন্তাও এদের সমগ্র জীবনকে ছাপিয়ে ওঠে না, তাকে বিচলিত করে না। এদের কামনা-বাসনা যেমন স্পষ্ট ও জীবনকে ঘিরেই আবর্তিত তেমনি এদের ব্যর্থতার বেদনারও কারণানুসন্ধান করা চলে, বেদনায় তীব্রতা থাকলেও তা অস্পষ্টতায় আকুল করে তোলে না। মেঘনাদ বীর। কিন্তু মোটামুটি নিশ্চিন্ত মানুষ। বারবার পরাজিত রামলক্ষ্মণের বেঁচে ওঠায় সে বিস্মিত হয়, রাবণের মত নিয়তির ইঙ্গিত কল্পনা করে অন্তরে অন্তরে নিঃশেষিত হয় না; নিজের বীরত্ব ও পৌরুষের প্রতি অসীম বিশ্বাস নিয়ে সে পরবর্তী সংগ্রামে শত্রুপক্ষের নিশ্চিত বিনাশের প্রতিজ্ঞা করে ;—

> "হে রক্ষঃকুল-পতি,
> শুনেছি মারিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
> রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
> কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্মূল
> করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
> করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
> নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

রাম-লক্ষ্মণের মরে পুনরায় বেঁচে ওঠার রহস্য সে বোঝে না, কিন্তু তা উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টাও তার নেই। সে পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণে তৎপর। মেঘনাদের চরিত্রে নিঃসন্দেহে ভাবনা তথা অন্তর্বেদনা অপেক্ষা কর্মের প্রাধান্য।

মহাকাব্যের ক্লাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে একটা উন্মুক্ত বর্বরতা এবং

উদারতার আশ্চর্য মিশ্রণ অনেকে লক্ষ্য করেছেন।[৩৮] মেঘনাদের চরিত্রের পশ্চাতে ক্লাসিক আদর্শ থাকলেও আদি মহাকাব্যগুলি রচিত হবার পরে বহুযুগ অতীত হয়ে গিয়েছে। ক্লাসিক আদর্শের বশীভূত হলেও সহস্র সহস্র বৎসর পূবের চরিত্রবৃত্তি তার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। মধুসূদন সমকালীন য়ুরোপীয় আদর্শ ভদ্রব্যক্তির চরিত্রের সাধারণ কতকগুলি লক্ষণের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। মধুসূদনের কল্পনার মেঘনাদে মার্জিত রুচি ভদ্রতা ও সভ্যতার পরিচয় আছে, মহাকাব্যিক বর্বরতা নেই। পরম শত্রু লক্ষ্মণের গুপ্তভাবে যজ্ঞাগারে আগমন এবং তার উদ্দেশ্য অবগত হয়েও মেঘনাদ তাই সহজেই তাকে আতিথ্যে বরণ করতে দ্বিধা করে না।

মেঘনাদের মধ্যে চিন্তাগত ট্রাজেডি নেই। প্রতি মুহূর্তে সমগ্র সত্তায় দীর্ণতার জ্বালা সে অনুভব করে না। তার জীবনে ট্রাজেডি এক ভিন্নমূর্তিতে দেখা দিয়েছে। মেঘনাদের ট্রাজেডিতে গ্রীক নিয়তিবাদের আদর্শ অনেকখানি রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয়।

অবশ্য গ্রীক নাটকগুলিতে ট্রাজেডি সংঘটনের পেছনে অন্ধ ও অকারণ দেবরোষই শুধু নেই, তাকে সামাজিক ও নৈতিক সামঞ্জস্যচ্যুতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে। গ্রীক সাহিত্য বিষয়ে পণ্ডিত এইচ. ডি. এফ. কিটোর মতে—

"The general spirit of Greek tragedy is for a very simple reason, commonly misunderstood. It is thought to represent humanity as the helpless victim of all powerful and irresponsible gods. It does nothing of the sort. The mistake comes from supposing that the gods in Greek drama are arbitrary divine persons. Nothing could be further from the truth. This had been an early conception of the gods, but it leaves no serious traces in tragedy. Rather the gods are a personification or a symbol of the fundamental laws or forces in human life which man has to respect if he would avoid catastrophe. If a man infringes a given natural or moral law—for whatever reason—a certain result will inevitably follow. The result

is 'the will of the gods'; but the dramatist is always concerned to show that the result always comes about in the natural course of events and the activity of the god are only different ways of expressing the same thing.······ The activity of the god neither starts nor controls the activities of human actors; it merely universalizes the peculiar case by showing that it is obeying a law."

গ্রীক নাটকের এই ট্রাজেডিতত্ত্ব ভারতীয় কর্মফলবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দাবি করতে পারে। কিন্তু গ্রীক দেববাদের যে বোধ থেকে গ্রীক নাটকের ট্রাজেডির এই রূপটি আগত হোমরের দেবকল্পনা তা থেকে স্বতন্ত্র বস্তু ছিল। সেখানে দেবতারা যুক্তিহীন, দায়িত্বহীন ও সর্বশক্তিমান; মানব প্রতিনিয়তই কারণে-অকারণে বা অজ্ঞাত কারণে তাদের খেয়ালের শিকারে পরিণত।

মধুসূদন মেঘনাদের মৃত্যুর যে চিত্র এঁকেছেন তার মধ্য থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা চলে। মেঘনাদের এই মৃত্যুও ট্রাজিক। যার সুখদুঃখের জ্ঞান নেই, অথবা যে সুখে বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে নিরুদ্বিগ্নমন তার ট্রাজেডি নেই। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার ট্রাজেডি নেই, ট্রাজেডি তাকে ঘিরে নবকুমারের। আলোচ্য কাব্যের মেঘনাদ সুখদুঃখের উর্ধ্বে নয়। তার চিত্তে চিন্তার জটিল জাল বিস্তৃত হয়ে আত্মাকে প্রতিনিয়ত অবক্ষয়িত করে না ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর প্রতি তার ভালবাসায় তো ফাঁক ছিল না এতটুকু, পিতামাতার স্নেহে, পত্নীর প্রেমে পূর্ণজীবন মহাধনুর্ধর এই বীরকে যেভাবে মৃত্যুবরণ করতে হল তা ট্রাজিক। মৃত্যুকালে তার বেদনাবিক্ষত যে উপলব্ধিকে কবি প্রকাশ করেছেন—

বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রা-নন্দন, তুই। শত ধিক্ তোরে!
রাবণ-নন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে? ··

তা নিঃসন্দেহে ট্রাজিক। অতঃপর তার মৃত্যুর বর্ণনায় একটা গম্ভীর গভীর দুঃখবোধ এবং জগতের কার্যকারণ সম্বন্ধে বিমূঢ় জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে—

এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ; লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল রহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্বাণ-পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

মেঘনাদের ট্রাজেডি বেঁচে থাকায় নয়, মৃত্যুতে। এ দিক থেকে রাবণের ট্রাজেডির সর্বব্যাপকতার সঙ্গে তার পার্থক্য লক্ষণীয়। দুই। মেঘনাদের ট্রাজেডির সঙ্গে ভারতীয় কর্মফলবাদ বা গ্রীক নাটকের সামাজিক ও নৈতিক সামঞ্জস্য বিধানের দৈবী দায়িত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। মেঘনাদের চরিত্রে বা কর্মে কোনো ছিদ্র তিনি রাখেন নি যার ফাঁক দিয়ে দেবরোষ বা কর্মফলের দণ্ড নেমে আসতে পারে। এই চরিত্রে তাই অন্ধ নিয়তির নিষ্ঠুর ও অকারণ লীলা প্রত্যক্ষ। হোমরের কাব্যে আকিলিসের মত মহাবীরের অকাল মৃত্যু লিখে রেখেছিল নিয়তি, অথচ তার কোনো সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তার সঙ্গে মেঘনাদের সম্পূর্ণ তুলনা চলে না, কারণ আকিলিসের মনে অকালমৃত্যুর আশঙ্কা প্রতিনিয়ত সূচের মত বিঁধেছে। মেঘনাদের মন অবিদ্ধ। এদিক থেকে হেক্টরের মৃত্যুর আকস্মিকতার সঙ্গে এই ঘটনার তুলনা চলে। ক্রূর দেবতাদের মানবেতর নিষ্ঠুরতার দিকে মেঘনাদের মৃত্যু স্পষ্ট অঙ্গুলিসঙ্কেত করে।

রাবণের ট্রাজেডিই মেঘনাদবধ কাব্যের রসাবেদনের ভিত্তি। মেঘনাদের ট্রাজেডি রাবণের ট্রাজেডিকেই পুষ্ট করেছে। রাবণের ট্রাজেডিতে এদেশীয় কর্মফলবাদ কিম্বা গ্রীক নিয়তিচেতনা কোনটির প্রভাব কতটা তা নিয়ে সমালোচকদের মনে প্রশ্ন আছে। এ বিষয়ে মেঘনাদচরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। গ্রীক নিয়তিচেতনা যে দেববাদের সঙ্গে যুক্ত হোমরের যুগে এবং গ্রীক নাটকের যুগে তার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। গ্রীক নাটকের ট্রাজেডি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মফলের ন্যায় একটি

বিশিষ্ট কার্যকারণসূত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। মধুসূদনের মনে দেশীয় কর্মফলবাদের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না একথা ঠিক, কিন্তু কোনো নিগূঢ় সংস্কার ছিল কিনা প্রশ্ন সেখানেই।

মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক রাবণের চরিত্রে মধুসূদন প্রবল বীরত্বের চিত্র এঁকেছেন। সপ্তম সর্গে তার প্রমাণ আছে। কিন্তু এই বীরত্ব আসলে যুদ্ধ-নির্ভর নয়। রাবণ যদি একবারও অস্ত্রধারণ না করত তার বীরত্বে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগত না। আসলে রাবণের বীরত্ব তার ব্যক্তিত্বের মূলধর্ম। এই ব্যক্তিগত বীর্যই মধুসূদন নবযুগের মানবমূল্যের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় রূপে গ্রহণ করেছিলেন, সাহিত্যসৃষ্টিতেই মাত্র নয়, নিজ জীবনচর্চার ভিত্তিতেও তাকেই গ্রহণ করেছিলেন। নিজের অন্তর যাকে সত্য বলে মনে করেছে তাকেই অনুসরণ করা, বিচারটা নীতির নয়, ধর্মের নয়, প্রশ্ন জয় বা পরাজয়ের নয়. বহিরাগত নির্দেশের নিকটে মাথা নত করলে ব্যক্তিত্ব যে সঙ্কুচিত হয়ে যায়—অস্তিত্ব মিথ্যা বলে মনে হয়, রাবণের বীরত্ব এই অটল প্রতিজ্ঞায়, নিজের সব কিছুর মূল্যে সেই প্রতিজ্ঞারক্ষার সঙ্কল্পে।

কিন্তু এই অন্তরসত্যকে রক্ষা করার জন্য মধুসূদনের রাবণকে সংগ্রাম করতে হয় নি। বাইরের নীতি ও ধর্মের বোধ বহিরঙ্গনেই থেকে গিয়েছে, তার অন্তরজগতে প্রবেশের পথমাত্র পায় নি। রাবণের চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু রাবণের যা কিছু ট্রাজেডি তা অন্তরানুভবেই। তার চিত্তলোকের বিদীর্ণতাই এ কাব্যের গভীর বেদনার উৎস। প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করতে গিয়ে রাবণ বলেছে—

> কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
> কি পাপে দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
> হরিলি এ ধন তুই?

তার মধ্যে পাপবোধ নেই। অন্ধ নিয়তির এই নিষ্ঠুরতার কারণ সে জানে না। তাই বিস্ময়বিমূঢ় জাগ্রত চোখে আপনার সর্বসঞ্চয়ের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে সে বেদনার্ত হয়ে ওঠে। একবার সে আক্ষেপের সুরে বলেছে—

> হায় সূর্পণখা,
> কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
> কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
> এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)

পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ?

অনেকে এখানে কৃতকর্মের জন্য রাবণের অনুশোচনা দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, রাবণ একটু পূর্বেই, তার কি পাপে এ দুরবস্থা বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। তাই মনে হয় এখানে পাপবোধ বা অনুশোচনা আদৌ প্রকটিত নয়। তার সোনার লঙ্কার এই সর্বনাশের কারণানুসন্ধান করতে গিয়ে কার্যকারণসূত্রের জট খুলে সীতাহরণে গিয়ে পৌছুতে হয়, সীতাহরণের পশ্চাতে ভগিনী সূর্পণখার অপমানে সহানুভূতির উল্লেখও সে না করে পারে না। সীতাহরণের ফলেই যে এ সংগ্রাম তা এমন কি রাবণের কাছেও দিবালোকের মত স্পষ্ট। প্রথমত, এ সীতাহরণে অনুষ্ঠিত পাপের বোধ তার নেই। দ্বিতীয়ত, ভগিনীর দুঃখে দুঃখিত হয়েই তার সীতাহরণ। ফলে সব কিছু সর্বনাশের মূল যদি কোথাও থাকে তো তারই স্নেহাধিক্যে। স্নেহাধিক্যেব জন্য অনুশোচনার অবকাশ রাবণচরিত্রে কোথায় ? তৃতীয়ত, সূর্পণখার অপমান, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে রাবণের সীতাহরণ, ফলে রামচন্দ্রাদির লঙ্কা আক্রমণ—এই পর্যন্ত কার্যকারণসূত্রটি স্পষ্ট রাবণের কাছে। কিন্তু রামের আক্রমণের সহজ ফল যে লঙ্কাব ধ্বংস রাবণ তা মনের সঙ্গে স্বীকার করতে পারে না। কারণ তার প্রশ্ন হল—

অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?—

রামচন্দ্র পত্নীকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করবেই, কিন্তু রামের মত সামান্য মানুষের শক্তির নিকটে লঙ্কার দুর্ধর্ষ বীরেরা পরাজিত হবে কেন—এখানেই রাবণের বিস্ময়। পাপবোধ থাকলে সে একটা সহজ উত্তর খুঁজে পেত ক্ষুদ্রশক্তি রামের হস্তে বিপুলশক্তি লঙ্কার বিপর্যয়ের। কিন্তু রাবণের সে বোধ নেই, তাই 'বিধি' নামক অজ্ঞাতশক্তির অন্ধ নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে তার মানস অবক্ষয় ঘটছে নিত্য। একই ধ্বংসমুখী লঙ্কার বুকে মেঘনাদ ও রাবণকে স্থাপন করেছেন কবি, কিন্তু মেঘনাদের মনোজগতের অবক্ষয় নেই, রাবণ মনের দিক থেকে নিত্য অবক্ষয়িত। কার সঙ্গে সে সংগ্রাম করবে ? অজ্ঞাত সেই শক্তি, তাকে যে দেখা যায় না, ধরা যায় না। রামের সঙ্গে সে যুদ্ধ করছে, কিন্তু

রামের তীরমুখে যে সূত্রে মৃত্যুবিষ সঞ্চারিত হচ্ছে তাকে রোধ করবে কি করে? রামের দুর্বল বাহুতে যে বল জোগায় কোথায় সে বাস করে? রাবণ যদি জানত যে সেই অজ্ঞাত শক্তির বাস তারই চরিত্রে ও কর্মে তাহলে তার মধ্যে দেখতে পেতাম অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু এখানে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, অজ্ঞাত কঠিন শক্তির তাড়নায় আসন্ন সর্বধ্বংস কল্পনায় প্রত্যক্ষ করে তীব্র আর্তনাদ আছে—

বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাটুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্মূল সমূলে
এর শরে!

রাবণের এই ট্রাজেডির আশ্রয় হল তার স্নেহ-কোমল হৃদয়। নিজের ভালবাসা দিয়ে গড়ে তোলা এই লঙ্কার ধ্বংস হচ্ছে। এ কেবল তার আত্মীয়-বিয়োগের বেদনা নয়। রাবণের লঙ্কা কেবল স্বর্ণে গঠিত নয়, গভীর ভালবাসা না থাকলে বেদনা এত গভীর হয়ে বাজত না—

কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী,
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী,
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?

রাবণের স্নেহ-দুর্বল হৃদয়ই ট্রাজেডির আবাস রচনা করেছে।

মধুসূদনের সৃষ্টিক্ষমতার গৌরব এখানে যে, কবি ভ্রূক্ষেপহীন বীরত্ব ও স্নেহদুর্বল প্রাণকে একটি ব্যক্তিত্বের সূত্রে সহজেই বদ্ধ করেছেন। রাবণের মানবমূর্তি এ কাব্যে পর্বতের ন্যায় দৃঢ়তা এবং ভাস্কর্যসুলভ সৌন্দর্যে মণ্ডিত। এদিক থেকে ক্লাসিক চরিত্রের লক্ষণ এ চরিত্রে দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু এই পর্বত আগ্নেয়গিরির সঙ্গেই উপমিত হবার যোগ্য। এ পর্বতের অন্তরে বেদনার বিগলিত অগ্নির নিত্যউৎক্ষেপ, মাঝে মাঝে উদ্গিরণে তা বাইরে বিস্তারিত। এই অন্তর্ধর্মই রাবণকে রোমান্টিক করে তুলেছে।

রাবণের চরিত্রে মূলগত কোনো পরিবর্তন দেখানো হয় নি। তবে নবম সর্গে তাকে যে অবস্থায়-দেখতে পাই, প্রথম সর্গে প্রদর্শিত মূর্তির সঙ্গে তার কিছু পার্থক্য আছে। নবম সর্গে রাবণ প্রথম সর্গের অনিবার্য পরিণতি। প্রথম সর্গে যে উচ্চকণ্ঠ হাহাকার, নবম সর্গে তা নেই। সব শেষ হয়ে গিয়েছে। রাবণ এখন আর ক্রমঅবক্ষয়িত নয়, মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অবসিত। মেঘনাদের চিতায় তার সব আশা ভস্মীভূত হয়েছে—

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্বুর-গৌরব-রবি চিররাহুগ্রাসে!

রাবণ বলেছে 'পূবজন্মফলে'—এ জন্মের কর্মের ফল ক'' সে তার সর্বনাশকে শেষ পর্যন্ত বোঝে নি। পূবজন্মফলের ধারণা মামুলি হিন্দুবিশ্বাস রূপেই এসেছে। রাবণের ট্র্যাজেডিতে—তার নিজের চেতনায় ভারতীয় বা বিদেশীয় কর্মফলবাদ তথা সামাজিক-নৈতিক সামঞ্জস্যবিধির প্রভাব নেই।

কিন্তু রাবণের স্রষ্টা মধুসূদন কর্মফলের প্রশ্নকে একেবারে অবহেলা করতে পারেন নি। রাবণের অজ্ঞাত নিয়তিচেতনার পাশেই তিনি বন্দিনী সীতার মূর্তিকে স্থাপন করেছেন। বন্দিনী সীতাই যে রাবণের নিয়তি—এ বিষয়ে রাবণ মুহূর্তের জন্যও সচেতন হয় নি, কিন্তু রাবণের স্রষ্টা এ সত্য অনেকাংশে মেনে নিয়েছেন, অস্বস্তি অনুভব করেছেন কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি।

॥ আট ॥

(মেঘনাদবধের মহাকাব্যত্ব নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকে এ কাব্যকে মহাকাব্য বলে স্বীকার করেছেন, অনেকে করেন নি। অবশ্য এ বিষয়ে বিদগ্ধ

পাঠকদের ঐকমত্য আছে যে মহাকাব্যের উদাত্ত গাম্ভীর্যের নৈকট্য যদি বাংলায় কোন কাব্য কিছুমাত্র পেয়ে থাকে তবে তা মেঘনাদবধ।

মেঘনাদবধের মহাকাব্যত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় অবতীর্ণ হবার মুখবন্ধ স্বরূপ মহাকাব্য বস্তুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। এদিক থেকে য়ুরোপীয় মহাকাব্য এবং মহাকাব্য বিষয়ক আলোচনার সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে পরিচিত মহাকাব্যগুলি কাব্যোৎকর্ষ সত্ত্বেও ঐ নামের উপযোগী নয়। কারণ মহাকাব্যের একটা ভিন্ন রসের সঙ্গেই একালের য়ুরোপ আমাদের পরিচিত করায়। কাজেই প্রথমেই সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মহাকাব্য-বিচারের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

মহাকাব্যের আদর্শ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। একালে অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাস থেকে মহাকাব্যের বিলোপ ঘটেছে। কিন্তু যতদিন মহাকাব্য একটা সাহিত্যিক রূপ হিসেবে জীবন্ত ছিল ততদিনও এর মধ্যে রূপরীতিতে একই প্যাটার্ন সর্বদা অনুসৃত হয় নি। পণ্ডিতেরা য়ুরোপীয় মহাকাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দুটি জাতের কথা বলেছেন—Authentic Epic এবং Literary Epic। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই দুই জাতের মূল পার্থক্যের একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন,—

"সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন—ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল-জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই—ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।··· আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ-মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে তেমনি ইলিয়াড ছিল। তাহা সমস্ত গ্রীসের হৃৎপদ্মসম্ভব ও হৃৎপদ্মবাসী ছিল। কবি হোমর আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করিয়াছিলেন। সেই বাক্য উৎসের মতো স্ব স্ব দেশের নিগূঢ় অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়াছে। আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিল্টনের প্যারাডাইস্ লস্টের ভাষার গাম্ভীর্য

ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাক-না কেন তথাপি তাহা দেশের ধন নহে, তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী।"

—রামায়ণ। প্রাচীন সাহিত্য।

এ দুটি বড় শ্রেণীর কথা ছেড়ে দিলেও মহাকাব্যের ভাবানুভবে ও রূপ-চেতনায় বিচিত্রতা বেশ কিছু দেখা যায়। রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শবোধ এবং সার্বভৌম কল্যাণে বিশ্বাস ইলিয়াড-ওডেসিতে নেই। ইলিয়াডের কাহিনী-রসের ঘনপিনদ্ধতা ওডেসিতে সুলভ নয়। একে মহাযুদ্ধের ঘনঘটা অপরে প্রায়-অন্তহীন সমুদ্রযাত্রা বিচিত্রতার সৃষ্টি করেছে। টাসোর কাব্যে ক্রুসেডের সঙ্গে রোমাণ্টিক কাল্পনিক কাহিনীর মাল্য গ্রথিত হয়েছে, মিল্‌টন মানুষ এবং তার স্রষ্টার সম্পর্ককে কাব্যধৃত করতে চেয়েছেন—অথচ খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস উভয়ের কাব্যরচনার অন্যতম প্রেরণাস্থল। সমালোচক ঠিকই বলেছেন,

"Valour and sagacity are recommended by example to Homer's hearers, Virgil presents an instructive embodiment of Roman virtue, Camoes gives the Portuguese a model of their own best characteristics and Milton constructs 'an imitation of an action' that demonstrates man's relation to his just creator." —[C. M. Ing.]

যুগে দেশে এবং কবিপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের ফলে মহাকাব্যের রূপে যে সব বিচিত্রতা ঘটেছে তা যেমন স্বীকার্য তেমনি এদের অভ্যন্তরীণ ঐক্যসূত্রটিও দৃষ্টি এড়াবার নয়। এই অভ্যন্তরীণ মূল আস্বাদটিই মহাকাব্যের প্রাণ। পূর্বোক্ত সমালোচকের মতে—

"Many of the devices mentioned are directed towards establishing large scale in the poem. The epic writer's intention is always to magnify his theme and his men, for in early days he was teaching his countrymen about the greatness of the ancestors whom they must emulate and in later days he was sometimes deliberately creating human symbols of valour and piety in order to induce noble aspiration and effort in his readers; for he took seriously the poet's function as prophet and teacher."

এই বক্তব্যের শেষাংশ প্রথমাংশের ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। মহাকাব্যত্ব কাহিনী এবং চরিত্রকে magnify করার মধ্যেই নিহিত, আকৃতি নয় প্রকৃতিগত বিশালতায়ই এর ভিত্তি।

(রবীন্দ্রনাথ Authentic epic-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে দেশকালের যে ব্যাপ্তিবোধের কথা বলেছেন, সমগ্র জাতির জীবনসুরের যে অনুরণনের প্রসঙ্গ তুলেছেন তা কিন্তু Literary epic-এর ক্ষেত্রেও একেবারে অপ্রযোজ্য নয়। প্রথমশ্রেণীর মহাকাব্য দানবাকৃতি বীরেদের ব্যক্তিগত কাহিনীর মধ্যেই তাকে সহজভাবে ধরে রাখে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাকাব্য ঐ একই উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বার্থকে ও সমস্যাকে সম্মুখে এনে উপস্থিত করে।

এই উদাত্ত গাম্ভীর্য ও ব্যাপ্তিরই সন্ধান করা হয় মহাকাব্যে। স্বভাবতই উপন্যাসের বাস্তবতা নয়, প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটির বিশ্লেষণ নয়, রোমান্সের বর্ণাঢ্য অতীত-পরিক্রমা নয়, সৌন্দর্যতৃষ্ণার রোমান্টিক সুদূরাভিসারও নয়, মহাকাব্য কাব্য বলেই এই গাম্ভীর্য ও ব্যাপ্তির সঙ্গে আবেগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক— তবে সে আবেগ ঘনীভূত, তরল নয়।

কি চরিত্র-চেতনায়, কি কাহিনী-বিস্তারে, কি বর্ণনা-ভঙ্গিতে এই "Sublimity"ই মহাকবির কাম্য। কবির জীবন-জিজ্ঞাসায় যুগের ব্যাপকতা এবং যুগকে ছাপিয়ে বিশ্ববোধকে বিদ্ধ করা এই "Sublime"-কেই পুষ্ট করে।[৩২]

(মধুসূদন য়ুরোপীয় কাব্যসাহিত্যের নিকটে পাঠগ্রহণ করেছিলেন, বহু মহাকাব্য পাঠে তাঁর চিত্ত প্রশস্ত হয়েছিল। মধুসূদনের মহাকাব্য রচনার প্রবৃত্তি তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের ফল; যুগের পরিবেশ বা প্রথানুগত্যের মধ্যে এর মূল খুঁজলে ব্যর্থ হতে হবে। যুগপরিবেশ তাঁকে কিছু সাহায্য করে থাকলে তা গৌণভাবেই এসেছে। রঙ্গলালের পদ্মিনী কাব্য পাঠে তৃপ্ত হয়ে উন্নততর, সুন্দরতর আখ্যানকাব্য রচনার বাসনা তাঁর হয়েছিল এমন মনে করবার কারণ নেই। হিন্দুকলেজে পাঠকালে শেক্সপীয়রের প্রভাব, বায়রনের উত্তেজনা ভেদ করে মিলটন তাঁর আত্মাকে আয়ত্ত করেছিলেন এমন প্রমাণ মেলে না। বিশপস্ কলেজে পড়ার সময়ে ক্লাসিক ভাষাগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। এর ফলে তাঁর মনের গভীরে নূতন প্রবণতার বীজ উপ্ত হয়েছিল। মাদ্রাজ-প্রবাসকালে বিদেশীভাষাশিক্ষা এ দিকে তাঁর আকর্ষণ বাড়িয়েছিল বলে মনে হয়। প্রাচীন মহাকাব্যগুলি পাঠ করতে করতে তিনি যেন অন্তরের গভীরে

নিজের সুপ্ত প্রবৃত্তিকে খুঁজে পেলেন। ক্যাপটিভ লেডি, তিলোত্তমাসম্ভবের সিঁড়ি ডিঙিয়ে মেঘনাদবধে এসে আপনার সেই প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করলেন। দ্বিতীয় মহাকাব্য রচনার আন্তরিক বাসনা তাঁর আর ছিল না। সাধারণত খুব কম কবিই দ্বিতীয় মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

মধুসূদনের জগৎদৃষ্টি মহাকবির। তাঁর কল্পনা মহাকাব্যিক। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনা মহাকাব্যিক হতে পারে, কিন্তু প্রথমোক্ত 'মহাকবি'র মধ্যে কাব্যকল্পনা বড অধিক ছিল না এবং দ্বিতীয় কবির কাব্যকল্পনা যা ছিল তাও নেহাৎ গীতিধর্মী। তাঁদের মহাকাব্যরচনা একটা কৃত্রিম অনুকরণ-বৃত্তিমাত্র। মধুসূদনের জগৎ-দৃষ্টির মূলে গীতিধর্মিতা ছিল, ব্যক্তিআত্মার প্রকাশবেদনার অনুরণন সে দৃষ্টিকে রঞ্জিত করেছিল। কিন্তু ব্যক্তিক গীতাবেদনের তরল প্রবাহে উচ্ছ্বসিত বিশ্ব তাঁকে মুগ্ধ করে নি। সমতলভূমির নদীপ্রবাহের কুলুকুলু ধ্বনি নয়, উপলব্যথিত মর্মরমুখরতাও নয়, মধুসূদনের কল্পনার গীতিধারা অভ্রভেদী-পর্বতবক্ষ-দীর্ণকারী স্রোতস্বিনীর সঙ্গেই উপমিত হবার যোগ্য। মধুসূদনের গীতিধর্মিতার সঙ্গে কাঠিন্য, বিপুলতা, গৌরবের বিরুদ্ধতা নেই, সালোক্য আছে। মহাকাব্যের যুগগত ও স্রষ্টার প্রবণতাগত বিচিত্র পার্থক্যের মধ্য থেকে যে মূলসূত্রটি অপরিহার্য বলে গ্রহণ করেছি তা হল এই Sublime-এর বোধ। আধা-ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে দেশমাহাত্ম্য বা ব্যক্তিগরিমার অভ্রভেদী মিনার গড়ে তুলতে পারে যে কবি-কল্পনা, কিছু অলৌকিকের সংযোগে, বর্ণনার গাম্ভীর্যে, ছন্দভঙ্গির ব্যাপকতায় একের কাহিনীকে বহুর বিমূঢ় জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত করতে পারে যে কবিশক্তি তাকেই মহাকাব্যিক কবিকল্পনা এবং মহাকাব্যিক সৃষ্টিক্ষমতা বলে সিদ্ধান্ত করেছি। মধুসূদনের মহাকবিসুলভ কল্পনা ছিল, জগৎদৃষ্টি ছিল। বাইরের কোনো প্রভাব অথবা বিরাট কিছু রচনা করবার বাসনামাত্র তাঁর মহাকাব্যসৃষ্টির পশ্চাতে নেই। তবে তাঁর এই দৃষ্টিটি পুষ্ট হবার পেছনে হোমর থেকে মিল্টন পর্যন্ত য়ুরোপীয় কবিদের এবং ভারতীয় বাল্মীকি-ব্যাসের অবদান সুপ্রচুর। মধুসূদনের ব্যক্তিসত্তার বিচার প্রসঙ্গে যাকে বলেছিলাম 'ক্ষত্রিয়ের ভোগবাদ' তার মধ্যেই যেন এই জীবন ও জগৎবোধ লুকিয়ে আছে। এরই অপর নাম বীর্য। বীর্যের শুল্কে জীবনকে জয় করা, অন্তত জয়ের সাধনা, নেহাৎ সে সাধনপথে জীবনত্যাগ—এই চেতনা জাগতিক হয়েও অতিজাগতিক। এই কল্পনায় বসুন্ধরার যে মূর্তি ধরা পড়ে ভীরুর দুর্বলতা তার নাগাল পায় না,

বীরের বাহুই তাকে অধিকার করে। সে বসুন্ধরা সত্যই বসুকে ধরে রেখেছে, তার ব্যাপকতা যেন তার মূল্যের সামান্য প্রতিফলন। এই বীর্য দেহের বল নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র এর প্রমাণ নয়, এ হল প্রধানত অন্তরের সামগ্রী। এর সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির কোমল পেলব উপলব্ধির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অথচ এ যেন "বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা" মালার মত। রাম-রাবণ-মেঘনাদ-বিভীষণ-প্রমীলার চরিত্রে এবং কাহিনীবিন্যাসে কবির এই কল্পনামূলকে রূপ ধারণ করতে আমরা দেখেছি।)

(মধুসূদন তাঁর কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্রের রূপাঙ্কনে যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছেন তাও অভিপ্রেত রসাস্বাদের ক্ষেত্রে সাফল্য এনেছে। রামের চরিত্র বাদ দিয়ে অন্যত্র চরিত্ররূপে মহাকাব্যিক Statuesque আকৃতি লক্ষণীয়। রাবণের অন্তরের রোমান্টিক প্রেরণা কিংবা প্রমীলার ব্যক্তিসত্তার রোমান্টিক স্ফুরণ সত্ত্বেও এই ভাস্কর্যধর্মকে তা বিনষ্ট করতে পারে নি।

এই মূল ভাববীজটিকে ধরে রাখতে হলে কাহিনীকে কিছু ব্যাপকতা দিতে হয়। এখানে মেঘনাদবধের মূল কাহিনীর মধ্যে মহাকাব্যিক সম্ভাবনা বড় অধিক ছিল না। রাবণের ব্যক্তিগত বেদনার কাহিনীকে একটা বিপুল দেশের ও বহু মানুষের সুখ দুঃখ আশা হতাশার মধ্যে বিস্তৃত করে দেবার প্রয়োজন ছিল। লঙ্কাপুরীর বহু মানুষের চিত্রটি বারংবার এনে কবি সে প্রয়োজন সিদ্ধ করেছেন। মেঘনাদের মধ্যে লঙ্কার স্বাধীনতা ও সম্মানের প্রশ্নটি ঘনীভূত রূপ ধারণ করেছিল। রাবণের ট্র্যাজেডির কারণ হিসেবে শুধু তার পুত্রদের নিধনকে গ্রহণ না করে বহু দীপালোকে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম লঙ্কাপুরীতে শ্মশানের নিস্তব্ধতাকে তুলে ধরেছেন কবি। স্বর্গ-মর্ত-নরকের যে সব কাহিনী এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিবেশকে বিস্তৃতি দান করেছে তার সর্বত্র পাঠকদের বিশ্বাস সমভাবে সজাগ নয়। উনিশ শতকের লেখক আর স্বর্গ-নরকের অলৌকিক কাহিনীতে বিশ্বাস রাখতেন না। কাজেই এর মধ্যে রক্তচাঞ্চল্যের অভাব, কিছু কৃত্রিম অনুকরণ অনুভূত হবেই। কিন্তু সব মিলে একটা প্রবল আলোড়ন পরিবেশে ঘনীভূত হয়েছে। লঙ্কার ধ্বংসের কাহিনী সমগ্র বিশ্বের উত্তেজনার ও চিন্তার, প্রস্তুতির ও নিস্তব্ধ প্রতীক্ষার বিষয় হয়ে উঠেছে।

মধুসূদন যে কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে কাল বাংলাদেশের সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নাকি সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনার উপযোগী ছিল না। বিদেশী সাহিত্যসমালোচকদের মতে—

Literary epic, if we judge by its best examples, flourishes

not in the hey-day of a nation or of a cause but in its last days or in its aftermath."

এই নীতি অনুসারে উনিশ শতকে বাংলাদেশের জীবনে যে গৌরব-ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়েছিল তাতে সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনা সম্ভবপর নয় বলে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন। কিন্তু একথা সত্য বলে মনে হয় না। উনিশ শতকের বাংলা দেশের গৌরব-ঔজ্জ্বল্যের মধ্যেও একটা বৃহৎ অভাব ও অপমান বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করেছে। দেশের পরাধীনতার লজ্জা হয়তো সবাই স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারেন নি, কিন্তু বুদ্ধিজীবী লেখককুল এ সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না আদৌ, অনেকে তো সোচ্চারই ছিলেন। বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের মহিম্ন জীবনচর্যা একালের অনেক লেখকের চিত্তেই একটা আদর্শ অতীতলোক সৃষ্টি করেছে। সেদিক থেকে অনেকেই উনিশ শতকের গৌরবকে জাতীয় জীবনের 'hey-day' বলে কল্পনা না করে 'aftermath' বলে মনে করেছেন। মধ্যযুগে সে 'aftermath' আসে নি—কারণ তখন ছিল গাঢ় নিদ্রা, এখন জাগরণের কালে উপলব্ধি ঘটেছে যে জাতির hey-day অতীতের বিস্মৃতিতে আজ লুপ্ত। কাজেই উপরি-উক্ত তত্ত্ব হিসেবেও এ-কাল মহাকাব্য রচনার অনুকূলই ছিল, প্রতিকূল নয়। মধুসূদনের অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি মোহ ছিল না। কিন্তু পরাধীনতার বেদনা তাঁর মত গর্বিত মানুষের অন্তরে যে বিঁধেছে অন্য বহু রচনার ন্যায় মেঘনাদবধেও তার সুপ্রচুর প্রমাণ আছে। পূর্বে আমরা তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছি। লঙ্কার জাতীয় বীররূপে মেঘনাদ নিশ্চিতরূপেই চিহ্নিত হয়েছে। রাবণের ব্যক্তিগত স্নেহপাত্র সমগ্র জাতির উদ্দাম আশার আশ্রয় হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে পরাধীন দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে এ কথা মেনে নেওয়া যায় কোনরূপ রূপকারোপের চেষ্টায় বিশ্বাস না করেও।

আবার অপর কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে—

"যখন সমাজ কতকগুলি মানুষের সর্বাতিশায়ী শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয় তখনই মহাকাব্যের উদ্ভব হয় এবং মহাকাব্য বিশেষ ভাবে তাঁহাদেরই কাহিনী।...তাহার মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, অর্জুন, অ্যাকিলিস, হেক্টর, য়ুলিসিস প্রভৃতি মহামানবের কথা থাকিতে হইবে এবং তাঁহাদের কার্যকলাপই মহাকাব্যের কাহিনীকে যথোপযুক্ত বিস্তৃতি ও বিশালতা দান করিতে পারিবে।...মহাকাব্য যে

সকল নায়কের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে তাঁহাদের প্রধান গুণ চরিত্রের ঔদার্য ও দীপ্তি। মহাকবি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হন না, কারণ তাহা হইলে চরিত্রের প্রশস্ততা ও শালপ্রাংশুতা নষ্ট হইয়া যাইবে।"

—সুবোধ সেনগুপ্ত।[৪০]

একালেও নেপোলিয়নের মত অতিমানবিক বীর টমাস হার্ডির মহাকাব্য রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কলম্বাসকে অবলম্বন করে রচিত মহাকাব্যের কথাও মনে করা যেতে পারে। বাংলাদেশে অবশ্য অতিমানবিক বীরদের অবির্ভাব ঘটে নি। কিন্তু মধ্যযুগের বীর্যহীন সামান্যতার পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত কর্মবীর-চিন্তাবীরদের মূর্তি বাঙালীর চোখ ঝল্সে দিয়েছিল। শ্রদ্ধায় এইসব মহাত্মাদের প্রতি জাতি চোখ মেলে তাকিয়েছিল। কিন্তু দেশটি বাংলাদেশ এবং কাল উনিশ শতক। কাজেই এঁদের গৌরব কর্মে ততটা প্রকাশ পায় নি, দম্ভে ও ব্যক্তিবীর্যে যতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হৃদয়ের ঔদার্যে ও বিশালতায় যতটা ব্যক্ত হয়েছে। মধুসূদনে উনিশ শতকের বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে এ দিক থেকেই। এই চিন্তানায়কদের পাশে আবেগ ও কল্পনার শীর্ষলোকবাসী মধুসূদনের স্থানও সুনির্দিষ্ট ছিল। রাবণে একটা বৃহৎ দেশকালের ছায়াপাত যে বিশালতার সৃষ্টি করেছে, তার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে মহাকাব্যিক সমুন্নতি দান করেছে তা মধুসূদনের ব্যক্তিচেতনার এবং তার মধ্য দিয়ে বাংলার এই হৃদয় ও চিন্তা -প্রধান বীরযুগের প্রতিফলনের ফল।

শেষপর্যন্ত এ কথাই সত্য বলে মনে হয় যে সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনার পক্ষে প্রয়োজন কবির বিশিষ্ট মহাকাব্যিক কল্পনা, একটি উদাত্ত উল্লাসবোধ, ব্যক্তির কাহিনীকে বহুর কাহিনীর বিস্তৃতিদান এবং মানুষের ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও দেশগত সমস্যার মধ্যে নিখিলের গম্ভীর সুরের ও সত্যোপলব্ধির অনুরণন। কখনও অতীত যুগের গৌরবকাহিনী কবিচিত্তে উদাত্ত উল্লাস জাগাতে পারে, কখনও বর্তমানের তটস্থ দর্শক-চিত্তও মহাকাব্যিক কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে। মধুসূদনের লঙ্কায় বাংলাদেশের উনিশ শতকের উল্লসিত জীবনবীর্য এবং পরাধীনতার গ্লানি যুগপৎ প্রতিফলিত। ফলে এই কাব্য জাতীয় জীবনের যুগবিস্তারকে অনেকখানি আয়ত্ত করেছিল। যুগপ্রতিফলনই অবশ্য মহাকাব্যত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে সে যুগের বাংলাদেশ জীবন্ত হয়ে আছে। তবে তা বড় স্তিমিত। স্তিমিত জীবনচর্চা,

নিদ্রালু প্রাত্যহিকতায় মহাকাব্যের দামামা বাজে না। উদ্দামতা চাই, তা প্রাচীন গৌরবের জন্য দীর্ঘশ্বাস নিয়েই দেখা দিক বা বর্তমান উদ্বেলতার উল্লাসেই হোক। উনিশ শতকে দুদিক থেকেই সেই দামামা বেজেছে, মধুসূদনের কাব্য তাকে সার্থকভাবেই ধরে রেখেছে।

কিন্তু মধুসূদন যুগন্ধর হয়েও যুগোত্তীর্ণ। মেঘনাদের মৃত্যুতে দেবতাদের চক্রান্ত, লক্ষ্মণের কঠিন প্রস্তুতি, বিভীষণের সহায়তা সব কিছু ছাপিয়ে একটা বিস্ময়বিমূঢ় জিজ্ঞাসায় মানবাত্মা আর্ত হয়ে ওঠে—এই মহাবীরের এই শোচনীয় মৃত্যু!—এই কি জীবনের মূল্য? রাবণের পরাজয়ে মধুসূদন ভারতীয় ন্যায়নীতির বোধকেই স্থাপিত করতে চেয়েছেন এমন একটি মতবাদ একালে কোন কোন পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আমার ভিন্নমত পূর্বেই প্রকাশ করা হয়েছে। কর্মফলের সমস্যাকে মধুসূদন সম্পূর্ণ এড়াতে না পারলেও সম্পূর্ণ গ্রহণ করতেও পারেন নি। রাবণ যে বিস্ময়বিমূঢ় নেত্রে আপন ধ্বংসের কারণ খুঁজতে চেয়েছে তা তিনি অনেকাংশে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন পাঠকসাধারণের অন্তরে। কারণ সে বিস্ময়ের ঘোর কর্মফলে বিশ্বাসের সহায়তায়ও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি কবি। রাবণ-চরিত্রকে আশ্রয় করে কবির সেই বিমূঢ় জিজ্ঞাসা বিশ্ববিধানের তল খুঁজেছে। ভারতীয় কর্মফলের উত্তর সে প্রশ্নের উপরে যবনিকা টানতে পারে নি। রাবণের মত ব্যক্তি অনুরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হল কেন? এই অতৃপ্তি বিশ্বনীতিকে বিদ্ধ করেছে। রাবণের ট্রাজেডির হাহাকার ব্যক্তিজীবন, গোষ্ঠীজীবন, দেশ ও কালকে ছাপিয়ে মহাবিশ্বে প্রসারিত।

সর্বশেষে আসে মহাকাব্যিক বাচনভঙ্গির কথা। সব দেশেই মহাকাব্য এই ছন্দোভঙ্গিকে আয়ত্ত করতে চেয়েছে যার মধ্যে তারল্যের পরিবর্তে ঘনীভূত গাম্ভীর্য অধিক পরিস্ফুট হতে পারে। মধুসূদন পয়ার ছন্দের ভারবহনক্ষম এবং তুলনামূলকভাবে গাম্ভীর্যের অধিকতর সহায়ক কাঠামোটিকে অবলম্বন করেছেন। এই কাঠামোর উপরে তিনি আপন কল্পনায় যে নব ছন্দের জন্ম দিলেন তার উদাত্ত গাম্ভীর্য, প্রবল গতি, ধ্বনিমুখরতা বাংলা কাব্যসাহিত্যে একেবারে অভিনব। অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদনের কবি-আত্মার প্রতিফলন মাত্র নয়, তাঁর

মহাকাব্যিক ভাবকল্পনার উপযুক্ত আধার। ঐ ভাবকল্পনা এবং এই আধার উভয়ের উৎসেই এক কবি-আত্মার কেন্দ্র।

মধুসূদনের বর্ণনাভঙ্গিও নিঃসন্দেহে মহাকাব্যিক। বাঙালী রসিক পাঠকের চিত্তে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব তিনি জানতেন। আপন কাব্যের রূপনির্মিতিতে বার বার উপমা-উৎপ্রেক্ষার পথ ধরে তিনি সেই দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের রাজ্যে পাঠককে নিয়ে গিয়েছেন। বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের শোককে ব্যাপকতা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের এই মহাভয়ঙ্কর সর্বনাশ স্মরণ করে পাঠকচিত্তে যে প্রসারতা আসে মহাকাব্যিক রসোদ্বোধনে তা নিশ্চিত সহায়ক। আবার অস্ত্রহীন মেঘনাদের যুদ্ধের সঙ্গে অভিমন্যুর তুলনার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—

অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহার পাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে,
যথা অভিমন্যুরথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্তরথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে।

এরূপ উদাহরণ অনেক সংগ্রহ করা যেতে পারে যেখানে কবি আপন কল্পনার ছবিটিকে ভারতীয় শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্যের চিত্রের সঙ্গে যুক্ত করে বিশালতা দান করেছেন। আবার লক্ষ্মণকে শেলাহত করে জয়োন্মত্ত রাবণের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে রণচণ্ডীর এই তুলনায় অনুরূপ ব্যঞ্জনা সৃষ্ট হয়েছে—

পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবী উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা, নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্র দেহ!

কবি কোন ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে তার গুরুত্বটিকে ধরে রাখবার জন্য মাঝে মাঝে নিসর্গবিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের খড়্গাঘাতে ভূমিতে পতিত হলে কবি বলেছেন—

থরথরি কাঁপিলা বসুধা ,
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে !

মেঘনাদের মৃত্যুকে বিশ্ববিপর্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করলেন কবি শুধু বর্ণনার কৌশলে, তার পরে তাঁর তুলির বিস্তৃতি পক্ষদ্বয় গুটিয়ে এনে রাবণ-মন্দোদরী-প্রমীলার চারপাশে কেন্দ্রীভূত করলেন, তার পরে আবার একটি উপমায় বিদ্ধ করতে চাইলেন সুদূর অতীতের গভীর দুঃখের অভিজ্ঞতাকে—

মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে !

অবশ্য ব্রজপুরের সাদৃশ্যে ঘনীভূত শোকোপলব্ধিতে কিছু তারল্যের সৃষ্টি হয়েছে একপ অভিযোগ করা যেতে পারে। কিন্তু মোট কথা হল এই যে কাব্যগত ঘটনার প্রতিক্রিয়াকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে কবি প্রত্যাশিত বিশালতা আনতে সমর্থ হয়েছেন। আবার মেঘনাদের মৃত্যুর পরে দেব-রাক্ষস-নর-বানরের যুদ্ধসজ্জায় আকুল পৃথিবীর শঙ্কিত ছবিতে একপ বিশালতারই ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে—

পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে !
পলাইছে যোগীকুল যোগযাগ ছাড়ি !
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
ভয়াকুলা , জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি।

কিংবা প্রমীলার স্ত্রী-সৈন্যদের হুঙ্কারে—

কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে

সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্বত-গহ্বরে সিংহ; বন-হস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত।

মানবরাজ্যে কিংবা অরণ্যে অথবা সমুদ্রতলে বিস্তারিত এই আলোড়ন উত্তাল নৃত্যছন্দে ধ্বনিত করে তোলে পাঠকচিত্ত।

নিসর্গজগৎ থেকে সঙ্কলিত উপমা বহুক্ষেত্রে মহাকাব্যিক উদাত্ত গাম্ভীর্য সৃষ্টিতে কবিকে সাহায্য করেছে—

প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে!

বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ চিত্ররচনায় সংহত বলিষ্ঠতা বিপুলতার ব্যঞ্জনা এনেছে। বর্ণনাভঙ্গিতে মধুসূদন মহাকাব্যের মূলরসকে সম্পূর্ণই আয়ত্তাধীন করেছেন। কাহিনী বা চরিত্রে কোথাও সামান্য ত্রুটি থাকলেও বর্ণনা তা পূরণ করেছে॥

॥ নয় ॥

মেঘনাদবধ কাব্য আধুনিক। কিন্তু এ কাব্য প্রাচীনও। শুধু অবলম্বিত বিষয়বস্তু অতীতাশ্রয়ী বলেই নয়। অতীতের রঙ-রূপ-গন্ধ গাঢ় বলেই। কবির কাছে লঙ্কা এবং রাবণ অতীতের নাম মাত্র নয়, যার মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর ভাবনা এবং কল্পনা প্রকাশ করা যায়। তারা শুধুই খোসা নয় শাঁসটি ধরে রাখার জন্য যা প্রয়োজনীয়—প্রয়োজনমাত্র; কিন্তু শেষপর্যন্ত পরিত্যাজ্য। প্রাচীন রাবণ লঙ্কা, মেঘনাদ, নবযুগের মনুষ্যচেতনা, কবির ব্যক্তিগত কামনা সব মিলে গিয়ে একটা গোটা জিনিস তৈরি হয়েছে।

মেঘনাদবধ আধুনিক, সেই আধুনিকতা আস্বাদ্য বলেই কাব্য হিসেবে সার্থক। আবার মেঘনাদবধ প্রাচীন এবং সে প্রাচীন-স্বাদু। মধুসূদনের ক্লাসিক দীক্ষার ফলে এই কাজ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সে ক্লাসিকবোধ কৃত্রিম নয় কারণ তা নবপ্রাণ-ধর্মে চঞ্চল।

রোমান্স জাতের উপন্যাস-সৃষ্টিতে বঙ্কিমও এ পথের পথিক হয়েছিলেন। ইতিহাসের যুগকে তিনি পুনর্নির্মাণ করেছেন (অনেকটা কল্পনা বলে হলেও).

যদিও সেই সব পুরাতন মানুষের ব্যক্তিত্ব আশ্চর্যভাবে একালের। বিপরীতের এই অসঙ্কোচ মিলন এদের অন্যতম রস-বৈশিষ্ট্য। মধুসূদন আরও অতীতচারী। পুরাণের কালরেখাহীন প্রান্তরে তাঁর মুক্ত পরিক্রমা। সে পরিক্রমা ছলনা নয়। তাই আধুনিক জীবনরস পান করান তিনি প্রাচীনের দেহপাত্রে। এবং দেহ ও প্রাণের মতই তারা অনন্য।

সর্বদিকের বিচারে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যকে ত্রুটিমুক্ত বলা যায় না ঠিকই, কিন্তু একখানি মহৎ-সুন্দর কাব্য হিসেবে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা চলে ॥

---

১ তিলোত্তমা বা বীরাঙ্গনা মহাকাব্য নয়। তবুও মহাকাব্যধারার মধ্যে মেঘনাদবধের সঙ্গে এদের নামোল্লেখ করা চলে। ব্রজাঙ্গনা চতুর্দশপদী থেকে এরা স্বরূপত পৃথক জাতের।

২ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩ মেঘনাদবধকে কেন্দ্র করে বাংলা সমালোচনার এক-শ বছরের বিবর্তনকাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এখানে প্রয়োজনানুরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র দেওয়া হল। এ বিষয়ে আমার সম্পাদনায় "মধুচর্চার এক শতাব্দী' নামে একটি বড় বই প্রকাশনার অপেক্ষায়।

৪ প্রচলিত গ্রন্থের সঙ্গে মধুসূদন ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন।

৫ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের Bengali Ramayanas নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যসৃষ্টি' ('সাহিত্য' গ্রন্থ) দ্রষ্টব্য।

৭ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের কৃত্তিবাস বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৮ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর 'মাইকেল মধুসূদন' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৯ "আজন্ম বিদেশী ভাবে শিক্ষিত, বিজাতীয় ধর্মে দীক্ষিত, বিদেশের ভাষায়, চিন্তায়, ভাবে, সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হইয়াও মধুসূদন স্বদেশ কখনও বিস্মৃত হন নাই। স্বদেশের ভাষায়, ভাবে তাঁহার--শুধু অনুরাগ নয় সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। সেই সহানুভূতি ও সমবেদনার সঙ্গমে দেশবাৎসল্যের স্বর্গীয় কহ্লার সহস্র দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কহ্লারের সৌন্দর্যে, সৌরভে বাঙ্গালার সাহিত্য ও সমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল। মমতা বুদ্ধির চোখের জলের বাঁধন দিয়া মাইকেল বাঙ্গালীকে "মায়াডোরে বাঁধিয়াছিলেন।" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিশ শতকের প্রারম্ভে এই জাতীয় আলোচনার মাধ্যমে বিধর্মী মধুসূদনকে জাতীয় মহাকবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যেও তিনি জাতীয় ভাব আবিষ্কার করে বলেছেন, "আদি-কবি বাল্মীকি হইতে লঙ্কর পর্যন্ত ভারতবর্ষের সকল কবিই অযোধ্যার রাজবংশের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সোনার লঙ্কা ছারখার হইল, রাবণের বংশ গেল ; এজন্য ভারতের কোন কবির চিত্ত বেদনায় চঞ্চল হয় নাই,—কেহ এক বিন্দু অশ্রুজলে সে শোচনীয় নিয়তির বিধানকে স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু মাইকেল রাবণ-পরিবারেও সমবেদনা ও সহানুভূতির অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের বীরত্বে মুগ্ধ না হয়, এমন বাঙালী কে আছে ?"

১০ এ প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য: "একটা বিষয়বস্তু, ঘটনা, বা চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া আদি, মধ্য ও অন্ত-যুক্ত কাহিনী-রচনা— আমাদের দেশে এরূপ কাব্যের রীতি নয়। সে কাব্যের কাহিনীর দুই মুখ—আদি ও অন্ত খোলাই থাকে, গল্পের ধারা যেন বহিয়াই চলে, এবং তাহা যথাস্থানে সমাপ্ত হইলেই হইল। সে সমাপ্তির জন্য পূর্বাপর সকল অংশের সমান প্রয়োজনীয়তা নাই, কাহিনীর কেন্দ্রটিকে ঘেরিয়া সকল উপাদান উপকরণকে সুপরিমিত ও সুবিন্যস্ত করার যে শিল্প-চাতুর্য, সেদিকে আমাদের কবিদের কি সংস্কৃতে কি ভাষায়- কোনও লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহাকাব্যে বিষয়ের একটা গাম্ভীর্য ও বিস্তৃতি এবং নানা রসের অবতারণা করিবার জন্য বর্ণনার বহুল বৈচিত্র্য থাকিলেই হইল, কাহিনীকে সর্বপ্রকার অবান্তর বাহুল্য বর্জিত করিয়া তাহার অবয়বগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, পাঠকের চিত্তে একটি সুস্পষ্ট রসরূপ জাগ্রত করা—আমাদের কাব্যশিল্পের আদর্শ ছিল না, তাহার কারণ, আমাদের রসবোধ অনেকখানি বস্তুনিরপেক্ষ ছিল।"- কবি শ্রীমধুসূদন।

১১ মঙ্গলকাব্যগুলি সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে অস্বীকার্য হওয়া উচিত, এমন বক্তব্য বর্তমান লেখকের নয়। তবে কাহিনীকাব্য হিসেবে এক মনসামঙ্গল ব্যতীত অন্য কাব্যগুলির একান্ত দুর্বলতা লক্ষ্য করবার মত। মনসামঙ্গল ধারায়ও কাহিনীবীজে যে নিপুণ কল্পনা আছে অনেক কবিই তার যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারেন নি এবং যুগরুচিমত সে কাহিনীর চারপাশে নানা উপকরণের সঞ্চয় তার নিজস্ব বিশুদ্ধ চেহারাটিকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান লেখকের "প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১২ E. V. Rieu.

১৩ মোহিতলাল গৌণত হলেও এই সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন 'কবি এই প্রথম কাহিনীর সুযোগে মূল পূর্ব-পর বৃত্তান্ত সংক্ষেপে পাঠকের গোচর করিয়াছেন--সীতার হরণ কাহিনী ও তাহার উদ্ধারের কাহিনী সুকৌশলে ইহার মধ্যে বলিয়া লইয়াছেন।

১৪ বর্তমান গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৫ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে মধুসূদন লিখেছেন- "**Many here look upon that book** (অর্থাৎ ৪র্থ সর্গ) **as the best among the five** (তখন পাঁচটি সর্গ নিয়ে কাব্যটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল), **though Jotindra and his school call the Book III—Promila's entry into the city—'the most magnificent.' My printer Baboo I. C. Bose (a very intelligent man and once a most warm admirer of Bharat) and his friends stick out for the I Book.**"

১৬ ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের 'আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্ত' সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য। 'রস' শব্দটিকে ব্যাপকভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে, বিশিষ্ট পারিভাষিক অর্থ সর্বত্র বজায় রাখা হয় নি।

১৭ দেবচরিত্র আলোচনাপ্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

১৮ এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে।

১৯ রবীন্দ্রনাথের 'মাভৈঃ' ('বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থ) দ্রষ্টব্য।

২০ প্রসঙ্গান্তরে এরূপ বর্ণনাভঙ্গির প্রকৃত সৌন্দর্য ও তাৎপর্য আলোচিত হবে।

২১ কবি এক পত্রে দুঃখ করেছেন, বাল্মীকি রামকে মানবসঙ্গি দেন নি। তাহলে রাম-রাবণের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তিনি একখানি ভারতীয় ইলিয়াড রচনা করতে পারতেন।

২২ জীবনে বীভৎসতা আছে, কিন্তু কাব্যে এর স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। বীভৎসতার বাস্তব ভাবকে চোলাই করে রসাস্বাদে উন্নীত করা যায় কি? বীভৎসরস বলে যা পরিবেশিত হয়ে আসছে তা কি শুধুই লৌকিক ভাব নয়?

২৩ Not far from hence the Mourning Fields are shewn, spreading on every side; such is the name by which they call them."—Virgil.

২৪ হোমরের "ওডেসি"তে কিংবা দান্তের "ডিভাইন কমেডি"তেও প্রেতপুরীতে মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে।

২৫ "সম্মুখে যাহা দেখিল তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, এতাদৃশ উত্তপ্ত যে, তাহা চক্ষে প্রবেশমাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল।" —বঙ্কিমচন্দ্র : চন্দ্রশেখর।

২৬ মধুসূদনের দেহে ইংরেজি পোশাক ও মুখে ইংরেজি বুলি দেখে তার স্বাজাত্যবোধে সন্দেহ করার কারণ নেই। কবি য়ুরোপীয় জীবনযাত্রার প্রতি যতই আকৃষ্ট হোন না কেন দেশীয় বিধিনিষেধ, আচার-আচরণের বিরুদ্ধে যত বোরই প্রকাশ করুন না কেন, মাদ্রাজ প্রবাসকালে স্বল্পত তার মনে স্বদেশ-বোধের সঞ্চার হতে থাকে। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে তা অনেকাংশে বিকশিত হয়। তার অসংখ্য চিঠিপত্র এবং জীবনের নানা টুকরো ঘটনার সাহায্যে এ কথা প্রমাণ করা যেতে পারে। অবশ্য তার স্বদেশ-চেতনা রাজনৈতিক নেতার ধ্যান-ধারণার ন্যায় স্পষ্ট, তীব্র ও কর্মপ্রেরণার উৎস ছিল না, একটা চাপা বেদনাবোধ, একটা গভীর প্রীতিরূপেই কবিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা বেড়ে উঠেছিল।

২৭ পরে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখব বাংলাদেশ প্রধানত তার প্রকৃতি ও উৎসবানন্দের মধ্য দিয়ে যতটা ধরা দিয়েছে, কবির চেতনায় তার রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যার মধ্য দিয়ে ততটা নয়।

২৮ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।

২৯ "মনে হয়, এ যেন কবির নিজেরও অজ্ঞাত কোন সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীর আকস্মিক ঝঙ্কার—ইহা যেন কোন দূর দূরান্তর হইতে তাহার কানে বাজিতেছে, ইহাকে ভুলিয়াও ভুলিতে পারা যায় না।......

নমি আমি কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্রসঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।

'তব অনুগামী দাস'—কবি ঠিকই বলিয়াছেন, সীতাচরিত-রচনায় তিনি আপন পথের পথিক নহেন; যে পথে বাল্মীকি ও বাল্মীকির অনুগামী রামায়ণ-কথা-কোবিদগণ গিয়াছেন, এখানে তিনিও সেই পথে চলিয়াছেন।"—মোহিতলাল মজুমদার: কবি শ্রীমধুসূদন।

৩০ "এক স্থলে সীতা লঘুচিত্ত, আমোদপ্রিয়, চপল বালিকার ন্যায় হরিণীদিগের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের সহিত গীতালাপ করিতেছেন এবং রসিক মধু-মক্ষিকা ও ভ্রমরকে 'নাতিনী জামাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।...অর্ধবাতুল রমণীরাই হরিণীদিগের সহিত নৃত্য করিতে পারে।"—রাজনারায়ণ বসু।

৩১ 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর নায়িকা এরা।

৩২ বৈদিক রুদ্র, পৌরাণিক মহাদেব, বাংলাদেশের শিব—মহাদেব চরিত্র-পরিকল্পনায় এদেশের দেবচেতনা এবং সাহিত্যচিন্তা বিচিত্রতার উপাসনা করেছে। মধুসূদনের কল্পনা বাংলাদেশের কৃষক-দেবতা শিবের সামীপ্য কামনা করে নি, কিন্তু পুরাণ বা ভারতীয় ক্লাসিক কবিকল্পনার সঙ্গে তার কোন বিরুদ্ধতা প্রকাশ পায় নি।

৩৩ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছিলেন, "মানুষের চরিত্রও এমন একটি সৃষ্টি যাহা জড়সৃষ্টির ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তগম্য নহে। তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলে দাঁড়ায় না। তাহা মানুষের পক্ষে পরম ঔৎসুক্যজনক, কিন্তু তাহাকে পশুশালার পশুর মতো খাঁচার মধ্যে পুরিয়া স্থির করিয়া দেখিবার সহজ উপায় নাই।'

৩৪ লক্ষ্মণের চরিত্রেও মধুসূদনের আত্মপ্রতিফলন দেখতে পেয়েছেন মোহিতলাল, বিশেষ করে লক্ষ্মণের স্বপ্নদৃষ্ট মাতৃমূর্তি প্রসঙ্গে। সমালোচকের এই আবিষ্কার স্বীকার্য।

৩৫ মোহিতলাল মন্দোদরীকে লঙ্কার অধিশ্বরী রূপেই বিশেষভাবে অঙ্কিত করতে চেয়েছেন।

৩৬ 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৩৭ রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব মধ্যে মানুষের মতো রোমান্টিক মনের অস্তিত্ব কল্পনা করে এই অনুচ্ছেদটি লিখেছেন।

৩৮ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'মহাকাব্যের লক্ষণ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩৯ আমার সম্পাদিত হেমচন্দ্রের নির্বাচিত রচনাবলী'র ভূমিকায় মহাকাব্যের লক্ষণ নিয়ে আরও কিছু কথা বলেছি।

৪ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থে মহাকাব্য বিষয়ে কিছু মূল্যবান বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে। এ বিষয়ে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের মহাকাব্য জিজ্ঞাসা'ও উল্লেখযোগ্য রচনা।

অষ্টম অধ্যায়

দুটি গীতিকবিতা | আশা-অহঙ্কার, মহাকাল

He is sometimes a warbler because he is blind.

—Encylopaedia Britannica

॥ এক ॥

মধুসূদন দুটি গীতিকবিতা লিখেছিলেন। 'আত্মবিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি'। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য ব্রহ্মসঙ্গীত লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। তার ফলে কবিতাটি রচিত। ১৮৬১ সালে ঐ পত্রিকায় কবিতাটি বেরিয়েছিল।

'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা ইংলণ্ডযাত্রা উপলক্ষে লেখা। ১৮৬২ সালের ৪ জুন রাজনারায়ণ বসুকে কবি এক চিঠি লেখেন :

> Well—I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long separation; four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame. Being a poetaster, I would not think of boating away without rhyming and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good, at least respectable.

এর পরে কবিতাটি লেখা ছিল। 'সোমপ্রকাশে' ১৬ জুন এটি মুদ্রিত হয়।

মেঘনাদবধ কাব্য শেষ হবার (১৮৬১ সালের মার্চ-এপ্রিল) পরে প্রথমটি এবং বীরাঙ্গনা-কাব্য শেষ হবার পরে দ্বিতীয়টি রচিত।

বাংলা ভাষায় এ জাতীয় কবিতা তিনি আগে লেখেন নি। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা যখন তুঙ্গে এবং খ্যাতি দেশব্যাপী তখনই এধরনের নব্যরীতির কবিতা তিনি লিখলেন। অবশ্য ইংরেজিভাষায় যথার্থ লিরিক তিনি আগে লিখেছেন—গুণের বিচারে তা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক। এবং বলার প্রয়োজন নেই ব্রজাঙ্গনার তথাকথিত লিরিকের থেকে এদের জাত আলাদা॥

॥ দুই ॥

আধুনিক কালে ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম নানা বিষয়ে স্বতন্ত্র কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। আখ্যানকাব্য থেকে এরা রূপে-স্বাদে আলাদা। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের অনুসরণে এদের অনেকে খণ্ডকাব্য বিশেষণে ভূষিত করে থাকেন। এরা পুরাতন বাংলা সাহিত্যের গেয় 'পদ' নয়। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে তুলনা করলেই এই পার্থক্য বোঝা যাবে। আবার নব্য গীতিকবিতার সঙ্গে এর আকারঘটিত সাদৃশ্য থাকলেও প্রকৃতিগত দূরত্ব কম নয়। তবুও এই 'খণ্ড' কবিতা থেকেই গীতিকবিতার জন্ম, যেমন খণ্ড কবিতার ভিত্তিতে পুরাতন 'পদ'-এর রূপ ও রীতির ঐতিহ্য, অবশ্য খণ্ড কবিতার সঙ্গে গীতিকবিতার-পার্থক্যের রেখাটি যে সর্বদা স্পষ্ট করে আঁকা যায় এমন নয়। খণ্ড কবিতায় যেখানে কবির আত্মকথন প্রধান সেখানে রচনা হয়ে ওঠে গীতিধর্মী। এই আত্মোদ্ঘাটনে কখনও ব্যক্তিগত ভাবানুভূতির স্পষ্ট তরঙ্গস্পন্দন শোনা যায়, কখনও তা অস্পষ্ট অনির্বচনীয় রহস্যঘন হয়ে ওঠে। কখনও তা স্বদেশচেতনায় উচ্চকণ্ঠ এবং উত্তেজিত, কোথাও একান্ত ব্যক্তিভাবনায় অনুচ্চার। কোথাও বস্তুর চারপাশে কল্পনার স্বল্পরেখ আলিম্পন, আবার বস্তুকে আত্মসাৎ করে সুদূরাভিসার কল্পনার কামস্বর্গে। কিন্তু যেখানে রচনা বস্তুনিষ্ঠ বা ব্যঙ্গবিদ্ধ, অথবা ব্যক্তিগত জীবনোপলব্ধির চেয়ে বস্তুমুখী জীবনচিন্তা মুখ্য তাদের গীতিকবিতার সীমায় টানা শক্ত।

ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকা এদিক দিয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। সামাজিক বিষয়, প্রাকৃতিক শোভা, রাজনৈতিক ভাবনা, ধর্মচেতনা। মানবিক অনুভূতি—কোনো বিশেষ ঘটনা বা দৃশ্য—এমনি নানা প্রসঙ্গে ছোট ছোট কবিতা লেখার সূত্রপাত ঈশ্বর গুপ্তের হাতে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র গুপ্ত-কবির শিষ্যত্ব মেনে নিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে তাঁদের বেশ কিছু কবিতা 'রূপক' শিরোনামে প্রভাকরে বেরিয়েছে। ১৮৬৫-৬৭ সালে 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকায়ও এ জাতীয় কবিতা রঙ্গলাল লিখেছেন। দীনবন্ধুর খণ্ডকবিতার সঙ্কলন 'দ্বাদশ কবিতা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭২ সালে। এগুলি সবই বস্তুমুখ্য বা চিন্তামূলক কবিতা। বিহারীলালের 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২ খ্রীঃ) অনেকটা গানের রাজ্যের। পাঠ্য কবিতায় স্থিত হল 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'প্রেমপ্রবাহিনী'। ১৮৭০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও দুতিন বছর আগে এদের কোনো কোনো অংশ সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। কিছু কিছু বর্ণনামূলক স্তবকের পাশে রোমান্টিক কল্পনার

আকাশচারিতা প্রকাশ পেল। 'সারদামঙ্গল'-এ তা অনির্বচনীয় রহস্যমণ্ডিত দিগন্তরেখার মত বিলীয়মান এক মায়াময় বিস্ময়কর রূপ নিল। 'এডুকেশন গেজেট'-এ ১৮৬৮ সালে হেমচন্দ্র কয়েকটি খণ্ড কবিতা লেখেন (বস্তুনিষ্ঠ ও বর্ণনা-মুখ্য)। তাঁর খণ্ড কবিতার সঙ্কলন প্রকাশিত হয়—দুইখণ্ড 'কবিতাবলী' (১৮৭০, ৮০ খ্রীঃ) এবং 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৫ খ্রীঃ)। শেষদিকের কিছু কবিতায় আত্মভাব-প্রধান লিরিকের লক্ষণ মিলছে। নবীনচন্দ্রের দুইখণ্ডে প্রকাশিত 'অবকাশরঞ্জিনী'তে (১৮৭১, ৭৮ খ্রীঃ) বস্তুমুখী ও আত্মমুখী দুজাতের কবিতাবই দেখা মেলে। এর প্রথম খণ্ডের কিছু কবিতা চার-পাঁচ বছর আগে 'এডুকেশন গেজেট'-এ বেরিয়েছিল।

এই বিচিত্র চেষ্টার গোড়ায় যথার্থ গীতিকবিতার (বস্তুমুখী খণ্ড কবিতার নয়) প্রথম নিদর্শন 'আত্মবিলাপ' (১৮৬১ খ্রীঃ) এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' (১৮৬২ খ্রীঃ)। এদের মধ্যে রোমান্টিক সুদূরাভিসার নেই, তবু এরা খাঁটি গীতিকবিতা—কবির আত্মোদ্‌ঘাটনে, স্বাদেশিকতা ও ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর মিশ্রণে, চিত্তদীর্ণ যন্ত্রনায়॥

॥ তিন ॥

আত্মবিলাপ কবিতার বহিরঙ্গ কতকটা খ্রীস্টীয় 'Confessions' জাতীয়—কতকটা আদি যুগের ব্রাহ্মসঙ্গীতের 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' এর আদর্শে রচিত। কিন্তু কবি কোনো ধর্মভাবনায় বা গোষ্ঠীচেতনায় আদৌ উদ্বুদ্ধ হন নি। ব্যক্তিচিত্তভেদকারী একটি বেদনার সুর সর্ববিধ নীতিবোধকে অতিক্রম করে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেম অর্থ যশ এই ত্রিবিধ কামনার বর্ণবিকীর্ণ চিত্তবিস্ফার এবং যে কোনো কামনানামক মরীচিকায় দিগ্‌ভ্রান্ত যন্ত্রণাজর্জর রোমান্টিকতা এ কবিতায় প্রাপ্ত। এবং সর্বান্তক মহাকালের উন্মুক্ত দৃষ্টিপাত আশাতাড়িত উৎফুল্ল ও আর্ত অস্তিত্বের উপরে একটা গম্ভীর গভীরতা নিয়ে এসেছে। এ কবিতা রচনাকালে মধুসূদনের জীবন আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত, কাব্যখ্যাতির শীর্ষাসন তাঁর আয়ত্ত। সেই সাফল্য থেকেও উৎসারিত হয়েছে বেদনার ও ব্যর্থতার সুর। নিঃসন্দেহে তা রোমান্টিক। তবে রোমান্টিক কল্পনার অতিরেক অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে নি। বরং কবির স্তবকসজ্জা, উপমা-অলঙ্কারের ব্যবহার সুসম, সুপরিকল্পিত। অর্থের সুস্পষ্টতা, চিত্রকল্পের সুনির্দিষ্টতা হৃদয়-ব্যাকুলতার আঘাতে বিপর্যস্ত নয়। কবিতার সবচেয়ে লক্ষণীয়

বৈশিষ্ট্য হল : এক। আশার কুহক ছলনা থেকে মুক্তিলাভ যে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় এবিষয়ে সুস্পষ্ট বোধ—

"তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ? একি দায়।"

দুই। আশার ছলনায় ভুলে যে যন্ত্রণা পাচ্ছেন কবি, তার চিত্ররূপই রচনাটির শিল্পোৎকর্ষের কারণ—

১. জ্বলন্ত-পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !

২. দংশিল কেবল ফণি !
এ বিষম বিষজ্বালা·

আসলে এ কবিতায় জ্বালার হরষই অনুভূত ॥

॥ চার ॥

"বঙ্গভূমির প্রতি" কবিতা হিসেবে বেশি শিল্পসফল। স্বদেশপ্রীতি এবং আত্মোদ্ঘাটন সহজে মিলে গেছে। বন্দেমাতরম্-এর আগেই "শ্যামা জন্মদে" বলে মাতৃভূমিকে মা বলে বরণ করেছেন কবি। এ কবিতায়ও ব্যক্তিগত আশামরীচিকার পেছনে ছুটে চলা, মৃত্যু-ভাবনা, যশে স্থায়িত্বলাভের কামনা স্পন্দিত হয়েছে। কিঞ্চিৎ অহংকৃত আত্মঘোষণা "মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে"—প্রবাসযাত্রার বিচ্ছেদ-বেদনা এবং প্রবাসে মৃত্যুতে ফুরিয়ে যাবার আশঙ্কার সুর মিশে গেছে। মা এবং মাতৃভূমি এমন কোমল মাধুর্যে নিরঙ্কুশ এক হয়ে যাওয়া সুলভ নয় অন্যত্র।

কিন্তু গীতিকবিতার এ-রাজ্যে কবির সাময়িক ভ্রমণ ॥

নবম অধ্যায়

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

উৎসের দিকে

কিন্তু যদি কোথাও কোন কবি-শিল্পীর মধ্যে ব্যক্তি ও কবি দুইই সমান বা অভিন্ন হইয়া উঠে,······ সেই কাব্য এমন একটি রসে অভিষিক্ত হইবে যাহা কাব্যরসও বটে, অথচ ব্যক্তিজীবনের বাস্তব-অনুভূতির অপূর্ব মমতা সেই রসকে তীব্র তীক্ষ্ণ করিয়া তোলে। কবি ও ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইলেও এখানে যেন এক হইয়া আছে। —মোহিতলাল। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র।

।। এক ।।

সাহিত্যের আধারগুলির মধ্যে সনেট সম্বন্ধে কঠিন নিয়মের বন্ধন এবং সে নিয়মগুলি পালনার দিকে সমালোচকদের ঝোঁক খুবই বেশি। সমালোচকেরা এই কথাটারই প্রতিষ্ঠা করতে চান যে, সনেটের আত্মা তার ঐ সংক্ষিপ্ত দেহভাণ্ডের মধ্যেই সংহত হয়ে আছে, ঐ দেহ থেকে সনেটের প্রাণকে একেবারেই পৃথক করা যায় না।

সনেটের এই বহুকথিত গঠন-শৈলীটির দিকে প্রথমে একটু লক্ষ্য করা যাক।

ইতালীয় কবি পেত্রার্কাকে সনেটের জনক বলে সাহিত্য-সমালোচকমহল স্বীকার করে থাকেন। কেননা তাঁর হাতেই সনেট আপন প্রভায় ও স্বাতন্ত্র্যে প্রথম ভাস্বর হয়ে উঠল। পেত্রার্কা প্রচলিত সনেটে—

এক। চৌদ্দটি পংক্তি থাকা আবশ্যক।

দুই। সমগ্র কবিতাটি অষ্টক এবং ষট্‌ক (অর্থাৎ প্রথমের আট পংক্তি এবং শেষের ছয় পংক্তি) এইভাবে দুটি স্তবকে বিভক্ত থাকবে।

তিন। অষ্টকের মিলগুলি হবে নিম্নরূপ: প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পংক্তিতে; এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তিতে।

চার। ষট্‌কের মিলগুলি সম্বন্ধে কবির স্বাধীনতা প্রশস্ততর। অবশ্য ষট্‌কের এই মিলগুলির অষ্টকের মিলগুলির তুলনায় বিশিষ্টতর হওয়া দরকার।

মহাকবি শেক্‌সপীয়র সনেট-রচনা করতে গিয়ে পেত্রার্কা-খ্যাত এই গঠনশৈলীতে কিছুটা লক্ষণীয় পরিবর্তনের সূচনা করলেন। শেক্‌সপীরীয় সনেট অষ্টক ও ষট্‌কে বিভক্ত নয়, তাতে থাকে পরপর চার পংক্তির তিনটি স্তবক এবং সমাপ্তিতে একজোড়া সমিল পংক্তি। অপরপক্ষে মিল্টন কিন্তু পেত্রার্কা-প্রভাবিত সনেটের অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যবর্তী ছেদটি তুলে দিয়ে ব্যবহৃত

চৌদ্দটি পংক্তিতে ধ্বনি-সঙ্গীত ও কাব্য-বস্তুর অখণ্ডত্ব বজায় রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ-চেষ্টা সম্পূর্ণ সচেতন, না পেত্রার্কা-সনেটের জীবন-ধর্ম না বোঝবার ফল, এ-বিষয়ে সমালোচকেরা ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারেন নি।

চোদ্দটি পংক্তির মাঝেও কবি-প্রাণের বিশেষ প্রবণতা আর কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ফলে নানান ধরনের পরিবর্তন তাঁরা করে এসেছেন,—আর এইটেই বোধ হয় স্বাভাবিক। এঁদের প্রত্যেকের উদ্ভাবিত আধারটি কেবল কাব্য-বস্তুর উপস্থাপনায়ই সমাপ্ত নয়, একটি বিশেষ রসাস্বাদের সত্যে বিধৃত।

পেত্রার্কা-সনেটের অষ্টক ও ষট্‌কের বিভাগ-দুটিতে কাব্য-কল্পনার ও কাব্য-সঙ্গীতের একটি নবতর ব্যঞ্জনা পরবর্তী কালের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সনেটকারদের কাব্যে দ্যোতিত হয়েছে। রসেটির মতে শ্রেষ্ঠ সনেটে অষ্টক-ষট্‌কের ভাগে কেবলমাত্র একটি সর্বজনীন ভাব ও তার বিশেষ প্রয়োগগত উদাহরণই সঙ্কলিত নয়—ভাবোচ্ছ্বাসের আবেগময় প্রবাহের সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনও অষ্টক-ষট্‌কের ছন্দোভঙ্গির মধ্যে আন্দোলিত। ওয়াট্‌স্ ডানটনের ভাষায়—

> A sonnet is a wave of melody :
> From heaving waters of the impassioned soul
> A billow of tidal music one and whole
> Flows in the 'Octave' ; then returning free
> Its ebbing surges in the 'sestet' roll
> Back to the deep's tumultuous sea.

উইলিয়ম শার্পের ভাষায় এ-বিষয়টিকে স্পষ্টতর করার চেষ্টা করা যাক—

> "When it is a love-sonnet, or the emotion is tender rather than dignified, it will correspond to the law of 'flow' and 'ebb'—i.e. of the inflowing solid wave (the octave), the pause, and then the broken resilient wash of the wave (the sestet), When on the other hand, it is intellectually or passionately forceful rather than tender or pathetic, dignified and with impressive amplitude of imagery rather than strictly beautiful, then it will correspond to the law of 'ebb' and 'flow'—i.e. of

the steady resilient wave-wash till the culminating moment when the billow has curved and is about to pour shoreward again (the octave), and of the solid inflowing wave sweeping through forward (the sestet).

—Sonnets of the 19th Century. Introduction by

William Sharp.

শেক্‌সপীরীয় সনেটের তিনটি স্তবকে ভাবকল্পনা এবং ভাষা-সঙ্গীত উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে করতে সমাপ্তির যুগ্ম-পংক্তিতে একটা আকস্মিক চমকে মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

মিলটনের সনেটে অষ্টক-ষট্‌কের ব্যবধান না থাকায় সমুদ্র-স্তনিত তরঙ্গ-ভঙ্গের কল্লোচ্ছ্বাস সেখানে অশ্রুত; কিন্তু সমগ্র সনেটটিতে ভাব-কল্পনা ও সঙ্গীতের একাগ্র পিনদ্ধতায় একটি এক-চোখ হীরকের তীব্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত।

আমাদের সনেটের ইতিহাসের স্বল্প-বিস্তারেও এমন প্রতিভার আবির্ভাব দুর্লভ হয় নি যাঁরা আপন কল্পনার বৈশিষ্ট্যে সনেটের দেহেও আনতে পারেন পরিবর্তন। আমি প্রমথ চৌধুরীর কথা বলছি। প্রমথ চৌধুরী বীরবলী ঔদ্ধত্যে কেবল যে প্রথানুগতাকে ভেঙেছেন তাই নয়, আপন কাব্য-কল্পনার বিশেষ ব্যঙ্গাত্মক বক্র-বাচনের উপযুক্ত আধারও আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর সনেটে দুটি চার-পংক্তির স্তবকের ভাব ও সঙ্গীতের ক্রমোচ্চতার পরেই একজোড়া সমিল পংক্তির চরম আকস্মিকতা—বলা যেতে পারে climax; আর তার পরে একটি বক্রদৃষ্টির তীব্র কটাক্ষের মধ্য দিয়ে চার পংক্তির anti-climax-এ সমাপ্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর 'জয়দেব' কবিতাটির কথাই ধরা যাক—

প্রথমেই প্রেম-মিলনের উপযুক্ত পরিবেশ—

ললিত লবঙ্গলতা দুলায় পবনে
বর্ণে গন্ধে মাখামাখি বসন্তে অনঙ্গে।
নূপুর-ঝঙ্কারে আর গীতের তরঙ্গে,
ইন্দ্রিয় অবশ হয় তব কুঞ্জবনে॥

পরের স্তবকে কিন্তু বর্ণ আরও গভীর, গন্ধ আরও মদির, সঙ্গীত আরও তীব্র ও উচ্ছ্বসিত—

উন্মদ মদনরাগ জাগালে যৌবনে,
রতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে।
রণক্ষত-চিহ্ন তাই অবলার অঙ্গে
পৌরুষের পরিচয় আশ্লেষে চুম্বনে।

এর পরের দুটি পংক্তিতে climax,—মানব-মিলনের শেষ কথা, জয়দেবের কাব্য-বিচারেরও—

পাণির চাতুরী হল নীবীর মোচন।
বাণীর চাতুরী কান্ত, কোমল বচন॥

আর তার পরেই anti-climax-এর চারটি পংক্তিতে আদিরসের অতিরেকের অবক্ষয়ী পটভূমি আর সর্বনাশা ফলাফলের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত—

আদিরসে দেশ ভাসে অজয়ে জোয়ার।
ডাকে কল্কি ম্লেচ্ছ আসে করে করবাল,
ধূমকেতু কেতুসম উজ্জ্বল করাল,
বঙ্গভূমি পদে দলে তুরস্ক সোয়ার।

আর্য-সনেটের আকৃতির সঙ্গে এর কতই না দূরত্ব; কিন্তু সনেটের সীমানা থেকে একে নির্বাসিত করা যায় না।

আসল কথা হল সনেট-দৃষ্টির প্রশ্ন। সনেটের কাব্যধারাটির চূড়ান্ত পর্যালোচনের আগে সনেটীয় অনুভূতির স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক।

এই সংহত কাব্যধারাটি কবি অবলম্বন করবেন—

for the concise expression of an isolated poetic thought—an intellectual or sensuous 'wave' keenly felt, emotionally or rhythmically.[২]

রসেটি সনেটকে বলেছেন—

A sonnet is a moment's monument
Memorial from the soul's eternity
To one deathless hour.

বাঙালী সমালোচক বলেছেন—

যখন কোন মুহূর্তের প্রবল ভাবের আবেশে সমাচ্ছন্ন কবি-হৃদয় সৌন্দর্যের দৈব-আবির্ভাবে জাগ্রত হইয়া ওঠে, সনেট ভাষায় ও ছন্দে সেই দুর্লভ মুহূর্তের চিত্র। ইহা হইতে বুঝা যায়, সনেটের রচনার মূলে প্রবল

ভাবের প্রণোদনা চাই। সেই ভাব যেন আবার বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত বিস্তারিত হইয়া তাহার ঘনীভূত আবেশ না হারায়। কোন কোন সনেট আবার গভীর চিন্তাশক্তি-প্রসূত—Shakespeare যাহাকে deep brain সনেট বলিয়াছেন। সুতরাং ভাব ও রসের একাগ্রতা সনেটের জীবন। তৎপক্ষে ভাষা ও ছন্দের যুগপৎ সংযম ও স্ফূর্তি আবশ্যক। বাহুল্যহীন পরিমিত কথায় ভাবকে পরিপূর্ণ, পরিণত অবয়ব দিবার জন্য, ভাষার প্রকাশশক্তির উপর জোর-জবরদস্তি হুকুম তামিল করিতে হইবে, অথচ ভাব-শিল্পের সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য-বিকাশেও দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে গীতি-কবিতার উন্মাদনা থাকিবে, অথচ মিত্রাক্ষর প্রাচুর্য-জন্য যে ঝঙ্কার-বাহুল্য ও আড়ম্বর গীতি-কবিতার গৌরব, তাহা হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। একদিকে দেখিতে হইবে, ইহা যেন চতুষ্পদী বা অষ্টপদীর ন্যায় চুটকী ভাষার বলে নিতান্ত স্বল্পায়তন হইয়া না পড়ে—অপরদিকে গীতি-কবিতার ভাব-প্রবাহের উচ্ছ্বাসে অনির্ধারিত সীমায় বিস্তারিত না হয়।

—প্রিয়নাথ সেন : সনেট-পঞ্চাশৎ

জীবনের বহুব্যাপক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যভাত করতে হলে যে কেবলমাত্র মহাকাব্যের বিরাট একটি পটভূমিকারই প্রয়োজন হবে, এরূপ মনে করবার কোন কারণ নেই, একটিমাত্র শিশিরবিন্দুর উপরে যেমন সমগ্র বিশ্বের প্রতিবিম্ব পড়তে পারে, ঠিক তেমনি একটি দৈবী-মুহূর্তের চেতনা বিশ্ব-চিন্তাকে নিখিলের অনুভূতিকে বিধৃত করবার ক্ষমতা রাখে। তাই এ-কথায় সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না যে—

> The sonnet might almost be called the alphabet of the human heart, since almost every kind of emotion has been expressed or attempted to be expressed in it.

এবং সনেট এমনই একটি কাব্যাকৃতি যেখানে কবি কীট্‌সের ভাষায় বলতে গেলে কবিকে হতে হবে "miser of sound and syllable", এর ঐ চৌদ্দটি পংক্তির স্বল্পায়তনে থাকতে পারবে না কোন slovenliness of diction, weak or intermediate terminations", "vagueness of conception" এবং "obscurity"।

বিখ্যাত সমালোচক উইলিয়ম শার্পের অনুসরণে সনেটের ভাব-বস্তুর কয়েকটি প্রাণলক্ষণ সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।—

এক। সনেট একটিমাত্র চিন্তা, একটিমাত্র ভাব, কিংবা একটিমাত্র কবি-কল্পিত ঘটনা বা বিষয়-বস্তুর পূর্ণ এবং স্বয়ংস্বতন্ত্র প্রকাশ।

দুই। সনেটের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল একটা সুউচ্চ মহিমা ও গাম্ভীর্য। এখানেই গীতি-কবিতার তরল ফেনিল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সনেটের কঠিন বন্ধনজাত সংহতির পার্থক্য।

তিন। সনেটে ভাব, চিন্তা ও অনুভূতির ঘনিষ্ঠ পারম্পর্য থাকা প্রয়োজন। শিথিলতার সামান্যতম স্থান এখানে নেই।

চার। আদ্যন্ত একটি সঙ্গীত-প্রবাহ থাকবে।

পাঁচ। আদি থেকে অন্ত অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হবে; এবং শেষ পংক্তিদ্বয়ে প্রকাশ-সৌষ্ঠবে কবি-কল্পনা সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্য-মণ্ডিত হওয়া উচিত।

সনেটের প্রাণ-ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেশী ও বিদেশী কয়েকজন খ্যাতনামা সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার দুটি অঙ্গকে সহজেই পৃথক করে নেওয়া যায়—একটি হচ্ছে মহাকাব্য, গীতি-কবিতার তুলনায় এর আস্বাদের নবীনত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দিক, আর অপরটি বিভিন্ন কবির হাতে এর রূপগত নানা বৈচিত্র্যের কথা ও তার তাৎপর্য সন্ধান। একটি কঠিন বন্ধনে ভাবাবেগের আলোড়ন-জাত সংহত কিন্তু তীব্র অনুভূতি, বিদ্যুৎ-চমকের আকস্মিকতায় মানব-জীবন ও ভাগ্যের গভীর রহস্যে অবগাহন অথবা কোন বস্তু বা দৃশ্য বা ঘটনার প্রতি বক্রকটাক্ষে মননের ক্ষণিক দীপ্তি-বিচ্ছুরণ—সনেটের আস্বাদ মোটামুটি এদের কোন একটি বা একাধিক বৈশিষ্ট্যে পুষ্ট হতে পারে। কিন্তু এই আস্বাদের সংক্ষিপ্ত সংহতিকে কবি যে অষ্টক-ষট্‌কের তরঙ্গভঙ্গেই রূপায়িত করবেন এমন নিশ্চয়তা কোথায়? শেক্‌সপীয়র কিংবা মিল্‌টন, আমাদের প্রথম চৌধুরী কিংবা অপর কোন কবির প্রদর্শিত পথ তিনি অনুসরণ করতে পারেন অথবা সৃষ্টি করতে পারেন নূতন দেহ-রূপ আপন প্রাণের বিশেষ প্রবণতায়। কিন্তু সংক্ষিপ্ততা আর সংহতিটি প্রয়োজন—বলা যেতে পারে অনিবার্য। তা না হলে গীতি-কবিতার লীলায়িত উচ্ছ্বাসে তার বিশিষ্ট আস্বাদটির হানি ঘটা সম্ভব।

প্রমথ চৌধুরী 'সনেট কেন চতুর্দশপদী' প্রবন্ধে সনেটের চৌদ্দ পংক্তি হবার কারণটি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। কোন্ বিশেষ ঐতিহ্যের স্রোতে ইতালীয় ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর একটি বিশেষ ধরনের সম্মিলনে সনেটের জন্ম তারই

একটি ছন্দ-ঘটিত ব্যাখ্যা সে-প্রবন্ধে আছে। কিন্তু আসল প্রয়োজনটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ততা ও সংহতির। তাই চতুর্দশ পদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ যে শাশ্বত এবং অবিচ্ছেদ্য এমন মনে করার কি কারণ থাকতে পারে? ষোড়শ পদে এমন কি অধিক গীতোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা আর দ্বাদশ পদেই বা 'চুটকী' হয়ে যাবার এমন কি বিপদ তার কারণ জানা যায় না। অপরপক্ষে চৌদ্দটি পংক্তি থাকলেও সনেটের কোন আস্বাদই যে পাওয়া নাও যেতে পারে চৌদ্দ পংক্তির অজস্র ব্যর্থ কবিতা তা প্রমাণ করবে।

অমরা তাই সনেট-বিচারে খুঁজব সনেটের বিশেষ আস্বাদটি; চৌদ্দ পংক্তির বিস্তৃতি তার উপকরণমাত্র আর পেত্রার্কীয় কিংবা শেক্‌সপীরীয় কিংবা অপর কোন স্তবক-সজ্জা তারই রস-বৈচিত্র্যের সহায়ক।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সনেটকার হিসেবে মধুসূদনের বিচার করা যেতে পারে।

মধুসূদনের ছন্দ এবং ভাষাগত অধিকার চতুর্দশপদীতে এসে এমন পরিণতি ও সর্বপ্রকার ভাব বহনের উপযোগী হয়ে উঠেছে, যাতে সনেটের উপযুক্ত বাহন হিসেবে কবি তাকে যদৃচ্ছ ব্যবহাব করতে পেরেছেন। যে-কোন একটি ভাব বা বক্তব্য, ক্ষুদ্র একটি দৃশ্য বা চিত্রের পারিপাট্য, অথবা হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উঠে-আসা একটি দীর্ঘশ্বাস চতুর্দশপদীর সাবলীল ছন্দ-কীর্তির মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে। তবু এ জিজ্ঞাসা পাঠকচিত্তে থেকে যাবে—সনেটের এই বিশেষ আস্বাদ আর আঙ্গিকের প্রতি কাব্য-জীবনের শেষ পর্বে মধুসূদনের আকর্ষণ এত একাগ্র হয়ে উঠল কেন? মধুসূদনের কবি-প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতাই কি এই কাব্যাকৃতিতে আপন প্রাণবন্যার উপযুক্ত আধারের সন্ধান পেল, যেমন তা একসময়ে পেয়েছিল মহাকাব্যের বিপুল বিস্তারে?

আমার মনে হয়, সনেট সম্বন্ধে মধুসূদনের মনে শেষ পর্যন্ত একটি সঙ্কোচ ছিল, আপন কবি-প্রতিভার পূর্ণ গভীর পরিচয় এই কাব্যাধারে বিধৃত করা যাবে কি না।

মধুসূদনের একটি পত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে—

> What say you; Or must I sink into a writer of occasional Lyrics and Sonnets for the rest of my days? The idea is intolerable.

চতুর্দশপদীর প্রথম সনেটটিও প্রসঙ্গত স্মরণ করা উচিত—

সেই আমি, ডুবি পূর্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা মুক্তা যৌবনে ;—
কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গাইল বাজায়ে বীণা, গাইল কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র নন্দনে ;—
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ;)—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর-জায়া-পক্ষে বীর-পতি-গ্রামে ;
সেই আমি শুন যত গৌড়-চূড়ামণি !

কোন কাব্যের প্রারম্ভে আপনার পূর্ব কীর্তির সাহায্যে আত্মপরিচয় দানের প্রয়োজন মধুসূদন আর কখনও অনুভব করেন নি। গর্বিত হৃদয় কবি আপনার প্রতিটি কাব্যকে আপন স্বতন্ত্র পরিচয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু সনেট-রচনা করতে বসে স্বভাবতই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে, একক সনেট তাঁর কবি-হৃদয়ের বিপুল ও গভীর পরিচয় বহন করতে সক্ষম হবে কি না। অতিসচেতন কবি তাঁর কাব্য-জীবনের এই সমাপ্তির কবিতাগুচ্ছে এসে আপন প্রতিভার স্বরূপ যে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। বিদ্যুৎ-চমকের মত কোন মুহূর্তের প্রত্যয়ে তিনি জীবনসত্যের সন্ধান পান না, মননের উত্তুঙ্গ শৈলশিখর থেকে এক পলক পৃথিবীর দিকে দৃকপাত করে জীবন-উপলব্ধির কোন দীপ্তিতে তিনি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন না। জীবনের বহুব্যাপক পটভূমিকার দিকে তাকিয়ে তিনি স্তম্ভিত, তার সুবিস্তৃত পশ্চাৎপটে সুউচ্চ মানববীর্যের মহিমা-কীর্তনে তিনি মুখর। মানুষের চিত্তবৃত্তিগুলিকে খুব উঁচু সুরে বেঁধে দেওয়ার দিকেই তাঁর মনোবীণার ঝোঁক। সে-রাজ্যে 'রথ-রথী-অশ্ব-গজে' মেদিনী প্রকম্পিত। শোকে ও সুখে সে রাজ্যে সমান অধীরতা। তাঁর সুবিপুল আবেগ-উচ্ছ্বাস সঙ্গীত-স্রোতে প্রবাহিত। একদিকে বিপুল, বিস্তৃত ও সংগ্রাম-মুখর, সমুচ্চ ও সমুন্নীত জীবন, অপর দিকে সঙ্গীতোচ্ছ্বাসের এক উপলব্যথিত কিন্তু অনিবার্য প্রবাহ, জীবন-দৃষ্টির এর কোনো ভঙ্গিই যে সনেটকারের

নয় তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার একদিকে গম্ভীর সমুন্নতি, অপরদিকে গীতোচ্ছ্বাস। বিপরীত দুটি ধারারও সমন্বয় শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত হতে পারে—কিন্তু সনেটের প্রাণধর্মের ঘাটে এসে এ সমন্বয়ের স্রোত কোনোকালে পৌছয় না।[৩]

তা হলে মধুসূদন এই নবতর কাব্যধারাটির দিকে আকৃষ্ট হলেন কেন? এর উত্তরে তিনটি সম্ভাব্য কারণের কথা বলা যেতে পারে,—তিনটির কোন্‌টি গুরুত্বে বেশি সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত-সিদ্ধান্ত করা চলে না। তিনটিকেই সম-মর্যাদায় স্বীকার করে নিলেই বোধ হয় মধুসূদনের কবি-প্রাণের যথার্থ অভিপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া যাবে।

প্রথম। মধুসূদনের কাব্যগঠন-ক্ষমতা আজ অস্তমিত। ১৮৫৯ সালের পূর্বে তাঁর জীবনে কাব্যরবির উদয় হয় নি, যদিও তার পূর্বাভাসে পূর্বগগন রক্তিমাভ হয়েছিল বহুদিন থেকেই। আর 'বীরাঙ্গনা'-সমাপ্তির পূর্বেই সে-সূর্য অস্তাচলে যাত্রা করেছে। বীরাঙ্গনা কাব্যের খণ্ডিত পত্রগুলিতে, সুভদ্রাহরণের পংক্তি কয়টির ইঙ্গিতে, সিংহলবিজয়ের সামান্য সূচনায় এবং আরও বহুস্থানে তার বেদনার্ত চিহ্ন বর্তমান। এখন তাই কাব্য-কলা-কৌতূহলে বিদেশী কাব্যের গঠন-ভঙ্গি-সুলভ চরম নিপুণতার আদর্শ ঘোষণা—'কোন ফরাসী সমালোচকও আমার এ কাব্যদেহের মধ্যে সামান্যতম ত্রুটির সন্ধান পা[illegible] না'—স্তব্ধ। মেঘনাদবধে আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত কাহিনীগঠনের যে দক্ষতা দেখেছি, বীরাঙ্গনায় নাট্য, গীতি আর আখ্যানের সমন্বয়ে যে সিদ্ধিলাভ ঘটেছে, আর সর্বত্র মানব-জীবনের গভীরে যে অনুপ্রবেশ অথবা আদি-অন্তে সুসঙ্গত চরিত্রসৃষ্টির যে নৈপুণ্য কবির আয়ত্ত তার সম্ভাবনা আজ সুদূরপরাহত। অথচ কবিপ্রতিভা তো নির্বাপিত হয় নি। কবি-প্রতিভা এবং কাব্যগঠন-ক্ষমতার মধ্যে কোন অচ্ছেদ্য বন্ধন নেই বলে মনে হয়। ক্ষমতা অবসিত, কিন্তু কবি হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। তাই সনেটের এই সংক্ষিপ্ত আধারটিকে তিনি গ্রহণ করেছেন। সনেটের আকৃতিগত ক্ষুদ্রতা তাঁর কাছে সহজ নৈপুণ্যহীনতার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। সনেট-আঙ্গিকের দুর্লভ সূক্ষ্মতার কোন স্পষ্ট চেতনা মধুসূদনের ছিল না বলেই মনে হয় এখানে গল্প-গ্রন্থন প্রয়োজনহীন, চরিত্রসৃষ্টির অভ্রান্ত-দৃষ্টির নেই কোনো সার্থকতা এবং দীর্ঘকালব্যাপী রচনা-নিষ্ঠ স্থৈর্যও অনাবশ্যক। কাজেই শ্রান্ত কবির কাব্য সমাপ্তির শেষ

ক্লান্ত-বাণীর উপযুক্ত আধার এই সনেট—অন্তত সনেটের যে রূপ-কল্পনা তাঁর চেতনার বস্তু।

দ্বিতীয়। মধুসূদনের প্রতিভার মধ্যে রয়েছে 'তরুণ গরুড়সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ'। আজ কাব্যগঠন-ক্ষমতার অবসানেও সে ক্ষুধার কিন্তু নিবৃত্তি হয় নি। এ ক্ষুধা গরুড়ের, অর্থাৎ এর প্রচণ্ডতা অনস্বীকার্য; কিন্তু এর তারুণ্য অর্থাৎ বালসুলভতাও অবশ্য-লক্ষণীয় সত্য। 'অলীক কুনাট্যরঙ্গে' যখন 'মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে' তখন তিনি বাংলাসাহিত্যে নূতন নাটকের উদ্বোধন করেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি তাঁর, প্রথম সার্থক প্রহসনও। নূতন যুগের প্রথম মহাকাব্য কিংবা পত্রকাব্যও তিনি লিখেছিলেন, শিশুরঞ্জন কবিতা রচনার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। যে বালসুলভ উৎসাহে বহুবিধ ভাষা-শিক্ষার উৎসবে তিনি মেতেছিলেন, সেই উৎসাহই বাংলাকাব্যে নব নব পথ-পরিক্রমায় কিংবা পথ-নির্মাণে তাঁকে উৎসাহিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচনার গৌরবও তাঁরই,—এই আশাই কি ইতালীর এই কাব্যধারাটির প্রতি কবিকে আকৃষ্ট করেছে? পেত্রার্কা—

কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।

আর আমাদের কবিও—

ভারতে ভারতীপদে উপযুক্ত গণি,
উপহার-রূপে আজি অরপি রতনে॥

তৃতীয়। সনেটের আধারে আপন 'ব্যক্তি-আমি'র প্রকাশের সুযোগ মধুসূদন লক্ষ্য করেছিলেন। য়ুরোপীয় গীতি-কবিতায়ও কবির ব্যক্তি-আমির প্রকাশ তিনি অবশ্য দেখেছেন। কিন্তু 'গীতি-কবিতা'র যে-বিশেষ একটি রূপ আমাদের বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলীতে প্রকাশিত, মধুসূদন নিজেও যার অনুসরণ করেছেন ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে—তাতে গীতোচ্ছ্বাস আছে, আছে আবেগের প্রাবল্য—কিন্তু কবির 'আমি'র সাক্ষাৎ দুর্লভ। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' রচিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এই আমির প্রতিষ্ঠা বাংলা কাব্যে হয় নি।[৪] অথচ মধুসূদনের কবি-প্রাণ আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুল; রাবণের সঙ্গে Self-identification-এর বাঁকা পথে নয় আর, সহজ

সরল প্রত্যক্ষভাবে, স্পষ্টভাষায়। তাঁর কাব্য-জীবনের সমাপ্তি যে ঘনিয়ে আসছে তার সাড়া তিনি অন্তরে নিশ্চিতই অনুভব করেছিলেন। তাই আপনাকে পরিপূর্ণভাবে কাব্যে স্থাপিত করে দূরে দাঁড়িয়ে তারই রূপদর্শনের এই শেষ সুযোগ কবি ছাড়লেন না।

মধুসূদনের প্রতিভা সনেট-অনুগ না হলেও নানা কারণে সনেট তিনি লিখেছেন, অনেক সনেট। বিশুদ্ধ কাব্য-প্রেরণার চাইতে অপর উৎসাহে এই নবতর কাব্যাধারের দিকে তাঁর প্রবণতা—এ-কথা সাধারণভাবে সত্য হলেও, এ-কথাও অসত্য নয় যে কবি-প্রাণের অনেক বেদনা ও কামনা রক্ত ও অশ্রুর ভাষায় এখানে স্তম্ভিত হয়ে আছে।

মধুসূদনের অধিকাংশ সনেটই মোটা তুলিতে আঁকা।[৫] চিত্রগুলি প্রায়ই একটি দৃশ্যকে মুহূর্তের সীমায় ধরে রাখার চেষ্টা। কিন্তু এর বহু চিত্রই আবার মুহূর্তের বন্ধনে বাঁধা যায় না,—তার প্রাণের গতি এতই বিস্তৃত, সঙ্গীত এতই বিচিত্র। 'মহাভারত', 'রামায়ণ', 'সীতা', 'হিড়িম্বা', 'সুভদ্রা', 'গদাযুদ্ধ', এমনি আরও অনেক কবিতায় সংক্ষিপ্ততাই আছে, কিন্তু সনেটসুলভ বিশেষ জীবন-দৃষ্টি, বিশেষ রসাস্বাদটি অনুপস্থিত। সাধাবণভাবে বলা যেতে পারে সনেটের ক্ষুদ্র আধারে মধুসূদনের স্তিমিত কবি-কল্পনাও আপনাকে ধরে রাখতে পারে নি। সত্যই—

> মধুকবির অনেক ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে নানাস্থানে একটা ব্যাহত শক্তি এবং পদগতির একটা অসচ্ছন্দতা পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করিতে পারিবেন।
>
> —শশাঙ্কমোহন সেন

তাই অনেকগুলো সনেটেই চৌদ্দ লাইনের বেড়া ডিঙিয়ে আরও চৌদ্দ লাইনে সেই ভাব-বীজটি আপনাকে প্রকাশ করেছে, একটির স্থানে দুটি সনেটে—'সীতা-বনবাসে', 'হিড়িম্বা', 'মেঘদূত', 'উপক্রম' প্রভৃতি কবিতাগুলি বিস্তৃত।

অষ্টক-ষট্‌কের স্তবকসজ্জা কয়েকটি সনেটে দেখা যায়। প্রসঙ্গত 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' কবিতাটির কথা মনে পড়ে—

> মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
> পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
> অন্নদা! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,

অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী ; ধনস্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেকদিন, জননীর বরে।

অন্নদার ঝাঁপির এই স্বর্ণময় সৌভাগ্য-প্রসূ কল্পনা কবির কাব্য-ধমনীতে যেন একটা চঞ্চল রক্তস্রোত প্রবাহিত করেছে,—চিত্রে-বর্ণে-বর্ণনায় এবং সঙ্গীতে এই আনন্দোচ্ছলতা প্রাণবন্ত। কিন্তু তার পরে—

কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল ;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ?
তব-বংশ-যশঃ-ঝাঁপি অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃত চন্দ্রের মণ্ডলে ॥

দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায় ঐশ্বর্যোজ্জ্বল সে কল্পনার ছবি। হতাশার একটি দীর্ঘশ্বাস যেন উদাস হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় প্রথম দুটি পংক্তিকে ঘিরে। আবার পরের চারটি পংক্তিতে নিজেই একটি সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেন অস্পষ্ট কণ্ঠে,—ধনে নয়, কাব্যেই হবে অমরতা। চঞ্চলা লক্ষ্মী, কিন্তু কাব্য-লক্ষ্মী যে সরস্বতী তিনি চির-অচঞ্চল। অষ্টকে আশা-আনন্দ-ঐশ্বর্য আর ষট্‌কে হতাশা-সান্ত্বনা-দীর্ঘশ্বাস একটি তরঙ্গভঙ্গে স্পন্দিত হয় আমাদের চেতনায়।

'তারা' কবিতায়ও ভাব কল্পনার বৈপরীত্যটি অষ্টক-ষট্‌কে বিভক্ত হয়ে কবি-মনের দ্বিধা-দীর্ণ বেদনার আভাসই বহন করছে—

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ওই গিরিশিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হাসিনি ?
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতী, থাকিতে যামিনী।
বহে কল কল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইসে, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ-মন্দিরে ?

আকাশে শুকতারার নীরব ঔজ্জ্বল্যে কবি-কামনার দীপ্তি রূপায়িত, আবার হতাশার আঁধারে স্মিত সান্ত্বনার বাণী—

কিম্বা, দেহ-কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
ভালবাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয়-আঁধার তার খেদাইতে দূরে ?
সত্য যদি নিত্য তবে শোভ নভস্তলে,
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য নিত্য উরে ॥

'সাংসারিক জ্ঞান', 'অর্থ' প্রভৃতি কতকগুলি কবিতায় ভাব-স্পন্দন-জাত এমনি একটি দ্বৈধ সনেটের আঙ্গিককে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যদিও সর্বদা আট-ছয়ের নিয়ম পালিত হয় নি।

কয়েকটি সনেটে অষ্টক-ষট্‌কে ছেদটি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ভাব-কল্পনা বা রূপ-সঙ্গীতগত বিশেষ কোন স্পন্দনজাত পার্থক্য সেখানে অনুভূত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ 'বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে', 'হিডিম্বা' (৬৩ নং), 'যশঃ', ৫৮ নং, 'সুভদ্রা' এবং আরও অনেক কবিতার নাম করা চলে। তবে বহু কবিতায় এই ছেদটিও যে রক্ষিত হয় নি—মধুসূদনের সনেট সম্বন্ধে এ-তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই অষ্টম পংক্তির ভাব-রসের প্রবাহ নবম কিংবা আরও পরে দশম-একাদশ পংক্তির কোন একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হচ্ছে। আবার বহুস্থানে ছেদহীন একটি রসস্রোতই আদ্যন্ত প্রসারিত। 'নূতন বৎসর' কবিতায় অষ্টম পংক্তির পরে একটি শ্বাস-বিরতি থাকলেও, এ ছেদ কবির অন্তরলোক পর্যন্ত অনুস্যূত নয়। একটিই ভাব-বীজ নীবন্ধ হতাশার পরিবেশকে মরুভূমির সর্বরিক্ততায় প্রথম থেকে চতুর্দশ পংক্তি পর্যন্ত ব্যাপ্ত করেছে আপনাকে—

ভূতরূপ সিন্ধুজলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমন।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশালতা শুকায়ে মরিল,
হায় রে কব তা কারে, কব তা কেমনে !

কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ুরূপ স্বরে ;
নাহি যার কেশপাশে তারা-রূপ মণি ;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

'নন্দন কানন', 'কল্পনা' এবং আরও অনেক কবিতায় ভাব-কল্পনা ও সঙ্গীত এমনি অদ্বৈত, সম্পূর্ণতার নিটোল ঐক্যে বিধৃত। এই আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যের উপরে মিল্‌টন-সনেটের প্রভাব কতটা তা ভাববার মত॥

॥ দুই ॥

চতুর্দশপদীর কবিতাগুলিকে বিভিন্ন ভাবকেন্দ্রের দিক থেকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব এবং এর রসোপলব্ধির পক্ষে অনেকটা অপরিহার্যও।

এই গুচ্ছের প্রতিটি কবিতায়ই কবির মানস-প্রবণতা ও প্রবৃত্তির, বিশিষ্ট জীবন-দৃষ্টি ও আসক্তির এবং বিশেষ বিশেষ রূপকল্পের প্রতি আকুতির পরিচয় আছে ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কতকগুলি কবিতায় কবির হৃদয়াভ্যন্তরের ব্যক্তি-আমি আপনাকে প্রকাশিত করেছে প্রত্যক্ষ স্পষ্টতায়। যেমন—'যশের মন্দির', 'নন্দন কানন', 'সরস্বতী', 'তারা', 'কল্পনা', 'সুভদ্রা-হরণ', 'বিজয়াদশমী', 'কুরুক্ষেত্র', 'নূতন বৎসর', 'যশঃ', 'সাংসারিক জ্ঞান', 'অর্থ', 'ভূতকাল', 'আশা', 'শনি', 'পৃথিবী', 'সমাপ্তে' প্রভৃতি।

অনেকগুলি কবিতায় ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশের কবিদের প্রতি মধুসূদন তাঁর নমস্কার জানিয়েছেন আর কতকগুলি পুরানো কাব্য-কবিতার রসাস্বাদকে ভাষায়-ছন্দে অমর করতে চেয়েছেন। যেমন—'কৃত্তিবাস', 'কাশীরাম', 'জয়দেব', 'কালিদাস', 'ঈশ্বর গুপ্ত', 'কমলে কামিনী', 'শ্রীমন্তের টোপর', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'ঈশ্বরী পাটনী', 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা'। এবং রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনেক চরিত্র-চিত্র, কাহিনীর অংশ ও দৃশ্যের বর্ণনা ;—'সীতাদেবী', 'সীতা-বনবাসে', 'বাল্মীকি', 'মহাভারত', 'সুভদ্রা-হরণ', 'কিরাত-অর্জুনীয়ম্', 'গদাযুদ্ধ', 'গোগৃহ-রণ', 'কুরুক্ষেত্র', 'সুভদ্রা', 'উর্বশী', 'দুঃশাসন',

'হিড়িম্বা', 'পুরুরবা', 'শিশুপাল', 'হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু', 'ব্রজবৃত্তান্ত' প্রভৃতি।

কতগুলি কবিতায় আপনার দেশ জাতি ও যুগযুগান্তরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় বিবৃত করেছেন কবি। যেমন—'পরিচয়', 'দেবদোল', 'শ্রীপঞ্চমী', 'আশ্বিন মাস', 'বিজয়াদশমী', 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা', 'ভারতভূমি', 'আমরা' প্রভৃতি।

ভাষা-ছন্দ, কাব্যরূপ ও রস সম্পর্কে কয়েকটি কবিতাও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত;—'বঙ্গভাষা', 'সংস্কৃত', 'ভাষা', 'মিত্রাক্ষর', 'কবি', 'কবিতা', 'করুণরস', 'বীররস', 'শৃঙ্গারবরস', 'রৌদ্ররস' প্রভৃতি।

বিদেশী কবি-পণ্ডিতদের প্রতি কবি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন 'পেত্রার্কা', 'দান্তে', 'গোল্ডস্টুকার', 'টেনিসন', 'হুগো' প্রভৃতি কবিতায়।

সামান্য কয়েকটি সনেটে কবি ব্যক্তি-প্রেমের বিষয়ে প্রবেশ করেছেন—'কে না জানে কবিকুল', 'নহি আমি চারুনেত্রা', 'প্রফুল্ল কমলে যথা', 'মেঘদূত' প্রভৃতি।

অপর কয়েকটি সনেটে নীতি ও ধর্মতত্ত্ব আলোচিত। যেমন—'মধুকর', 'সূর্য', 'সৃষ্টিকর্তা', 'বটবৃক্ষ', 'কুসুমে কীট', 'ভারসলেস্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান', 'শ্মশান', 'দ্বেষ' প্রভৃতি।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিত্র ও ভাবাসঙ্গ বহন করছে অনেকগুলি কবিতা;—'বউ কথা কও', 'সায়ংকাল', 'সায়ংকালের তারা', 'নিশা' 'নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির,' 'ছায়াপথ', 'কপোতাক্ষ নদ', 'বসন্তে একটি পাখীর প্রতি', 'নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির', 'শ্যামাপক্ষী', 'তারা' প্রভৃতি।

এদের নানা স্তর কবি-মনের নানা প্রবণতা ও দিগন্তের সংবাদ বহন করে। কাব্য হিসেবে তাদের অনেকের মূল্য অকিঞ্চিৎকর। আবার নানা স্তর কবি-আত্মার দুর্গমতম অন্তস্তল থেকে উৎসারিত, নানা স্তরে রূপে-বর্ণে এক পরম সমারোহ—কাব্য হিসেবে এদের মূল্য অস্বীকার করা চলে না। এমনি নানা স্তরে-উপস্তরে, প্রাণের বাহিরে আর অন্দরে, তথ্যের ভারে আর কাব্যের দীপ্তিতে বৈচিত্র্যের বিস্তৃতি আছে চতুর্দশপদীর; তবুও এত স্তর ভেদ করে, অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে মধুসূদনের মানস-ভ্রমণের একটি বিশিষ্ট রাজ্য উঁকি মারে। মধুসূদনের সারা জীবনের

মাধুকরীবৃত্তি য়ুরোপের প্রাচীন, এবং আধুনিক কবিদের কল্পনার রাজ্যে; ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারতের বিপুল সমুন্নীত মহাকাব্যের মহাসমুদ্রের তীরে তীরে। আপন কাব্যজীবনের মধ্যভাগে, আপনার সর্বসঙ্কট-সমন্বিত, সর্ব-দ্বিধা-উত্তীর্ণ 'মেঘনাদবধ'-কথায় স্বর্ণলঙ্কায় চলেছে তাঁর মানস-ভ্রমণ। তার চারপাশে 'প্রচণ্ড সমর-তরঙ্গ উথলিল'। সেই সমর-তরঙ্গে উদ্বেলিত হতে হতে কবি-হৃদয়ের শক্তি সাহস ও আশা আজ শ্রান্ত এবং নির্বাণোন্মুখ। সে-সংগ্রাম এখন অতীতের স্বপ্নে এবং স্মৃতিতে বিচরণ করেই সমাপ্ত। তাদের স্থান বাহির-মহলে, অন্তরের অন্দর-মহলে আজ এক শ্রান্ত শান্তির কামনা—

জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম।[৬]

কবি-হৃদয়ে চলেছে এরই প্রস্তুতি।

কবি-চিত্তে আজ যে নবতর রাজ্য সৃষ্ট হচ্ছে, তাব নির্মিতি হয়তো সম্পূর্ণ নয়, তবু পলে পলে সমুদ্রগর্ভ থেকে যে নূতন মহাদেশ গড়ে উঠছে অস্পষ্ট আর অসম্পূর্ণ হলেও, এবং ভঙ্গুরতা সত্ত্বেও তা মিথ্যে নয়।

এ-রাজ্যে গদাযুদ্ধ-গোগৃহরণ কেবলই প্রথানুগত্য রৌদ্ররসের গর্জন ও শক্তি বাইবের কোন সূত্র থেকে আহৃত, 'মহাভারতে'র পংক্তিতে পংক্তিতে যুদ্ধের পর যুদ্ধ বর্ণনার সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি যেন ক্ষণদাদের সূত্রে ভোজবাজীর মালা। আসলে রণক্লান্ত সেনাপতি বিশ্রামের বাঁশি শুনেছেন, যে বাঁশি একবার 'ব্রজাঙ্গনা'য় দুদিনের জন্য বাজিয়েছিলেন; সেই বাঁশির আহ্বান এক কোমল-গান-ভরা শ্যামল বনস্থলীতে কবিকে উপস্থিত করেছে,—সে রাজ্যের প্রান্ত বয়ে কপোতাক্ষের কুলুনাদ, সেখানে আম্রশাখা শ্যামাপক্ষীর কূজন-মর্মরিত আর কাশীদাসের ভাগীরথীধারা ভারতকাহিনীর রসপানে মানুষ আকণ্ঠ-তৃপ্ত; দেবদোলের ফাগমুষ্টিতে, দুর্গোৎসবের আনন্দসঙ্গীতে তথা বিজয়া-দশমীর বেদনার আর্তিতে দেবতা-মানবে একাকার;—এবং 'সায়ংকালের একটি তারা' কিংবা রাত্রিগভীরের ইন্দ্রাণীর পায়ে পায়ে ফুটে-ওঠা 'ছায়াপথে'র স্বপ্নে বসে আপনার না-জানা এবং না-পাওয়া প্রিয়তমার কানে বাণী-প্রেরণ—

কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদুনাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি!

বীরাঙ্গনার সুপ্রতিষ্ঠিত আত্মঘোষণার স্থানে মৃদুনাদে মলয়হিল্লোলে বিরহ-বেদনা ব্যক্ত করে কবি ক্লান্ত মনের বিশ্রামই কামনা করেছেন তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাঝখানের এই ক্ষুদ্র উপলব্যথিত উপদ্বীপে।

মোহিতলালের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য মধুসূদনের সমগ্র কবিজীবনেরই যেন ব্যাখ্যা—চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে সে জীবনের সমাপ্তির ইঙ্গিত ;—

> আয়োজনের ত্রুটি ছিল না,—ছন্দ, ভাষা, ঘটনা-কাহিনী, হোমার-মিল্টনের ভঙ্গী, দান্তে-ভার্জিলের কল্পনা এবং সর্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবস্তু—এমন কি কাব্যঝঙ্কার পর্যন্ত আত্মসাৎ করিবার প্রতিভা—সবই ছিল, কিন্তু কবি সত্যকার কবি বলিয়া সৃষ্টিরহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন—তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙ্গালী-জীবনের গীতিকাব্য। দূর দিগন্তের সাগরোর্মি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, তিনি তাহারই অভিমুখে তাঁহার দেহ-মনের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাব্য-তরণী চালনা করিয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষে তরণী ভাসিল, ছন্দে, ভাষায় ও বর্ণনা-চিত্রে নীলাম্বু-প্রসার ও জল-কল্লোল জাগিয়া উঠিল—কিন্তু কবি-কর্ণধারের মনশ্চক্ষু আধ-নিমীলিত কেন? সাগর-বক্ষে উত্তাল তরঙ্গরাজির মধ্যেও এ কার-কুলুকুলু ধ্বনি?—এযে কপোতাক্ষ! তীরে, ভগ্নশিবমন্দিরে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, জলে 'নূতন গগনে যেন নব তারাবলী' এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। সমুদ্র গর্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণী-তটে আছাড়িয়া পড়ুক—তথাপি এ স্বপ্ন বড় মধুর! সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্য-তরণীর গতিনির্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল,—
>
> 'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।'— —আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য

মোহিতলালের এই মন্তব্যের মধ্যে পরোক্ষভাবে মধুসূদনের কবি-দৃষ্টির স্বদেশাভিমুখী প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে। চতুর্দশপদীতে এসে প্রথম দিকের পাশ্চাত্য প্রবণতার এরূপ পরিবর্তনের কথা আরও কেউ কেউ বলেছেন। আমার বিশ্বাস মধুসূদনের কবিদৃষ্টিতে দেশকালের একটি বিশিষ্ট সত্য সর্বদাই ছিল। কোন সার্থক কবিই দেশকালের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হতে পারেন না। চতুর্দশপদী কবিতার সুরের মৃদুতা কবির ক্লান্ত মনের বিশ্রামকামনা এবং চরম সমাপ্তিমুখিতার ইঙ্গিতবাহী॥

॥ তিন ॥

বিভিন্ন কাব্য-কল্পনায় মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে নানাভাবে পূর্ববর্তী আলোচনাগুলিতে তার বিস্তৃত পরিচয় নেবার চেষ্টা আমরা করেছি—তিলোত্তমার সৌন্দর্য-কল্পনায় কবি-প্রতিভার আপনাকে চেনবার চেষ্টায় এবং মেঘনাদের রাবণ-চরিত্রের 'মহতী বিনষ্টি'র উচ্চকণ্ঠ হাহাকারে। আবার ব্রজাঙ্গনায় 'মিসেস রাধা'র বিরহ-ব্যথিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় তাঁর আত্ম-প্রতিফলনের অভাবও দেখেছি। অপরপক্ষে নিজের কামনা-বাসনার ব্যক্তিক সুরটিকে একান্তে রেখে মানবজীবনের বহুবিচিত্র নিজত্বকে দেখবার চেষ্টায় বীরাঙ্গনা একক।

মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের প্রকাশের দিক থেকে একপ্রান্তে যদি বীরাঙ্গনার স্থান হয়, তবে চতুর্দশপদীর স্থান বিপরীত প্রান্তে। অন্যান্য কাব্য-কবিতাগুলি মধ্যবর্তী। বীরাঙ্গনায় মধুসূদনের 'আমি'র অনুপস্থিতি, মেঘনাদ-তিলোত্তমায় এই 'আমি'র নানা বাঁকা পথে প্রতিফলন, এবং চতুর্দশপদীতে এর নিরাবরণ প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

> মেঘনাদবধ-এর কোলাহল-মুখরিত রণোন্মাদনার পাশে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের নিভৃত আপন মনের গান। এই নিভৃত মনের গানে মানুষের অন্তরের প্রকৃষ্ট পরিচয়। আমরা সাধারণত কোন কোন বড়লোককে জানিতে এবং বুঝিতে চাই তাঁহার জীবনের বড় বড় কাজের ভিতর দিয়া। ওটা আমাদের ভুল; মানুষের অন্তরাত্মার পরিচয় সব সময় বড বড় কাজের ভিতর দিয়াই নহে, সে পরিচয় ছড়াইয়া থাকে অনেক সময় জীবনের ছোট ছোট টুকরা টুকরা কাজ ও কথার ভিতর দিয়া—পাহাড়ের ফাটলে ফাটলে সোনার রেখার মত। অনেক কথা অনেকক্ষণ বসিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে হইলে আমাদিগকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বহু কলা-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিতে হয়। এই বহু ভাষণ ও কলা-কৌশলের আড়ালে আমাদের সহজ মনের পরিচয় অনেকখানি ঢাকা পড়িয়া যায়। মেঘনাদ-বধের ভিতরে ভিতরে মধুসূদনের মনের পরিচয় রহিয়াছে বটে,—কিন্তু মহাকাব্য-জাতীয় কাব্যের একটা স্বধর্মও রহিয়াছে, কবিমনকে সেখানে এই কাব্যের স্বধর্মের আড়ালে খানিকটা চাপা পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু

সেই কবি-মনের সহজতম ও সুন্দরতম প্রকাশ এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ভিতরে। —বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ

বিহারীলাল সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে বাংলা কাব্যে কবির ব্যক্তি-'আমি'র প্রকাশের ইতিহাস অনুসরণের চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ—

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনও কখনও প্রকাশ পাইয়া থাকিবে—কিন্তু তাহা বিরল—এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, বেদনায় গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।

—আধুনিক সাহিত্য

অবশ্য এই 'আত্মকথা' বলতে নানা জিনিস বোঝা যেতে পারে,—বাংলার মঙ্গলকাব্য আর বাঙালী কবিদের প্রতি তাঁর প্রাণেব নবতর আকর্ষণের, বাংলার প্রকৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর পরিবেশের একটি বেদনা-মধুর স্মৃতিব স্বীকৃতি এবং আরও অনেক কিছু। আমার মনে হয় এই সব বিভিন্ন আকষণ ও প্রবণতা আখ্যায়িকা বা অন্যজাতীয় কাব্যের মধ্যেও অল্পাধিক প্রকাশ করবার সুযোগ কবির রয়েছে। কিন্তু কবির ব্যক্তি-'আমি'র প্রকাশই এখানে অভিপ্রেত। বিহারীলালের আলোচনা প্রসঙ্গে চতুর্দশপদীর প্রশ্নটি উত্থাপিত করে রবীন্দ্রনাথও সেই দিকেই সঙ্কেত করতে চেয়েছেন, যদিও দ্বিধাগ্রস্তভাবে।

মধুসূদনের কবি-প্রাণের কেন্দ্রগত দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে আবার তা সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। মধুসূদনের কবি-চেতনা এবং জীবন-চেতনা মনের দুটি বিভিন্ন স্তর আশ্রয় করে নি, একই স্তরে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত ছিল। ব্যক্তিগত জীবনের পার্থিব যাবতীয় ভোগ্যবস্তুকে ভোগ করবার কামনা কবির কাব্য-কল্পনার উৎস পর্যন্ত অনুস্যূত। নতুন যন্ত্রতান্ত্রিক সভ্যতা য়ুরোপের মানুষের কাছে এই পৃথিবীর নব নব যা-কিছু ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যকে উপস্থিত করেছে আমাদের কবি তারই দিকে হস্ত প্রসারিত করেছেন আকুল আগ্রহে। এই ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ কামনার কামরাজ্যের যশস্বী কবির আসন তিনি অলঙ্কৃত করবেন, তিনি মহাকবির অমরত্ব পাবেন, গৌড়জন নিরবধি আনন্দে তাঁর কাব্যসুধা পান করবে—

এই বাসনা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনবোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় সংবদ্ধ। তিনি কাব্য-সৃষ্টি করতে করতে এই নব কামনার রাজ্যটিকে ভাষা আর ছন্দের রত্নৈশ্বর্যে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু কল্পনায় তাকে পাওয়া এবং বাস্তবে না-পাওয়ার দীর্ণ গীতোচ্ছ্বাসে নবতর কবিতার উৎস খুলে দেবার চিত্ত মধুসূদনের নয়। কারণ আপন-সৃষ্ট এই সাম্রাজ্যকে মাটির পৃথিবীতে বাস্তব করে তোলার সাধনা তাঁর জীবনের অন্য কোটিতে। ফলে দ্বন্দ্ব এবং অবক্ষয়। এ অবক্ষয় কবির এবং ব্যক্তিরও। কারণ মধুসূদনের কবি-চেতনা এবং ব্যক্তি-চেতনা একই বৃন্তে বিধৃত।

কবি-চিত্তের এই বিশেষ গঠনের ফলেই মাত্র সেই কটি বছরই সৃষ্টির সোনার ফসল তিনি ফলিয়েছেন যখন এই দ্বিধা-বিভক্ত হৃদয়ের অন্তত সাময়িক ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছিল। সে ভারসাম্য বীরাঙ্গনার সমাপ্তির পূর্বেই কবি হারাতে বসেছেন। অর্ধসমাপ্ত কাব্য-কবিতার খণ্ডত্ব কবি-প্রাণের ভারসাম্যহীনতার বেদনাই যেন বহন করে। তাঁর জীবনীকার বলছেন—

> বীরাঙ্গনা কাব্যের জনা-পত্রিকা শেষ করিয়া তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন—'The epistle of poor জনা must be revised and printed along with the second set, I am very unpoetical just now. God knows in what all this trouble, anxiety and vexation will end.'
>
> —যোগীন্দ্রনাথ বসু : জীবন-চরিত

সৃষ্টির উৎসবমুখর বৎসর কয়টিতে এই "trouble, anxiety and vexation"-এর সন্ধান মেলে না। অন্তত "very unpoetical" যে কবি কখনও হয়ে পড়েন নি তা সংশয়হীন চিত্তে বলা চলে। তাই ইংলণ্ডযাত্রায় কবি-মনের অপর কোটির প্রাধান্যই সূচিত। মধুসূদনের জীবনীকারও বলেছেন—

> যে সকল কারণে মধুসূদনের জীবনে শান্তি ছিল না, অর্থাভাবই তাহাদিগের মধ্যে প্রধান।…ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে তাঁহার অর্থাভাব-ক্লেশ দূরীভূত হইবে ভাবিয়া তিনি ইংলণ্ড গমনের সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন।[৭]
>
> —যোগীন্দ্রনাথ বসু

কিন্তু তাঁর এই সঙ্কল্প যে তাঁর কবি-প্রাণ ও কাব্য-সৃষ্টির অনুকূল নয় তা যেন

তিনি বুঝতে পারছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে আপন দ্বন্দ্ব-দীর্ণ চিত্তকে আপনিই যেন প্রশমিত করতে চেয়েছেন—

> You must not fancy, old boy, that I am a traitor to the cause of Muse.

তার পরে প্রবাস-জীবনে মধুসূদন যে অবস্থায় পড়েছিলেন তার বিস্তৃত নিষ্করুণ বিবরণ তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলিতে সঙ্কলিত আছে। আমি কেবল বিদ্যাসাগরকে লিখিত একটি পত্রের অংশবিশেষের উল্লেখ করব—

> I am going to a French jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution, tho' I have fairly 4000 Rs. due to me in India. The Benchers of Gray's Inn, from whom I was compelled to draw 450 Rs. have suspended me and this is the third term I am losing this year.

মধুসূদনের চরম অর্থকষ্ট এবং বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় এ সঙ্কটের কিছুটা সমাধানের কথা কবির জীবনীর পাঠকমাত্রেই জানেন। কিন্তু এই মানস-পটভূমিকায় মধুসূদনের সনেটগুলির জন্ম। বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ করে লেখা সনেটটিতে এর প্রত্যক্ষ উল্লেখ—

> বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
> করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
> দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
> হিমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
> কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা-পর্বতে,
> যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে
> সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
> গিরীশ।[৮]

অবশ্য এটি কাব্যাকারে সত্যভাষণমাত্র—কবিতা নয়, বিবৃতি; কিন্তু অন্য একটি কবিতায় ("বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে" কবিতাটি বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য করেই রচিত) এই শুষ্ক তথ্য কবি-চিত্তের সংযোগে কাব্যসত্যে বিধৃত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখানে কবিতাটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত হল—

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে ?
এ মম মিনতি, দেব, আসি আকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা, এ দূর অঞ্চলে।
তাহলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে।

এ-ভাষা কবির ভাষা। এই রূপকল্পের মধ্যে মধুসূদনীয় মহাকাব্যমন্থনের অমৃতলাভ ঘটেছে ; নিরাবরণ তথ্য-বিবৃতির মধ্যে যে শ্রদ্ধা অস্ফুট ছিল এখানে তা একটি মহাভারতাশ্রিত আলঙ্কারিক রূপকল্পের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এবং এই একটি চিত্র যেন মুহূর্তের ইঙ্গিতে—বাংলাভাষার সৌধ-নির্মাণে বিদ্যাসাগরের যে দানকর্ম মধুসূদনের অন্তরর বহু ঘোষণায় অনুপস্থিত—তাকে সত্যের মহিমান্বিত আসন দিয়েছে। প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগরকে লিখিত কবির একটি চিঠির কথা মনে পড়ে। ইংরেজিতে লিখতে লিখতে হঠাৎ কবি বলে ওঠেন আবেগের আতিশয্যে—

> But your letter has pained me no little, as one would say in our mother-tongue, আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি......If I could write Bengali like you, I shall continue in that language...

এ মম নিমতি, দেব, আসি আকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা, এ দূর অঞ্চলে।

কি উপরি-উদ্ধৃত অংশের কাব্যরূপ নয় ?

কবি তাহলে কি করবেন ?

নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে
বেঁচে আছে আজও দাস তোমার প্রসাদে ;
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা নগরে,
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যালাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।

গৌরব-স্পর্ধিত আপন প্রাণশক্তির এই ঘোষণাটি কিন্তু মধুসূদনের নিজস্ব। এই সনেটে একটিমাত্র শরসন্ধানে কবির জীবনের তথ্য আর চেতনার অতি-গর্বিত সত্য বিদ্ধ করেছে মধুসূদন-বিদ্যাসাগর কেন্দ্রিত বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসকে এবং বহুদূর অতীতের পৌরাণিক বর্ণাঢ্যতাকেও।

বন্ধু গৌরদাস বসাককে ফ্রান্স থেকে লেখা একখানা চিঠিতে এই সময়কার কবির মানসিক অবস্থাটি আরও স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। এতদিন চলছিল দ্বন্দ্ব এবং তাব ফলে জন্ম হয়েছিল একটি সমস্যার, বর্তমানে তা যে সঙ্কটে পরিণত হয়েছে আলোচ্য পত্রে তার চমৎকার ইঙ্গিত মিলবে।

> a room elegantly fitted up with all the comforts (if not luxuries) of European civilization and so forth.

-এ বসে মধুসূদন য়ুরোপ সম্বন্ধে বন্ধুকে লিখছেন,

> This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Rajah of Burdwan ever dreams of ! I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost half his enormous wealth to command, no, even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty ! This is the অমরাবতী of our ancestral creed.

এবং আরও অনেক কিছু।

য়ুরোপের এই ঐশ্বর্য-অলঙ্কৃত ভোগবাদী জীবনই মধুসূদনের আসল কামনা; অর্থ এই প্রাপ্তির উপলক্ষ মাত্র—লক্ষ্য নয়। কিন্তু যখন বহুসংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে কবি তাঁর এই কামনার স্বর্ণলঙ্কায় এসে পৌছুলেন তখন দেখলেন, কোন অজ্ঞাত নিয়তির নির্মম আঘাতে লঙ্কার কনকরবি অস্তাচলে গত। এই পত্রেরই সমাপ্তির দুটি মাত্র পংক্তিতে সব পেয়েও কিছু না পাওয়ার সুতীব্র হাহাকার স্তম্ভিত হয়ে আছে ;—

> **I have not been doing much in the poetical line of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away and I do not know if it will ever come back again.**

কবিচিত্তের এই দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হবার প্রাণপণ চেষ্টার রক্তাক্ত ব্যর্থতা এবং সমস্যা থেকে সঙ্কটের হতাশায় আত্মনিমজ্জনের মধ্য দিয়ে বঙ্গ-ভারতীর কবিতা-কমল-বন থেকে বিদায়বাণী উচ্চারণই চতুর্দশপদীর কবির আত্মকথা।

মধুসূদন পৃথিবীর কবি। বর্ণে-গন্ধে-সঙ্গীতে-সৌন্দর্যে এবং আনন্দে এ পৃথিবীর অণু-পরমাণুও যেন স্বর্ণময়। আকুল আগ্রহে দুটি বাহু বাড়িয়ে দেন কবি এই সুন্দরী ধরিত্রীর দিকে—

নির্মি গোলাকারে তোমা অরোপিলা যবে
বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা, ধরা! অতি হৃষ্ট মনে
চারিদিকে তারাচয় সুমধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ বীণা) গাইল গগনে,
কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে
হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি
আবরিলা শ্যাম বাসে বর কলেবরে,
আঁচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি,
নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণী,
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে।

—পৃথিবী

কিন্তু বেদনার উদ্বেলিত সমুদ্রে এই পৃথিবীর আনন্দটুকু একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সামান্যতায় দুর্নিরীক্ষ্য, পাপ-বোধে এখানে সৌন্দর্য-চেতনা বারংবার বিধ্বস্ত এবং এই পৃথিবীর প্রত্যন্তে—প্রত্যন্তে কেন, অন্তরে—

নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে!
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—

রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান বিফল সকলে!

—শ্মশান

তাই কবি সাগর-মেখলা, শ্যামল-বসনা, মণি-কুন্তলা এই পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেও প্রাণের পক্ষবিস্তার করেন এক অন্তহীন জিজ্ঞাসায়—

পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে কীটরূপে কুসুমে কি নাশে?

—শনি

এই জিজ্ঞাসায়ই ব্যাকুল সিদ্ধার্থ একদিন সংসার-ত্যাগ করে দুষ্কর তপস্যার মধ্য দিয়ে নব-বোধি লাভ করেছিলেন, আত্মার সঙ্কটের করেছিলেন সমাধান। আর এই একই প্রশ্নের ঘূর্ণাবর্তে আমাদের কবি তিল তিল করে অবক্ষয়িত হয়েছেন আর এই অবক্ষয়িত মনের বেদনার্ত মুহূর্তগুলি সনেটের ভাষায় ব্যক্ত করে গেছেন। এ প্রশ্ন পৃথিবীর আদি প্রশ্ন এবং শেষ প্রশ্নও বটে।

এক দিক দিয়ে কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যময় 'শনি'-শীর্ষক কবিতার বিষয়-সংগ্রহ।

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী?

এই নিন্দার বাধাই কি কবির চিত্তাকর্ষণের জনয়িতা? যে রো টক চেতনা কুৎসিতকেও সুন্দর করে রাবণের রাক্ষসত্বের ভয়ঙ্করতায় কোমল প্রাণের বীজ উপ্ত করে,—সে-চেতনাই শাস্ত্র আর মামুলি চিন্তার বাধা উল্লঙ্ঘনে চির-তৎপর।

একদিকে য়ুরোপীয় জীবনবোধ, অন্যদিকে কাব্যসৃষ্টি। একদিকে লক্ষ্মী, অন্যদিকে সরস্বতী। কবি-প্রাণে এ-দ্বন্দ্ব অন্তত একবার দেখা দেবেই, আর মধুসূদনের কবিচিত্তের অর্থই হল এই দ্বন্দ্ব। 'অর্থ' ও 'সাংসারিক জ্ঞান' কবিতায় এ দ্বন্দ্ব আছে এবং তাকে সমন্বিত করবার চেষ্টাও আছে।

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা স্বর্ণ কিরণে;—
কিন্তু যে কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে

কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে !
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয় ?

—অর্থ

চিরকাল ভারতীয় কবিরা তো লক্ষ্মীকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছেন, দারিদ্র্যের মধ্যে পেতেছেন সরস্বতীর আসন। সেই অতি-খ্যাত সরল-সহজ পথে এই কবিতার মত যদি আত্মার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পারতেন কবি! কিন্তু মধুস্থদনের কাছে এই সান্ত্বনা, আত্মপ্রতারণাও। মধুস্থদনের কাব্য-সরস্বতীর আসন স্বর্ণকমলে সংস্থাপিত, মূল্যহীন শ্বেতপদ্মে নয়; ["যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া বাল্মীকির রসনায় স্বর্ণ-পদ্মে যেন !"] তাঁর অঙ্গে অঙ্গে ঝলকিত মণি-মুক্তার অলঙ্কার—তিনি নিরাভরণা বাকল-বসনা নন। তাই এর পরেও 'সাংসারিক জ্ঞানে'র তীব্র ভর্ৎসনায় কাব্যচেতনার স্বর্গলোক থেকে তাঁর পতন ঘটে—

কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘরূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?
স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দিবে অন্ন অর্ধমাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?
ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দূরে !

একি কেবলই সাংসারিকজ্ঞান ? এ হল কবির আপন ব্যক্তিসত্তারই খণ্ডিত অর্ধাংশ।

বাইরে বিশিষ্ট জীবন-পরিবেশ এবং অন্তরে আপনারই খণ্ডিত আত্মার লুতাতন্তুজাল। কবির এ অবস্থা চক্রব্যূহবন্দী অভিমন্যুরই মত। অভিমন্যুর মতই সুকৌশলে জীবনের এই নিগূঢ় রহস্যের কেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন কবি—কাব্য-কল্পনায় এবং বস্তুগত জীবনবোধেও। কিন্তু এ রহস্য ভেদ করতে তিনি অপারগ। নিষ্করুণ ভাগ্যের তৃতীয় নয়নের ঘনায়মান ছায়ায় তিনি আজ অস্তাচলগামী। এ যেন ঠিক—

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে, সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি!
যে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারিদিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মূরতি,
উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জুনি বিষাদে,
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে!
আঁধারি চৌদিকে যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অন্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।

—কুরুক্ষেত্র

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অজস্র সংগ্রাম ও মৃত্যুর মধ্য থেকে কেবল অভিমন্যুর মৃত্যুদৃশ্যটি অঙ্কন কবি-আত্মার উদ্ঘাটনে সার্থক। উল্লেখ্য যে মেঘনাদের আসন্ন মৃত্যুর মুখেও এই বিশেষ মহাভারতীয় উপমাটি কবি ব্যবহা. করেছিলেন। আমার মনে হয় আরও অনেক আত্ম-উদ্ঘাটনকারী কবিতার মধ্যেও উপযুক্ত রূপকল্প-ব্যবহারের দিক থেকে এ কবিতাটি একক। সমগ্র প্রতিকূল পৃথিবীর 'অন্যায়' আক্রমণে কবি-প্রাণ "ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে"। একটি বীরের মৃত্যু, একটি স্বপ্নের পতন—ঘটনাটি মুহূর্তের, কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র সম্ভাবনার অকাল-ধ্বংসের বেদনাকে ব্যঞ্জিত করে।

কবির সৃষ্টি-ক্ষমতা আজ অবসিত। "The fit has passed away" একাধিক অসমাপ্ত কাব্য-নাটক এই অবসানের স্তূপীকৃত ব্যর্থতা বহন করছে—সুভদ্রাহরণ, দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর, রিজিয়া, সিংহল-বিজয়, বীরাঙ্গনার খণ্ডিত পত্রগুলি। আর ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকে উঠে-আসা একটি দীর্ঘশ্বাস সনেট 'সুভদ্রা-হরণে'র কয়েকটি পংক্তি ;—

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরি!

কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে!

আপন সৃষ্টি-ক্ষমতার স্বরূপটি সম্বন্ধে তবুও কবির দৃষ্টি কিন্তু অভ্রান্ত, তাই উপযুক্ততম চিত্রকল্প এই রূপহীন শক্তির আভাস বহন করেছে আলোচ্য সনেটে—

ফলে কি ফুলের কলি, যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী?
ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর!

সে শক্তি যজ্ঞের অগ্নির সাথে পুষ্পের প্রস্ফুটনের বিপরীত সমন্বয়ের শক্তি, সে শক্তি বেদনায় বিগলিত প্রচণ্ড-বীর্য লঙ্কার রাবণ! কিন্তু আজ তা নির্বাণোন্মুখ।

কবি-প্রতিভা আর সৃষ্টি-ক্ষমতার মধ্যে সম্বন্ধটি কি অচ্ছেদ্য—প্রসঙ্গত এ প্রশ্নটি করা যেতে পারে। মনে হয় যে এ সম্বন্ধ শাশ্বতভাবে অচ্ছেদ্য নয়, কবিভেদে তা ভিন্নরূপে প্রকাশিত। অন্তত মধুসূদনের জীবনী তো অনুরূপই প্রমাণ করে। আবাল্য কবিপ্রতিভার অধিকারী হয়েও মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর চিত্তভূমির যথার্থ বন্ধুরতা ঘোচে নি। তার পরে কয়েক বছর সৃষ্টির প্রাচুর্যে আদিগন্ত মাঠ ভরে দিয়ে আজ আবার সে পুরবীর তান ধরেছে। কিন্তু কবি-প্রতিভাও কি সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষিত? নিঃশেষিত নয় বলেই এই অতিকাতর পক্ষবিধূনন। আরও কয়েক বছর পরের কলকাতার ব্যারিস্টার মধুসূদনের সঙ্গে চতুর্দশপদীর মধুসূদনের পার্থক্য এখানেই। ব্যারিস্টার মধুসূদন একজন প্রাক্তন মহাকবি—কেবল সৃষ্টির বন্ধ্যাত্বে নয়, প্রতিভারও অকাল মৃত্যুতে। চতুর্দশপদীতে সৃষ্টির বন্ধ্যাত্ব আসন্ন-প্রায়—প্রতিভার মৃত্যু হতে আরও কয়েক বছর লেগেছিল।

শক্তিহীন প্রতিভার এই কাতরোক্তি অন্তত দুটি সনেটে সার্থক ছন্দ-মূর্তি পেয়েছে—'নন্দন-কানন' এবং 'কল্পনা'য়। নন্দন-কাননে উড়ে যেতে চান কবি, কামনার মোক্ষধামে,—যেখানে চেতনার প্রতিটি ভাল-লাগা চয়ন করে অনন্ত যৌবন আর শাশ্বত সৌন্দর্য হিল্লোলিত, যাকে চাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যায় না কোনদিন;—

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
যথা ফোটে পারিজাত ; যথায় উর্বশী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশী,—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে ;
যথা রম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা রূপসী
মোহে মনঃ সুমধুর স্বর বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণতীরে বসি,
মিশায়ে সু-কণ্ঠ-রব বীচির বচনে !

বক্ষের হৃৎপিণ্ড উল্লসিত এই কবিতার ছন্দে ও ভাষা-নির্মাণে। কবিতা হিসেবে এটি উচ্চস্তরের। মন্দাকিনীর শীকর-সিক্ত, পারিজাতের গন্ধ-বিহ্বল, পিককূজন-পুরিত, স্তনভারে অলসগমনা উর্বশীদের নৃত্যোজ্জ্বল ঐ নন্দন-কানন অবস্থিত জীবনের ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সমুদ্রের পরপারে।[৯] কিন্তু এখানে পৌছনো যায় না কোনদিন। এ কেবল

ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।

—নন্দনকানন

কিন্তু কালিন্দীতটের নীপচ্ছায়ায় বাঁশরীর তানে রাধা-কৃষ্ণের যে মিলন-স্বপ্ন, অথবা উথলিত সমরতরঙ্গে ইরম্মদ-সদৃশ কলম্বকুলের অম্বরপ্রদেশে শনশনে যাত্রায় যে পথ-নির্দেশ, তা তো কবির অতিপরিচিত, আপন সৃষ্টির (ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদবধ প্রভৃতি কাব্যের) কুক্ষিগত। এ রাজ্য তো স্বপ্ন নয—কবির চেতনায় একান্ত বাস্তব—এ রাজ্যের তিনিই একচ্ছত্র নৃপতি। কিন্তু আজ সেখানে পৌছুবার ক্ষমতাও কবি হারিয়েছেন, তাই তাঁর এ কাতর প্রার্থনা নিঃসন্দেহে হৃদয়-বিদারক,—

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি,
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি !
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে
পুরি বেণুরবে দেশ ! ... ...

কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি। —কল্পনা

মেঘনাদবধের প্রারম্ভেই কবি বলেছেন, এমন কাব্য তিনি রচনা করবেন 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' রাজনারায়ণ বসুকে তিনি বলেন, 'ইহা কি আমাকে অমর করিতে পারিবে না?' অমরত্ব লাভ করতে চেয়েছেন কবি। যশের সুবর্ণ-মন্দিরে চিরন্তন আসন তিনি কামনা করেছেন। কিন্তু ভগ্ন লেখনী হাতে নিয়ে কেবলই তাঁর চিত্ত অস্তায়মান দিবসের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে—পেছনে অসমাপ্ত আশা আর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা আর সামনে কেবলই নীরন্ধ্র অন্ধকার—

বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

—নূতন বৎসর

কি দিয়ে এই মহাকালের যাত্রা রুদ্ধ করবেন কবি? সে মন্ত্র তাঁর অজ্ঞাত, সে শক্তি নিঃশেষে অপচিত।—

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে,
—কোন্ মূল্যে—এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি জালে
এ দুর্লভ দ্রব্য-লাভ? কোন্ দেবে স্মরি,
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম ধরি?

—ভূতকাল

ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার বেদনা-পাত্রে কবি মানব-জীবন-রহস্যের একটি চিরন্তন সত্যকে আমাদের ওষ্ঠাধরে পৌছে দিয়েছেন। বকরূপী ধর্মরাজের 'কি আশ্চর্য' এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃস্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥

এই মৃত্যু-খণ্ডিত জীবনকে ধরে রাখবার সাধনা আর কামনা নিয়েই মানুষ

এবং তার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ জীবন ও মরণের মধ্যে উমা-মহেশ্বরের দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ অনুভব করে এ সংশয় থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন, কিন্তু মধুসূদন যশের ভেলায় এ দুস্তর সমুদ্র উত্তরণে প্রয়াসী। যশের স্বুবর্ণ-মন্দির কিন্তু "অতিতুঙ্গ-শৃঙ্গ-শিরে" স্থাপিত আর "বহু অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে।" তবুও আজীবন এই 'ক্ষুরস্য ধারা' পথ অতিক্রমের সাধনা চলেছে, কিন্তু কবি-জীবনের এই প্রান্তে দাঁড়িয়েও সংশয় ঘুচল না হৃদয়ের—

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?
ফেন-চূড়-জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?

—যশঃ

এই সংশয় নিয়েই কবিকে আজ বিদায় নিতে হবে। কারণ এই কাতর আবেদন উপেক্ষা করেই জীবনের বিজয়া-দশমী সমাগত—

যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে !
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে

—বিজয়া-দশমী

কাজেই হৃদয়-মণ্ডপ শূন্য করে কাব্য-লক্ষ্মীকে আজ বিসর্জন দিতেই হবে,—সে বেদনা যতই সীমাহীন হোক,—

বিসর্জিব আজি, মাগো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি !
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম, কর্ম ! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে, খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্পদিন ! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি ! ডাকিলা যৌবনে ;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে ! —সমাপ্তে

এর মধ্যে আছে শালপ্রাংশু মহাভুজ পুরুষের অকাল পতনের ট্রাজিক বেদনা—অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় "অমরত্বের ও ঐশ্বর্যের দুই কোটির অসম্ভবের সাধনায় সদ্য-ভগ্ন জীবনের হরধনু!"—এবং শেষ দুই পংক্তিতে এই বেদনা-উত্তীর্ণ এক পরম প্রশান্তি—

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে!

—সমাপ্তে

কবিতাটিকে সত্যকার সমাপ্তির মহিমায় উন্নীত করেছে, আর বহুদূর আকাশের একটিমাত্র তারা "নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে" ভূপতিত বীরের অর্ধনিমীলিত চোখ দুটিতে অসীমের শেষ ছোঁয়া দিয়ে গিয়েছে ॥

॥ চার ॥

চতুর্দশপদীর বহু কবিতায় এ দেশের অনেক কবি এবং সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন মধুসূদন। স্বভাবতই সাহিত্যিকদের জীবনী-রচনার বা তাঁদের কাব্যসমালোচনার দায়িত্ব কবির নেই। তাঁর চেতনার গভীরে অভিপ্রেত কবির যে মানসরূপ বা মননজাত মূর্তি গড়ে ওঠে তারই পরিচয় আমরা এ-জাতের কবিতায় প্রত্যাশা করি। এ কবি-পরিচয় বহু-বিস্তৃত তথ্যসঞ্চয়ে বা কোন জীবন-নির্যাস তত্ত্ব উপস্থাপনে সার্থক নয়, বরং এই তথ্যসঞ্চয় বা তত্ত্ব-নির্ণয় কবি-প্রশস্তিকে অনেকক্ষেত্রেই কাব্যসৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করে। এর উদাহরণ পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথের বহু কবিতায় আমরা দেখেছি। আলোচ্য কবির জীবনের কোন একটি বিশেষ সত্য লেখকের আপন মনের মাধুরীর স্পর্শে এখানে আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে কি না—এ-জাতীয় কাব্য-বিচারের তাই একমাত্র মাপকাঠি। কবিতা হিসেবে যদিও কোন তথ্যের প্রতি এর পক্ষপাত থাকার কথা নয়, তবুও বিষয়ের স্বরূপের বৈশিষ্ট্য রসের অনুভবে বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম। উত্তর আকাশের একটিমাত্র তারা কবির সৃষ্টিকে যে আনন্দের আশ্রয় করে তা সুদূর অসীমের এক ভাষা-উত্তীর্ণ আহ্বান, আবার বাসন্ত কানন যে আস্বাদ বহন করে তা প্রেমের মধুরসে উজ্জ্বল। কবি রসস্রষ্টা—প্রজাপতি ব্রহ্মার মত নব নব সৃষ্টির উৎসবে পৌরোহিত্য করার অধিকার একমাত্র কবিরই,—কিন্তু তবুও উপাদানগত নিজত্বকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। তাই যে-কবি আমার

কাব্যের উপাদান তাঁর কবি-জীবনের একটি বিশেষ রসসত্য যদি আমার কবিচেতনাকে উদ্বোধিত না করে তবে আমার সে-কবিতা উপাদানগত বিশেষ সম্ভাবনাকে চিরন্তন কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। বিশেষত সনেটের সংহত মুহূর্তবোধ এই আদর্শকে আরও দুরূহ করে তোলে।

কাশীরাম ও কৃত্তিবাসই বাংলার প্রাচীন কবিদের মধ্যে মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। কৈশোরের স্বপ্নের কথা বাদ দিলেও (যে স্বপ্ন বাঙালী কিশোরদের মনে কৃত্তিবাস-কাশীদাসকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত) মাদ্রাজে যখন বহুভাষা-শিক্ষার উৎসবে মেতেছিলেন মধুসূদন, তখনো বিস্মৃতপ্রায় বাংলাভাষা আলোচনার জন্য গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা চিঠিতে এই দুই কবিকেই তিনি স্মরণ করেছিলেন—

> I say, old Gourdas Bysack! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharat by Cassidoss as well as the ditto of the Ramayana—Serampur edition. I am losing mv Bengali faster than I can mention.

কাজেই এঁদের প্রতি কবির যে অসাধারণ ঋণ তারই স্বীকৃতি হিসেবে কবিতা দুটিকে গ্রহণ করা চলে।

কাব্যরস-তৃষ্ণায় বঙ্গবাসীর আকুলতা—

ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।

চেতনার গভীর অন্তস্তলে যে আহ্বান একদিন তাঁকেও ভ্রষ্ট করেছিল ইংরেজি কাব্যসৃষ্টির পথে পথে পারিক্রমা থেকে, সেই একই আহ্বান কাশীরামও শুনেছিলেন। তার পরে চলেছে তাঁর বিরাট সাধনা। সুরধুনীর ধারাকে পৃথিবীর বক্ষে প্রবাহিত করবার যে দুশ্চর তপস্যা ভগীরথের, তারই সঙ্গে উপমিত করে একটিমাত্র চিত্রকল্পে কবি কাশীরামের মহতী কীর্তি-কথাকে সনেটের ক্ষুদ্র দেহে বদ্ধ করেছেন ;—

কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)

সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে; এ তিন ভুবন ;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !

মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্যের বিপুলতাকে ভাষান্তরিত করবার কীর্তি নিঃসন্দেহে দানবীয় ; কাশীরামের কবিশক্তির এই প্রচণ্ড সমুন্নতিই মধুসূদনকে আকৃষ্ট করেছে ;—মধুসূদনের মানস-প্রবণতার দিক থেকেও তাই-ই স্বাভাবিক।

'কৃত্তিবাস' কবিতার ভাব-কল্পনা এবং কবিমনের উল্লাস কিন্তু অনেকাংশে স্তিমিত। 'কৃত্তি' এবং 'কীর্তি' এই দুটি শব্দ নিয়ে খেলা করা খুব উচ্চস্তরের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন নয়। মধুসূদন ব্যক্তিগত রুচিবোধকে[১০] একান্তে রেখে কৃত্তিবাসকে যথাযথভাবে চিত্রিত করবার জন্যই ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানের সঙ্গে তাঁর পূত-হৃদয়কে উপমিত করেছেন, একথা মেনে নিয়েও বলতে হবে কবিতা হিসেবে এটি অসার্থক ;—কারণ কবির প্রাণের সাড়া এখানে নেই।

'জয়দেব'-নামাঙ্কিত কবিতাটি কিন্তু সর্বকালের প্রথম শ্রেণীর কবিতা হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। জয়দেব সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর একটি সনেট এই আলোচনার প্রারম্ভে উদ্ধৃত হয়েছে। কবিদের মানস-গঠনের বিভিন্নতা একই কবিকে অবলম্বন করে রচিত কবিতায় কতটা পার্থক্যের সৃষ্টি করতে পারে তারই একটি উদাহরণ হিসেবে এর উল্লেখ করছি। অতি-আধুনিক মনন ও ব্যঙ্গ-প্রধান কাব্যধারার জনয়িতা প্রমথবাবুর কাছে জয়দেবের 'কান্ত-কোমল বচন' নীবির মোচন বলে মনে হলেও মধুসূদন কিন্তু এই 'ললিত-গীত-কলিত কল্লোলে'র মধ্য দিয়ে পৃথিবী ছাড়িয়ে সৌন্দর্যের এক কল্পলোকে উড়ে যাবার পথ পেয়েছেন—

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে,
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে !

মধুসূদনের কবি-কল্পনায় জয়দেব তাঁর সৃষ্ট মাধবের সঙ্গে একাকার। কবিই স্বয়ং মাধব। কৃষ্ণের মুরলী তো নয়—তাঁরই কণ্ঠ-নিঃসৃত কাব্যসঙ্গীতে শুরু হবে শিখীর নৃত্যচাপল্য, পিকের কূজন, মলয়-বীজন—আর মানুষের হৃদয়ে জেগে উঠবে প্রেম-মিলনের ব্যাকুলতা—

না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে !
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,—
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে ! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী ?

বৈষ্ণব ধর্মে আর তত্ত্বে কোন আস্থা নেই মধুসূদনের। কাজেই তিনি ভক্তদের সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বলেছেন—

মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে ?

কিন্তু প্রাচীনভারতীয় কবিদের মধ্যে কালিদাসের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধার পরিচয় এমন আর কারও প্রতি নয়। একাধিক পত্রে তাঁর য়ুরোপীয় বহু প্রিয় কবির সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে এই নামটিও তিনি উচ্চারণ করেছেন। কবির নানা কাব্য-নাটকে কালিদাসের কিছু কিছু অনুসরণও আছে। 'কালিদাস' কবিতায় কবির যে ভাবমূর্তি কবিতার বাচ্যাংশ ছাপিয়ে ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত, তা হল উদ্দাম যৌবন, উজ্জ্বল প্রেম আর প্রভূত ঐশ্বর্যের। কবি-' কাননে তিনি পিককুল-পতি, তাঁর রসনা অমৃতরসে সিক্ত এবং হাতে ভারতীর দান স্বর্ণবীণা। আর এই ভারতী (অর্থাৎ তাঁর কবিতা)-মূর্তিও যৌবনোদ্বেল নায়িকার—

শুনিয়াছি মায়ামুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে
নব-নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায় ;

কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তাকে কিভাবে নাড়া দিয়েছিল বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই সে কথা জানেন। কাব্যটি এর অভিনব কল্পনা এবং সৌন্দর্যের জন্য মধুসূদনকেও আকৃষ্ট করেছিল। স্বভাবত অপরের কাব্য-দৃষ্টি যখন কাব্যসামগ্রী হিসেবে কোন কবির কাছে উপস্থিত হয়, তখন কবিমনের স্পর্শে তার নবতর রূপায়ণই আমরা প্রত্যাশা করি,— পুরানোর যথাযথ অনুসরণ মাত্র নয়। তাই মেঘদূত কাব্য অবলম্বন করে

রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথেরই। মধুসূদনের 'মেঘদূত' নামাঙ্কিত দুটি সনেটের অন্তত একটি সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা চলে। কবিপ্রাণের চিরন্তন সৌন্দর্য-কামনা এবং চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব এ কবিতার প্রাণ-কেন্দ্র থেকে অসীম আকাশের দিকে উত্থিত।

কালিদাসের মেঘদূত আদৌ বিরহের কাব্য নয়। প্রভুশাপে যে যক্ষ রামগিরিশৃঙ্গে নির্বাসিত তার এই দূতপ্রেরণ আপন বিরহ-সন্তাপ হরণের জন্য নয়,—বিরহের ছলে সৌন্দর্য-সম্ভোগের জন্য। তাই ভূতলের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য উজ্জয়িনী মেঘের যাত্রাপথে না পড়লেও সে পথেই মেঘকে যাবার জন্য যক্ষের অনুরোধ—হোক না তাতে কিছুটা বিলম্ব।—

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।

কারণ,

বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥

কিন্তু মধুসূদনের মেঘদূত বিরহের বেদনায় ভারাক্রান্ত। সে বিরহ শুধু যক্ষের নয়, কবিরও।—

তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি,—
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া, হায়, যার রূপ স্মরি।
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি।

এ বিরহে রবীন্দ্রনাথের নিখিলের সুর বাজে নি। কিন্তু কবির ব্যক্তিক বেদনা যে যুবতীকে কামনা করে সে কি রক্তমাংসের কেউ? মধুসূদনের পূর্ব-কাব্যের সমস্ত ঐতিহ্য ভেদ করে এর চারপাশে একটা রহস্যের ইন্দ্রধনুর অতিসুদূরতা ব্যপ্তিত। এ যুবতী কি তাদেরই একজন নয়, যারা—

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

যাকে কবি স্বপ্নে পান, স্বপ্নভঙ্গে হারান, যে আদর্শ সৌন্দর্য আর প্রেমের নিকেতনকে স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে 'সশরীরে কোন নর গেছে মোক্ষধামে ?'

মেঘদূত কাব্য এবং বাংলার কবিদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, কিন্তু সৌন্দর্য-সম্ভোগের কাব্য এখানে চিরন্তন বেদনায় ভারাক্রান্ত। এ ভাব-কল্পনা কেবল রবীন্দ্রপরবর্তীদের ঐতিহ্যানুসরণে নয়—এ সুর রবীন্দ্রপূর্ববর্তী মধুসূদনের কবিতায়ও প্রত্যক্ষ। আমার মনে হয়, বাংলার বর্ষায় যে বিরহবেদনা তারই অনুরণন এইসব কাব্য-কবিতা পর্যন্ত চলে এসেছে। বৈষ্ণব কবির 'ভরা বাদর মাহ ভাদরে'র আর্তি মধুসূদন এবং তাঁকে ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালী কবির প্রাণকে জানা-না-জানায় নানাভাবে টেনেছে। এ প্রসঙ্গে কবির যৌবনকালীন ইংরেজি কবিতার বর্ষাপ্রসঙ্গ লক্ষণীয়।

'মেঘদূত' নামাঙ্কিত দ্বিতীয় সনেটটি বর্ণোজ্জল বর্ণনার প্রতি কবিপ্রাণের আকর্ষণের ফল, কবি-আত্মার গভীর আকুতির পবিচয় এখানে নেই। হৃদয়ের ব্যাকুলতার সঙ্গে বর্ণনার সৌন্দর্য যখন সমন্বিতই হল না, তখন তাকে পরিহার না করে অন্য একটি সনেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা কবি-মনের একটি বিশেষ দুর্বল প্রবণতারই পরিচয়।

'শকুন্তলা' কবিতাটি কল্পনা ও রচনা উভয় দিকের বিচারেই সার্থক। কালিদাসকে তিনি কণ্ব মুনির সঙ্গে উপমিত করেছেন। এ শকুন্তলা যেন বাস্তব পৃথিবীর কোন নারী নয়, এ নারী কবি কালিদাসের মানস-সৃষ্টি। ব্যাসদেবের মহাভারতের বিপুল প্রসারে যে শকুন্তলা কাব্যের উপেক্ষিতা, কালিদাসের কবিচিত্তের অনুরাগে এবং রূপনির্মাণের সফলতায় সে হয়ে উঠল পরিপূর্ণা—পাঠক-হৃদয়ের সব-কটি দ্বার তাকে গ্রহণ করবাব জন্য উৎসুক হয়ে উঠল, উন্মোচিত হল।

> মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
> প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে ভারত-কাননে,
> শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি ·ামতি,
> কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে
> কালিদাস !

আকর গ্রন্থের সামান্যতায় যার চরিত্রের পূর্ণতা নেই সেই বালিকার গর্ভধারিণী জননী হলেও সে গ্রন্থকার মেনকার মত হৃদয়হীনা অপ্সরী

মাত্র। আর যে কবির হৃদয়ের স্নেহে-অনুরাগে সেই বালিকার যৌবনলাভ, সে জন্মদাতা না হলেও কণ্বেরই মত জন্মদাতারও অধিক। 'মেঘনাদ'-সৃষ্টি-ব্যাপারে যে বিরুদ্ধ সমালোচনার দ্বারা কবিকে আক্রান্ত হতে হয়েছিল এর মধ্যে তার উত্তরের কিছু ইঙ্গিত আছে।

কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে শকুন্তলার সৌন্দর্যের যে বর্ণনা আছে তার বস্তু-সঞ্চয়ে অভিনবত্ব না থাকলেও ভাবরসে একটা স্নিগ্ধ কোমলতা পরিস্ফুট। 'বীরাঙ্গনা'র মত এ শকুন্তলা মধুসূদনের সৃষ্ট নয়, কালিদাসের কল্পনাকেই নিজস্ব ভাষারূপে তুলে ধরবার চেষ্টা মাত্র—

নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে,
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে ;
মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে ,
অধরে অমৃত-সুধা , সৌদামিনী হাসে ,
কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি ঝরে
অশ্রুধারা, ধৈর্য ধরে কে মর্ত্যে, আকাশে ?

এ চিত্রে কামনা-মদিরতা নেই, সরস প্রফুল্লতা আছে। শকুন্তলার মূল ভাবটি তাতেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভারতচন্দ্র কিংবা মুকুন্দরামের মঙ্গলকাব্যের প্রতি মধুসূদনের কোন আন্তরিক আকর্ষণের পরিচয় তাঁর চিঠিপত্রে মেলে না। মুকুন্দরাম সম্বন্ধে তিনি নীরব। ভারতচন্দ্রের সৌভাগ্যে (রাজকবি ছিলেন বলে ?) এবং খ্যাতিতে তিনি ঈর্ষান্বিত। অনেকে মনে করেন সনেটে এই ধরনের শ্রদ্ধা-নিবেদন বাংলার নিজস্ব জাতীয় আদর্শের প্রতি কবিমনের ক্রমবর্ধমান ঝোঁকের প্রমাণ বহন করে। এ সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিতভাবে কিছু বলবার পক্ষপাতী আমি নই। আমার মনে হয়, আলোচ্য কবিতাগুলিতে দু একটি ক্ষুদ্র চিত্রাঙ্কনেই পুরানো বাংলাকাব্যের সঙ্গে মধুসূদনের সহমর্মিতার সীমা। যেমন, 'কমলে কামিনী'র গজ-ভক্ষণ—

বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগারি সঘনে।

গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে

'ঈশ্বরী পাটনী'তে অন্নপূর্ণার সৌন্দর্য সম্পর্কে—

রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম।

কিংবা 'শ্রীমন্তের টোপরে'র ঐশ্বর্য-দীপ্তি—

(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে,
উজলি চৌদিক শত রতনের করে
দ্রুতগতি !

কিন্তু তার চেয়েও বেশি কবিকঙ্কণ-কবিগুণাকরের কবিখ্যাতি আপন জীবনে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করবার কামনা। 'ঈশ্বর গুপ্তে' যে আশঙ্কা প্রকাশিত [পরে দ্রষ্টব্য] এখানে দেখলাম তার থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা। মুকুন্দরামের দারিদ্র্যে[১১] কি কবির নিজের দুস্থতার ছায়া পড়ে নি, আর তাঁর দারিদ্র্য-উত্তীর্ণ অমরত্বে আপন হৃদয়ের দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ বাসনা ?—

কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে !
কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে। যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুঃখ জীবনে ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা মজি তব গানে ?
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

—কমলে কামিনী

অন্নদামঙ্গল কাব্যের গুণকীর্তনেও একই সুর বেজেছে—

কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ;
চঞ্চলা ধনদা রমা ধনও চঞ্চল ;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি-অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে ॥ —অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে মধুসূদনের ধারণা খুব উচ্চ ছিল না এবং থাকবার কথাও নয়। আলোচ্য কবিতার নাম 'ঈশ্বর গুপ্ত' হলেও এটি আসলে ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে নয়। আপন কবি-জীবন ও কীর্তির এক সংশয়ান্বিত ভবিষ্যৎ অন্য এক কবিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে এখানে—আর সেই অন্য কবির নাম ঈশ্বর গুপ্ত। মধুসূদনের কবিকল্পনা এখানে উদ্বোধিত আত্মকথনে—যেমন তা উদ্বেলিত 'নূতন বৎসর', 'যশঃ' কিংবা 'ভূতকাল' কবিতায়। ঈশ্বর গুপ্ত বা যে-কোন মৃত কবি-সাহিত্যিকের মধ্যেই আপন-ভবিষ্যতের ছবি দেখে তাঁর কবিপ্রাণ চমকে উঠতে পারত;—

এই ভাবি মনে—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?

॥ পাঁচ ॥

রামায়ণ-মহাভারতের রাজ্য মহাকাব্যিক বিরাটত্বের রাজ্য। আবার মধুসূদনের কবিমন গঠনের মধ্যেই রয়েছে মহাকাব্যোচিত এক সমুন্নত কল্পনা। তাই তাঁর তিলোত্তমা কিংবা মেঘনাদবধ—সর্বত্রই কাব্য-কল্পনার দেহ রচনা করেছে যে অজস্র চিত্র, উপমা আর উৎপ্রেক্ষা তারা রামায়ণ-মহাভারতের রাজ্য থেকেই আহৃত। এগুলি সাধারণ এক একটি উপমা মাত্র নয়—এগুলির মধ্য দিয়ে ঘটনাগত সামান্যতা মহাকাব্যের ব্যাপ্তি পেয়েছে। আজ কবির পক্ষে তিলোত্তমার ন্যায় আখ্যায়িকা কিংবা মেঘনাদবধের ন্যায় মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে রামায়ণ-মহাভারতের সেই চিত্র-রসাস্বাদ আর সম্ভব নয়, কারণ সে-সৃষ্টির উৎস আজ রুদ্ধ। তাই উপমার সংক্ষিপ্ততা পরিহার করে সনেটের স্বতন্ত্র চিত্রে চিত্রে কবির মানস-অভিযান চলেছে পুরাতনের রাজ্যে।

রামায়ণ-কাহিনীর প্রতি মধুসূদনের প্রাণের তৃষ্ণা অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়েছে মেঘনাদবধ রচনার মধ্যে, এমন কি সাময়িকভাবে আকর্ষণও কিছু কমে গিয়েছে বীরকাহিনীর প্রতি। কবির একটি পত্রে এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে।—

But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry

after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.

কবি মেঘনাদবধের পর রণক্লান্ত, কিন্তু এর অবিশ্রান্ত গীতধর্মী ক্রন্দনোচ্ছ্বাসও কবিকে গীতিপ্রাণতা থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে নি। তাই 'রামায়ণ' কবিতায় দেখি যদিও বাল্মীকি—

হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে !

তবুও হিয়ার জ্বলন এ কবিতায় বুদ্ধির কথা—হৃদয়ের স্পর্শ সেখানে লাগে নি ;—

কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ-ঘোষণে,
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে ;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে।

এখানে শুধুই পংক্তিতে পংক্তিতে যুদ্ধবর্ণনার বর্ণ ও প্রাণহীন ভোজবাজী। কিন্তু যেখানে সীতার স্মরণে কবি বলেন—

কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি ;
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তিজলে !

সেখানে তা কবির প্রাণ-রসসিঞ্চনে ধন্য। মেঘনাদের চতুর্থ সর্গের অমর কীর্তিও সীতা সম্বন্ধে কবির হৃদয়ে তৃপ্তি আনে নি।

একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কটিরে
নীরবে।

মেঘনাদবধের এই বেদনা-উজ্জ্বল পরিবেশই আবার স্মরণ করা হয়েছে একটি সনেটে—

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি ! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,

একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা

—সীতা দেবী

সীতা-কল্পনা মধুসূদনের সমগ্র চেতনাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে এমন কি তাঁর 'grand fellow' রাবণকে প্রত্যক্ষ ভৎর্সনায়ও কবি কখনও কখনও পিছু-পা হন না—

কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে।

—সীতা দেবী

কিন্তু সীতার আরও বহুতর ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতিই যেন বর্তমানে মধুসূদনের অধিকতর আকর্ষণ। একাধিক সনেটে বিস্তৃত সীতার এই কাহিনী কবিতা হিসেবে উচ্চ কৃতিত্বের পরিচয় বহন না করলেও কবির এক অসম্পূর্ণ কল্পনার ইঙ্গিত দেয় যেন। জন্ম-দুঃখিনী সীতার নানা বেদনা-বিধুত কাহিনী অবলম্বনে এক কাব্য-রচনার পরিকল্পনা হয়তো কবির ছিল। সে পরিকল্পনা কোনদিনই সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্য-কল্পনায় সুগঠিত হয় নি, খণ্ডিত—কয়েকটি সনেটে আপন চিহ্ন রেখে গিয়েছে মাত্র। এ চিহ্ন কাব্যের পৃথিবী থেকে মধুসূদনের বিদায়ের চিহ্নও বটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঐ একই সময়ে কবি ইংরেজিতে সীতা সম্বন্ধে এক কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন। খুব অল্প অংশই মাত্র লেখা হয়েছিল।

মেঘনাদবধ প্রসঙ্গে বীরকাহিনীর প্রতি কবির যে মনোযোগের কথা একটু আগেই উল্লিখিত হয়েছে তা যে একান্ত সাময়িক এ কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এ মন্তব্য কবিমনে মেঘনাদবধের অনন্যতারই প্রমাণ। আসলে কবির চিত্তবীণার একটি তার সর্বদাই উঁচু সুরে বাঁধা এবং এর পশ্চাৎপটে রণডমরুর দূরাগত একটি ধ্বনি মন্দ্রিত। কবির হাতে গাণ্ডীব আজ ভগ্ন। বীরকাহিনী অবলম্বনে মহাকাব্য রচনার প্রয়াসও আজ অসম্ভব। তাই দূর থেকে স্মৃতি-রোমন্থনের মতই মহাভারত থেকে সঙ্কলিত এই সব খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ-দৃশ্যে কবির উন্মাদনার চিহ্ন। কোথাও দুঃশাসনকে ভীমসেনের সরোষ আক্রমণ—

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে;

হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে ;—
পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে ;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।

—দুঃশাসন

কোথাও দুর্যোধনের সঙ্গে ভীমের গদাযুদ্ধের উল্লসিত বর্ণনা—

দুই মত্ত হস্তী যথা উর্ধ্ব শুণ্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল রণে,
গরজিলা দুর্যোধন, গরজিলা অরি
ভীমসেন। ধূলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল ;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে ;
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন ! যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজ্বলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা,
বিজলী ; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
উগারিল অগ্নি-কণা দরশন হরা !
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে ॥

—গদাযুদ্ধ

কোথাও কৌশলে অগ্রসর হবার জন্য পার্থের প্রতি সাবধান-বাণী ('কিরাতার্জুনীয়ম্'), কোথাও 'শিশুপাল' বধের বর্ণনা, আবার কোথাও বা সদ্য ছদ্মবেশ-মুক্ত বীরের 'গোগৃহরণে' চরম কৃতিত্বের কাহিনী। কবি-চিত্ত যেন সদ্য নিদ্রোত্থিত সিংহের মত বহুকাল পরে রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তার শিরায় শিরায় সেই রক্ত গতিতে চঞ্চল, নেশায় ফেনিল হয়ে উঠেছে। তবে সিংহ-চিত্তের এই উজ্জীবন ক্ষণিকের, এবং এই শেষবারের জন্য চির-নির্বাণের পূর্ব-মুহূর্তের প্রজ্বলন মাত্র ; আর 'কুরুক্ষেত্রে' অভিমন্যু-বেশে এই কবি-প্রাণই—

ছাড়িল জীবন-আশা তরুণ যৌবনে !

কিন্তু মহাভারতের সুদূর রাজ্য মধুসূদনের কাছে কেবলই সংগ্রাম-ক্ষুব্ধ নয়।

একদিকে যুদ্ধের তাণ্ডব, অন্য দিকে প্রেমের ঐশ্বর্য। অন্য ভাষায় বলতে গেলে প্রেম-ধন-লাভের আশায়ই যেন এই সংগ্রাম।—

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজগরে,
চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল্য রতনে ;
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-ধনে।

—পুরুরবা

কিন্তু উর্বশী বা সুভদ্রার যে খণ্ড-চিত্রগুলি এখানে অঙ্কিত তাকে কোন দিক দিয়েই প্রেমচিত্র আখ্যা দেওয়া যায় না। অর্জুনের এই সম্ভোগ-দৃশ্য—

তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা সুক্ষণে,
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে।

—সুভদ্রা

কিংবা উর্বশীর এই উদ্দাম কাম-নিবেদন—

উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্বশী ;
"কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিঙ্করী ;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থরথরি।"

—উর্বশী

এ কেবলই দেহ-মিলনের কথা। বরং এ দেহ-মিলনের মধ্যে এক স্থূল রূঢ়তা আছে, প্রেমজ কোমলতার কোন চিহ্নই যেন নেই। কিন্তু এই-ই হল মহাকাব্যিক জীবনবোধ ;—একদিকে বর্বর সংগ্রাম ও শত্রুর বক্ষোরক্তপান আর অপরদিকে হৃদয়স্পর্শহীন নারী দেহ-সম্ভোগ।

প্রসঙ্গত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে চিত্রিত মানবজীবন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তার উল্লেখ করা চলে।—

> রামায়ণ-মহাভারত ও হোমরের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। ......সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার

উপর কোন আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ্, কোনরূপ রঙ্-ফলানো ছিল না।"
—মহাকাব্য

মধুসূদনের দৃষ্টির কিছু সাদৃশ্য এর সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রাণের অন্তরালে মহাভারতের মহাকাব্যিক পটভূমিতে একটি কাব্য-রচনার প্রেরণা হয়তো কবির ছিল। হয়তো আরব্ধ 'সুভদ্রাহরণ' কাব্য কিংবা অন্যতর চেষ্টায় এ প্রেরণা রূপবদ্ধ হতে পারত। তার মধ্য দিয়ে কি এই বাধাবন্ধহীন জীবনের উচ্ছল রসধারা কবি পান করতে চেয়েছিলেন ?

অকুণ্ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কোন বাধাবন্ধ ; নাই চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাই ঘর-পর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত
অকাতরে , —রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু সে অলিখিত কাব্য নিয়ে কল্পনায় রসাস্বাদ নিরর্থক। এই সনেটে সেই অলিখিত মহাকাব্যের ভগ্ন অংশগুলি যেন ছড়িয়ে আছে।

খণ্ডিত প্রকাশ বলেই এদের সাহায্যে স্পষ্ট করে বুঝবার উপায় নেই, কবিজীবনের এই শেষ পর্বে মহাকাব্যগুলি সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কবিচিত্তে দানা বেঁধে ছিল কি না। তবে যে বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত সনেটে মিলছে তা যে রবীন্দ্রনাথের বোধ ও ব্যাখ্যা থেকে মূলত পৃথক তা সহজেই বোঝা যায়। মহাকাব্যের কাহিনী ও চরিত্রকে মধুসূদন আপন বিশিষ্ট কবি-ভাবনা দ্বারা বহুলাংশে পরিবর্তিত করেছেন। কিন্তু ধর্ম, ভক্তি বা কোন আদর্শবাদী মননের মধ্য দিয়ে মহাকাব্যকে দেখেন নি। তার প্রমাণ এই সনেটগুলি। এর পেছনে বস্তু-অনুগ ক্লাসিক দৃষ্টির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করলে মধুসূদনের এই বৈশিষ্ট্যটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায়, বহু গদ্য রচনায় আপনার বিশেষ ভাবদৃষ্টির বর্ণে রঞ্জিত করে রামায়ণ-মহাভারতকে উপস্থিত করেছেন। রামায়ণ তাঁর কাছে যুগপৎ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে আদর্শ এক বীরর্ষভের কাহিনী, বিশ্ববেদনার এক আশ্চর্য অনুরণন। হারিয়ে যায় সব কিছু, ঘটনার বহুলতা মিলিয়ে যায়, বীরত্বের গৌরব বিলুপ্ত হয়, থাকে শুধু—

শুধু সে দিনের একখানি সুর
চিরদিন ধরে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে।
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবের কানে।
—পুরস্কার

আর মহাভারত তাঁর কাছে মনে হয়েছে—

কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার,
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিকো আর।…
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান্,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চিরমানবের প্রাণে।
—পুরস্কার

এক অলিখিত মহাকাব্যের বিরাট হর্ম্যের কয়েকটি অব্যবহৃত প্রস্তরখণ্ডের মতই ছড়িয়ে আছে মধুসূদনের এ সনেটগুলি। সম্পূর্ণ এবং সার্থক কবিতা হিসেবে এই সনেটগুলি সম্বন্ধে তাই প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু আপন মনের সঞ্চয় থেকে খসে-পড়া এই সনেটের মনিচূর্ণগুলির চিহ্ন এঁকে এঁকে মধুসূদনের কবিপ্রাণ বিদায়ের পথ ধরেছে—এ-দিক দিয়ে এ-রচনাগুলির একটা বিশেষ ধরনের সার্থকতা আছে॥

॥ ছয় ॥

মধুস্থদনের কিছু কবিতায় কবির স্বাদেশিকতার পরিচয় আছে। মেঘনাদ-বধ কাব্যে লঙ্কার স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম কিংবা বিভীষণের প্রাণে দেশপ্রেম উদ্দীপিত করবার জন্য ইন্দ্রজিতের যে ভাষণ—তার মধ্য দিয়ে কবির দেশভক্তির অপ্রত্যক্ষ কিন্তু কাব্যিক পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। এ অপ্রত্যক্ষতা নানা কারণে জটিল ;—কাহিনী এবং চরিত্রের নিজস্ব গতিভঙ্গি, আর কবিমনের বিচিত্র আকুতি, আসক্তি ও প্রবণতার মিশ্র প্রতিক্রিয়া এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত, কিন্তু চতুর্দশপদীতে অন্তত কয়েকটি কবিতায় কবির স্বদেশপ্রেম প্রত্যক্ষতা পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশবোধের প্রকাশ খুব দীর্ঘদিনের ইতিহাস নয়। পাশ্চাত্য প্রভাবের পথ বেয়ে আমাদের জীবনবোধ এবং সাহিত্যে যে সব নব চেতনার জন্ম হয়েছিল, স্বাদেশিকতা তার মধ্যে অন্যতম। নানা আর্থনীতিক ও সামাজিক কারণে এক-ভারত-চেতনা কিংবা বঙ্গজননীর প্রতি শ্রদ্ধা এ পর্বেই এদেশে প্রথম দেখা যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের নানা কবিতায় এর প্রারম্ভিক প্রকাশ মেলে। রঙ্গলালের কাহিনী-কাব্যগুলিতেও নানা অপ্রত্যক্ষ ভঙ্গিতে এই স্বদেশপ্রেম প্রকাশিত। এই নানা ভঙ্গির জাতীয়তাবোধ ও তার আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব-দ্বিধা সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কৃষক-আন্দোলনগুলির প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গি, নীলকর-বিদ্রোহের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কবির জড়িত হয়ে পড়া প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই এবং প্রয়োজনও নেই। বর্তমানে এ কথা বলাই যথেষ্ট যে সনেটগুলিতে মধুস্থদনের যে দেশপ্রেম তা সংগ্রাম-ক্ষুব্ধ নয়, তা পরাধীনতার বেদনায় আপ্লুত কিন্তু বিদেশী শাসনের অবসানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয়।

সমসাময়িককালে এ জাতীয় কবিতা-রচনায় হেমচন্দ্রের খ্যাতিই হয়েছিল সর্বাধিক। মধুস্থদনের এ কবিতাগুলির বিচারপ্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে, যদিও হেমচন্দ্র আরও কিছুকাল পরে তাঁর এ-জাতীয় কবিতা-গুলির রচনা শুরু করেন। হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' কিংবা 'ভারত-বিলাপ'-এ উচ্চকণ্ঠ মঞ্চবক্তৃতায় রাজনৈতিক জ্বালাকে প্রচার করার চেষ্টা হয়েছে, সাধারণ রাজনীতির বোধ এখানে কবিচিত্তের ব্যক্তিগত চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত হয় নি। ফলে কবিহৃদয়ের আন্দোলনজাত কাব্যরূপ এবং কাব্যভাষা হেমচন্দ্রে অনুপস্থিত। কিন্তু মধুস্থদনের সনেটগুলি সম্পূর্ণ অন্ত

জাতীয়। তাঁর যে দুটি কবিতায় দেশের পরাধীনতার জন্ম বেদনাবোধ প্রকাশিত তাতেও কবিভাষা একটি বিশেষ রূপে বিধৃত ;—

কি হেতু নিবিল-জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা-ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ?

—আমরা

'ভারত-ভূমি' কবিতায় যুগে যুগে বার বার পরপদানত এই দেশের কথা বলতে গিয়েও কবির কবি-প্রাণই আলোড়িত হয়েছে, এই পরাধীনতার কারণ যে তাঁর ঐশ্বর্যময়ী-রূপ এই গন্ত-বিবৃতিতেই শেষ হয় নি—

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ? রতন-সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !

মধুসূদনের এই স্বদেশ-ভক্তির পেছনে কোন রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক দৃষ্টি নেই। দেশকে কবি ভালবেসেছেন দেশের ভাষাকে প্রাণ-মন-চেতনা দিয়ে ভালবেসে। এ ভালবাসা মূলত কবি-প্রাণের উৎসেই জন্মেছে। দেশের প্রকৃতির রূপসম্ভোগ এ প্রেমকে স্পষ্ট ও বাস্তব করে তুলেছে ; আর বহুকালব্যাপী যে উৎসব ও আনন্দ একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে এ দেশবাসীর জীবনে তারই কমনীয় সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে কবি এ দেশকে ভালবেসেছেন। মধুসূদনের এ দেশপ্রেমও রূপতান্ত্রিক এবং আবেগকম্পিত। দেশের উৎসবানুষ্ঠানের ঐতিহ্যানুসরণে যেটুকু বুদ্ধির ক্রিয়া চলেছে কাব্যদেহে তাও কিন্তু আবেগের রসেই স্থিতিলাভ করেছে।

হেমচন্দ্রের কবিতা আপনার দেশের পরিচয় দিতে গিয়ে যেখানে বীরত্বোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের তথ্য-মন্থন করেছে—

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,

এ ভারতভূমি যবনের দাস,
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!
আর্য্যাবর্ত-জয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা!

মধুসূদনের আত্মপরিচিতি সেখানে দেশের সৌন্দর্যবর্ণনায় মুখর—

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুরকালে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী, যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস ঊর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন-শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ!) হেরি ভীষণ মূরতি,—
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্তকাননে,
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী,—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে,—
সে দেশে জনম মম, জননী ভারতী;...

—পরিচয়

এই আত্ম-পরিচয়ে হেমচন্দ্রের অপেক্ষা কম আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায় নি। দেশের পরাধীনতার জন্য কবি-হৃদয়ে বেদনা আছে ('আমরা', 'ভারত-ভূমি') যদিও সে বেদনার অনুভূতি রূপে-বিধৃত; আর প্রকৃতির অকৃপণ দানে ধন্যা জন্মভূমির জন্য গৌরববোধ আছে।

একদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য—অপরদিকে উৎসবমুখর মানুষ। এই উৎসবের সূত্রেই এক বৃন্তে অতীত আর সৌন্দর্য বিধৃত। যুগ-যুগান্তর ধরে বঙ্গবাসী দোল, দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়েই আপন মানবসত্তার সৌন্দর্য-মাহাত্ম্যকে দৈনন্দিনতার ক্লেদমুক্ত করে উপলব্ধি করতে শিখেছে। সাংসারিকতার মালিন্য-জড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাণবকদের এই জগৎ মধুসূদনের কল্পনার সুউচ্চ

গাম্ভীর্যকে আদৌ আকর্ষণ করতে পারত না। রাবণের মত grand fellow-রাই তাঁর মনের মানুষ। তাই উৎসবের সৌন্দর্যে ও আনন্দে রোজকার বর্ণ-হীনতাকে কবি বর্ণোজ্জ্বল করে তুলেছেন আর এই পথেই তাদের সামীপ্য উপলব্ধি করেছেন।

আগমনী আর বিজয়া গানের সুর বাঙালীর প্রাণের সুর। বালিকা কন্যার বিবহের পর মাতৃহৃদয়ের আনন্দ-বেদনার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এ সুরের ঝঙ্কার ওঠে। জাতির প্রিয়তম উৎসবের সঙ্গে বাঙালী তার এই প্রাণের সুরকে সংযোজিত করে দিয়েছে। মধুসূদন অনাধুনিক এই সব কাব্যসঙ্গীতের রসসুধা পান করেছেন এবং সুউচ্চ হোমরীয় ভাবকল্পনা এবং মিল্‌টনীয় ছন্দসঙ্গীতের পাশাপাশি এই গ্রাম্য সুরটিকেও হৃদয়ের কোণে সম্মান-স্থান দিয়েছেন, আর দিয়েছেন বলেই এ সনেটগুলিকে কৃত্রিম বলে মনে হয় না আদৌ। সেই গ্রাম্য কবিদের মত মধুসূদনও মহিষমর্দিনীর মধ্যে বাংলার মায়ের উমাকেই দেখেছেন—

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দিনীরূপে ভকতের ঘরে ;

—আশ্বিন মাস

আর নবমীর রাত্রে মেনকার কণ্ঠে বলেছেন—

যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।

—বিজয়া-দশমী

মধুসূদনের এ কবিতাগুলি দেখে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে প্রবাসে দারিদ্র্যে তিনি আবার প্রাণেমনে হিন্দু ধর্মের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কবির মনের পরিচয় হিন্দু বা খ্রীস্টান ধর্মের মাপকাঠিতে বিচার্য নয় ;—দেশকে এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়েই কবি ভালবেসেছিলেন, আর এই উৎসবানুষ্ঠানের মধুর কমনীয়তাই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। হিন্দু-মুসলমান বা খ্রীস্টান কোনো ধর্মের প্রতিই ধর্মহিসেবে তাঁর আকর্ষণ আত্যন্তিক ছিল না। আপন প্রাণের বন্যা একদা হিন্দুধর্মের গণ্ডী ভেঙে বাইরে বেরুতে চেয়েছিল। সুদূর ইংলণ্ডের তটপ্রান্তে সমুদ্রের ঢেউ হয়ে পৌঁছুবার সাধ ছিল বলেই খ্রীস্টানত্বের অঙ্গীকার, আবার সৌন্দর্যে-সুষমায়-লালিত্যে আকর্ষণীয় বলেই, জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশের চিহ্নবাহী বলেই কোজাগর লক্ষ্মীপূজা আর

দেবদোলের বিষয়ের প্রতি আনুগত্য, আবার বেদনা আর বীরত্বের অমর কাহিনী বলেই 'মহরমে'র দিকে তাঁর আকর্ষণ। সত্যই জীবনে অথবা সৃষ্টিতে অন্য শ্রেষ্ঠ কবির মত মধুসূদনেরও একটিমাত্র ধর্ম—সে হল কবি-ধর্ম ॥

॥ সাত ॥

পূর্ববর্তী আলোচনায় মধুসূদনের স্বদেশবোধের যে বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে তাতে ভাষার স্থানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশকে কবি ভালবেসেছেন বঙ্গভাষার মাধুর্যের এবং সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে। আর তাঁর সমগ্র জীবনের মহত্তর যে কামনা—মহাকবি হিসেবে অমর হবার কামনা—তারও দ্বার উন্মুক্ত করেছে এই বঙ্গভাষা—

পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে ॥
—বঙ্গভাষা

দেশবিদেশের কাব্যকুঞ্জবনে মাধুকরী বৃত্তি মধুসূদনের। দ্বিধাহীন চিত্তে বিদেশী ভাব-কল্পনা এমন কি ছন্দ-বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত তিনি আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করেছেন। বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে তিনি বন্ধুদের স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন—

> I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama···Do you dislike Moore's poetry because it is full of orientalism, Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and modes of thinking; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

কিন্তু তবুও তাঁর সাধনা বঙ্গভারতীর। পাশ্চাত্য ভাব ও রসবোধ বঙ্গভাষার আধারে পরিবেষণের চেষ্টায়ই এসেছে তাঁর মহাকবিত্ব—Captive Ladie-র রচনায় নয়। তাই বঙ্গভাষার প্রতি আকর্ষণ তাঁর মাতার আহ্বান,—

নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?)

—সমাপ্তে

অপরিণত চিত্তের কিছু খণ্ডিত চেষ্টার পরে কবির যে জীবন-সাধনা তা এই ভাষারই সাধনা। এই ভাষাবন্ধ রূপেই তাঁর দেশপরিচিতি, তাঁর অমরত্বের কামনা, তাঁর সৃষ্টির উৎসব। তাই মাতৃভাষার নিন্দুকের প্রতি তাঁর এই আঘাত আপন অপরিণত যৌবনের উন্নাসিকতাকেও—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ লো সুন্দরি
ভাষা!—শত ধিক তারে! ভুলে সে কি করি
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী?
রূপ-হীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী?
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কুধ্বনি?
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী!

—ভাষা

কবি সীতার সঙ্গে উপমিত করেছেন তাঁর ভাষাকে। এই আশ্চর্য সার্থক চিত্রকল্প অনায়াসে কবির চেতনা ও বেদনাকে ধরে রেখেছে। যে বেদনা কবির জীবনের ও সৃষ্টির, যে বেদনা তাঁর ভাষা-চর্চার, সেও কি সীতারই মত জনমদুঃখিনী?[১২]

কবির কাছে ভাষাও রূপ ধরেছে। মধুসূদনের মনের জগৎটি হচ্ছে রূপের জগৎ—চিত্রের জগৎ। 'ভাষা' এখানে মূর্তিধারণ করে, ছন্দস্পন্দও এখানে দেহী হয়ে ওঠে—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—

—মিত্রাক্ষর

প্রসঙ্গত বিদেশী কবি-সমালোচকের একটি কথা মনে পড়ে যায়। "কবিরা কানে কথা বলে আর মুখে কথা শোনে।"—পল ভ্যালেরী। অর্থাৎ কবিত্বের মধ্যে আছে একটা ওলট-পালট ব্যাপার, ইন্দ্রিয়ানুভূতির একটা চূড়ান্ত বিপর্যয়। এ বিপর্যয়টা দুভাবেই ঘটতে পারে—অথবা এর কোন একটি ভাবে। কবি-মন আর কাব্যসৃষ্টি কিংবা কাব্যপাঠ আর তার রসগ্রহণ। মধুসূদনের আলোচ্য কবিতাগুলির মধ্যে এর একটি সরল পরিচয় মেলে। ছন্দের স্পন্দন ও গতিভঙ্গি মূর্তি ধরে কাব্যসৃষ্টিতে। যা ছিল শোনার ব্যাপার তা-ই হয়ে দাঁড়ায় দেখার, আবার পাঠকমনে নানা রসানুভূতির বৈচিত্র্য মধুসূদনের কবিতায় ব্যক্তিমূর্তিতে জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। কবির কাব্যশিল্পের অন্যতম মূলকথাই এই চিত্রায়ণ।

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে উপযুক্ত সাধনায় রাগরাগিণীর মূর্তিধারণের কথা আছে। মধুসূদনও 'রস' সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে যা পাঠকমনে আস্বাদ্যমাত্র তাকেও ভাষাবদ্ধ করে মানবদেহে রূপায়িত করেছেন।

রসকুলপতি 'বীররস'কে কবি দেখলেন বীরেন্দ্রের বেশে—

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে, বায়ু-রথে পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন! ভীম শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীরমদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারি ভীষণে!

অথবা রস-কুলরানী করুণা বামাকে—

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে, মলিন-মুখী, শরতের শশী,
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদু কাঁদে সুবদনা ঝরঝরে ঝরি,
গলে অশ্রুবিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি!

—করুণ রস

এবং এমনি ভাবে রৌদ্র ও শৃঙ্গার রসও মানবদেহ নিয়ে আমাদের সম্মুখে দেখা দিল। 'করুণ রস'-এ অবশ্য কারুণ্য নেই, সুন্দরীর ক্রন্দনের বিশিষ্ট সৌন্দর্য-আস্বাদ আছে। কিন্তু অন্য তিনটি কবিতায় দেহধারী সার্থকনামা। এও তো এক ধরনের ইন্দ্রিয়-বিপর্যয়েরই নমুনা। তবুও এখানে বিপর্যয়ের পদ্ধতিটি সরল এবং কবিতা হিসেবেও এরা অত্যুৎকৃষ্ট নয়।

মধুসূদনের সৃষ্টিধর্মের ব্যতিক্রম কোথাও হয় নি। যে-কোন বিষয়ই কবির মনের স্পর্শে এবং কবিভাষায় বিধৃত হয়ে নবতর কাব্য-নির্মিতিতে সার্থক। আর কবির কাজ যে এই সৃষ্টিধর্ম সে সম্পর্কেও মধুসূদন অবহিত। দেশী-বিদেশী কাব্যরসপানে আপন বুদ্ধিবৃত্তিও অনুভূতিকে পরিপুষ্ট করেছেন তিনি। তাঁর পত্রাবলী নিঃসন্দেহে সমসাময়িক বাংলার শ্রেষ্ঠ কাব্যসরবেত্তার স্থান তাঁকেই দেবে। তাঁর একাধিক কবিতায়ও এই কাব্যতত্ত্ব-চেতনার পরিচয় আছে। শব্দসজ্জায়, পয়ার-বন্ধে বা অনুপ্রাস-যমকের মধ্যে কবিত্ব নেই ;—

> সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
> যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
> অস্তগামী-ভানু-প্রভা সদৃশ বিতরি
> ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।

এই কল্পনা বা 'প্রতিভা'র অধিকারীই তো কবি। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার মত স্রষ্টা। সমগ্র বস্তুবিশ্ব তাঁরই ইঙ্গিতে নবতর রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নবতর ভাব-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে,—

> আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে,
> অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছাবলে ,
> নন্দন কানন হতে যে সুজন আনে
> পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমল ,
> মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
> বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে।

॥ আট ॥

বিদেশী কবিদের নিয়ে লেখা সনেটগুলি সর্বপ্রথমেই আমাদের দৃষ্টিতে একটি বিশেষ প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। হোমর, ভার্জিল, টাসো ও ওভিড-এর সম্পর্কে কোনো সনেট যে কেন লেখা হল না, এর উত্তর মেলা সহজ নয়। যে মিল্‌টন সম্পর্কে কবির উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা তাঁর পত্রাবলীতে বারংবার প্রকাশিত তাঁর সম্পর্কেও একটি সনেট এখানে মিলছে না। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে,—

জীবনে যে আশা সফল হয় না, সাহিত্যের কল্পতরুতে তাহাই ফল

প্রসব করে। দেশে থাকিতে এই সব বিদেশী কবিদের স্পর্শ তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সার্থকতায় চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল। এই সব কবিদের সফলীভূত আকাঙ্ক্ষা আর কাব্যের সামগ্রী ছিল না।

—মাইকেল মধুসূদন

কিন্তু এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট যুক্তিবহ বলে মনে হয় না। তাহলে সীতা দেবী বা রামায়ণ-কাহিনী নিয়ে সনেট লিখবার চেষ্টা করতেন না কবি।

কবিতা হিসেবে এই পর্যায়ের রচনাগুলির মূল্য অসামান্য নয়। পেত্রার্কার (২নং কবিতা) সনেটকে ক্ষুদ্র মণির সঙ্গে উপমিত করা কিংবা দান্তের প্রশস্তিতে তাঁর Divine Comedy-র নরক-ভ্রমণের উল্লেখ—

দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।

ছাড়া এঁদের কারুরই কবি-প্রাণের বৈশিষ্ট্য কিংবা মধুসূদনের চিত্তপটে মুদ্রিত তাঁদের বিশেষ রূপমূর্তির সন্ধান এ সনেটগুলিতে নেই। এ প্রশস্তি-বাচন তাই কবি-আত্মার সমগ্রতার আলোড়নজাত নয়, এর উৎস হৃদয়, মন ও বুদ্ধির অন্য নানা স্তরে অনুসন্ধানযোগ্য।

এই গুচ্ছের মধ্যে গোল্‌ডস্টুকার সম্বন্ধীয় রচনাটি কবিতা হিসেবে উন্নততর। গোল্‌ডস্টুকার খ্যাতনামা সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত। মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর সংযোগের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী কবির একটি চিঠি থেকে উদ্ধার করা যায়। বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি চিঠিতে কবি বলেছেন,

I have even refused the offer of the Bengali Professorship at University College, London, a post of great honour and dignity though without a salary. Dr. Goldstucker (of whom you have no doubt heard) was very anxious to have me, but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary. The Doctor is a profound Sanskrit scholar and

loves all Hindus. We spoke about you (he knows you well by name) and the remarriage of widows.

আলোচ্য সনেটটির কাব্য-কল্পনা এবং কবিভাষার সৌন্দর্যও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য,—

কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে ?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে ,
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে !
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি।—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে।

কবি-চিত্তের জাগরণ এখানে নিশ্চিত অনুভব করা যায়। মাত্র একটি দুটি পংক্তিতে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত মহাকাব্যের ঐশ্বর্যের প্রাণকেন্দ্রে যেন কবি আমাদের নিয়ে যান। কালিদাস এখানে সখা, বাল্মীকির রামায়ণ-গান সুকল বীণাধ্বনি কিন্তু মহাভারতের 'মহাগীত-ধ্বনি গিরিজাত স্রোতঃ-সম ভীম ধ্বনি করে ॥'

॥ নয় ॥

স্বল্প কয়েকটি কবিতায় মধুসূদন প্রেমানুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন। মেঘনাদবধ-ব্রজাঙ্গনা-বীরাঙ্গনার নানা ধবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য থেকেও প্রেম সম্পর্কে একটা সাধারণ বোধ লক্ষ্য করা যায়। সীতার একক উদাহরণ বাদ দিলে মধুসূদনের প্রেমচেতনা কিছু প্রগল্ভ, কিছু অতিমাত্রায় দেহসচেতন। প্রকৃতির সঙ্গে কোন সহজ সম্পর্ক স্থাপিত করে বস্তু-অতীত ভাবকল্পনার সুদূরে এ প্রেমানুভূতি পক্ষবিস্তার করে না। তাঁর প্রেমবোধে তাই সূক্ষ্মতার অভাব সর্বদা লক্ষ্য করা যায়। চরিত্রের বলিষ্ঠ সর্ববাধালঙ্ঘনকারী প্রত্যক্ষতা স্থূলতাকেও বহু ক্ষেত্রে মর্যাদা দিয়েছে। তবে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কবি মধুসূদনের ব্যক্তি-হৃদয়ের প্রেমজিজ্ঞাসার প্রতিফলন মিলতে পারে। এ দিক দিয়ে পাঠকদের বিস্ময়ের কারণ আছে। মধুসূদন বাক্-সংযম অভ্যাস করেন নি। বলা যেতে পারে এটি তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য যে, জীবনে, কথায় ও কাব্যচেতনায় একই রাজ্যের অধিবাসী তিনি। অথচ আপন প্রেমকেন্দ্রিত জীবনের যথার্থ সংবাদ সেই বহু বাক্য

ও বহু কাব্যের মধ্যে আদৌ প্রকাশিত নয়। সরব কবি আপন জীবন-কামনার নানা দিগন্ত সম্পর্কে যত উচ্চবাক্, ঠিক তত মৌন আপন ব্যক্তিজীবনের এই অতি মূল্যবান বোধ সম্পর্কে। একবার মাত্র 'আশার ছলনে ভুলি' কবিতার দীর্ঘশ্বাসে আপনার ব্যক্তিজীবনের প্রেমের ব্যর্থতার বেদনা মূর্ছিত হয়েছে—

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে,
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

অথচ দ্বিতীয় পত্নী হেনরিয়েটা-সহ কবির দাম্পত্য জীবন সুখে-দুঃখে প্রেমগভীর ছিল এরূপ সাক্ষ্য তাঁর জীবনীকারেরা এবং বন্ধুবান্ধবেরা সবাই দিয়ে থাকেন। তবে কিসের এ অতৃপ্তি ? জীবনের তথ্যান্বেষণে এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে বলে আমার বিশ্বাস নয়। এই একটিমাত্র প্রশ্নে বন্ধুদের নিকটে লিখিত তাঁর পত্রগুলি আমাদের খুব সাহায্য করে না। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সঙ্গে তাঁর প্রকৃত সম্পর্ক, রেবেকার সঙ্গে বিবাহ ও বিচ্ছেদ বিষয়ক মনোজগতের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ কোন দলিল-পত্রের সাহায্যেই আজ আর বোঝা যাবে না।

লক্ষণীয় মাত্র চার-পাঁচটি কবিতাকেই মধুসূদনের ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করা চলে। অথচ যে পেত্রার্কার অনুসরণে তাঁর সনেট রচনার সাধনা তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি লরাকে লক্ষ্য করে লেখা প্রণয়াত্মক কবিতাগুলিতে। অথচ কবি মধুসূদন আপন ব্যক্তিহৃদয়ের সেই নিগূঢ় স্থানটির উন্মোচনে এত কৃপণ। মনের প্রত্যেকটি স্তরের উদ্‌ঘাটনে কবির উৎসাহ যেখানে সীমাহীন উদ্বেল, সেখানে হৃদয়ের এই মহলের দ্বার বিস্ময়কর ভাবেই রুদ্ধ।

"সতত সঙ্গিনী মোর সংসার মাঝারে"-কে লক্ষ্য করে লেখা কবিতায় কবির আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা প্রকাশিত। উত্তেজনাহীন প্রশান্ত বর্ণে রঞ্জিত এ প্রতিমা—

প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে।

একটা কোমল পেলবতা ধরা দিয়েছে উপমাদিচয়নে—

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি ;

কিংবা—

সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস,

আদিত্যের জ্যোতিতেও এখানে যেন উজ্জ্বলতা আছে, উত্তেজনা নেই, জ্বালা নেই। সম্ভবত ধূমায়িত অন্তর্দাহে বিকল কবির শান্তিকামনা হেনরিয়েটার প্রেমকে আশ্রয় করেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে নীড় রচনা করেছিল। কিন্তু হেনরিয়েটাকে লক্ষ্য করে লেখা এ কবিতায় কবিচিত্তের রূপবদ্ধ সার্থক প্রকাশ ঘটে নি। মধুসূদনের সূর্য-দীপ্ত চিত্ত কি কেবল প্রশান্তির সাধনায় পরিতৃপ্ত ? যদি পরিতৃপ্তিই আসত তবে বেদনার দীর্ঘশ্বাস কেন ? আবার 'মেঘদূত' (প্রথম) কবিতার শেষ পংক্তি দুটিতে যদি প্রবাস থেকে বাস্তবত পত্নীকে লক্ষ্য করা হয়ে থাকে তবে সেখানেও এই শান্ত মৃদুতার সুরের সামীপ্য আবিষ্কার করা যায়।

কিন্তু মধুসূদনের প্রেমকামনায় উত্তেজনার জ্বালা ছিল, মদিরমত্ত প্রগল্‌ভ ঐশ্বর্য ছিল, কিছু স্থূল দেহবোধও ছিল। মধুসূদনের অন্য কাব্যগুলি এরূপ প্রমাণ করে। সনেটগুচ্ছে সঙ্কলিত দুটি কবিতায়ও এ কোটির পরিচয় আছে। কখনও নারীদেহের বর্ণনায় ও অলঙ্করণ-বৈদগ্ধ্যে কামবাসনার রক্তিম রঞ্জন—

কামের নিকুঞ্জ এই ! কত যে কি ফলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে।
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে,
কদম্ব, বিম্বিকা, রম্ভা, চম্পকের সনে !
সাপিনীরে হেরি, ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল ; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু-নয়নে।

আর কখনও অলঙ্করণকে লঙ্ঘন করে কামকলার উদ্দাম উন্মুক্ত বর্ণনা—

নহি আমি, চারু-নেত্রা, সৌমিত্রি কেশরী ;
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে ?
চন্দ্রচূড়-রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।

গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি ; দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধরে
মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি !

কাব্যশিল্প হিসেবে এদের সার্থকতা প্রশ্নের অতীত নয়। তবে কবিপ্রাণ যে এখানে উল্লসিত ভাষারূপে তার নজির মেলে। মধুসূদনের প্রেমোপলব্ধির হতাশ দীর্ঘশ্বাসের বীজ কোথায়? প্রশান্ত দাম্পত্য-জীবন ও পেলব পত্নীপ্রীতির অন্তরালে ইন্দ্রিয়বন্ধচূর্ণকারী অতি প্রবল ও উদ্দাম কামনামদিরতায় কি ?

॥ দশ ॥

নীতি, ধর্ম, তত্ত্ব বিষয়ে যে সামান্য কয়েকটি সনেট মধুসূদন লিখেছেন তাদের কাব্যমূল্য অধিক নয়। কবির কবিচিত্ত কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ব্যাকুল ছিল না। মধুসূদনের সনেটকে কবি আসক্তি-মুক্তির কাব্য বলে যাঁরা অভিহিত করতে চেয়েছেন তাঁরা এ কাব্যের এবং কবি-অন্তরের যথার্থ পরিচয় পেয়েছেন বলে মনে হয় না। মধুসূদন প্রবল আসক্তির কবি। এ আসক্তি ক্ষত্রিয়োচিত, বিশ্বগ্রাসী কামনা এর। আর এই আসক্তির মধ্যে মহাধ্বংসে এবং বিপুল আর্তনাদেই তাঁর কাব্যজীবনের কেন্দ্রীয় সত্য নিহিত। দর্শন-শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল না, এবং কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসায় তিনি ব্যাকুলও ছিলেন না। তাঁর জীবন-প্রশ্নগুলি সরল, জটিল নয়, তবে গভীর।

'সৃষ্টিকর্তা' নামক কবিতায় কবির যে প্রশ্ন—

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য-কথা, বিশ্বে আমি মন্দমতি ?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি ;—
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি—
ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে !

তার মধ্যে দার্শনিক বিশ্ব-জিজ্ঞাসার সুর বিশেষ বাজে নি। বসুমতীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ, সূর্যের হেমবর্ণ ঔজ্জ্বল্যে উদ্বুদ্ধ, চন্দ্রকিরণের পেলবতায় মোহগ্রস্ত কবি

এদের উৎসে হানা দিতে চান—কী সৌন্দর্য, কী ঔজ্জ্বল্য, কী পেলবতা, কী উত্তেজনা সেখানে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে উপলব্ধি করবার জন্য। এ কৌতূহল রূপ-বুভুক্ষুর, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর নয়। 'সূর্য' নামক সনেটেও সূর্যের রূপ ভাষাবদ্ধ করবার পরে সূর্যস্রষ্টা ঈশ্বরের মহিমার কথা তোলা হয়েছে শেষের দুই চরণে। এ কবিতায় ঈশ্বরের মহিমা-কথন যেমন প্রাণহীন, সূর্যরূপ-বর্ণনায়ও তেমনি মামুলি শব্দচয়ন লক্ষণীয়। আসলে মধুসূদনের সঙ্গে ঈশ্বর, ধর্ম, তত্ত্ববোধের সম্পর্ক অধিক ছিল না। এ-জাতীয় দু একটি কবিতা তিনি নানা কারণে লিখলেও সত্যকার অন্তর-প্রেরণা এদের রচনার পেছনে অনুভব করেছেন এমন মনে হয় না।

নীতিবোধ সম্পর্কেও তিনি বড় ব্যাকুল ছিলেন না। তবে দু একটি সনেটে দ্বেষ ত্যাগ করবার এবং সর্পের ন্যায় সুন্দর কিন্তু ভয়ঙ্কর নারী থেকে দূরে থাকবার উপদেশ আছে। কুসুমে কীটের অবস্থান দেখে বেদনাবোধ আছে, ভারসলেস নগরে রাজপুরী ও উদ্যান দেখে পার্থিব বস্তু-ঐশ্বর্যের অনিত্যতার চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। এ কবিতাগুলি উপদেশপ্রধান বা চিন্তা ও সিদ্ধান্ত মূলক। কবিতায় উপদেশদানের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মধুসূদনের এ কবিতাগুলিও সার্থক ও সুন্দর হয় নি। যে উপলক্ষে কবি নীতিকথাটির উত্থাপন করেছেন তা প্রায়ই চিত্ররূপে ধন্য হয় নি, কারণ কবি তাকে লক্ষ্য করেন নি, নীতি-প্রচার-রূপ লক্ষ্যের সোপান বলে মনে করেছেন। ভারসলেসের ভগ্ন উদ্যান ও রাজপুরীর চিত্রের বর্ণনায় ও বিবর্ণ বর্ণে প্রকাশ পায় নি অনিত্যতার হাহাকার। অবার কেউটিয়া সাপ কবিতায় শেষ দুই চরণে হঠাৎ বিষধরের ন্যায় নারীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। রূপ-বিচ্ছিন্ন চিন্তা কাব্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়, এদের অদ্বয় সম্পর্কই কবিতায় অভিপ্রেত। সেদিক থেকে মধুসূদনের ব্যর্থতা লক্ষ্য করবার মত ॥

॥ এগারো ॥

মধুসূদনের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পূর্বে নানা কথা বলা হয়েছে। এই জিনিসটিই লক্ষ্য করেছি যে কবির প্রকৃতি জড়ত্বের বন্ধন উন্মোচন করে চেতন হয়ে উঠেছে মাঝে মাঝে কিন্তু স্বাধীন হয়ে ওঠে নি কখনই ; মানুষের জীবন-লীলার পটভূমি রচনা করেছে, তার অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পায় নি। এদিক

দিয়ে সনেটগুলির প্রকৃতিবোধ একটু স্বতন্ত্র। সনেটে কবি প্রকৃতির কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবেশ বা সামগ্রীকে তাঁর কাব্যকল্পনার বিষয়ীভূত করেছেন এবং তাদের রূপায়ণকে স্বাতন্ত্র্যে দীপামান করে তুলেছেন—মানবমনের কোন বিশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষা কিংবা অনুভূতির পটভূমি হিসেবেই তাদের উপস্থাপনা ঘটে নি। এর মানে অবশ্য এই নয় যে কবির মন-নিরপেক্ষ কয়েকটি বস্তুচিত্র এখানে সঙ্কলিত। সনেট-গুচ্ছে কবির দৃষ্টি যে প্রধানত আপন হৃদয়ের সাপেক্ষতার পথানুবর্তী এ সত্য আমরা পূর্বের নানা আলোচনায় দেখেছি। আর নিসর্গ-কবিতার সার্থকতাও কোন প্রাকৃতিক বস্তু বা দৃশ্যের যথাযথ রূপচিত্রাঙ্কনে নয়, কবি-হৃদয়ের সঙ্গে তার সুগভীর অন্তরঙ্গতায়।

নিসর্গ দৃষ্টিতে কবিদের মধ্যে পার্থক্য থাকে আর থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ-জাতীয় কাব্যের দুটি নিষেধের সীমানা অবশ্য স্বীকার্য। একদিকে প্রকৃতির বস্তু-যাথার্থ্যে এর সমাপ্তি নয়, অন্যদিকে প্রকৃতিকে অবলম্বন-মাত্র করে কবিমনের নানা অনুভূতি কিংবা চিন্তার জাল বিস্তারেও এ সার্থক নয়। প্রকৃতির বাস্তবতা এবং কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও মুহূর্তচেতনা (mood) এদেরই সমন্বয়ে নিসর্গ-কবিতার সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সীমাবদ্ধ মানবজীবনের খণ্ডতাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও আনন্দের সমন্বয়ে অসীমের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন, মধুসূদনের কবিতায় যে তেমন ভাবকল্পনার সন্ধান মিলবে না, এ খুবই স্বাভাবিক। মধুসূদনের কবি-দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ থেকে যে ভিন্নতর তা আমরা আগেই দেখেছি। মধুসূদনের কবি-মনের বৈশিষ্ট্য - কি প্রেম কি সৌন্দর্যবোধ—সর্বত্রই সীমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ, অসীমের ধ্যানে রুদ্ধ নয়।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে এক দুরত্বের করুণ ব্যঞ্জনা কবিচিত্তকে আকুল করে তুলবে এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। মধুসূদনের কবি-মন কিন্তু সন্ধ্যার এই ধ্বনি-সঙ্গীতে মুগ্ধ না হয়ে তার মধ্য থেকে বহু বর্ণোজ্জ্বল চিত্রের সম্ভাবনাকে গ্রহণ করেছে এবং ভাষায় বিকশিতও করেছে। মধুসূদনের দৃষ্টিতে এক বর্ণবিহ্বলতা ছিল। তাঁর চিত্র কেবল রেখায় রেখায় জীবন্ত নয়, বহু বর্ণে উজ্জ্বল এবং বহু রত্নে ভূষিতও। এই চিত্রণ-ক্ষমতা এবং বর্ণবিহ্বলতা সন্ধ্যার অন্ধকারের অস্পষ্টতাকে ভেদ করে কবি-চক্ষে সত্য করে তুলেছে তার অন্য মূর্তি—এ মূর্তিতে কবির ব্যক্তি-আমির অংশও তাই বিজড়িত।

চেয়ে দেখ, চলিছেন মুদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে!

—সায়ংকাল

সন্ধ্যার আকাশে একটি মাত্র তারার ভাবাসঙ্গটি সাধারণ ভাবে সুদূরাভিমুখী বলেই মনে হয়। হয়তো রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালব্যাপী সৃষ্টির প্রাচুর্য এ সম্বন্ধে আধুনিক বাঙালী পাঠকের মনে একটি সিদ্ধরসের সৃষ্টি করেছে। কবির গানের সুরে—

প্রহর জাগে প্রহরী জাগে
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

পৃথিবীর মানুষের উজ্জীবনেই নয়, সুদূর নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে বিহার করে এ এক অরূপের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ করে পাঠকের চেতনাকে। মধুসূদনের কবি-কল্পনা কিন্তু ভিন্নতর। সন্ধ্যার একটি তারা মণি-মাণিক্যের দীপ্তি নিয়ে দেখা দেয় তাঁর কাছে—নিকটকেই সে উজ্জ্বল করে, দূরকে নিকুট করে না—করে না নিকটকে দূরের উড্ডীয়মান পক্ষে স্থাপন ;—

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জলে?

—সায়ংকালের তারা

স্বভাবতই মধুসূদনের কল্পনার রাত্রিও অমানিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন নয়। এ রাত্রি বাসন্তপূর্ণিমার উজ্জ্বল সৌন্দর্যে ও প্রেম-মিলনের পরিবেশে ধন্য। কবি পরম আনন্দে চিত্রে-বর্ণে এই সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছেন তাঁর 'নিশা' কবিতায়—

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি!—সুহাস মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।

এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নিশা-কল্পনার পার্থক্য অনুধাবনযোগ্য। শরৎচন্দ্রের কাছে,

> অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে।···এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা তত অন্ধকার।

—শ্রীকান্ত

আর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে—

তুমি একেশ্বরী রাণী বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপুরে
সুগম্ভীরা হে শ্যামা সুন্দরী।
দিবসের ক্ষয়ক্ষীণ বিরাট ভাণ্ডারে প্রবেশিয়া
নীরবে রাখিছ ভাণ্ড ভরি।
নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তি-সিংহাসনে
তোমার মহান্ জাগরণ।
আমারে জাগায়ে রাখো সে নিস্তব্ধ জাগরণ তলে
নির্নিমেষ পূর্ণ সচেতন।

এঁদের দৃষ্টির ও সৃষ্টির মৌল পার্থক্যটি নিশ্চয়ই আর অধিক আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

মধুসূদনের কবিতায় 'নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষতলে শিব-মন্দির'-এ—

রাজসূয় যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে; আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ ·· ।

আর 'ছায়াপথ' বাসন্ত-পূর্ণিমা রাত্রের উপযুক্ত মিলন-সঙ্কেতই বহন করে,—

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে,—সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,

মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারাগণে—

সৌন্দর্য্যে ?—

এ সৌন্দর্যে রহস্যের দ্যোতনা নেই বলে কি একে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দেওয়া চলে ?

পর্বত-নদী ও বিহঙ্গ সম্পর্কিত কয়েকটি কবিতা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে।

'পরেশনাথ গিরি' কবির কল্পনাকে যে উদ্বুদ্ধ করবে এ খুবই স্বাভাবিক। পর্বত ও সমুদ্রই মধুসূদনের চিত্তের বিস্তৃতিকে আর উন্নতিকে ধারণ করতে সক্ষম। পরেশনাথের মধ্যে একটি পর্বতের গৌরব ও গাম্ভীর্য সুনিপুণ ভাবে রূপায়িত করেছেন কবি,—

হেরি দূরে ঊর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মূরতি ?

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটিতে নদীর স্বরূপের চেয়ে একটি ভাব-রূপই অধিকতর স্পষ্ট। আপন হৃদয়ের রোমান্টিক বেদনা বাসনা ও আকুতি ওই একটি নামকে কেন্দ্র করে কল্লোলিত। নিসর্গ-কবিতা হিসেবে না হলেও সাধারণভাবে এটির মূল্য অসামান্য। নিঃসন্দেহে এ কবিতার মূল প্রেরণা বিশুদ্ধ রোমান্টিক। বিদেশে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের পরিবেশে দরিদ্র কপোতাক্ষ নদের স্মৃতি রোমন্থন বিধর্মী এবং বিদেশপ্রাণ কবির স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন বলে অনেক ব্যাখ্যা করেছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন—

'সীন' তাঁহার স্মৃতিপট হইতে কপোতাক্ষের ছবি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই :

জুড়াই এ কাল আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদী-জলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

—দেশমাতার প্রতি প্রেমভক্তির এমন সুন্দর ছবি, দেশাত্মবোধের এমন মমতাপূত অভিব্যক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যে আর আছে কি ?

—সাহিত্য, ১৩২৩

কবি নিজে গৌরদাসকে লেখা একটি চিঠিতে এই কবিতাটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন—

> You again date your letter from Bagirhat. Is this Bagirhat on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca, the Italian poet, and scribbling some sonnets, after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ।

কবির পত্র পড়ে সমালোচকদের আরোপিত অভিপ্রায়টি আদৌ যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। কবতক্ষ নদই বা কেন তাঁর দেশাত্মবোধের প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে। শৈশবের স্বল্প পরিচয় একটা মায়াময় স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ করে দিয়েছে এই পর্যন্ত।

'বসন্তে একটি পাখীর প্রতি' কবিতায়ও সেই সৌন্দর্যের আকুতি, সেই বহু বর্ণোজ্জ্বলতার প্রতি কবি-চিত্তের আকর্ষণ—

দুরন্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এদেশে
নির্দ্দয়; ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি।
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি!—
ডাক তুমি ঋতুরাজে, মনোহর বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি!

একমাত্র 'শ্যামাপক্ষী' কবিতায় কবির ব্যক্তিক বেদনা বিহঙ্গের বেদনার্তির সঙ্গে একাকার হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক সঙ্গীতস্রোতে এবং সে সঙ্গীতোচ্ছ্বাস পিঞ্জর ভঙ্গ করে অসীমকে স্পর্শ করতে চেয়েছে,—

আঁধার পিঞ্জরে তুই, কুঞ্জ-বিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে?
কে মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর? বুঝা রে, ঁ. বুঝিতে না পারি!
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃশ্য ও কারাগারে নয়নের বারি?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীতিধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি?

আর আকাশ থেকে, সায়ংকালের রত্নপ্রতিম একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র নয়, অসীমের স্পর্শবাহী একটি তারা কবিপ্রাণের রূপের সীমার দেয়াল মুহূর্তের জন্যও যেন চূর্ণ করেছে।—

নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি তলে, সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ-মন্দিরে?
কিম্বা, দেহ-কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
ভালবাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয়-আঁধার তার খেদাইতে দূরে?

—তারা

পরিশেষে এ-কথা বলব চূড়ান্ত কাব্যবিচারে সর্বত্র এ কবিতাগুচ্ছ সনেটের আস্বাদ বহন না করলেও এখানে কবিহৃদয়ের অজস্র মণিরত্ন সঞ্চিত হয়ে আছে। নিজের বুকের রক্ত আর চোখের জলে ভিজিয়ে এই রত্নকণিকা ছড়িয়ে কবি আপন বিদায়-পথকে চিহ্নিত করে গিয়েছেন॥

১ এই প্রসঙ্গে জন্মকাল থেকে ঊনিশ শতক পর্যন্ত সনেটের ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করা চলে। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকে সিসিলির কবিগোষ্ঠীর হাতে সনেটের জন্ম। 'Vita Nuava'-তে দান্তে এর অনুসরণ করেন। সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মধ্যেও এর প্রচলন হয়। পেত্রার্কা 'Rime'-এ লরা দি-নর্ভির প্রতি তাঁর আদর্শায়িত প্রেম প্রকাশ করেন সনেটের মাধ্যমে। ভাব ও রূপে এখানেই সনেট প্রথম স্বতন্ত্র পুষ্টি ও পরিণতি পায়। ষোড়শ শতক পর্যন্ত ইতালীতেই সনেট সীমাবদ্ধ থাকে। এইকালে স্পেনে পেত্রার্কা-সনেটের প্রবর্তন করেন বস্‌কান এবং গার্সিলাসো। ইংলণ্ডে প্রথম উইট এবং পরে সারে সনেটের প্রচলন করেন ইতালীয় আদর্শে। এবং প্রথম থেকেই উইটের সনেটে একজোড়া সমিল পংক্তিতে সমাপ্ত করার বিশেষ প্রবণতা দেখা দেয়। সারের সনেটে একটি করে বিকল্প পংক্তিতে (alternate) মিল দেবার চেষ্টা লক্ষণীয়। ইংলণ্ডে স্পেন্সার, সিডনে প্রমুখের সাধনার মধ্য দিয়ে শেক্সপীয়রে এসে সনেট এক আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং পেত্রার্কা-ধারা থেকে আপনার স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে। ফ্রান্সে ক্লিমেন্ট ম্যারট এবং সেন্ট-জিলেস কর্তৃক সনেট প্রবর্তিত হয়। এর পরে দুবেলে পেত্রার্কা-আদর্শ অনুসরণে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। এই সময় থেকেই রনসাউ-প্রমুখের সনেটে কিছু কিছু বিশিষ্ট ফরাসী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ষোড়শ শতকে একটি মূল ভাবের (প্রধানত কবিপ্রেয়সীকে লক্ষ্য করে আত্মউদ্ঘাটন) কেন্দ্রে সনেটগুচ্ছ রচনার দিকেই প্রধান আকর্ষণ ছিল। সপ্তদশ শতকে প্রাধান্য পেল খণ্ড খণ্ড সনেট রচনার রীতি। সভাকবিদের হাতে এর অবক্ষয় সূচিত হলেও কোন কোন স্পেনীয় ও জার্মান কবির হাতে ধর্ম ও যুদ্ধবিষয় বর্ণনায় সার্থকতার পরিচয় মেলে। এবং মিল্‌টন একে নব মাহাত্ম্যে উন্নীত করেন।

আঠরো শতকে সনেট-রচনা-প্রবণতা বিস্ময়করভাবে অবলুপ্ত হয় এবং উনিশ শতকে পশ্চিম য়ুরোপের সর্বদেশের রোমান্টিক কবিকুলের হাতে সনেটের পুনর্জন্ম ঘটে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স, ব্রাউনিং বা বোদলেয়রের সার্থক রচনা এই শতাব্দীতে সনেটের একটা বিশেষ অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে তোলে। মধুসূদনের য়ুরোপবাসকালে এই সনেট-পরিবেশ তাঁকে চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় কতটা প্ররোচিত করেছিল তাও ভাববার মত।

২ জি. রবার্টসন সনেট-রূপের দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখছেন, "It has proved equally opposite for the expression of deep personal emotion and of domestic affection, for subtle analysis of feeling, for the evocation of moods and memories, for religious, patriotic, political and satirical themes. Its stylized yet relatively flexible form, which permits it to espouse the poets' thought without losing its identity ; its length, which for most poets has proved a satisfactory length in which to explore and present a single concept ; the possibility of linking it in sequences, these have been the chief technical reasons for its persistence."

৩ বিখ্যাত সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন তাঁর 'মধুসূদনের অন্তর্জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন, "মধু ছিলেন বৃহৎ ভাব-পারাবার বিমুক্ত আকাশ-বিহারী পক্ষী। গীতি কবিতার বিশেষতঃ আধুনিক বঙ্গের এই সঙ্গীতজাতীয় কবিতার ক্ষুদ্রপঞ্জরের মধ্যে তাহার পাখা মেলিবার অবকাশও যেন হয় নাই। এজন্য কোন কোন কবিতায় মধুসূদনের শিল্পাদর্শটি পৃথক বলিয়া মনে হইবে এবং উহাদের ভাবগ্রহ ও উল্লাসও যেন কাহিল বলিয়াই মনে হইবে। উহারা যেন তাঁহার চিত্ত-স্পন্দনকেই ধরিতে পারিতেছে না।"

৪ মধুসূদনের "রেখো মা দাসেরে মনে" এবং "আশার ছলনে ভুলি" কবিতা দুটির মধ্যে প্রথম নবধরনের বিশুদ্ধ লিরিক কবিতার সাক্ষাৎ মেলে। অবশ্য বিহারীলালের কবিতায় এই জাতীয় কাব্যরূপের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

৫ "এস্থলে মধুসূদন অত্যধিক সূক্ষ্মতার দিকে না যাইয়া বৃহৎ তুলিকা হস্তে কেবল ভাবের বৃহৎ প্রবাহগতি এবং বিপুল উচ্ছ্বাসের ধারণাতেই অব৷ • হইয়াছিলেন এবং উহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াই নিজেকে এ জীবনের জন্য কৃতার্থ করিয়াছিলেন।" শশাঙ্কমোহন সেন: মধুসূদনের অন্তর্জীবন।

৬ কবি এর পরেও বহুদিন বেঁচে ছিলেন। এখানে আমি 'কবিপ্রাণে'র মৃত্যুর ইঙ্গিত করছি।

৭ কবির ইংলণ্ড গমনের সংকল্প যে তাঁর চেতনার আরও গভীর ও জটিল কারণের ফল তা আমি স্থানান্তরে আলোচনা করেছি।

৮ "I hope you will write to me in France, and that I shall live and go back to India, to tell my countrymen that you are not only Vidyasagara but Karuna-sagara also !"—বিদ্যাসাগরকে লিখিত পত্রের অংশ।

৯ একদিন Albion's distant shore-ই ছিল এই অমরাবতী। কিন্তু আজ এ অমরাবতীও তো তাঁর আত্মার সংকট-মোচনে অপারগ। তাই-ই এই নবতর নন্দন-কাননের কামনা।

১০ "The subject is truly heroic, only the monkeys spoil the joke……"—পত্রাংশটি প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য।

১১ কবি মুকুন্দরামের আত্মজীবনী পঠিতব্য।

১২ প্রায় একই সময়ে ভার্সাই থেকে গৌরদাসকে লেখা এই চিঠিতে কবির সচেতন মনোভাবেরও পরিচয় জানা যাবে—"After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue……. If there be any among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue, that is his legitimate sphere, his proper element. European scholarship is good in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilised quarters of the globe but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those who feel that they have fresh thought in them, fly to their mother tongue. Here is a bit of lecture for you and the gents who fancy that they are swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays ! I assure you that they are nothing of the sort. I should scorn pretensions of that man to be called 'educated' who is not master of his own language."

দশম অধ্যায়
মধুসূদনের অসমাপ্ত রচনা

"যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না"

"প্রতিভা ক্ষ্যাপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট্‌পালট্‌ করিতেই আসে—তাহা আজিকার এই খাপ ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া, দিনের মতো হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়—কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে, কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে।"

—রবীন্দ্রনাথ। বিচিত্র প্রবন্ধ

॥ এক ॥

সাহিত্যিকেরা কোনো কোনো রচনা মৃত্যুকালে অসমাপ্ত রেখে যাবেন এ ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া কোনো কোনো রচনা আরম্ভ করবার পরে মধ্য পথেই নানা কারণে পরিত্যক্ত হতে পারে। সমালোচক-গবেষকেরা এই সব অসম্পূর্ণ রচনা খুঁজে বের করেন। শিল্পীর মনের অন্দর-মহলের অনেক গুপ্ত পরিচয়, এই রচনাগুলির মধ্য দিয়ে পাওয়া যেতে পারে। পূর্ণাঙ্গ রচনা যেন শিল্প-রঙ্গমঞ্চের সুসজ্জিত অভিনয়, এই সব ভাঙা-চোরা লেখায় শিল্পীমনের অমার্জিত অসজ্জিত নেপথ্যলোক উদ্ঘাটিত হয়।

মধুসূদনের স্বল্পকালস্থায়ী সাহিত্যজীবনে এ-জাতীয় রচনার সংখ্যা অনেক। অল্প সময়ে অনেক কিছু করতে চেয়েছিলেন কবি। বিপুল কিছু—মহৎ কিছু। বহু বিচিত্রকে তাঁর সৃষ্টির জালে ধরতে চেয়েছিলেন। কবির ভগ্ন খণ্ড রচনাংশ-গুলি সেই চাওয়ার পরিচয় বহন করে, আর সঙ্গে সঙ্গে না পাবার বেদনাও।

মধুসূদনের অসম্পূর্ণ রচনাগুলির একটি তালিকা সঙ্কলন করা প্রথমেই প্রয়োজন।[১]

নাম	শ্রেণীপরিচয়	কি পরিমাণ রচিত হয়েছিল	রচনাকাল
সুভদ্রা[২]	নাট্যকাব্য	দুই অঙ্ক সমাপ্ত করেছিলেন, কিন্তু কিছুই একালের হাতে এসে পৌছয় নি।	১৮৫৯ সালের শেষ দিকে কিংবা ১৮৬০ সালের প্রথম দিকে।

নাম	শ্রেণীপরিচয়	কি পরিমাণ রচিত হয়েছিল	রচনাকাল
রিজিয়া[৩]	নাটক ; অমিত্রাক্ষর ছন্দে এবং গদ্যে	খুব অল্পই লেখা হয়েছিল। আলতুনিয়ার একটি স্বগতোক্তিমূলক সংলাপের কতকাংশ মাত্র পাওয়া গিয়েছে।	১৮৬০ সালের প্রথম দিকে।
'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' -এর 'বিহার' নামক ২য় সর্গ	কবিতা	মাত্র তিনটি স্তবক লেখা হয়েছিল।	১৮৬০ সালের এপ্রিলের আগে।
সিংহল-বিজয়[৪]	অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহাকাব্য	প্রারম্ভিক কয়েকটি পংক্তি মাত্র লেখা হয়েছিল।	১৮৬১ সালের মাঝামাঝি।
'বীরাঙ্গনা কাব্য' -এর ২য় খণ্ড	কবিতা	অসম্পূর্ণ পাঁচটি কবিতা।	১৮৬২ সালের ফেব্রুআরির পরে।
দ্রৌপদীস্বয়ম্বর, মৎস্যগন্ধা, সুভদ্রা-হরণ, পাণ্ডববিজয়, দুর্যোধনের মৃত্যু।	ভারত-বৃত্তান্তের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীকাব্য বা সব মিলে একটি মহাকাব্য (?)	কতকগুলি কবিতার অল্পই রচিত হয়েছিল।	১৮৬৩ সাল থেকে ১৮৬৪-এর মধ্যে।[৫]
হেক্টর বধ	হোমরের ইলিয়াডের সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদ	প্রায় অর্ধাংশ রচিত হয়েছিল।	১৮৬৭ সাল।[৬]
বিষ না ধনুর্গুণ	নাটক		১৮৭৩-৭৪ সাল।
দেবদানবীয়ম্	ব্যঙ্গ কবিতা	কয়েকটি চরণ	জীবনের শেষভাগ

এই রচনাগুলি পূর্ণাঙ্গরূপ পেল না কেন তা এক কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন কারণ কাজ করেছে। সেই কারণ বিশ্লেষণ করলে

মধুসূদনের স্রষ্টা চিত্তের এমন কিছু পরিচয় মিলবে, যে পরিচয় তাঁর পূর্ণাঙ্গ রচনাগুলি ধরে দিতে পারে না॥

॥ দুই ॥

ব্রজাঙ্গনার 'বিহার' খণ্ডের খণ্ডিত (?) কবিতাটি রূপে-রসে এ কাব্যের অন্যান্য কবিতার সমজাতীয়। ব্রজাঙ্গনার কবিতাগুলির কাব্যমূল্য বেশি নয়। তবুও কবির ক্ষমতার পূর্ণ দীপ্তির যুগে এদের সৃষ্টি। অস্তাচলগামী কবি-প্রতিভার পক্ষে কোনো রচনা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করা অনেক বেশি স্বাভাবিক। ব্রজাঙ্গনার দ্বিতীয় সর্গ লেখা হল না কেন তা ভাববার কথা।

ব্রজাঙ্গনার প্রথম সর্গ 'বিরহ' তিনি শেষ করলেন, দ্বিতীয় সর্গ 'বিহার' পরিত্যক্ত হল; এতে মনে হতে পারে বিচ্ছেদে যে কবিত্বের অবকাশ ছিল রাধার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে, মিলনের অতিনৈকট্যে তা বিনষ্ট হল। কবির রসপ্রেরণা তাই শেষ পর্যন্ত সজীব থাকতে পারে নি। এরূপ সিদ্ধান্ত মানার পক্ষে বাধা আছে। প্রথমত, মধুসূদনের প্রেমধারণায় বিরহকে মিলনের ঊর্ধ্বে স্থান দেবার কোন প্রবণতা নেই। "কেন তুমি মূর্তি ধরে এলে রহিলে না ধ্যানে ধারণায় ?" এ বেদনা মধুসূদনের নয়। দ্বিতীয়ত, ব্রজাঙ্গনার 'বিরহ' সর্গেও যত ক্রন্দন সম্ভোগবাসনাও তত প্রবল।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যটি তাঁর কবিচিত্তের বিশ্রাম- ছন্দের কারুনৈপুণ্যের রাজ্যে।[৭] তিলোত্তমা কাব্য শেষ করার আগে এ কাব্যটির শুরু এবং মেঘনাদবধ কাব্য আরম্ভ হতে হতেই এ কাব্যের শেষ। মধুসূদনের কবিমনে এই মৃদু প্রণয়গীতির সুর দীর্ঘকাল আসন পাতে নি। তিলোত্তমা সম্ভবের সৌন্দর্য এবং নব ছন্দ সঙ্গীতের উন্মাদনা থেকে মেঘনাদবধ কাব্যের গম্ভীর মাহাত্ম্যে পৌঁছুবার মাঝখানে এ কাব্য বিশ্রামের একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। তিনি যখন ব্রজাঙ্গনার প্রথম সর্গ শেষ করেছেন তখন মেঘনাদবধ কাব্যের আহ্বান পৌঁছে গিয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনা যাই-ই থাক কবিকল্পনার সঙ্গে তার মিলন আর সম্ভব হল না। প্রাপ্ত স্তবক তিনটি ঐ পরিকল্পনার চিহ্নবাহী। স্রষ্টা মধুসূদন তখন ক্ষয়িষ্ণু স্বর্ণলঙ্কার পথ ধরেছেন॥

॥ তিন ॥

মধুসূদন কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লেখেন,

"Some weeks ago I sent you the First Act of সুভদ্রা

through our friend Jodu. Here goes the Second Act. I must tell you, my good friend, that I do not intend this drama for the stage. It is simply a dramatic poem."

১৮৬০ সালের আগস্ট মাসের ৬ তারিখে কৃষ্ণকুমারীর রচনা আরম্ভ হয়। অসম্পূর্ণ সুভদ্রা কাব্যনাট্য রচনাকালে কবি কৃষ্ণকুমারী নাটকের পরিকল্পনাও করেন নি। প্রহসন দুটি তখন রচিত হয়েছে, কিন্তু মুদ্রিত হয় নি। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ তখন পর্যন্ত ভগ্ন শিবমন্দির নামে পরিচিত। কবি ঐ চিঠিতে লিখছেন, "What about the Farce, the ভগ্ন শিবমন্দির?" পদ্মাবতী নাটকও তখন লেখা হয়ে গিয়েছে। কাজেই ১৮৫৯ সালের একেবারে শেষ ভাগ অথবা ১৮৬০ সালের একেবারে প্রথম ভাগে সুভদ্রার অঙ্ক দুটি রচিত হয়েছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে। কাব্যনাট্য রচনা দ্বিতীয় অঙ্কের বেশি এগোয় নি।[৮] এই অংশটুকুও আমাদের হাতে এসে পৌছয় নি। মধুসূদন কাব্যনাট্য রচনায় কি জাতীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সম্ভবত তার পরিচয় মিলত এই খণ্ডিত রচনাটির মধ্যে। মহাভারতের সুভদ্রাবিবাহ কাহিনীটি মধুসূদনের প্রিয় ছিল। একাধিকবার এই কাহিনী নিয়ে তিনি একটা কিছু লিখতে চেয়েছেন। কিন্তু কোনটিই শেষ করতে পারেন নি। একটি সনেটে তিনি এই ব্যর্থতার জন্য দুঃখও প্রকাশ করেছেন। সুভদ্রাহরণের কাহিনীতে এমন কিছু আছে যা মধুসূদনকে মুগ্ধ করত। স্বাধীন প্রেমকে চরিতার্থ করবার জন্য সুভদ্রার সব বাধা উত্তরণ এবং বীর্যবত্তা প্রকাশই সম্ভবত বিশেষ করে মধুসূদনকে আকর্ষণ করেছিল।

সুভদ্রাহরণ রচনা আরও একদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। কবির কাব্য-নাট্যের বিশিষ্ট রীতির প্রতি প্রীতি কত তীব্র ছিল এর মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ মেলে। মধুসূদনের প্রতিভার মধ্যে নাটকীয়তা ছিল। প্রহসন দুটি এবং কৃষ্ণকুমারীতে তার পরিচয় আছে। কিন্তু ঘটনা তরঙ্গিত খাঁটি নাটকের রাজ্য থেকে ভাবাবেগপ্রধান কবিত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রহসন ছাড়া সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতীতে নাটকে অবৈধভাবে কবিত্বের প্রবেশ ঘটেছে। কাব্যের মধ্যেও নানা উপায়ে নাট্যরস সঞ্চারের চেষ্টা তাঁর মুখ্য রচনাগুলিতে দেখা যায়। মেঘনাদবধ নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। বীরাঙ্গনা তো প্রায় dramatic monologue। নাট্যকাব্যে কবি এমন একটা জগৎ সৃষ্টি

করতে চাইলেন যেখানে কবিত্ব নাটকের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করে নাট্যাস্বাদে বিঘ্ন ঘটাবে না, আবার নাট্যরস কবিতার আনুগত্য মেনে তাকে অলঙ্কৃত মাত্র করবে না। কাব্যনাট্যে কবিত্ব এবং নাটকত্ব দুই-ই স্বাধীন এবং সমন্বিত। বাংলা কাব্যনাট্যের ধারাস্রষ্টা হিসেবে কবিকে গৌরব দিতে পারত সুভদ্রা। কিন্তু সুভদ্রা সম্পূর্ণ হয় নি, এবং অসম্পূর্ণ কাব্যনাট্যটিও হারিয়ে গিয়েছে।

সুভদ্রা সম্পূর্ণ হল না কেন, এ প্রশ্নটি তোলা সঙ্গত। তিনি যদিও কেশববাবুকে লিখেছিলেন, কাব্যনাট্যটি অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত নয়। কিন্তু তা কবির মনের কথা ছিল না। কারণ, সুভদ্রার রচিত অংশটুকু তিনি অভিনেতা কেশববাবুকে পাঠিয়েছেন। কেন? বেলগাছিয়া থিয়েটারে কেশববাবুর প্রভাব আছে, তিনি জানতেন। একেবারে অভিনব ভঙ্গির এই নাট্যকাব্য বেলগাছিয়ায় অভিনয়ের জন্য সরাসরি প্রস্তাব করতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করেছেন। কিন্তু কেশববাবুকে পাণ্ডুলিপি পাঠাবার মধ্যে একটি নীরব অনুরোধ লুকানো ছিল। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা প্রমাণ দেয় যে আমাদের ধারণা সত্য। তিনি নাট্যকাব্যটি দু অঙ্কের পরে আর না লিখবার কারণ হিসেবে বলেন,…"He did not proceed beyond the second act, because he did not find any countenance from the Rajahs who had been almost closed their theatre." সুভদ্রা অপূর্ণ থাকার এইটিই প্রকৃত কারণ বলে মনে হয়॥

॥ চার ॥

রিজিয়া নাটকের একটি পরিকল্পনা করে কবি কেশববাবুর মারফৎ বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেন। পরিকল্পনাটির প্রথমে কবি চরিত্রগুলির পরিচয় দিয়েছেন।[৯] পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে রিজিয়ার ভ্রাতা এবং পরবর্তী সম্রাট বাইরাম, সিন্ধুর শাসনকর্তা আলতুনিয়া, রিজিয়ার প্রণয়ী জামাল নামক ক্রীতদাস, মনোহর সিংহ নামক রাজপুত সেনাপতি প্রধান। এ ছাড়া আছে আলতুনিয়ার বন্ধু কেবর্ক এবং বালিন, মস্ত নামক এক মাতাল, জনৈক দালাল প্রভৃতি। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে সম্রাজ্ঞী রিজিয়া, সম্রাজ্ঞীর দুই পরিচারিকা,—পারস্যাগত সেরী এবং হিন্দু বালিকা লীলাবতী, আর আছে মস্তের স্ত্রী মেহদী। এর পরে কবি একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখলেন,

"During the life of the Emperor Altamush, Rizia's father, that princess was engaged to be married to Altunia, Governor of Sind. He comes to Delhi—finds the emperor dead, and Rizia reigning in his stead. He also finds his intended wife quite changed and in love with a slave (Jammal) whom she had made the 'Master of the House'—Here the play opens."

তারপরে অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগের পরিকল্পনা, এবং অতি সংক্ষেপে বিষয়বস্তুর উল্লেখ। প্রথম অঙ্কে সিন্ধু প্রত্যাগত আলতুনিয়ার ক্রোধ, ক্ষোভ ও প্রতিশোধস্পৃহা, বন্ধুদ্বয় সমভিব্যাহারে গৃহবন্দী বাইরাম সকাশে গমন। এই অঙ্কের দুটি দৃশ্য।

দ্বিতীয় অঙ্কে বাইরাম ও আলতুনিয়ার রিজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। এই অঙ্কে চারটি দৃশ্য, মনোহর-লীলার প্রণয়মূলক উপকাহিনী এই অঙ্কে কিছুটা বিকাশ লাভ করেছে।

তৃতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য। রিজিয়ার সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করে তাকে বন্দী করল। জামাল নিহত হল। রিজিয়া কৌশলে আলতুনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। তার সহায়তায় সিংহাসন অধিকার করল।

চতুর্থ অঙ্কের দুটি দৃশ্যে বিরোধী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে আলতুনিয়ার পরাজয় ও মৃত্যু এবং রিজিয়ার বন্দীত্বের ঘটনা।

পঞ্চম অঙ্কের দুটি দৃশ্যে রিজিয়ার হত্যা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

এই পরিকল্পনামত তিনি খুব সামান্য অংশই লিখছিলেন। সিন্ধু প্রত্যাগত আলতুনিয়ার সম্রাজ্ঞী রিজিয়া সম্পর্কে প্রথম উপলব্ধি—তার ব্যর্থপ্রণয়ের জ্বালা, ঈর্ষা, অভিমান ও আহত পৌরুষ তীব্র প্রতিশোধস্পৃহার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সুন্দর নাটকীয় স্বগতোক্তিতে ধরা পড়েছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এর রসাবেদন আরও ঘনীভূত করে তুলেছে—

> হা বিধি, অধীর আমি! অধীর কে কবে,
> এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া?
> হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্ব্বকথা কয়ে,
> দ্বিগুণিছে এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে।
> কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি,
> মুহুর্মুহু দংশে আজি জর্জ্জরি হৃদয়ে?

কেমনে, লো দুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায়? সে পূর্ব্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে?
হায় লো সে প্রেমাঙ্কুর কি তাপে শুকাল?
এ হেন সুবর্ণ দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বিধি! ইত্যাদি।

নাটকটি অংশত অমিত্রাক্ষর ছন্দে এবং অংশত গদ্যে লিখবার ইচ্ছা কবির ছিল।[১০]

রিজিয়ার ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে একটি গতিময় ও প্রবৃত্তি-সংক্ষোভপূর্ণ নাটক লেখা সম্ভব এরূপ ধারণা তিনি পোষণ করতেন। মাদ্রাজ প্রবাসকালে "Rizia : the Empress of Inde" নামে যে ইংরেজি নাটকটি তিনি লিখেছিলেন তার সঙ্গে বর্তমান পরিকল্পনার ঘনিষ্ঠ ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। নাট্যরচনায় তিনি মুসলমানী বিষয়ের অনুরক্ত ছিলেন, কারণ—

"We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mahomedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out f intrigue than ours."[১১]

কিন্তু যে কারণে কবির রিজিয়া রচনার উৎসাহ প্রধানত সেই কারণেই বেলগাছিয়ার কর্তৃপক্ষ পত্রপাঠ এই পরিকল্পনাটিকে বাতিল করে দিলেন। মুসলমানী বিষয় নিয়ে রচিত নাটকের অভিনয়-সাফল্য সম্বন্ধে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।[১২] বিফল মনোরথ হয়ে কবি সদ্য আরব্ধ নাটকটি রচনা স্থগিত রাখলেন। কিন্তু দিল্লীর ইতিহাসের একমাত্র মহিলা শাসনকর্ত্রী রিজিয়াকে তিনি ভুলতে পারলেন না। কৃষ্ণকুমারী নাটকটি শেষ করে এই কাজে নূতন করে হাত দেবার বাসনা তাঁর ছিল—

"After this, we must look to 'Rizia'—I hope that will be a drama after your own heart. The prejudice against Moslem names must be given up."[১৩]

॥ পাঁচ ॥

১৮৬০ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে লেখা এক চিঠিতে রাজনারায়ণ বসু মধুসূদনের তিলোত্তমা কাব্যের প্রশংসা করেন এবং বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয়ের উপাখ্যান নিয়ে একটি জাতীয় মহাকাব্য রচনার প্রস্তাব করেন।—

"The conquest of Ceylon by the Bengali prince Vijaya and his companions is I think, a nice subject for an Epic poem to be called the 'Singhala-Vijaya-Kavya' and to be written in an easier style than 'Tilottama'."

এর পরে তিনি বিস্তৃতভাবে সিংহলবিজয় কাব্যের জন্য একটি পরিকল্পনা বিবৃত করেন এবং পরিশেষে মন্তব্য করেন,

"An epic poem like the one suggested above is much required to infuse patriotic zeal and a warlike spirit into the breasts of our degenerate countrymen. It is true that a hundred far more powerful agencies are required to bring about that mighty change, but the poet also must lend his aid to the good work." [১৪]

কিন্তু জাতীয় মহাকাব্য লিখবার মত দক্ষতা তখনও অর্জন করতে পারেন নি বলে কবি তখনই সিংহলবিজয় রচনায় হাত দিতে চান নি। তা ছাড়া মেঘনাদবধ রচনার প্রেরণা তিনি অন্তরে অন্তরে বেশ তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন।[১৫] কিন্তু কবি এই বিষয়টির কথা বিস্মৃত হন নি। রাজনারায়ণ বসুর লিখিত প্রস্তাবটি তিনি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। মূল ইতালীয় ভাষায় টাসোর কাব্য পড়তে পড়তে সুমধুর 'ottava rima' ছন্দে সিংহলবিজয় লিখবার কথা প্রসঙ্গত বলেছিলেন,

"If God spares me, for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one in the Ottava Rima······perhaps I shall write your সিংহলবিজয় in that measure."

সিংহলবিজয় কবির মনকে আকর্ষণ করেছিল। রাজনারায়ণ এই কাহিনীর মধ্যে স্বদেশিকতা প্রচারের উপকরণ দেখেছিলেন। কিন্তু কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুর অভিমতের (এই প্রবন্ধেই একটু আগে তা উদ্ধৃত করেছি) সঙ্গে মধুসূদনের কিছুমাত্র মতৈক্য ছিল না। বিজয়ের কাহিনীটি তাকে উল্লসিত

করেছিল অন্য কারণে। সমুদ্র যাত্রার উত্তেজনা, উত্তুঙ্গ পার্বত্য প্রদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতা প্রভৃতির প্রতি কবির স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। মেঘনাদবধ শেষ করে যখন নূতন কাব্যের বিষয় অনুসন্ধানে তিনি ব্যস্ত তখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বা উষাহরণের কাহিনীর চেয়ে সিংহলবিজয় রচনার ইচ্ছাই তাঁর প্রবল হল। তিনি রাজনারায়ণকে লিখলেন—

"Give me the সিংহল, old boy. I like a subject with oceanic and mountain scenery, with sea-voyages, battles and love adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope."

এবং এই কারণেই তিনি সিংহলবিজয়ের আংশিক পরিকল্পনা তৈরি করলেন এবং তার প্রথম দিকের কিছুটা লিখে ফেললেন। সেই কবিতার এবং পরিকল্পনার কতকাংশ পাওয়া গিয়েছে।

পরিকল্পনার প্রাপ্ত অংশটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে রাজনারায়ণ বসুর প্রস্তাবিত কাহিনী-বিন্যাসের সঙ্গে এর গুরুতর পার্থক্য আছে। মধুসূদন রাজনারায়ণ বাবুর কাছ থেকে গল্পটি গ্রহণ করলেও তাকে আপন কল্পনা অনুযায়ী বিন্যস্ত করবার সিদ্ধান্তই করেছিলেন। কবির পরিকল্পনাটি ছিল নিম্নরূপ—

"Book I—Invocation; description of the voyage. They near Ceylon, when মুরজা excites পবন to raise a storm which disperses the fleet. The ship, with বিজয় and his immediate followers, is wrecked on an unknown island. The hero lands after worshipping the দেবতা of the place and eating প্রসাদ; wanders out alone to explore the island. লক্ষ্মী prays বিষ্ণু to defeat the ill designs of মুরজা. He consoles her and by a favourable gale directs the other ships to same port. The chiefs alarmed by the absence of the prince send messengers all round to seek him. On the return of the messengers without the prince they set sail and retire to a neighbouring island and encamp there.

Book II—The adventures of বিজয়। মূরজা on finding বিজয় separated from his companions sends a যক্ষ to lead him to the city of the king of the island [Andaman]. He marries বিমোহিনী the king's daughter and has a castle in a distant wood assigned for his residence. In the society of his wife he forgets the purpose of his voyage, as well as his companions.

Book III—লক্ষ্মী sends বিজয় a vision. He prepares to leave his new home in search of the companions of his voyage, as also the Island Kingdom promised to him and his descendants"

কবির পরিকল্পনার মধ্যে কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এক। হোমরের 'ওডেসি' মহাকাব্যটির আদর্শ এখানে গ্রহণ করবার চেষ্টা আছে। ট্রয়ধ্বংসের পরে সমুদ্রপথে দেবতাদের ক্রোধে অদিস্যুস যে ভাবে বিপদগ্রস্ত হয়েছিল তার সঙ্গে প্রথম সর্গে বর্ণিত বিজয়ের জীবন ও ভাগ্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুই। মধুসূদনের রচনায় মূরজা চরিত্রটির দেখা আগেও একবার মিলেছে, 'পদ্মাবতী' নাটকে। এখানে তাকে হোমরবর্ণিত চক্রান্তকারী দেবীরূপে উপস্থিত করেছেন কবি। হোমর-কল্পিত হীরীর সঙ্গেই তার মিল বেশি। পবন চরিত্রটি যেন হোমরের সমুদ্র দেবতার আদর্শে পরিকল্পিত। তিন। কবি শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটিও সম্পূর্ণ করবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। লক্ষণীয় তৃতীয় সর্গের পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসারও অর্ধপথেই খণ্ডিত।

সিংহলবিজয় কবিতা রচনা সামান্যই এগিয়েছিল। তার অল্প একটু অংশই মাত্র পাওয়া গিয়েছে। লক্ষ্মীদেবীর অনুগৃহীত বিজয় সিংহ লঙ্কা অধিকারে চলেছে। মূরজা তার রক্ষিত সুন্দরী নগরীটি বিজয় সিংহের হাতে তুলে দিতে রাজী ছিল না। *তা ছাড়া লক্ষ্মীর প্রতি ঈর্ষাও তাকে বিজয় সিংহের বিরুদ্ধবাদী করে তুলেছে। মূরজা বিজয়ের উদ্দেশ্য পণ্ড করবার জন্য বায়ুরাজের সাহায্য লাভের জন্য যাত্রা করেছে। সিংহলবিজয়ের প্রাপ্ত অংশটিতে মূরজার পূর্বোক্ত মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। কবিতা হিসেবে এই কয়েকটি চরণের বিচার করা যায়-না। একটি পরিকল্পিত বৃহৎ মহাকাব্যের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি চরণের যথাযথ সাহিত্য-মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে এই অংশটির

ভাষার অতি মার্জিত রূপ দৃষ্টি এড়ায় না। কবির হাত অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং বাংলা ভাষায় ত্রুটিহীন নৈপুণ্য লাভ করেছে। পরিণত শিল্পসৃষ্টি মেঘনাদবধ কাব্যের সিদ্ধি লাভের অব্যবহিত পরে রচিত এই খণ্ডাংশ ভাষা ও ছন্দের অনায়াস ঔজ্জ্বল্যে পাঠককে মুগ্ধ করে ;—

স্বর্ণ-সৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী—
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা-নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গল-বাদ্য বাজিছে চৌদিকে।
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা ;—
"হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে।
কি লজ্জা ! থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি, সই ! উদ্যানস্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে ? ইত্যাদি।

সামান্য এই রচনাটুকু কাব্যসৌন্দর্য বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট না হলেও ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে মেঘনাদবধ-বীরাঙ্গনার কবির পক্ষে অগৌরবের নয় এ কথা বলা চলে।

'সিংহল-বিজয়' আরম্ভ করেই কবি ছেড়ে দিলেন কেন ? কবির সৃষ্টিক্ষমতা তখন মধ্যগগনে। সুভদ্রা-রিজিয়া নাট্যরচনায় রঙ্গমঞ্চের নিরুৎসাহ বিঘ্ন ঘটিয়েছিল ; কাব্যক্ষেত্রে সেরূপ বাইরের বাধা ছিল না। কবি আপন হৃদয় থেকেই বাধা পেয়েছিলেন।

মেঘনাদবধ কাব্য শেষ করে নূতন কাব্যের বিষয় সন্ধানে যখন কবি ব্যস্ত তখন তিনি রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন,

১. "I am afraid it will not be an easy thing to beat Meghanad, but there is no harm in trying."

২. "I suppose I must bid adieu to Heroic poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something *like a repetition.*"

কবি ঠিকই বুঝেছিলেন। সিংহল-বিজয় নিয়ে অল্প অগ্রসর হবার পরেই তাঁর সন্দেহ রইল না, পুনরুক্তি ঘটবে পদে পদে—মেঘনাদকে অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। বিশেষ করে মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে গঠনরীতিতে আত্যন্ত একাগ্র নিষ্ঠা নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। তার অব্যবহিত পরেই আর একটি নূতন মহাকাব্য রচনার পরিকল্পনা যথেষ্ট বিবেচনাপ্রসূত নয়। কবির মনে সাময়িক বিশ্রামকামনা জাগে নি এমন বলা যায় না। তা ছাড়া অল্পদিনের মধ্যেই বীরাঙ্গনার নব্য আঙ্গিক তাঁকে আকর্ষণ করল। কবি এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন।

> "I have only written 20 or 30 lines of the new epic. In fact I have laid it by,—for a time only, I hope. But within the last few weeks, I have been scribbling a thing called বীরাঙ্গনা ..."

সিংহল-বিজয় লেখার স্বল্পস্থায়ী চেষ্টা এখানেই শেষ হল, কবি নূতন কাব্য বীরাঙ্গনা লেখায় ডুব দিলেন। এখানে পুনরুক্তির ভয় নেই; মেঘনাদবধকে অতিক্রমের প্রশ্নও উঠবে না;—এটি সম্পূর্ণ অন্য জাতের কাব্য। সিংহল-বিজয় আরম্ভেই পরিত্যক্ত হল॥

॥ ছয় ॥

বীরাঙ্গনা কাব্যের পরিকল্পনা জানিয়ে এক চিঠিতে কবি লিখেছিলেন,

> "It is my intention, God willing, to finish this poem in XXI Books. But I must print the XI already finished. The proceeds of the sale of the 1st part must defray the expenses of printing the second."

কবি দ্বিতীয় খণ্ডের প্রস্তাবিত দশটি কবিতার মধ্যে পাঁচটি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ১. ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, ২. অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা, ৩. যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, ৪. নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী, ৫. নলের প্রতি দময়ন্তী। লক্ষণীয় এদের মধ্যে কোনো কবিতাই কবি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। গান্ধারীর পত্রের ৩৬ চরণ, ঊষা পত্রের ২০ চরণ, শর্মিষ্ঠা পত্রের ১৬ চরণ, লক্ষ্মী পত্রের ১৫ চরণ এবং দময়ন্তী পত্রের মাত্র ৫ চরণ লেখা হয়েছিল। কবি একটি শেষ না করেই আর একটি লিখতে আরম্ভ করেছেন, সেটির পূর্ণতা-

সাধনের ধৈর্যও কবি দেখান নি, আর একটি লিখতে শুরু করেছেন। সেখানেও অপূর্ণতার ব্যর্থতাই কবিকে বহন করতে হয়েছে।

বীরাঙ্গনার পূর্ণাঙ্গ প্রথম খণ্ডের শেষ কবিতা জনাপত্রটি লিখবার সময়ে কবি নিজ মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

> "I am very unpoetical just now. God knows in what all this trouble, anxiety, and vexation will end."

বোঝা যাচ্ছে কবির মন তখন অশান্তিতে ভরে গিয়েছিল। কাব্যসৃষ্টির উপযুক্ত চিত্তস্থিতি তখন বিচলিত। শর্মিষ্ঠা নাটক লেখার কাল থেকে (১৮৫৮ খ্রী) বীরাঙ্গনার প্রথম এগারোটি পত্রিকা লেখার সময় পর্যন্ত (১৮৬২ খ্রী) মোটামুটি তাঁর মন এমন একটা প্রশান্তি এবং ভারসাম্য আয়ত্ত করেছিল যা ছাড়া কোনো উৎকৃষ্ট সৃষ্টিই সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘকাল অতি উচ্চ ঐশ্বর্যকামনাকে প্রশমিত করে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর মধ্যে এমন একটা উদ্দাম চলমানতা অপ্রাপ্তকে অধিকার করবার এমন দুর্ধর্ষ সাহসিকতা ছিল, যাতে কোনো নিশ্চিন্ত বন্দরে নোঙর গড়া তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের বিরোধী ছিল। বাংলা কাব্যসাহিত্যের উচ্চতম সিংহাসন যখন তাঁর করায়ত্ত হল তখনই মনে হল অন্যতর রাজ্য দখলের আয়োজন করতে হবে। আর মধু কবি নয়, মাইকেল এম. এস. ডাট. বার-অ্যাট-ল —আত্মপরিচয়ের এই রূপান্তরের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।[১৬] মানসিক অস্থৈর্যের মধ্যে আরব্ধ বীরাঙ্গনার দ্বিতীয় খণ্ডের কবিতাগুলি সম্পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

এই অপূর্ণ কবিতাগুলির বিষয়ের দিকে তাকিয়ে মনে হয় প্রেমিকা নারী-চরিত্রের আরও কতকগুলি বিচিত্র রূপকে ধরে কবি তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যরূপ নায়িকা চরিত্রের এই মালাটিকে আরও পূর্ণতা ও ব্যাপকতা দিতে চেয়েছিলেন। এদের মধ্যে একমাত্র গান্ধারী পত্রে কাব্যসৌন্দর্য সামান্যত লক্ষ্য করা যায়। অন্যগুলি এতই সংক্ষিপ্ত যে কবিতা হিসেবে মূল্য বিচারের প্রশ্নই প্রায় আসে না। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে পতিত্বে বরণ করে চিরকালের জন্য স্বেচ্ছায় অন্ধত্বকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। রূপময় এই পৃথিবীর কাছ থেকে তার বিদায়গ্রহণ সৌন্দর্যে যেমন মনোরম তেমনি বেদনাগর্ভ—

> আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু,
> তব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে ;

তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি,
চারুচন্দ্র, তারাবৃন্দ তোমরা গো সবে।···
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন,
হে উৎস, গিরিদুহিতা জননী মা তুমি,
নদ, নদী, আশীর্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধ হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয় মুখ।··· ইত্যাদি।

এর মধ্যে কি সৌন্দর্যজগৎ থেকে কবির স্বেচ্ছাবৃত বিদায় গ্রহণের বেদনার সুরও বাজে নি?

॥ সাত ॥

মধুসূদন য়ুরোপপ্রবাসকালে 'ভারতবৃত্তান্ত' নাম দিয়ে দুটি কবিতার কতকাংশ লিখেছিলেন। এই কবিতাংশ দুটি ('দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর' এবং 'মৎস্যগন্ধা') ভারতবৃত্তান্ত নামক একটি বৃহত্তর কাব্য পরিকল্পনার দুটি অংশ বলে মনে হয়। ১৮৬৩ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরের প্রাপ্ত অংশটি রচিত। মৎস্যগন্ধা লেখার সময় জানা যায় না।

এ ছাড়া মহাভারতের বিষয় নিয়ে কবি আরও কয়েকটি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। 'সুভদ্রাহরণ', 'পাণ্ডববিজয়', 'দুর্যোধনের মৃত্যু'। এর কোনটিই কয়েকটি চরণের বেশি লেখা হয় নি।

ভারতবৃত্তান্ত নাম দিয়ে কবি যে দুটি অংশ লিখেছিলেন তাকে সংহতদেহ এক কাব্যের মধ্যে বাঁধা যায় না। মৎস্যগন্ধার কাহিনী এবং দ্রৌপদীস্বয়ম্বর মহাভারতের বহু দূর প্রান্তে অবস্থিত। কালগত বা ঘটনাগত ঐক্যের কোনোরূপ সূত্রেই এদের ধরা যায় না।

তা ছাড়া সুভদ্রাহরণ, পাণ্ডববিজয়, দুর্যোধনের মৃত্যু প্রভৃতি নিয়েও কি কবি পৃথক্ পৃথক্ পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করিতে চেয়েছিলেন? এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এ বিষয়ে দুটি অনুমান করা যেতে পারে।

এক। মহাভারতের নানা আকর্ষণীয় ঘটনা নিয়ে ছোট ছোট পূর্ণদেহ কতকগুলি কবিতা লেখার এবং এই স্বতন্ত্র কবিতাগুলির সঙ্কলনকে ভারত-

বৃত্তান্ত নামে পরিচিত করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। বহু স্বতন্ত্র কাহিনীর শিথিল গ্রন্থনের মধ্য দিয়ে একটি নব্য আঙ্গিক প্রবর্তনের বাসনাও হয়ত তাঁর থেকে থাকবে। সম্ভবত সেই ভারতবৃত্তান্তে দ্রৌপদীস্বয়ম্বর, মৎস্যগন্ধা, সুভদ্রাহরণ, পাণ্ডববিজয়, দুর্যোধনের মৃত্যু প্রভৃতি নানা কবিতার স্থান হত।

দুই। আবার এমনও হতে পারে মধুসূদন এক একটি কাব্যরচনা আরম্ভ করছেন, কয়েকটি চরণ লিখবার পরে আর এগুতে চাইছে না মন। কবি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছেন। কিছুকাল চুপচাপ থেকে আবার অন্য একটি বিষয় নিয়ে লিখতে আরম্ভ করছেন একটি স্বতন্ত্র কাব্য, কিন্তু আবার ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি।

তবে এ দুটির মধ্যে আমি প্রথম অনুমানটিকে সমর্থনযোগ্য মনে করি। সুভদ্রাহরণ কাব্য রচনা করতে বসে প্রথমেই তিনি দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের কাহিনীর উল্লেখ করলেন—

> ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
> কৌতুকে করিলা বাস।

বলার ভঙ্গিতে মনে হয় দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের কাহিনী কিছু পূর্বেই কবি বিবৃত করেছেন। দ্বিতীয়ত, দ্রৌপদীর বিবাহ, সুভদ্রাহরণ, পাণ্ডববিজয়, দুর্যোধনের মৃত্যু বিষয়গুলিকে শিথিলসূত্রে গ্রন্থন করা আদৌ অসম্ভব নয়। একমাত্র মৎস্যগন্ধা বিষয়টিকে এর মধ্যে আমন্ত্রণ জানানো কঠিন।

ভারতবৃত্তান্ত বা এর অন্তর্ভুক্ত কোনো ক্ষুদ্র কাব্যই সম্পূর্ণ হয় নি। এর কারণ অনুসন্ধান করলে কবির মনের সমকালীন অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। এক। কবি কিছুকাল আগে যে কারণে সিংহল-বিজয় লিখতে আরম্ভ করেও শেষ করতে পারেন নি, এখানেও অনেকটা সেই একই কারণ লক্ষ্য করা যায়। মেঘনাদবধের মত মহাকাব্য লেখার পরে নূতন মহাকাব্যে পুনরাবৃত্তি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে এ ভয় তাঁর ছিল। দ্রৌপদীস্বয়ম্বর, সুভদ্রাহরণ বা পাণ্ডববিজয়ের আরম্ভ অংশ অনেকটা মেঘনাদবধের মঙ্গলাচরণের মত। দুই। ১৮৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ধারণা করা যেতে পারে এই সব ব্যর্থ চেষ্টায় একবছর দেড় বছরের মত সময় কেটেছে। ১৮৬৫ সালের প্রারম্ভে চতুর্দশপদী কবিতার নূতন জগতে তিনি কিছুকালের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠা পেলেন। মহাকাব্যের জগতে

ব্যর্থ কালক্ষেপ আর নয়। সনেটের সাফল্যে পরিক্রমা চলল। তিন। কবির কবিপ্রতিভার তখনও অবসান ঘটে নি। কিন্তু তা অবক্ষয়মুখী। মহাকাব্য গঠনের জন্ম দীর্ঘ কালব্যাপী যে নিষ্ঠা ও ধৈর্য আশ্রয় করতে হয় তার সম্ভাবনা সম্পূর্ণই তিরোহিত হয়েছিল। আর্থিক অনটনে, য়ুরোপ সম্পর্কে কিছুটা স্বপ্নভঙ্গে কবির মানসিক অবস্থা তখন বেশ বিপর্যস্ত। তা ছাড়াও কবি তখন অন্তরে অনুভব করতে পারছিলেন যে জীবনে এবং কাব্যসাধনায় তাঁর ভাগ্য-সূর্য অস্তমুখী। মনের এই পরিবেশে ভারতবৃত্তান্ত অসমাপ্ত থেকে যাবে, এটিই স্বাভাবিক।

কবিতা হিসেবে এরা প্রায় সবই অকিঞ্চিৎকর। তবে কয়েকটি প্রসঙ্গের দিকে এরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এক। দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের একস্থানে কবি সোজা পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য যতিপাতে কিছুটা স্বাধীনতা লক্ষণীয়—

> বিধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরী
> গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
> আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
> কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি। ইত্যাদি।—

মধুসূদনের লেখা বিশুদ্ধ পয়ার ছন্দের কবিতা আর দেখা যায় না। বাল্যকালে লেখা কয়েকটি পংক্তির কথা এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। ব্রজাঙ্গনা অন্ত্যানুপ্রাস কাব্য হলেও সরল পয়ার-ভঙ্গির নয়।

দুই। সুভদ্রা হরণের প্রারম্ভে শচীর ক্রূর ঈর্ষা-কাতর একটি মূর্তির আভাস দিয়েছেন কবি। পদ্মাবতী নাটকের শচীর কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। এই চরিত্রটিতে হোমরকল্পিত হীরীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

তিন। দুর্যোধনের মৃত্যুর যে অংশটুকু পাওয়া গিয়েছে তার কিঞ্চিৎ কাব্যসৌন্দর্য স্বীকার্য। দুর্যোধনের পুরুষ মূর্তির ট্র্যাজিক বেদনার কিছুটা আভাস ভাষারূপে সুন্দর ফুটেছে। তা ছাড়া প্রকৃতি বিষয়ক এক মধুর ব্যাকুলতাও এখানে প্রকাশ পেয়েছে—

> "দেখ, দেব, দেখ চেয়ে", কাতরে কহিলা
> কুরুরাজ কৃপাচার্যে,—"আসিছেন ধীরে
> নিশীথিনী ; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,—
> না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি।

শিবির-বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ ! রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু। .
কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য রথি ?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি ;—
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে ? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে !"

এই জাতীয় প্রকৃতিচেতনা চতুর্দশপদীর আগে মধুসূদনের অন্য কোনো রচনায় দেখা যায় নি। কবির আত্ম-প্রতিফলনও এইসব অংশে চমৎকার ব্যক্তিত হয়েছে। কবি সব আভরণ পরিত্যাগ করে উৎসের দিকে ফিরেছেন, যেখানে মাতা বসুন্ধরা জীবনের সব যন্ত্রণা করুণাকোমল হস্তে লুপ্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' কবিতার কথা প্রসঙ্গত মনে পড়ে; প্রকৃতি-বোধের সেই নিগূঢ়তার কিঞ্চিৎ পূর্বচ্ছায়া এখানে লক্ষ্য করা যায়—

সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে—
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায়,
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়
দিবাতাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ উল্কাতারা
জীর্ণ কীর্তি ; শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

এই প্রশান্তি মধুসূদনের কোনো কোনো সনেটকে সুন্দর স্পর্শ করেছে। দেহের মৃত্যু এখনও দূরে। কিন্তু কবি-আত্মার অবসান অতি নিকট। তিনি তা অনুভব করেছিলেন। দুর্যোধনের মৃত্যুর মধ্যে নিজের আত্মার সমাপ্তিকাল কবি দেখতে পেয়েছেন। এই খণ্ডিত কবিতাও তাই মর্মের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি॥[১৭]

১ আমার সম্পাদিত 'মধুসূদন রচনাবলী'র (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ) 'নানা কবিতা' অংশে এই রচনাগুলি সঙ্কলিত হয়েছে।

২ কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য।

৩ মধুসূদনকে লেখা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের চি এবং কবির লেখা পরিকল্পনাটি দ্রষ্টব্য।

৪ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি এবং কাব্য-পরিকল্পনাটি দ্রষ্টব্য।

৫ ১৮৬৫ সালের জানুআরিতে চতুর্দশপদী কবিতাগুলি লেখা আরম্ভ হয়। এই সব বিচ্ছিন্ন ও অপূর্ণ চেষ্টা তার পূর্ববর্তী হওয়াই সম্ভব।

৬ 'হেক্‌টর-বধ'-এর গুরুত্ব বিবেচনায় সে বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ অন্যত্র লিখেছি।

৭ আমার 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প' গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি।

৮ অভিনেতা কেশব গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "Simultaneously with the two farces, or soon after, Michael commenced to write another play সুভদ্রাহরণ but probably did not proceed beyond the second act..."

৯ এই পরিকল্পনাটি কেশব গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদনের জীবন-চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুকে দেন। তাঁর বইয়ে এটি পুরো উদ্ধৃত হয়েছে।

১০ "The next play that he intended to write was Rizia a drama partly in blank verse, with Mahomedan characters' (কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা)

১১ কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা মধুসূদনের পত্রাংশ।

১২ মধুসূদনকে লেখা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি দ্রষ্টব্য।

১৩ কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি।

১৪ যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মধুসূদনের জীবনচরিতে এই পরিকল্পনাটি উদ্ধৃত।

১৫ মধুসূদন এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন, "The Subject you propose for a national epic is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the 'Art of Poetry' to do it justice. So you must wait a few years more, In the meantime I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit."

১৬ "No more Modhu the কবি, old fellow, but Michael M. S. Dutt. Esquire of the luner Temple Barrister-at-law ! Ha !! Ha !! Isn't that grand ? But I hope I shan't be disappointed." (রাজনারায়ণ বসুকে লেখা কবির চিঠি)।

১৭ 'বিষ না ধনুর্গুণ'-সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। কারণ নামটি ছাড়া এর সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না। বেঙ্গল থিয়েটারের শরচ্চন্দ্র ঘোষ মধুসূদনকে অভিনয়ের জন্য দুটি নাটক লিখে দিতে বলেন। তাঁকে অগ্রিম টাকাও দেওয়া হয়। রোগশয্যায় কবি 'মায়াকানন' নামে একটি নাটক সম্পূর্ণ করে দেন। 'বিষ না ধনুর্গুণ' লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। অসম্পূর্ণ লেখাটি পাওয়া যায় নি—কোন্ পর্যন্ত লিখেছিলেন তাও জানা যায় নি।

একাদশ অধ্যায়

মধুসূদনের জীবন-গোধূলীর কবিতা

কবিতার খেলা এবং কবিতা-ব্যবসা

"এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্মলা নদীতে আবর্ত আছে; ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্যহৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে।"

—বঙ্কিমচন্দ্র : কমলাকান্ত

॥ এক ॥

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের শেষ কাব্যগ্রন্থ। ১৮৬৫ সালে এর কবিতাগুলি রচিত। ১৮৭৩ সালে কবির মৃত্যু হয়। এই আট বৎসর কাল তাঁর সৃষ্টির বন্ধ্যা যুগ। মরুর আক্রমণে সৃষ্টির সবুজ সমারোহ অবলুপ্ত। কিন্তু কিছু কবিতা, নাটক ও গদ্য-রচনা এই বিস্তীর্ণ শুষ্ক, মৃত্যুমুখী বালুকাক্ষেত্রে দুএকটি বিবর্ণপ্রায় হরিৎপত্রে ক্বচিৎ অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করেছে। ১৮৬৭ সালে তিনি হেক্টর-বধ নাম দিয়ে হোমরের ইলিয়াডের সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদে হাত দেন। গ্রন্থটির অর্ধাংশের বেশি শেষ করতে পারেন নি। ১৮৩৭ সালে মায়াকানন নামে একটি নাটক রচনা করেন। বিষ না ধনুর্গুণ নামে আর একটি নাটক আরম্ভ মাত্র হয়েছিল। তা ছাড়া এই আট বছর ধরে তিনি কিছু খণ্ড কবিতা লিখে ছিলেন।[১] এর কয়েকটি রচনা ১৮৬৫ সালে সনেট রচনার সমকালীন। প্রথম সংস্করণ চতুর্দশপদী কবিতাবলীর শেষ দিকে 'নীতিগর্ভ কাব্য' নাম দিয়ে তিনটি কবিতা সংযোজিত হয়েছিল—'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগালী', 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'। ভার্সাইয়ে ফরাসি রীতির "ল' ফঁতে"-এর আদর্শে এগুলি লিখিত হয়েছিল। ইতালির সনেটের সঙ্গে সঙ্গে এর দিকেও তিনি স্বল্পস্থায়ী দৃষ্টিপাত করেছিলেন।[২] পরে এ জাতীয় আরও আটটি কবিতা তিনি লিখেছিলেন। কবি নীতিগর্ভ কাব্য নামে এই রচনাগুলির পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। এই সময়ে কয়েকটি সনেটও তিনি লিখেছিলেন। এরূপ কবিতার সংখ্যা গুটি কয়েক।

আরও গুটি পাঁচেক ক্ষুদ্র কবিতা এই কালের রচনা। রূপনির্মিতিতে সনেট থেকে তাদের কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। তিনি কয়েকটি মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য রচনায়ও হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশি দূর এগোন নি। এই কবিতাগুলি বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ চতুর্দশপদী রচনার পরে মধুসূদন নূতন করে আর কোনো কাব্য রচনায় হাত দেন নি।

মহাকবি মধুসূদন জীবনের শেষ আট বছরে মাত্র বাইশটি কবিতা লিখেছেন, (প্রথম তিনটি নীতিগর্ভ কবিতা চতুর্দশপদীর যুগে লেখা, তাদের বাদ দিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় উনিশটিতে) ভাবতেও অবাক লাগে। মহাযজ্ঞের আগুন নিভে গেলেও প্রচুর ভস্মের সঞ্চয় আর বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ। মধুসূদন কয়েক বছর ধরে সৃষ্টির মহা অগ্নি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন; তা যে এমন নিঃশেষ অবসান লাভ করবে, পেছনে প্রায় কোন অবশেষই রেখে যাবে না এ খুবই বিস্ময়কর। কবির প্রতিভা চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে সঙ্গেই এমন ভাবে বিদায় নিল যে পরের আট বছর সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রায় শূন্যতা বিরাজ করতে লাগল। কাব্য জগত থেকে এমনিভাবে অবসর গ্রহণ করার উদাহরণ আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাধর সাহিত্যিকদের মধ্যে আর নেই।

এই অবসর পর্বের যে সামান্য কয়টি রচনা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে,[৩] তার কাব্যমূল্য কিছু বেশি নয়, কিন্তু কবি মানুষটিকে চিনবার কাজে এদের কিছু কিছু সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। সে কারণেই মধু-চর্চায় এই প্রসঙ্গের অবতারণা প্রয়োজন।

॥ দুই ॥

নীতিগর্ভ কবিতাগুলির তিনটি ১৮৬৫ সালের লেখা। ঠিক কি উদ্দেশ্যে তখন এই কবিতাগুলি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন বলা কঠিন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শিশু ও কিশোর-সেব্য কবিতার অতি ক্ষীণ দুর্নিরীক্ষ্য-প্রায় ধারাটির পুষ্টিসাধনের বাসনা তাঁর থেকে থাকবে। বাংলা সাহিত্যে নূতন নূতন পথ খোঁজায় তিনি ক্লান্তিহীন ছিলেন। এমন কি অবসিত সাহিত্যিক প্রতিভা নিয়েও তিনি হেক্টর-বধ লিখতে প্রবৃত্ত হলেন। বহু পায়ে পায়ে যে পথ চিহ্নিত মধুসূদনের অহংকার সে পথে পদচারণা করতে তাঁকে বাধা দিত।

অপর আটটি কবিতা ১৮৭০ সালে রচিত।[৪] ১৮৬৫ এবং ১৮৭০ সালের মধ্যে অনেক ব্যবধান। ১৮৬৫ সালে য়ুরোপ প্রবাসে চরম অর্থকষ্ট তিনি ভোগ

করেছেন, কাব্যজীবনের উপরে যে পূর্ণচ্ছেদ নেমে আসছে সে-বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু তখনও নূতন নূতন ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশ সমানে চলছিল। সনেটের মত একটি নবীন সাহিত্যাঙ্গকে তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। ১৮৭০ সালে তাঁর কাব্যজীবন অতীতের একটা স্মৃতিমাত্র। বাংলা সাহিত্যে কোনো নূতন রাজ্য জয়ের বাসনা আর নেই, অধিকৃত পুরাতন ইতিহাস-রাজ্যও তাঁর জীবনকালেই একটা কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে লেখা নীতি কবিতাগুলির পেছনে বাংলা শিশু-সাহিত্যকে উন্নীত করবার বাসনা আর ছিল না। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অর্থলাভবাসনা।

> "নীতিমূলক কবিতাগুলি, 'ঈশপস্ ফেবল্‌সে'র (Aesop's Fables) আদর্শে, বাঙ্গালা কথামালার প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল। নিজের অর্থাভাবক্লেশ দূর করিবার আশায়, বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ হইবার জন্য মধুসূদন তাহা রচনা করিয়াছিলেন।"
>
> —[যোগীন্দ্রনাথ বসু : মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত]

এইকাজে মধুসূদন যা কিছু রচনা করেছিলেন তার প্রায় সব কটির লক্ষ্য ছিল অর্থার্জন। মায়াকানন নাটকটি শেষ হয়েছিল। থিয়েটার-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি অগ্রিম অর্থ পেয়েছিলেন। হেক্টর-বধ শেষ হয় নি, নীতিগর্ভ কবিতা মাত্র এগারোটি রচিত হয়েছিল, পুস্তকাকারে সংবদ্ধ ও প্রকাশিত হয় নি। সম্ভবত এ দুটি ক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কবি আগে থেকে নিশ্চিন্ত হতে ারেন নি।

১৮৬৫ সালে লেখা 'ময়ূর ও গৌরী', 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', 'কাক ও শৃগালী' শিল্পমূল্যেও একেবারে গৌরবহীন নয়।[৫] এর আগে পর্যন্ত বাংলা শিশুসাহিত্যে কবিতার আয়োজনে দৈন্য ছিল একান্ত তীব্র।

বাংলা শিশুসাহিত্যের জন্ম ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি অনুসরণ করলে দেখা যায় সাহিত্যিক গদ্যভাষার ভিত্তি রচিত হবার পরে বালকদের পাঠ্যপুস্তক এবং সাময়িক পত্রকে আশ্রয় করে এই ধারাটির আবির্ভা ঘটে। নানারূপ ক্ষুদ্রাকৃতি প্রবন্ধ এবং গল্প (সবই শিক্ষামূলক) প্রকাশিত হতে লাগল। এদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দু একটি নীতিগল্পের কথা ছেড়ে দিলে সত্যকার সৃজনধর্মী সাহিত্য শিশু ও কিশোরদের লক্ষ্য করে লেখা হয় নি। মধুসূদনের আবির্ভাবের আগে বাংলা সাহিত্যে নূতনের বিজয়-অভিযানের সূত্রপাত হয় নি। তার আগে প্রকৃত সৃষ্টিমূলক শিশুসাহিত্য (গল্প-

কবিতা প্রভৃতি) পাওয়া সম্ভব নয়। পুরাতন ধারার কবিদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারই ১৮৪৯ সালে পয়ার ছন্দে সরলভাষায় প্রভাত-বর্ণনা করে ("শিশুশিক্ষা" ১ম ভাগ) এই ধারাটির সূত্রপাত করলেন।

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির ॥ ইত্যাদি

মদনমোহনের কবিতাটির অনুসরণে পরে আরও কিছু কবিতা রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বহুরূপী" নামক একটি কবিতা (বঙ্গীয় পাঠাবলীতে সঙ্কলিত)। ১৮৬৩ সালে হরিশ্চন্দ্র মিত্র "কবিতা কৌমুদী" ১ম ভাগ প্রকাশ করলেন। (এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বালকদের উপযোগী মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষরে লেখা কয়েকটি নীতি কবিতা স্থান পেয়েছিল।[৬] ১৮৬৪ সালে তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের "লঘুপাঠ পদ্য" প্রকাশিত হল। এঁর কবিতায় মদনমোহনের অনুকরণ অত্যন্ত প্রকট,—

ধরাতল সুশীতল রবি অস্ত যায়।
শীতল বাতাস বয় শরীর জুড়ায় ॥
সন্ধ্যা হলো পাখী সব উড়িয়া চলিছে।
কলরবে নিজ নিজ কুলায় পশিছে ॥ ইত্যাদি

মধুসূদন যখন ১৮৬৫ সালে তিনটি নীতিগর্ভ কবিতা লিখলেন তখন সম্ভবত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ১৮৬৩ বা ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত শিশুরঞ্জক কাব্যগ্রন্থের খবর তিনি জানতেন না। ১৮৭০ সালে যখন অন্য আটটি কবিতা লিখলেন তখনও শিশুকবিতার সংখ্যা এমন কিছু বৃদ্ধি পায় নি। হরিশ্চন্দ্রের দুই তিনটি পুস্তিকা ছাড়া ১৯৬৯ সালে হরিচরণ দের "কবিতা মঞ্জরী" প্রকাশিত হয়েছিল।

পরে ১৮৭১ সালে গোপাল দত্তের "কবিতা মঞ্জরী", ১৮৭৩ সালে হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জ্ঞানমঞ্জরী" এবং মথুরানাথ তর্করত্নের "কবিতা মঞ্জরী" প্রকাশিত হয়। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি ("পদ্যপাঠ"-এ সঙ্কলিত) সম্ভবত এই সময়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭২ সালের অপর উল্লেখযোগ্য শিশু কবিতা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের অনুসরণে দীনবন্ধু মিত্রের

লেখা "রাত পোহাল, ফর্সা হলো"। এর পরে দশ-বারো বৎসর শিশুসেব্য কাব্যগ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নি।

এই পটভূমিতে মধুসূদনের নীতিগর্ভ কবিতাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার্য। ১৮৫০ থেকে ১৮৮২-৮৪ সাল পর্যন্ত বিশিষ্ট বাঙালি কবিদের মধ্যে মধুসূদনই একমাত্র কবি যিনি শিশু ও কিশোরদের কবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ কবিরা ছোটদের জন্য কবিতা লেখেন নি। নবযুগের শক্তিমান কবিদের সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় শিশু কবিতার ধারাটি একেবারে ক্ষীণপ্রাণ হয়ে উঠেছিল। মধুসূদন ১৮৬৫ সালে বাংলা সাহিত্যের নব্য ধারার সঙ্গে শিশু কবিতার সম্বন্ধ ঘটালেন। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করে নিতে হবে।

এতাদন শিশুদের জন্য যে স্বল্প সংখ্যক কবিতা রচিত হয়েছে তারা হয় বর্ণনামূলক, না হয় উপদেশমূলক। বর্ণনামূলক রচনাগুলির মধ্যে দু একটির সামান্য সাহিত্যমূল্য থাকলেও উপদেশমূলক রচনাগুলি ছন্দোবদ্ধ নীতিশিক্ষা, তাই কাব্যরসবর্জিত। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় গদ্যরচনা কিছু সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে অগ্রসর হয়েছিল। নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত কিছু কিছু গল্প উপদেশটির সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছে, সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টি তার মুখ্য আবেদন হয়ে পড়েছে। মধুসূদন নীতিগর্ভ কবিতায় নীতি-উপদেশ দিতে চাইলেন, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ কবিতার ভাষায় এক একটি ক্ষুদ্র কাহিনী এমনভাবে বিবৃত করলেন যাতে উপদেশটি ছাপিয়ে গল্পরসে (এমন কি ক্বচিৎ চরিত্রের ইঙ্গিতে) পাঠকচিত্ত সরস হয়ে ওঠে। অন্তত প্রথম লেখা কবিতায় উপদেশটি গল্পাংশের অনিবার্য ও অচ্ছেদ্য পরিণতি নয়। বাংলার দীন শিশু কবিতায় এরা যে নূতন সম্ভাবনার পথিকৃৎ একথা মানতেই হয়; কাব্য-জীবন থেকে বিদায় নিতে নিতে অনায়াসে কবির এই নব দ্বারোদ্ঘাটন তার শক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহিত করে তোলে। দু চারিটি অপ্রচলিত শব্দ এবং উপমাদির প্রয়োগ ক্বচিৎ কিশোর পাঠকদের কাছে এদের দুর্বোধ্য করেছে। তবে সে ত্রুটি এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

॥ তিন ॥

তবুও কিশোরসেব্য কবিতা হিসেবে নীতিকবিতাগুলির যে মূল্য তা অনেকটা সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয়। এই রচনাগুলি মধুসূদনের বিদায়কালীন মনের সামান্য পরিচয়ও বহন করে। এ কারণেই এদের আলোচনা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

এই এগারোটি কবিতার মধ্যে অন্তত পাঁচটিতে কবির আত্মপ্রতিফলন স্পষ্ট পাঠ করা যেতে পারে।

'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' কবিতার শক্তিমত্ত আম্রবৃক্ষের দম্ভোক্তি—

হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি গো ডরাই কখন?

ঝড়ের আক্রমণে মুহূর্ত মধ্যে চিরতরে নীরব হয়ে গিয়েছে। কবি উর্ধ্বশির জনের নীচশির ব্যক্তিকে ঘৃণা করা উচিত নয় বলে একটি নীতিবাক্য কবিতার শেষে যুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু গোটা কবিতায় এই উর্ধ্বশির আম গাছটির প্রতি একটা ধিক্কার ও ঘৃণার ভাব আদৌ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। কেন পারেন নি? কারণ মনেপ্রাণে চান নি। তাঁর সব সহানুভূতি ঐ হিমাদ্রি-সদৃশ আমগাছের দিকে। আম গাছের পতনে কবির সারা প্রাণটি আর্ত হয়ে উঠেছে। একটা মর্মান্তিক ট্রাজেডির সুর কানে বাজবেই—

মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ুসহ দর্প বনস্থলে!

কবি এই রসালের শক্তি ও দৈবাহত পতনের সঙ্গে নিজের সমগ্র অস্তিত্বকে, তার বিপুল কর্মকে, কৃতিত্বকে, প্রতিভাকে এবং অজ্ঞাত কারণে, অজ্ঞাত উৎস থেকে আগত অকাল-সর্বনাশকে (এ সর্বনাশ তাঁর কবিত্বশক্তির অকাল ও দ্রুত বিনাশে, তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার চরম বিপর্যয়ে, তাঁর কামনা-বাসনার সম্পূর্ণ অবসানে) কোনো চেষ্টা না করেই জড়িয়ে ফেলেছেন।

'সূর্য ও মৈনাকগিরি' কবিতায়ও অন্তর্মুখী সূর্যের আয়নায় মধুসূদন

নিজের মুখ দেখেছেন। সেই প্রতিবিম্ব শেষ পর্যন্ত কাহিনীর স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে—

রমার থাকিলে কৃপা, সবে ভালবাসে,—
কাঁদ যদি সঙ্গে কাঁদে ; হাস যদি, হাসে ;
ঢাকেন বদন যবে মাধব-রমণী,
সকলে পলায় রড়ে, দেখি যেন ফণী ;

আলোচ্য কবিতার সঙ্গে এই নীতি-উপদেশের কোনো সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যায় না। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনে অর্থভোগের তীব্র কামনা ছিল। তার মানবতা, মর্ত্যপ্রীতি, ভোগবাদ সমন্বিত হয়ে জীবনদৃষ্টির কেন্দ্রটি তৈরি করেছিল। য়ুরোপপ্রবাস থেকেই অর্থাভাবের ফলে তিনি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন এবং দেশে প্রত্যাগমনের পরে তার তীব্রতা বেড়ে যায়। ঠিক এই সময়েই তাঁর কাব্য-প্রতিভারও অবসান ঘটে। কবি সহজেই জীবনের সামগ্রিক বৈফল্যের সঙ্গে অর্থসঙ্কটকে যুক্ত করে ফেলেন। এ কবিতায় কবি নিজের কথাই বলেছেন।

'ময়ূর ও গৌরী' কবিতায় নিজ অবস্থায় মন স্থির রাখবার জন্য কবি উপদেশ দিয়েছেন। এ কি উপদেশ না নিজ জীবনঘটনার স্মৃতি রোমন্থন এবং দীর্ঘশ্বাস? কোকিলের সুস্বর নেই বলে ময়ূর দুঃখিত। নিজ পুচ্ছদেশে চন্দ্রককলাপ, আখণ্ডল ধনুর বরণ, গলদেশে ঝলঝলে স্বর্ণহার, শিরে স্বর্ণচূড়া। তবুও তার সন্তোষ নেই। এই অসন্তোষই মধুসূদনের সমগ্র জীবনচর্চার অন্যতম প্রধান সুর। তারুণ্যে খ্রীস্টধর্ম বরণে, আত্মীয় বান্ধবহীন মাদ্রাজে স্বেচ্ছানির্বাসনে, দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতায় সর্ব প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হয়ে রেবেকাকে বিবাহ করায়, রেবেকাকে ত্যাগ করে হেনরিয়েটাকে গ্রহণ করায়, হঠাৎ সাহিত্য-জীবনে প্রবেশ করে অবিলম্বে সে রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করায়, খ্যাতি যখন শীর্ষ-বিন্দুতে তখন হঠাৎ সে জীবন পেছনে ফেলে ব্যারিস্টারী পড়বার জন্য য়ুরোপ গমনে তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে—

হেথা নয় হেথা নয়
অন্য কোথা অন্য কোনখানে।

প্রাপ্ত বস্তুতে অতৃপ্তি, অপ্রাপ্তকে লাভ করবার সাধনা। আজ জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতির মুখে দাঁড়িয়ে সে কথা কবি ভুলতে পারেন না, নীতি-কবিতায়ও নিজের বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস মর্মর ধ্বনি তোলে।

'অশ্ব ও কুরঙ্গ' কবিতার উপদেশটি হল পরের অনিষ্ট করতে গেলে নিজের ক্ষতি হয়। কিন্তু আখ্যানটির সঙ্গে এই উপদেশের সঙ্গতিবিধান হয় নি। পররাজ্যে প্রবেশ করে কুরঙ্গই কলহের ভিত্তি রচনা করেছে, অশ্ব নয়। শিকারীকে আহ্বান করায় অশ্বের মূর্খতা প্রকাশ পেলেও সে যতটা অপরাধী তার চেয়ে বেশি অত্যাচারিত। পরাধীন অশ্বের জন্য বেদনাবোধ হয়, ধর্মের জয় হল বলে পাঠকের মন উল্লাস অনুভব করে না। স্বল্পবুদ্ধি শক্তিশালী অশ্ব মানুষের কৌশলে পরপদানত হল। ভাগ্যাহত শক্তিধরদের জীবন-কথা বর্ণনায়ই মধুসূদন বেশি আগ্রহী। এ আগ্রহের উৎস তাঁর আপন জীবনচেতনা।

'সিংহ ও মশক' কবিতায় ক্ষুদ্র কৌশলী শত্রুর আক্রমণে শক্তিদম্ভী পশুরাজের পতন-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এখানে ক্ষুদ্র শত্রুকে অবহেলা না করবার যে উপদেশ কবি দিয়েছেন তা কাহিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ নয়। ক্ষুদ্র শত্রুকে সিংহ অবহেলা করে নি। গুপ্ত কৌশলেব কাছে তার বীর-মহিমা বিধ্বস্ত হয়েছে। মরণোন্মুখ সিংহের এই গর্জন—

> অধীর ব্যথায় হরি,
> উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি,
> কহিলা, "কে তুই, কেন
> বৈরিভাব তোর হেন ?
> গুপ্তভাবে কি জন্য লড়াই ?—
> সম্মুখ-সমর কর; তাই আমি চাই।
> দেখিব বীরত্ব কত দূব,
> আঘাতে করিব দর্পচূর ,
> লক্ষ্মণের মুখে কালি
> ইন্দ্রজিতে জয় ডালি
> দিয়াছে এ দেশে কবি।"[৭]

জীবনট্র্যাজেডির নায়ক কবির কণ্ঠে অজ্ঞাত নিয়তির প্রতি উচ্চারিত বলে মনে হয়।

মধুসূদন সারাজীবন যে অর্থ ও বাহ্য সম্পদের চর্চা করেছেন তাঁর কাব্য-কল্পনাকেও তা গভীর রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে ব্রহ্মার সাত্ত্বিকতা আবৃত হয়েছে স্বর্ণদ্যুতিতে। মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের

স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কাহিনী। শেষজীবনে অভাবের তীব্রতা যখন অনশনের রূপ নিয়ে এল তখন সেই স্বর্ণকামনা রোগবিকৃত দৃষ্টির প্রক্ষেপে চারদিকে হলুদ রঙ্ ছড়িয়ে দিল যেন। নীতিগর্ভ কবিতায় কবি বারবার চারদিকে সোনা-মণি-মাণিক্য দেখেছেন। বাংলাদেশের সৌন্দর্য-বর্ণনায় হীরামুক্তাই কবির চোখ ঝলসে দিয়েছে প্রথমে—

ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলঙ্কত হীরা মুক্তা মরকতে।

শুধু তাই নয়, এ রাজ্যে গদা অতি সহজে পথের মধ্যে বৃহৎ টাকার থলে দেখতে পায়, কুক্কুট বিনা আয়াসে অমূল্য রত্ন পেয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যদোষে সেই সম্পদের ভোগ তাদের জীবনে ঘটে না।

নীতিগর্ভ কবিতা লিখতে গিয়েও মধুসূদনের সন্ধ্যার মন সেখানে ছায়া ফেলেছে। সূর্যাস্ত যে একান্ত আসন্ন বুঝতে কষ্ট হয় না॥

॥ চার ॥

প্রমথ চৌধুরী একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন তাঁর "সাহিত্যে খেলা" প্রবন্ধে—

"জগৎ-বিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর রোঁদ্যা, যিনি নিতান্ত জড় প্রস্তরের দেহ থেকে অসংখ্য জীবিতপ্রায় দেব-দানব কেটে বার করেছেন, তিনিও শুনতে পাই, যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে আঙুলের টিপে মাটির পুতুল তয়ের করে থাকেন। এই পুতুল গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা। শুধু রোঁদ্যা কেন, পৃথিবীর শিল্পীমাত্রেই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন।"

প্রতিভার দোর্দণ্ড প্রতাপের দিনে মধুসূদন একবার এমনি খেলা খেলেছিলেন। তাঁর ব্রজাঙ্গনা কাব্য এই খেলার ফল। ভাবগভীরতার অভাবে, অঙ্গপ্রসাধনের ঔজ্জ্বল্যে এবং কারুকর্মের প্রাধান্যে সে কাব্যের বিশিষ্টতা চিহ্নিত।[৮]

নীতিগর্ভ কবিতাগুলি রচনার পেছনে প্রত্যক্ষ কারণ ছিল অর্থোপার্জনের আশা। কিন্তু কবিতার ব্যবসা করতে বসেও জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত কবি বিদায়বেলার এই অকিঞ্চিৎকর লেখাগুলিতে কিছু খেলাও খেলেছেন। কবিতার অঙ্গ নিয়ে কারুকার্যের খেলা।

কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা। স্রষ্টা শুধু নন, তাঁর আপন ব্যক্তিত্বের উপকরণে যেন এই ছন্দটি গঠিত। নীতিগর্ভ কবিতাগুলিতে তিনি মিত্রাক্ষরের রাজ্যে প্রবেশ করলেন। প্রচলিত মিত্রাক্ষর কবিতার পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা পথ ত্যাগ করে মিল নিয়ে যে বিচিত্র খেলা তিনি খেলতে লাগলেন তার সঙ্গে পূর্ববর্তী ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মাত্র তুলনা চলে। এই খেলায় কবির মন সাড়া দিয়েছিল—যে মন বেঁচেছিল অজস্র অনটন, দুশ্চিন্তা, অপমান এবং ট্র্যাজিক আর্তনাদের অন্তরালে।

'কুক্কুট ও মণি' কবিতাটি চৌদ্দ পংক্তির, সব মিলে একটিই স্তবক। কবি মিলের ব্যাপারে কোন পুনরুক্তিমূলক প্যাটার্নের, যেমন প্রতি দুচরণে মিল, বিকল্প চরণে মিল, ক খ খ ক জাতীয় মিল প্রভৃতি অনুসরণ করেন নি এ কবিতায়।

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ কুক্কুট পাইল — ক
একটি রতন,— — খ
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল, — ক
"ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন?" — খ
বণিক কহিল,—"ভাই, — গ
এ হেন অমূল্য বস্তু, বুঝি দুটি নাই।" — গ
হাসিল কুক্কুট শুনি, তণ্ডুলের কণা — ঘ
বহু মূল্যতর ভাবি,—কি আছে তুলনা? — ঘ
"নহে দোষ তোর, মূঢ়, দৈব এ ছলনা, — ঘ
জ্ঞান শূন্য করিল গোঁসাই।"— — গ
এই কয়ে বণিক ফিরিল। — ক
মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে? — চ
নর-কুলে পশু বলি লোকে তারে মানে,— — চ
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভানে। — চ

কবিতাটির শেষ চরণ পর্যন্ত কবি নূতন নূতন মিল ব্যবহার করেছেন, কানের কাছে পরিচিত হয়ে উঠতে দেন নি। রসাস্বাদের দিক থেকে এর মূল্য যথেষ্ট নয়। তার কারণ কবির চিত্ত আজ আবেগশূন্য, ছন্দে কারুকার্য আছে, গান নেই। কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাসে তাঁর ক্রীড়াশীল মন আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্রিয়াপদে মিলের তিনটি ক্ষেত্রে অবশ্য দুর্বলতা প্রকট।

'গদা ও সদা' কবিতায় গদ্যাত্মক ভঙ্গিটিকে কবি বজায় রেখেছেন অথচ

কবিতার জাতিচ্যুতিও ঘটে নি। এ পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ কবিতার মিলের ধারাটি একেবারে অন্য জাতের।

গদা সদা নামে	ক
কোন এক গ্রামে	ক
ছিল দুইজন।	খ
দূর দেশে যাইতে হইল;	গ
দু'জনে চলিল।	গ
ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,	খ
ভল্লুক শার্দ্দূল তাহে গর্জ্জে অনুক্ষণ।	খ
কালসর্প যেমতি বিবরে,	ঘ
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে,	ঘ
পথিকের অর্থ অপহরে,	ঘ
কখন বা প্রাণনাশ করে।	ঘ

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এই মিলনের কোনো নিয়ম নেই। আর এই সব কটা চরণ ধরে একটা প্যাটার্ন মনে করারও কারণ নেই, কারণ কবিতাটির পরের অংশে এই প্যাটার্ন অনুসৃত হয় নি।

'মেঘ ও চাতক' কবিতায় প্রথম আট চরণে অন্ত্যানুপ্রাস এইরূপ—ক খ খ গ গ গ ঘ ক। এর মধ্যেও কোন প্যাটার্ন নেই: এর পরেও • না ধরনের মিল, প্রধানত পর পর দুই চরণে (চরণগুলি আট বা দশ মাত্রার, ফলে পয়ারেব আবেদন আনে না), কচিৎ পর পর তিনটি চরণে। মাঝে মাঝে দু' একটি চরণ ছয় মাত্রার এবং মিলহীন। আবার শেষ দিকে বিকল্প চরণে মিল থাকায় বেশ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কবিতার চরণগুলির মাত্রা সংখ্যায়ও এই ক্রীড়াশীল মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৪ (৮+৬), ১০, ৮, ৬—মাত্রাসংখ্যা নিয়ে কবির খেল • • সংখ্যাগুলির বাইরে যায় নি। তবে চৌদ্দমাত্রায় পংক্তির পাশে ছয় মাত্রায় পংক্তি বসিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাসের সৃষ্টি করেছেন, দশ মাত্রা, আট মাত্রা ও ছয় মাত্রাও সহজেই কাছাকাছি এসেছে, মিলের সূত্রে বদ্ধ হয়েছে।

ব্রজাঙ্গনায় অন্ত্যানুপ্রাস তথা মাত্রা সংখ্যার বৈচিত্র্য একটা নিয়মিত প্যাটার্নের রূপ ধরেছে, এখানে তা একান্তই অনিয়মিত। কবি চিত্তের সেই

কেন্দ্রটি আজ নিষ্ক্রিয় যা বৈচিত্র্যকে সংযত করে, একমুখী করে। আজ শুধু খেলার অপরূপ দায়িত্বহীনতা॥

॥ পাঁচ ॥

পাঁচটি সনেটকল্প রচনা কবির এই পর্যায়ের কবিতাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সেখানেও এই ক্রীড়াশীলতা লক্ষ্য করা যায়। কবি এই কবিতাগুলিতে সনেট-দেহ নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এরূপ বলা যেতে পারত, কিন্তু সে-নিষ্ঠা আর অবশিষ্ট ছিল না।

'পঞ্চকোট গিরি বিদায় সঙ্গীত' কবিতাটি পনর চরণের এক বিচিত্র-দেহ রচনা। এগারোটি চরণ চৌদ্দ মাত্রার ; দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম এবং দ্বাদশ চরণ ছয় মাত্রার। অন্ত্যানুপ্রাসে কোনো নিয়মিত প্যাটার্ন চোখে পড়ে না (ক ক খ খ ক গ ক ঘ ঘ চ ছ জ ক ছ)। কোথাও কোথাও একটি প্যাটার্নের আভাস আসে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙে যায়। অথচ সব মিলে কবিতাটির শিল্পরূপ বিপর্যস্ত এরূপ বলার উপায় নেই। আসলে কবি খেলাচ্ছলে একটু বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছেন। সে সময়েও কিছু কিছু সনেট কবি লিখেছিলেন, আরও একটি দুটি সনেট লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। নূতন কিছু লিখবার সাধ জেগেছে। এই কবিতার অঙ্গকান্তিতে সেই সাধের পরিচয় আছে। যে কবি অনেক মহৎ নবীনের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটা জাতির নব্য সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তিনি আজকের শক্তিহীন সন্ধ্যায় নূতনের খেলা দিয়ে নিজেকে ভোলাতে চাইছেন।

সাত চরণের 'হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি' একটি অপূর্ণ সনেট। নূতন আঙ্গিক নিয়ে খেলা নয়। সনেটের প্রচলিত মিলের রীতিটিও (ক খ খ ক ক খ খ···) এখানে অব্যাহত রয়েছে। 'সমাধি-লিপি' কবিতাটি আট চরণের, আরও ছয় চরণ যোগ করে একটি পূর্ণদেহ সনেট রচনা করবার ইচ্ছা কবির ছিল বলে মনে হয় না। লক্ষণীয় সনেটসুলভ অন্ত্যানুপ্রাস অনুসরণের কিছুমাত্র চেষ্টা এখানে নেই। ভাবানুভূতি বিচারে এটিকে আট চরণের ক্ষুদ্রদেহ কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কবিতা বলে গ্রহণ করা উচিত।

'জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে' কবিতার চরণ সংখ্যা বারো ; এ কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস নেই। সনেটে সচরাচর যে জাতীয় অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহারের রীতি আছে (অর্থাৎ, ক খ খ ক-ক খ খ ক-গ ঘ-গ ঘ-গ ঘ। অথবা

ক খ ক খ-ক খ ক খ-গ ঘ চ-গ ঘ চ। প্রভৃতি) কবির চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তার বিশ্বস্ত অনুসরণ লক্ষণীয়। কিন্তু এ কবিতায় সনেট আঙ্গিকের দ্বিমুখী পরীক্ষা হয়েছে। এক। চৌদ্দ পংক্তির চেয়ে দু পংক্তি কম হলেই কি সনেটের সংহত আস্বাদ বিনষ্ট হবে, ক্ষুদ্রদেহ চুটকির সামান্যতায় তা অবনমিত হবে? দুই। অন্ত্যানুপ্রাস ছেড়ে অমিত্রাক্ষরে রচিত হলে সনেটের অস্বাদে কোনো ক্ষতি হবে কি? এ জিজ্ঞাসার উত্তর কবি পান নি, খোঁজেনও নি, প্রশ্নটিই খেলাচ্ছলে তুলেছেন, নূতন আঙ্গিকসৃষ্টির পরীক্ষায় নামার আর সময় ছিল না। 'পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামক কবিতায় ষোলটি চরণ; অন্ত্যানুপ্রাস আছে, কিন্তু রীতিটি একটু স্বতন্ত্র। চারটি চতুষ্পদীতে কবিতাটি বিভক্ত, প্রত্যেক চতুষ্পদীতে বিকল্প চরণে অন্ত্যানুপ্রাস। আর্ষ সনেট বলে একে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু এখানেও কবির সেই প্রশ্ন, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি সনেটের ক্ষেত্রে ব্যর্থ? সনেটের ইতিহাসে তার দেহের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আস্বাদের বিশিষ্টতার জন্য তাদের জাতিচ্যুতি ঘটেনি।৯ মধুসূদন কি সনেটের দেহ নিয়ে কোনো নূতন পরীক্ষায় নামতে চাইছিলেন? হয়ত মনের কোণে সেরূপ কোনো অভিপ্রায় লুকিয়েছিল। শিল্পী হিসেবে সেখানে তাঁর মাহাত্ম্য। কিন্তু সাধ্য আর ছিল না। তাই খেলার আয়োজন। সেখানে তাঁর ব্যর্থতা॥

॥ ছয় ॥

এই রচনাগুলির মধ্যে দুটি সনেট আছে, বিষয় হিসেবে কা... কাব্যভাণ্ডারে যা অভিনব। 'কবির ধর্মপুত্র' (শ্রীমান খ্রীষ্টদাস সিংহ) এবং 'পুরুলিয়া' (পুরুলিয়ার খ্রীষ্টমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত)। কবি খ্রীষ্টীয় বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় আর কিছু রচনা করেন নি। ধর্মান্তর গ্রহণের সময়ে তিনি ইংরেজিতে একটি গান লিখেছিলেন—

> Long sunk in superstition's night.
> By sin and satan driven,—
> I saw not,—cared not for the light,
> That leads the blind to Heaven.

এতে তীব্র আত্ম-ঘোষণা ছিল, গভীর ধর্মোপলব্ধি থাকার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। শেষ জীবনের এই দুটি কবিতায় কবির ধর্মচেতনার কোনো গভীরতর চিহ্ন মুদ্রিত আছে কিনা বিচার্য।

মধুসূদন ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন, উৎসাহ ভরে hymn লিখেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় এবং বিশ্বাসে তাঁর নৌকো সমুদ্রই চিনেছিল, কোনো ধর্মের বন্দরে পাকা আশ্রয় চায় নি।[১০] খ্রীস্টধর্মে তার শিল্পচেতনাকে যে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি, গোটা জীবনের সাহিত্যসাধনায় তাঁর প্রমাণ আছে। য়ুরোপীয় মহাকাব্যের Paganism, ভারতীয় মহাকাব্যের ও পুরাণের রাজ্য তাঁকে আকর্ষণ করেছে। মিল্‌টনের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁর খ্রীষ্টীয় Puritanismএর অংশীদার মধুসূদন কখনও হতে পারেন নি। মিল্‌টনের উদাত্ত গাম্ভীর্য এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতি আয়ত্ত করবার সাধনা তিনি করেছিলেন। খ্রীস্টধর্ম মধুসূদনের কবি-প্রাণকে স্পর্শ করে নি।

আলোচ্য কবিতা দুটি তার প্রমাণ বহন করছে। এরূপ বিবর্ণ, নিরুত্তাপ, আবেগবর্জিত কবিতা তিনি অল্পই লিখেছেন। বিবৃতিসর্বস্ব, মামুলি উপমাপ্রয়োগে জীর্ণ এ সনেট দুটি সাময়িকের চিহ্ন বহন করে, কবিহৃদয় থেকে এরা উৎসারিত নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তা একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। য়ুরোপে প্রবাসকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায়ই তিনি আর্থিক অনটন থেকে মুক্তি পান। কলকাতায় ফিরে আসার পরেও বিদ্যাসাগর নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করে যান। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা ছিল, ভালবাসাও ছিল। উভয়ের মধ্যে যে সব পত্রের বিনিময় হয়েছিল তাতে এর প্রমাণ আছে। মধুসূদনের পত্রগুচ্ছে বিদ্যাসাগরের কাছে লেখা চিঠির সংখ্যা অনেক। (আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে 'বঙ্গদেশে এক মান্য-বন্ধুর উপলক্ষে', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', এই দুটি সনেটের অবলম্বন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি 'পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতাটি লেখেন—

> শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
> হে ঈশ্বরচন্দ্র !

কবির আন্তরিকতার নিশ্চয়ই অভাব ছিল না। কিন্তু এ কবিতায় কবিপ্রাণের গভীর আন্দোলন সাড়া তোলে নি। পরিকল্পিত কিছু উপমা-চয়নে কবি আপন কর্তব্য সমাপন করেছেন বলে মনে হয়।

কবির এই সময়ের অধিকাংশ সনেট এবং সনেট-কল্প রচনাই সাময়িক ঘটনার উৎসে জন্মলাভ করেছে। পুরুলিয়ার 'পরেশনাথ গিরি' কবির উদাত্ত গাম্ভীর্যের কামনাকে কিছুটা তৃপ্ত করেছে। তাই সনেটটিতে মোটামুটি সার্থকভাবে ধ্যানস্তম্ভিত মহাদেবের চিত্রে পার্বত্য মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে—

হেরি দূরে উর্ধ্বশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে ধরেছ ও পাষাণ মূরতি?

বিশেষ করে 'ব্যোমকেশ' এই শব্দটির ব্যঞ্জনার সূত্রে একদিকে যোগমগ্ন ধূর্জটি অন্যদিকে পর্বত পরেশনাথের গাম্ভীর্য বদ্ধ হয়েছে।

১৮৭২ সালে মধুসূদন ঢাকা গেলে তাঁকে এক সম্বর্ধনা জানানো হয়। সেই সম্বর্ধনার উত্তরে মধুসূদন একটি কবিতা লিখেছিলেন। সাময়িক কারণে রচিত হলেও কবির শেষ জীবনের দারিদ্র্য, হতাশা ও দীর্ঘশ্বাসের স্পর্শে এর শেষাংশ উত্তপ্ত—

পীড়ায় দুর্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি!···
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে;
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি।

'জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে' কবিতায়ও এই দীর্ঘশ্বাস। মহাকবি হোমর ও বাল্মীকির কথা বললেও কবি আসলে নিজের কথাই বলতে চেয়েছেন। 'মধুস্মৃতি' রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ সোমের মতে :

"কবিতাটি সম্ভবতঃ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচিত হইবার সময়ে যে কাব্য রচিত, তাহা তাহার অপরিমার্জিত ভাষা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।"

কিন্তু তিলোত্তমাসম্ভবের যুগে এই সুরের কবিতা লেখা সম্ভব ছিল না। মেঘনাদবধ কাব্য বা 'আশার ছলনে ভুলি'তে গভীর বেদনার যে সুর তাতে মাহাত্ম্য আছে—ট্র্যাজেডির ক্লাইম্যাক্সের মত। এখানের বিষণ্ণতায় সমাপ্তির পূরবী বাজছে।

পঞ্চকোটের কর্মজীবন মধুসূদনের শেষ জীবনের একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়, কিন্তু কলকাতার একঘেয়েমি থেকে স্বতন্ত্র বলেই উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে তাঁর জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—

"ব্যারিষ্টরী ব্যবসায়ে আর কোন উন্নতির আশা নাই দেখিয়া, মধুসূদন এই সময়, মানভূমের অন্তর্গত পঞ্চকোটের রাজার আইন উপদেষ্টার (Legal adviser) পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কার্য্যটি স্থায়ী হইলে আর কিছু না হউক, তাঁহার অন্নাভাব ক্লেশ দূরীভূত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজার চপলতায় বিরক্ত হইয়া, অল্পদিনের মধ্যে তিনি এই কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন"।[১১] —[মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত]

পঞ্চকোট সম্পর্কে লেখা তিনটি কবিতা পাওয়া গিয়েছে। দুটি প্রথাসিদ্ধ সনেট, একটি স্বতন্ত্র আঙ্গিকে লেখা। কবিতা তিনটি ব্যর্থ হয় নি। কবিপ্রাণের জাগরণ এর মধ্যে অনুভব করা যায়। এর কারণ খুব দুরধিগম্য নয়। রোগজীর্ণ দারিদ্র্যাহত কবি চারপাশের হতাশার নিগূঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটি স্বপ্নরাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই স্বপ্নরাজ্য যে কত অলীক, কত ক্ষণস্থায়ী কবি তা জানেন, তবুও দুদিনের জন্যও সেই স্বপ্নকে সত্য বলে মনে করতে ভাল লাগছে!—

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে,
হাঁটু গাড়ি হাতী দু'টি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
পদ্মাসন উজলিত শত রত্ন-করে
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
দুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অম্বরে
আলো করি দশ দিশ, হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী যেন কৈলাস-সদনে।

—[পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী]

এ শুধু পঞ্চকোটের রাজলক্ষ্মী নয়, কবির জীবনের কাম্যলোক। কমলে কামিনীর মূর্তিতে তাই আবেগের স্পর্শ আছে, বর্ণের উজ্জ্বল দীপ্তি ভাষায় ধরা পড়েছে। কিন্তু বাস্তবত পঞ্চকোট রাজ্য আজ লক্ষ্মীহীন। রাজকর্মচারী হিসেবে বিশৃঙ্খল এই রাজ্যটির পুনর্গঠনের সঙ্কল্প করেছিলেন কবি। এর মধ্যে কি তার জীবনের ভেঙেপড়া কাম্য লোকটি গড়ে তোলার অচরিতার্থ কামনা প্রতিবিম্বিত? তা না হলে হৃদয়বর্ণে এই পুনর্গঠনের ব্যর্থ কামনাটি প্রকাশিত হত না—

ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়, ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।
—[পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত]

এ ক্ষণিকের স্বপ্ন। ভেঙে যাবেই। পঞ্চকোটের পুনর্গঠন তাঁর সাধ্যাতীত, নিজ কাম্যলোকের নির্মিতিও। পঞ্চকোট গিরির দিকে তাকিয়ে তাই তাঁর মনে হয় স্বর্ণ-জ্যোতিহীন ভগ্ন লঙ্কার মহাবীর কুম্ভকর্ণ গতপ্রাণ ও ভূপতিত হয়ে আছে। সর্বগৌরবচ্যুত রাজলক্ষ্মীপরিত্যক্ত হয়ে এই রাজ্যের মহাপর্বত মণিহারা ফণীর মত শোকানল বুকে বহন করে রয়েছে। মহান্ শক্তিধরের বেদনার্ত পতন চিত্ররূপে বদ্ধ হয়ে ট্র্যাজিক সুর বাজিয়েছে।

'হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি' অপূর্ব কবিতা। সরাসরি কবির বেদনা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। এ সুরের কবিতা চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যেও কতকগুলি আছে। কিন্তু হতাশার সঙ্গে সেখানে মাহাত্ম্যের সুযোগ ছিল। এখানে মাহাত্ম্য আর নেই, তা শুধু স্মৃতির সামগ্রী, শুধুই হতাশ দীর্ঘশ্বাস।

'সমাধি-লিপি' কবিতাটি মধুসূদনের লেখা শেষ কবিতা কিনা জানি না। কিন্তু হওয়া অসম্ভব নয়। কবিতাটি সহজ, সরল। কাব্যোৎকর্ষ বিচারে কিছু অমূল্য সামগ্রী নয়। কিন্তু মহাকবি ছাড়া অপরের পক্ষে এরূপ সমাধি-লিপি রচনা অসম্ভব। মধুসূদনের মত আত্মসচেতন কবি, ট্র্যাজিক হাহাকারে, হতাশার দীর্ঘশ্বাসে যাঁর শেষ জীবনের সমস্ত লেখা পূর্ণ—কি করে এমন নিরাসক্ত সুরে সিদ্ধিলাভ করলেন। বাক্-সংযমের নিগূঢ় তাৎপর্যকে আয়ত্ত করলেন, ভাবতে বিস্ময় জাগে। কবি শ্রীমধুসূদন বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। পিতা-মাতা জন্মভূমির নাম—যে পরিচয় বহন করে এসেছিলেন পৃথিবীতে, শুধু সেই পরিচয় আর খ্যাতির নির্মোকমুক্ত প্রশান্ত বিশ্রাম, কপোতাক্ষের শব্দে এবং শীতলতায় সেই মহানিদ্রার পরিবেশ ঘনীভূত।—আবার উৎসে ফিরে যাওয়া —সে উৎস এই মহাপৃথিবী, সে উৎস জননী জাহ্নবী—

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে

(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত।
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
যশোরে সাগর দাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী !

---

১ আমার সম্পাদিত "মধুসূদন রচনাবলী"তে (সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত) "নানা কবিতা" অংশে 'নীতিগর্ভ কাব্য' এবং 'সনেট ও সনেটকল্প কবিতা' শিরোনামে ধৃত রচনাগুলি অবলম্বনে এই প্রবন্ধ রচিত।

২ **"I have not been doing much in the political line, of late beyond imitating a few Italian and French things."**—পত্রাংশ।

৩ এই পর্বে রচিত কবিতার দুচারটি হারিয়ে যেতে পারে। তাদের সংখ্যা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়।

৪ "নীতিমূলক কবিতাগুলি মধুসূদন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন।" (যোগীন্দ্রনাথ বসু : মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত)

৫ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য' গ্রন্থে যোগীন্দ্রনাথ বসুর একটি মন্তব্যের (পাদটীকা ৩ দ্রষ্টব্য) অনুসরণ করে নিশ্চিত ভাবে ধরে নিয়েছেন যে মধুসূদনের যাবতীয় নীতিগর্ভ কবিতাই ১৮৭০ সালে লেখা। এ ধারণা ঠিক নয়। এগারোটি নীতি কবিতার মধ্যে তিনটি পাঁচ বৎসর আগে য়ুরোপে বসে লেখা।

৬ হরিশচন্দ্র মিত্রের "কবিতা কৌমুদী"র দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ যথাক্রমে ১৮৬৭ এবং ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়। "ছাত্রসখা" নামে তাঁর বালকবোধ্য অপর একটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে।

৭ কবি গল্পের স্বাভাবিকতা বর্জন করে সিংহের মুখে মেঘনাদবধ কাব্যের উল্লেখ করেছেন এখানে।

৮ এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৯ 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প' বইয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১০ আমার "কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী" বইয়ের আলোচনাংশ দ্রষ্টব্য। মধুসূদনের জীবনে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব নিয়ে সেখানে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। কবি মাদ্রাজ প্রবাসকালে ইংরেজিতে **"Visions of the Past"** নামে যে খণ্ডকাব্যটি লেখেন তার বিষয়বস্তু পুরোপুরি খ্রীষ্টীয় এবং কাব্য-প্রেরণাও একান্ত কৃত্রিম নয়। খ্রীষ্টীয় ধর্মদেশের সমর্থনে কবির মুদ্রিত বক্তৃতা **The Anglo-Saxon and the Hindu**-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১১ ১৮৭২ সালে সাত আট মাস তিনি পঞ্চকোটে কাজ করেছেন। এ বিষয়ে প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় বলা হয়েছে, **"The one that I at present recollect was in connection as legal adviser of the Raja of Purulia. He said that after he was for a few days with the Raja, the idea struck him that he could be happily compared to a street-hydrant of the Calcutta Water Works. Anybody who chose had only to put it by the ear and then drink his full. Mr. Dutta was obliged to give up the appointment after a few month's service.**

দ্বাদশ অধ্যায়
অমিত্রাক্ষর ছন্দ

> "মঞ্জীর খুলিয়া রাখ
> অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী !"

এইরূপ উদাত্ত ভাষাগৌরব ও ধ্বনিগাম্ভীর্যসমন্বিত, অন্ত্যমিলনহীন, অথচ অন্তশ্ছন্দঃস্পন্দের বিচিত্র প্রবাহের দ্বারা গীতোচ্ছ্বাসময় কবিতার জন্য দেশের কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। ইহার জন্য পাশ্চাত্ত্য-কাব্যপুষ্ট, প্রতিবেশনিরপেক্ষ একক কল্পনার মধ্যে। কবিপ্রতিভার সহিত সমকালীন কাব্যরুচির একরূপ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান অতিক্রম করিবার শক্তি তিনি নিজ অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যেই পাইয়া-ছিলেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

ছন্দশিল্পী নামে বিশেষ করে কোনো কবিকে আখ্যাত করলে তাঁকে প্রশংসা করা হয় না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বিবিক্ত মন নিয়ে নিরীক্ষা চালাবার বস্তু নয় ছন্দ। এদেশেরই কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের যাদুকর বলে অভিনন্দিত হয়েছেন কোনো কোনো মহলে—সে শুধু শেষোক্ত কারণটির জন্যই। সত্যেন্দ্র-নাথের ছন্দকীর্তি তাঁকে উঁচুদরের কবির মর্যাদা দেয় নি। কৌতূহলীর কলা-বিলাসিতার স্তর অতিক্রম করে তাঁর ছন্দসাধনা কাব্যভাবনা ও জীবনচেতনার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে কোনো গভীরতর তাৎপর্যের দ্যোতনা আনে নি।

কিন্তু মধুসূদনের ছন্দসাধনা সম্বন্ধে আদৌ একথা বলা চলে না। তাঁর ছন্দ তাঁর কাব্যের সঙ্গে, তাঁর জীবনবোধ, শিল্পচেতনার সঙ্গে একেবারে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে তার অবদানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব যতই থাক, তাঁর বিশিষ্ট ছন্দভাবনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ এত স্পষ্ট যে তার যথার্থ অনুসরণ পরবর্তীকালে ঘটে নি।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন অবশ্য ছন্দ নিয়ে কিছুটা কলা-বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, কারুনির্মিতির সাময়িক উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তবে সমিল কবিতার বিচিত্র ভঙ্গি এবং স্তবক গঠনের সেই নানান কৌশলের মধ্যে মধুসূদনের কবি-আত্মার আলোড়ন শ্রুত হয় নি। মধুসূদনের কবিপ্রাণ একটি মাত্র ছন্দভঙ্গিকে বরণ করে নিয়েছে। সেই ছন্দে তার কবিপ্রাণ প্রথম উদ্বোধনের আনন্দ অনুভব করেছে, সেই ছন্দের মার্জিত উৎকর্ষে তিনি আপন সাধনাকে নিয়োজিত করেছেন, তার নাম অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এমন কি সনেটের দেহবন্ধে অন্ত্যানুপ্রাসের বহুল উপস্থাপনা সত্ত্বেও অমিত্রাক্ষরের অনেক বৈশিষ্ট্য যে স্বভাবতই বজায় আছে তাও লক্ষ্য করবার মত।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে মধুসূদনের কবিপ্রতিভাকে পৃথক্ করে নেবার কোনো উপায় নেই। এই ছন্দের দর্পণেই কবির প্রথম আত্মপরিচিতি লাভ, এই ছন্দ আয়ত্তাতীত হওয়ার পরেই কাব্যসৃষ্টির জগৎ থেকে কবির নিশ্চিত বিদায়গ্রহণ। তাই একথা মিথ্যা নয় যে অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই অপর নাম কবি মধুসূদন॥

॥ দুই ॥

অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদনের প্রবল ভাবাবেগ ছিল তার প্রমাণ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তিলোত্তমাসম্ভব রচনার পূর্বে যে বিতর্ক হয়েছিল তা থেকে শুরু করে তাঁর রচিত চতুর্দশপদী কবিতাবলী পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। কবির ভাষায়—

কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেইজন,
সেই কি সে যম-দমী?

—কবি

আবার—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি। কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি ওঠে রাগে!

—মিত্রাক্ষর

প্যারাডাইস লস্টের ভূমিকায় মিল্‌টনের উক্তির[১] সঙ্গে অন্ত্যানুপ্রাসের বিরুদ্ধে মধুসূদনের এই মনোভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে কবি ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বলেছেন—

> Blank Verse is the 'go' now. As old Runjit Sing used to say, when looking at the map of India,—"Sub lal ho jaga", I say "sub Blank Verse ho jaga."

কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁর সচেতন ভাবনাকে আশ্রয় করে নি, ভাবাবেগের স্তরেই আবদ্ধ ছিল, একথা ঠিক নয়। হয়তো ছন্দ বৈয়াকরণের নিরাসক্ত নিষ্ঠায় তিনি একে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে চান নি, কিন্তু শ্রুতিকে আশ্রয় করে অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে আপন ভাবনাকে তিনি অনেকখানি খেলিয়েছেন, যাতে এর

মূল স্বভাবধর্মের অনেকটাই তাঁর সচেতন চিন্তার আয়ত্তে এসে গিয়েছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদন তাঁর পত্রাদিতে যে সব প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন তা একথার সত্যতা প্রমাণ করবে—

এক। I am afraid you think my style hard, but believe me I never study to be grandiloquent like the majority of the 'barren rascals' that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration ! Good blank verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the toughest of poets—I mean old John Milton !

দুই। You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain ; our language as regards the doctrine of accent and quantity. is an 'apostate', that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our family priest ! If your friends know English, let them read the Paradise Lost and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed.···Let your friends guides their voice by the pause (as in English Blank Verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My advice is—Read, Read. Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

তিন। So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th. examples :—

"জয় জয় অমরারি যার ভুজবলে
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী"—তিলো—৪।
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে
অনঙ্গ।"—মেঘ—২।
"কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু।"—তিলো—৪।
"আইলেন রক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী
কুঞ্জরগামিনী।"—তিলো—২।

and so on. If this would satisfy the friends about whom you wrote to me sometime ago, they are welcome to this explanation.

এই পত্রগুলির বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধে হয় না মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের কয়েকটি মূল রহস্য সম্বন্ধে সচেতন ভাবেই ভেবেছিলেন।

এক। ভাল অমিত্রাক্ষর ছন্দের পক্ষে 'sonorous' হওয়া প্রয়োজন। তাই তথাকথিত 'কঠিন' শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা তিনি অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করেছেন। কঠিন শব্দ বলতে যুক্তাক্ষরবহুল তৎসম বা খাঁটি সংস্কৃত শব্দের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন কবি। এবং এই প্রসঙ্গে কাব্যপ্রেরণার স্রোতে এই শব্দগুলির ভেসে আসবার কথারও উল্লেখ করেছেন। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তাক্ষর প্রধান সংস্কৃত ও বাংলা শব্দের বহুল ব্যবহার পাঠক ও সমালোচককুল বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। অন্ত্যানুপ্রাসে বাইরের মিলের সাহায্যে ধ্বনিসঙ্গীত সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা এতকাল প্রচলিত ছিল তাকে একান্তই বাহ্যিক ও অগভীর বলে অস্বীকার করে গভীরতর ও বিচিত্রতর ধ্বনিসৌন্দর্য সৃষ্টির অঙ্গীকার করল এই নবীন ছন্দ। বাংলা যুক্তাক্ষরের বিচিত্র ধ্বনিসৃষ্টির ক্ষমতা, বিশেষ করে যুক্তাক্ষরপ্রধান সংস্কৃত শব্দকে বাংলা ভাষায় সহজে আত্মসাৎ করবার সম্ভাবনাকে এই উদ্দেশ্যে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। কাজটা সর্বদাই যে ভেবে চিন্তে করেছেন তা নয়। অতিসচেতনতা স্বতঃস্ফূর্ততায় বাধা দিত। তবে মূল প্রত্যয়টা কবির অজানিত ছিল না। চরণের মধ্যে অনুপ্রাস ও যমকের সুপ্রচুর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুনিপুণ ব্যবহার এই সঙ্গীতধর্মকেই কলকণ্ঠ করে তুলেছে। অমিত্রাক্ষরে একটা অবারিত সঙ্গীতের স্রোত প্রবাহিত, তারই

মাঝখানে যুক্তাক্ষরপ্রধান শব্দগুলি, অনুপ্রাস আর যমকগুলি, যেন পার্বত্য ঝরনার উপলখণ্ডের মত ছড়িয়ে আছে। গান যা জাগছে তা যেমন এদের বাধাকে আশ্রয় করে, তেমনি এই বাধাকে অতিক্রম করেও।

দুই। দ্বিতীয় পত্রাংশে মধুসূদন বাংলাছন্দে 'accent' এবং quantity-র অপ্রাধান্যের কথা বলেছেন। ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের কয়েকটি প্রধান পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি যে ইংরেজি ছন্দের (বিশেষ করে মিল্টনের) আদর্শ অনুসরণ করেছেন তা উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন। মধুসূদন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে একবার বলেছিলেন, বাংলাভাষা সংস্কৃতের দুহিতা বলে এ ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি অবশ্যই সম্ভব। এ কথা বলবার সময়ে তিনি কি সংস্কৃত কাব্যের অন্ত্যানুপ্রাসের কথাই ভেবেছিলেন, তার বর্ণবৃত্তের স্বরতরঙ্গ-লীলা তাঁর কানে কি একেবারেই বাজে নি? অবশ্য প্রত্যক্ষ আদর্শ হিসেবে তিনি মিল্টনকেই অনুসরণ করেছিলেন, সংস্কৃত কাব্যকে নয়। তাই তিনি বারবার Paradise Lost পড়বার উপদেশ দিচ্ছেন, নূতন ছন্দের শিক্ষা ঐ সূত্র থেকেই মাত্র লাভ করা সম্ভব। কিন্তু তাই বলে মধুসূদনের ছন্দ জাতীয় ঐতিহ্যচ্যুত ভুঁইফোড় নয়। মোহিতলাল বলেছেন,—

> আমাদের উচ্চারণে, শব্দ বা বাক্যাংশের (Phrase) আদ্য-অক্ষরে একটু ঝোঁক পড়ে, সে কথা বলিয়াছি। আবার হসন্ত-বর্ণের জন্য পূর্ব-অক্ষরে যে একটু মাত্রাবৃদ্ধি হয়, তাহাও দেখিয়াছি। এই দুইটির সাহায্যে, বাংলা ছন্দে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করিবার উপায় পূর্ব হইতেই ছিল। তথাপি, এ পর্যন্ত বাংলা কবিতার ছন্দে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরভঙ্গি প্রশ্রয় পায় নাই—যেন প্রাণের ভাষা, কাব্যচ্ছন্দে ছন্দিত হইতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাঙালীর প্রাণ যে মুক্তিকামনার আবেগে স্পন্দিত হইয়াছিল - ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে, নূতন করিয়া যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে সে অধীর হইয়াছিল, সেই Romantic ভাবোৎসারের ফলে, আর সকল আন্দোলনের মত, কাব্যের আদর্শ-কল্পনায় যে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল—মধুসূদন তাহারই প্রথম ও প্রধান নেতা; তিনিই, যে বস্তুর সহিত ভাষা অপেক্ষা কবিতার ভাবগত যোগ অধিক, সেই ছন্দকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বাক্যভঙ্গি ও উচ্চারণ-রীতির সহিত যুক্ত করিলেন তাহাতে সেই পুরাতন অক্ষর, বা স্বরান্ত বর্ণ, তাহার ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই, নূতন গুণ-সমৃদ্ধিলাভ করিল—বাংলা বর্ণবৃত্ত সত্যকার ছন্দ-গৌরবের অধিকারী হইল। অক্ষরগুলি পূর্বের মতই পায়ে পায় ঠিক

চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মাথা শস্যশীর্ষের মত দুলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের বর্ণবৃত্তেও অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি ছন্দকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল।[৩]

—কবি শ্রীমধুসূদন

তিন। যতিপাতের স্বাধীনতা এবং বৈচিত্র্য মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি প্রধান বিশিষ্টতা। মধুস্থদনের কবিপ্রাণের বিপুল বিস্তার, ঊনবিংশ-শতাব্দী-সুলভ চিত্তমুক্তির আকুতি, সর্ববাধা-উত্তীর্ণকারী বিদ্রোহী মানসিকতা পয়ারের নির্দিষ্ট যতিপাতে যেন কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছিল না। এই ছন্দ যেন বিশেষ করে মধুস্থদনের ন্যায় কবিব্যক্তিত্বের উপলব্ধিতে ধৃত যুগ ও জীবনচেতনাকে যথার্থরূপে প্রকাশ করেছে। যতিপাতের স্বাধীনতাকে অবশ্য মধুস্থদন প্রধানত ব্যবহার করেছেন ভাবের ও আবেগের বিস্তার অনুযায়ী চৌদ্দমাত্রাকে ডিঙিয়ে আরও বহু মাত্রাকে আত্মসাৎ করবার কাজে। স্বল্পতর দৈর্ঘ্যের বাক্যনির্মিতির স্বাতন্ত্র্য তাঁকে আকর্ষণ করে নি।

মিল্‌টন অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহায়তায় কিরূপ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর দীর্ঘ কাব্য Paradise Lost-এ তার চমৎকার পরিচয় দিয়ে সমালোচক Raleigh বলেছেন—

> In a long poem variety is indispensable, and he preserved the utmost freedom in some respects. He continually varies the stresses in the line, their number, their weight, and their incidence, letting them fall, when it pleases his ear, on the odd as well as on the even syllables of the line. The pause or caesura he permits to fall at any place in the line, usually towards the middle, but, on occasion, even after first or ninth syllables. His chief study, it will be found, is to vary the word in relation to the line. No other metre allows of anything like the vanity of blank verse in this regard, and no other meterist makes so splendid a use of its freedom. He never forgets the pattern ; yet never stoops to teach it by the repetition of a monotonous tatoo. —Milton.

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধেও তা যে অনেকখানি প্রযোজ্য একথা অবশ্য স্বীকার্য ॥

॥ তিন ॥

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের বিবর্তন-ধর্ম সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিলে, কি করে নিপুণতায় এবং উৎকর্ষে ক্রমে তা সাফল্যের সর্বসিদ্ধিতে পৌঁছুল তা জানা যাবে। পদ্মাবতী নাটকে প্রথমে তিনি বেশ কয়েকটি পংক্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা লিখলেন। কলি নামক চরিত্রের সংলাপ হিসেবেই এ ছন্দ নাট্যমধ্যে প্রবেশ করেছে। নমুনা হিসেবে একটু উদ্ধৃত হল—

জন্ম মম দেবকুলে,—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর মন্থনে।
ধর্মাধর্ম সকলি সমান মোর কাছে!
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী …

বাংলাভাষার এই প্রথম অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য হল : এক। চরণান্তিক অনুপ্রাস নেই এখানে। দুই। যতিপাতে পয়ারের বন্ধন থেকে মুক্তির চেষ্টা আছে, কিন্তু স্বাধীন যতিপাতের বৈচিত্র্যের সম্যক্ উপলব্ধি এখনও আদৌ আসে নি। তিন। শব্দপ্রয়োগগত বিশিষ্টতা ধ্বনিসঙ্গীত সৃষ্টিতে সার্থক নয়। চার। বিচিত্র উপায়ে accent, quantity এবং syllable-এর সমন্বিত তরঙ্গভঙ্গে সুরহিল্লোলের সম্ভাবনা বড় লক্ষ্য করা যায় না।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে রাজবেশ ধারণ করে এই নবীন ছন্দ উপস্থিত হল। পদ্মাবতী নাটকের পংক্তিগুলির তুলনায় এই ছন্দ যে অনেকখানি মার্জিত ও শ্রুতিসুখকর হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই।—

কত স্বর্ণলতা
সাধিল ধরিয়া আহা, রাঙ্গা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে, কত মহীরুহ
মোহিত মদন-মদে দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতিস্তুতি করিলা কোকিল

কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলিদল,—কে পারে কহিতে ?

এরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিলোত্তমাসম্ভব শুধুমাত্র অন্ত্যানুপ্রাস বর্জনেই সাফল্য অর্জন করে নি, সঙ্গে সঙ্গে যতিপাতে প্রকৃত স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হ্রস্ব-দীর্ঘ কাব্য-বাক্যগঠন বিচিত্রতা এনেছে ছন্দে। তদুপরি শব্দপ্রয়োগকে সুমিত ও মার্জিত করে গীতিসঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু accent ও quantity-র সহায়তায় ছন্দস্পন্দ তরঙ্গিত করে তোলার সাফল্য এখনও আসে নি বলেই কোন কোন ক্ষেত্রে চরণগুলি সঙ্গীতহীন বলে ভ্রমাভাস ঘটায়। যেমন—

বনদেব তপস্বী মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি।

এর প্রথম চরণে 'তপস্বী' 'যথা' শব্দ দুটির প্রয়োগের ফলে স্বর-সুষমা বিপর্যস্ত হয়েছে। আবার—

নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনক কিরীট)
না পারে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয়।

—এর তৃতীয় চরণে 'অন্যান্য' শব্দটি সঙ্গীতকে নিশ্চিত বিনষ্ট করেছে, কিন্তু সমগ্রভাবে এই অংশে সুরঝঙ্কারের অনুপস্থিতির কারণ এসেছে accent, quantity এবং syllable-এর সমন্বয় এবং নিপুণ নিয়ন্ত্রণ এখনও কবির আয়ত্তাধীন নয় বলে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে অমিত্রাক্ষরের ছন্দসঙ্গীত প্রধানত মাধুর্যকে আশ্রয় করেছে, ওজস্বিতাকে নয়, বর্ণনার লিরিক-আস্বাদই সেখানে মুখ্য, নাট্যরস তাতে দানা বাঁধে নি। তিলোত্তমার ছন্দ সম্বন্ধে মোহিতলাল যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

এখানে তেমন ছন্দস্পন্দ অথবা পদমধ্যস্থ বিরাম-যতির কৌশল না থাকিলেও মিলের অভাব আর একটা বস্তুর দ্বারা পূরণ হইয়াছে ; নিপুণ শব্দযোজনায়

জন্য পংক্তিগুলির সুরঝঙ্কারে একটি সুললিত কাব্যচ্ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে ; অর্থাৎ, ইহাই বাংলা কবিতার প্রথম Lyrical Blank Verse……কিন্তু এ অমিত্রাক্ষর—Epic নয়—Lyric-এর উপযোগী ; ইহাতে ভাবের সুরই আছে—প্রাণের সর্ববিধ অনুভূতি ও আকূতির বিচিত্র কণ্ঠস্বর-সঙ্গীত নাই।

—কবি শ্রীমধুসূদন

মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।

এক। তিলোত্তমাসম্ভব পর্যন্ত মাঝে মাঝে যে সঙ্গীতমূর্ছনাহীন অংশ চোখে পড়ে মেঘনাদবধে তা প্রায় অনুপস্থিত। সর্বত্র সমান উৎকর্ষ নেই ঠিকই,' আর থাকা সম্ভবও নয়, কিন্তু সুরের রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসনও বড় ঘটে নি।

দুই। মেঘনাদবধ কাব্যেই accent, syllable এবং quantity-র সমন্বয়-চমৎকারিত্বে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গিতে পংক্তিগুলি বেজে উঠেছে।[৪] যুক্তাক্ষরবহুল শব্দচয়ন, অনুপ্রাস-যমকাদির ব্যবহারও এই কাব্যে নিপুণ সাফল্য লাভ করেছে। বর্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যে সব লক্ষণের বিষয় আলোচনা হয়েছে তাতে মেঘনাদবধের পরিণত ছন্দ-গৌরবের পরিচয়ই প্রকাশিত।

তিন। তিলোত্তমাসম্ভবের তুলনায় মেঘনাদবধের ছন্দ অনেক পরিণত এই কারণে যে, শুধুমাত্র গীতের আবেগোচ্ছ্বাস ও ললিত সৌকুমার্য নয়, সর্ববিধ ভাব ও আকূতি, বিশেষ করে ওজস্বিতা-গাম্ভীর্যকে সম্পূর্ণত প্রকাশ করবার শক্তি সে আয়ত্ত করল। শব্দচয়নের যুক্তাক্ষরবহুলতার দিকে প্রবণতা এদিক দিয়ে কবির উদ্দেশ্য-চরিতার্থতায় অনেকখানি সহায়তা করল।[৫]

মেঘনাদবধের পরিণত অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও একটি প্রধান ত্রুটির দিকে বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন—

> Mr. Dutta, however, is not faultless. He wants repose. The winds rage their loudest when there is no necessity for the lightest puff. Clouds gather and pour down a deluge, when they need do nothing of the kind ; and the sea grows terrible in its wrath, when everybody feels inclined to resent its interference. All this bombast is unworthy of Mr. Dutta's genius and cultivated taste.

এই অভিযোগ তাঁর ভাব-কল্পনার বিরুদ্ধে, ছন্দসঙ্গীতের বিরুদ্ধেও। "যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে" জাতীয় বেশ কিছু-সংখ্যক পংক্তির কথা এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়বে। অনুপ্রাস এবং যমক ব্যবহারের মাধ্যমে যে ছন্দ সঙ্গীত সৃষ্টির সাধনা তিনি করেছেন অমিত্রাক্ষরে, অতিব্যবহারে তাই মাঝে মাঝে এই ছন্দকে ক্লিষ্ট করেছে মেঘনাদবধ কাব্যে। এই ত্রুটি ক্রুটি থেকে বীরাঙ্গনার অমিত্রাক্ষর প্রায় মুক্ত।

বীরাঙ্গনার অমিত্রাক্ষর ছন্দ কড়ি ও কোমলে সমান বেজেছে। এ ছন্দে বীর্য আছে, কিন্তু সে বীর্য প্রায় কখনই আস্ফালনে পরিণত হয় নি। এ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ Lyric ও Epic-এর সঙ্গীতকে মিলিয়েছে, তিলোত্তমাসম্ভবের ন্যায় Lyric-এর রাজ্যে মাত্র সীমিত থাকে নি। এ কারণেই বীরাঙ্গনাকাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ উৎকর্ষের শীর্ষে উঠেছে এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে॥

॥ চার ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ারের সঙ্গে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের কিঞ্চিৎ তুলনা করা চলে। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ব্যর্থ অনুকরণ কিংবা গিরিশচন্দ্রের হাতে গৈরিশছন্দ নামে এর যে বিকৃতি ঘটেছিল তার সঙ্গে মধুসূদনের ছন্দের তুলনা করে লাভ নেই। কারণ তাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা তার স্রষ্টার প্রাণস্বরূপের কোনো নূতন পরিচয় মিলবে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ার মূলত মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে পৃথক্ জাতের বস্তু। এ পার্থক্য শুধুমাত্র অন্ত্যানুপ্রাসের ক্ষেত্রে নয়, অভ্যন্তরীণ accent, quantity এবং syllable-এর সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও। আসলে একটু ভাবগম্ভীর এবং বিবৃতিধর্মী কবিতার বেলাতে এই ছন্দ ব্যবহার করলেও রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ার মূলত গীতিধর্মী, রোমান্টিক কবির মনোভাবের যথার্থ বাহন। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে গীতিধর্ম ও মহাকাব্যিক ক্লাসিক ধর্ম সমন্বয়ের সাধনাই লক্ষিত। সব মিলে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের রোমান্টিক সঙ্গীতার্তি, এবং সুমিত সৌন্দর্যচেতনায় তাঁর প্রবহমান পয়ারে সুরভিত। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের যতি ও সঙ্গীতের মুক্তিতে যেমন রোমান্টিক গীতিধর্ম রণিত, সুনিয়ন্ত্রিত accent, quantity-র মধ্যে তেমনি ক্লাসিকাল সংযম প্রতিফলিত। এই ছন্দের অন্ত্যানুপ্রাস লোপে যেমন মধুসূদনের

বিদ্রোহী কবিপ্রাণের মুক্তির দ্যোতনা, ছন্দস্পন্দ সৃষ্টিতে ও শব্দচয়নের নিপুণতায় তেমনি শিল্পী-চেতনার স্বেচ্ছা-বৃত সংযম সাধনা এবং তারই অপর নাম সৌন্দর্য।

---

১ "The measure is English Heroic Verse without Rime, as that of Homer in Greek, and of Virgil in Latin ; being no necessary adjunct or true ornament of Poem or good verse, in longer works especially, but the invention of a barbarous Age to set off wretched matter and lame metre ;......Not without cause, therefore, some both Italian and Spanish Poets of prime note, have rejected Rime both in longer and shorter works, as have also long since our best English tragedies, as a thing of itself, to all judicious ears, trivial and of no true musical delight, which consists only in apt Numbers, fit quantity of syllables, and the sense variously drawn out from one verse into another, not in the jingling sound of like endings, a fault avoided by the learned Ancients both in poetry and all good oratory.. ... '

—John Milton

২ উদ্ধৃত অংশগুলি রাজনারায়ণ বসুকে লেখা কয়েকটি পত্র থেকে গৃহীত। তিলোত্তমা কাব্য রচনা তখন সমাপ্ত হয়েছে, মেঘনাদবধ কাব্য লেখা চলছে।

৩ মোহিতলাল মজুমদার মধুসূদনের ছন্দ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

৪ মোহিতলাল মজুমদারের 'কবি শ্রীমধুসূদন' দ্রষ্টব্য।

৫ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সমালোচনকালেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই নবছন্দের ভাবগৌরব ও ওজোগুণ প্রকাশের সুযোগ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। তিলোত্তমাসম্ভবের অমিত্রাক্ষর অন্যান্য বাংলা কাব্যের তুলনায় ভাবগৌরব ও ওজোগুণে সমৃদ্ধ হলেও, সত্যকার উচ্চকাব্যোচিত ওজস্বিতা এসেছে মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষরে।